কাঁটায়-কাঁটায়

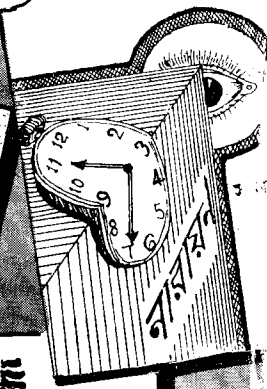

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কাঁটায়-কাঁটায়

নারায়ণ সান্যাল

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.12.16 13:54:25 +06'00'

কৈফিয়ৎ

কাঁটা-সিরিজ লেখা শুরু করি সাতের দশকে, **নাগচম্পা** উপন্যাসটি চিত্রায়িত হবার অব্যবহিত পরে। ঐ নাগচম্পা-কাহিনীতেই ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর প্রথম আবির্ভাব। তখন তিনি ছিলেন কনফার্মড-ব্যাচিলার এবং বৃদ্ধ। তিনি উত্তম না অধম এ প্রশ্ন আমার মনে আদৌ জাগেনি। সুধীজন মাত্রেই জানেন চিত্রস্বত্ব বিক্রয় করার সঙ্গে জ্যান্ত-পাঁঠা বিক্রয়ের পার্থক্য নেই। অতঃপর সেই অবোলা জীবটিকে মাথার দিকে কাটা হবে অথবা ল্যাজের দিকে, তা স্থির করার দায়িত্ব চিত্র-পরিচালকের। **"যদি জানতেম"** ছায়াছবির উদ্বোধনের দিনে ছবি দেখতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, পি. কে. বাসু অধম নন, **"উত্তম"**। ফলে বৃদ্ধ নন, এবং তাঁর স্ত্রী বর্তমান, যদিও পঙ্গু। হুইল-চেয়ারে আসীনা। ব্যাপারটা মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর উপায় রইল না। তাই **'নাগচম্পা'** হচ্ছে কাঁটা-সিরিজের ট্রায়াল বল—এলেবেলে খেলা।

কাঁটা-সিরিজ লিখতে শুরু করি নিতান্ত খেয়ালবশে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার যে প্রবণতা আমার অন্তর্লীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—বোধকরি তারই তাগিদে। প্রথম কাহিনী ক্রিস্টি-কীর্তি **"মাউস-ট্র্যাপ"**-এর ছায়া-দিয়ে-গড়া: **"সোনার কাঁটা"**। তার কৈফিয়তে প্রসঙ্গত লিখেছিলাম (2.10.74):

> নাগচম্পা উপন্যাসে ঐ বাসু-সাহেব চরিত্রটাকে আমি রূপায়িত করেছিলাম একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর **'ব্যোমকেশ বক্সী'** চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছিলেন স্যার আর্থার কনান ডয়েল-এর বিশ্ববিশ্রুত গোয়েন্দা **শার্লক হোমস**-এর ছায়া দিয়ে। শার্লক হোমস্-এর সহকারী ডাক্তার ওয়াটসনের প্রতিরূপ-রূপে অজিতবাবুকেও পেয়েছে বাংলা সাহিত্য। গোয়েন্দা গল্প যে চপল লঘু-সাহিত্য নয় এটা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন শরদিন্দু। তাঁর সাহিত্য আমার শিল্প-প্রচেষ্টাকে নানা ভাবে, নানা যুগে প্রভাবিত করেছে। তাঁর **ঝিন্দের বন্দী**তে বিদেশী কাহিনীকে খোল নলচে পালটে বাঙলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় আমি এক সময়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার ফলশ্রুতি আমার **মহাকালের মন্দির**। শুধু ভাব নয়, সেখানে শরদিন্দুর ভাষাও আমি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি। আরও পরিণত বয়সে লিখেছি **আবার যদি ইচ্ছা কর**---সেখানে ভাষার বন্ধন আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম।
>
> এবারও শরদিন্দুবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি একটি বিদেশী গোয়েন্দাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি বাঙলা সাহিত্যে—যে চরিত্রটি স্ট্যানলি গার্ডনার-সৃষ্ট চরিত্র পেরী মেসন, 'বার-এ্যাট-ল'।গার্ডনারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহস্যমোচন হয়েছে যবনিকাপাত-মুহূর্তে, আদালতের কক্ষে, ওকালতি-প্যাঁচে।
>
> ব্যোমকেশ চিরতরে অবসর নিয়েছেন। অজিতবাবুর কলম আজ স্তব্ধ। বাঙলা সাহিত্যের একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেল। সেই গুরুতর অভাবটা পূরণ করতে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান কোনও সাহিত্যিক অগ্রসর হয়ে আসছেন না। কিরিটী, পরাশর বর্মা প্রভৃতিরাও এখন আত্মগোপন করে রয়েছেন। যেন মনে হচ্ছে এই দশকের বাঙলাদেশে খুন-জখম-রাহাজানি সব বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রিমিনালরা বুঝি সব কারাপ্রাচীরের ওপারে—মিসায় আটক পড়েছে!
>
> ফলে এই অক্ষম প্রচেষ্টা—'পি. কে.বাসু সিরিজ'এর অবতারণা। এই সিরিজে নাগচম্পাকে প্রথম কাহিনী হিসেবে ধরে নিলে বর্তমান কাহিনী হচ্ছে দ্বিতীয় কাহিনী।
>
> পি. কে. বাসু যদি পাঠকদের মনোহরণে সমর্থ হন তাহলে তাঁর পরবর্তী কিছু কীর্তিকাহিনী শোনানোর বাসনা রইল।

শরদিন্দু আমাকে কী প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিলেন—অন্তত গোয়েন্দা কাহিনী ও ঐতিহাসিক কাহিনীর ক্ষেত্রে—তা বোঝা যাবে আমার এই গোয়েন্দা সিরিজের প্রথম বইটির উৎসর্গ-পত্র থেকে। *"কাঁটায়-কাঁটায়"* সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের পরে প্রতিটি কাহিনী হয়তো পৃথকভাবে আর পুনঃপ্রকাশিত হবে না। তাই এই সিরিজের প্রথম সংকলনগ্রন্থে প্রথম কাহিনীর উৎসর্গপত্রটি এখানে পুনঃপ্রকাশিত করা বুদ্ধিমানের কাজ:

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম
ব্যোমকেশ বক্সী-মশাই,

তোমার কীর্তিকাহিনী আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জেনেছি কয়েক দশক ধরে। গোয়েন্দা-কাহিনীকে তুমি ক্লাসিকাল সাহিত্যের সমপর্যায়ে উন্নীত করেছিলে। মৈনাককে তুমি মগ্ন হয়ে থাকতে দাওনি, দুর্গের রহস্য তুমি ভেদ করেছিলে, চিড়িয়াখানার কলকাকলীতে তুমি বিভ্রান্ত হওনি, শঙ্করের কাঁটা কার হৃৎপিণ্ডের কোন দিকে বিদ্ধ হচ্ছে তা একমাত্র তোমারই নজরে পড়েছিল। তুমি গোয়েন্দা নও, তুমি ছিলে সত্যান্বেষী! 'অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে তুমি আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেলে চিরদিনের জন্য! তাই তোমাকেই স্মরণ করছি সর্বাগ্রে।

গ্রন্থকারের তরফে
পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল
২।১০।১৯৭৪

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে একটি ব্যক্তিগত বেদনার কথা জানাই। ব্যোমকেশ বক্সী মশাই তাঁর জীবনের শেষ 'কেস'টার সমাধান করে যেতে পারেননি। শরদিন্দু অমনিবাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রদ্ধেয় প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন:

> ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে শরদিন্দুবাবু কলকাতায় এসে মাসখানেক ছিলেন। পুণায় ফিরে গিয়ে তিনি **"বিশুপাল বধ"** শুরু করেছিলেন। গল্পটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। পড়লে মনে হয় প্রায় অর্ধেক লেখা বাকি আছে। উত্তর কলকাতার একটি থিয়েটারের স্টেজে একজন অভিনেতার খুনের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা কেবল আরম্ভ হয়েছে। এই গল্পে আমার নামের সঙ্গে মিল, শরদিন্দুবাবু হয়তো বলতেন স্বভাবের সঙ্গেও মিল, একটি চরিত্র আছে। সে ব্যোমকেশকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রসন্নচিত্তে গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে সত্যবতীর বাজারের ব্যাগ নিজের হাতে বয়ে নিয়ে আসছে। গল্পটির পাণ্ডুলিপি লেখকের জীবদ্দশায় দেখিনি। তবে তাঁর মুখে শুনেছিলাম তিনি আমার নাম ব্যবহার করেছেন। আমার ক্ষীণ আপত্তি টেকেনি। এই গল্পে প্রতুলবাবু নামের ব্যক্তিটিকে পুলিসের জেরায় নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু গল্পটি ততদূর এগোয়নি। থিয়েটারের প্রম্পটার কালীকিঙ্কর দাসের জবানবন্দী আরম্ভ হয়েছে মাত্র। থিয়েটারের লোকের জবানবন্দী শেষ হলে অন্য সবার পালা আসত। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অসমাপ্ত ভূতের গল্প রেখে গিয়েছিলেন, তার নাম নিশীথ-রাক্ষসীর কাহিনী। গল্পটির সূত্রপাত কেবল আরম্ভ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে কোনও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সেটিকে অন্য একজনকে দিয়ে সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।
>
> শরদিন্দবাবুর প্রকাশক সে চেষ্টা করেননি। বোধহয় ভালই করেছেন।

অগ্রজপ্রতিম মহাপণ্ডিতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম অসহায় ব্যোমকেশ বক্সী-মশাইকে! কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে শরসজ্জায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের মতো; বরং বলা উচিত 'জকি'র- দোষে শেষ-লেংথে হুমড়ি-খেয়ে-পড়া চির-অপরাজেয় রেসের ঘোড়ার মতো। ওদিকে অজিতের চিতা জ্বলছে, এদিকে ব্যোমকেশ সব্যসাচীর শেষাবস্থায়—গাণ্ডীব তূলবার ক্ষমতাও নেই তাঁর, অথচ অসহায় গোয়েন্দার চোখের সামনে যাদবকুলবধূ অপহরণকারীর অট্টহাসি হাসছে বিশুপালের হত্যাকারী। এক রবিবাসরীয় আসরে কথাটা বলেছিলাম শ্রদ্ধেয় প্রতুলবাবুকে। উনি সহাস্যে প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন, আপনি গল্পটা কীভাবে শেষ হত তা আন্দাজ করতে পারেন?

জবাব দিইনি। অর্থাৎ দিয়েছিলাম—লিখিত জবাব—পরের অধিবেশনে। পরে বিশুপাল বধের শেষাংশটি উনি আমাকে প্রত্যর্পণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। প্রতুলবাবুর সবকয়টি শর্তই শেষাংশে মানা হয়েছিল—অজিতের গাড়ি হয়েছিল, সে-গাড়িতেই তার মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া

হয়, 'প্রতুল' নামধারী ভালমানুষ অধ্যাপকটিকে অহৈতুক পুলিসের জেরায় পড়তে হয়। আর অন্তিমে বিশুপালের হত্যাকারীর হাতে হাতকড়া পড়ে।

ঘটনাচক্রে একথা বন্ধুবর সমরেশ বসুর কর্ণগোচর হয়। সে আমার কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করে। সমরেশ তখন 'মহানগর' পত্রিকার সম্পাদক। পূজাসংখ্যায় 'বিশুপালবধ-উপসংহার' নামে কাহিনীর শেষাংশটি ছাপা হয়। সে সময় শরদিন্দুর সহধর্মিণীও প্রয়াত। দুঃসংবাদটা আমার জানা ছিল না। তাঁর কাছে অনুমতি ভিক্ষা করি। জবাব পাই না। পরে যাঁরা শরদিন্দুর সাহিত্যকীর্তির গ্রন্থস্বত্ব আইনত ভোগ করার অধিকারপ্রাপ্ত হন তাঁরা আমাকে গ্রন্থাকারে ঐ উপসংহারটুকু প্রকাশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। শরদিন্দুর ভক্ত হিসাবে ওভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার অধিকার আজ আমার আইনত নেই। সে-ক্ষোভ কিছুটা মিটলো এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি রচনা করে।

আরও দুটি কথা এই প্রসঙ্গে বলব। এক: পি. কে. বাসুর কোনও কেস অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় যদি তাঁর সৃষ্টিকর্তার কলম হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় (ঐ যাকে বলে, "প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে...") তাহলে অধম গ্রন্থকারের কোন স্বত্বাধিকারীর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না—কপি-রাইট আইন যাই বলুক। সে-ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের প্রকাশক অনুজপ্রতিম শ্রীমান সুধাংশু দে সে-কালীন কথাসাহিত্যিকদের ভিতর থেকে বেছে নিয়ে কোন একজনকে দায়িত্ব দেবে কাহিনীটি সমাপ্ত করার জন্য। অন্যের প্রয়াণে পি. কে. বাসু ব্যর্থ হয়ে থাকবেন আবহমানকাল—এটা আমার বরদাস্ত হবে না। বরদাস্ত করার হিম্মত থাক-না-থাক! দ্বিতীয় কথা: ঐ 'আবহমানকাল' শব্দটা ব্যোমকেশ বক্সী-মশাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীমান সুধাংশু দে-কে আমার অনুরোধ, সে বা তার স্থলাভিষিক্ত স্বত্বাধিকারী যেন এই গ্রন্থের "এন-এথ"তম এডিশনে 'বিশুপাল বধ-উপসংহার'কাহিনীটি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করে 22.9.2020 তারিখের পরে। যখন কপিরাইট-আইনের বেড়াজালের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যোমকেশ হবেন দেশের সম্পদ, দশের সম্পদ!

এ পর্যন্ত যতগুলি গোয়েন্দা-কাহিনী লিখেছি তার সবগুলি বর্তমান সংকলন-গ্রন্থে প্রকাশ করা গেল না। এর পরবর্তী অনুজ সংকলনগ্রন্থটি আসন্ন। তারপর তিন-নম্বর গ্রন্থ সংকলন লিখবার সুযোগ আদৌ হবে কি না খোদায় মালুম।

একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য যে, বিভিন্ন কাহিনীর মৌল-কাঠামো এবং গোয়েন্দা-কাহিনীর প্যাঁচ বিষয়ে মৌলিকতার কোনও দাবী আমার নেই। মাকড়শার জাল তার নিজস্ব কীর্তি, মৌমাছির মৌচাক তা নয়। যাঁরা সাহিত্যে মৌলিকতা ভিন্ন রসাস্বাদনে অক্ষম তাঁরা মাকড়শার জাল চর্বণ করতে থাকুন। আমার মধুকর-বৃত্তিতে অহেতুক বাধাদান করবেন না। অকুণ্ঠভাষায় স্বীকার করি: অধিকাংশ কাহিনী ইংরেজি ভাষায় লেখা নানান ডিকেটটিভ কাহিনীর হচপচ। যাঁরা কনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি বা স্ট্যানলে গার্ডনার-এর মূল কাহিনীর রসাস্বাদনে অক্ষম তাঁরা যদি আমার গ্রন্থপাঠে... তাই বা কেন? অ্যান্টনি হোপের **'দ্য প্রিজনার অব জেন্দা'** তো আমার পড়া ছিল, তবু কেন রুদ্ধ-নিশ্বাসে শেষ করেছিলাম শরদিন্দুর **"ঝিন্দের বন্দী"?**

কাঁটা-সিরিজ বিষয়ে পাঠিকা-পাঠকদের কাছ থেকে আমি সচরাচর দুই জাতের চিঠি পাই। পত্রলেখকরা যেন দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। দীর্ঘদিন যদি শিল্প-ভাস্কর্য- স্থাপত্য-বিজ্ঞান জাতীয় ওজনদার বিষয়ে ডুবে থাকি তাহলে প্রথম দলের কাছ থেকে তাগাদা আসে: 'বাসু-সাহেবের 'অবিচুয়ারিটা' তো *স্টেটস্‌ম্যানে* দেখিনি। উনি কেমন আছেন?'

দ্বিতীয় জাতের পত্রবন্ধুরা প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে তিরস্কার করেন। বলেন, "আপনার নিজের জবানবন্দি অনুসারে অত অত গুরুতর বিষয় মগজস্থ রয়েছে—না-মানুষী 'বিশ্বকোষের' যাবতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী, রূপমঞ্জরীর দ্বিতীয় খণ্ড, লেঅনার্দো, দাক্ষিণাত্যে ময়দানবের স্থাপত্যকীর্তি ইত্যাদি প্রভৃতি: আর আপনি ছেলেখেলা করছেন? ছি-ছি-ছি নয়, এমনকি য-ফলা-যুক্ত ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যাও নয়, বলতে ইচ্ছে করে তোবা! তোবা!"

আমি আপনমনে রামপ্রসাদী ভাঁজি:

'সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি...'

নারায়ণ সান্যাল

1.12.90

সোনার কাঁটা

রচনাকাল: 1974

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর 1974

প্রচ্ছদশিল্পী: খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ: ব্যোমকেশ বক্সী

ক্রিররং-ক্রিং...ক্রিররং-ক্রিং!

কোনও মানে হয়? দার্জিলিঙ-এর শীত। সকাল ছটা বেজে দশ। ছুটির দিন—দোশরা অক্টোবর, 1968। গান্ধীজীর জন্মদিবস। সব সরকারী কর্মচারী আজ বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোবে—শুধু ওরই নিস্তার নেই! এই সাত-সকালে টেলিফোনটা চিল্লাতে শুরু করেছে।

ক্রিররং ক্রিং...ক্রিররং-ক্রিং!

লেপটা গা থেকে সরিয়ে খাটের উপর উঠে বসে নৃপেন ঘোষাল—দার্জিলিঙ সদর-থানার দারোগা। দেখে, পাশের খাটে লেপের ফাঁক থেকে সুমিতাও একটা চোখ মেলে তাকাচ্ছে। ঘোড়া দেখলেই মানুষে খোঁড়া হয়। নৃপেন আবার সটান শুয়ে পড়ে বলে—দেখতো?

সুমিতা লেপটা টেনে দেয় মাথার উপর। স্বগতোক্তি করে একটা, দেখতে হবে না, রং নাম্বার!

অগত্যা আবার উঠে বসতে হয়। সুমিত্যা লেপের মায়া ত্যাগ করবে না। রং নাম্বার ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলে তো বাঁচা যেত। ডি-সি-র ফোন হতে পারে, পুলিস সুপারের হতে পারে—কে জানে, ট্রাঙ্ক-কল কিনা! হাড়-কাঁপানো শীত অগ্রাহ্য করে উঠে পড়ে নৃপেন। হাত বাড়িয়ে হুক থেকে গরম ড্রেসিং-গাউনটা **নামায়।** গায়ে চড়াতে চড়াতে চটিটা পায়ে গলাতে থাকে।

সুমিতা মুখটা বার করে বলে, বেচারী!...কেন ঝামেলা করছ। শুয়ে থাক। ও আপনিই থেমে যাবে।

কোথায় কোন সিঁধেল চুরি হয়েছে—

—সিঁধেল চুরিই হোক, আর বউ-চুরিই হোক—আরও বারো ঘন্টা এ নরক যন্ত্রণা আমাকেই ভোগ করতে হবে—

ড্রেসিং গাউনের ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে ঘর ছেড়ে 'হল'-কামরায় পৌঁছানোর আগেই টেলিফোনটা দাঁত কিড়মিড় করা বন্ধ করল।

—যা বাব্বা! ঠাণ্ডা মেরে গেলি?—মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পড়ে নৃপেন।

অনেকক্ষণ বাজছিল অবশ্য। হয়তো ও পক্ষের মানুষটা ভেবেছে—যাকগে; মরুগগে—এখন আর ও-লোকটা কী ভেবেছে তা নিয়ে নৃপেনের কী মাথা-ব্যথা? লোকটা যখন টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে তখন নৃপেনের দায়িত্ব খতম। ঘরে ফিরে আসে সে। ড্রেসিং গাউনটা খুলে আবার হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখে। হঠাৎ ওর দৃষ্টি চলে যায় কাচের জানলা দিয়ে উত্তর দিকে। অপূর্ব দৃশ্য! নির্মেঘ আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় মাথায় লেগেছে আবীরের স্পর্শ। উদয়-ভানুর প্রথম জয়টীকা। এ দৃশ্য দেখতে এতক্ষণে নিশ্চয় ভিড় জমেছে টাইগার হিলের মাথায়—দূর দূরান্তর থেকে এসেছে যাত্রীদল, নৃপেনের কিন্তু কোন ভাবান্তর হল না। স্ত্রীকে ডেকে জানালো না পর্যন্ত খবরটা। একটা হাই তুলল সে। জানলার পর্দাটা টেনে দিয়ে উঠে বসল খাটে। লেপটা নিল আবার। নৃপেন ঘোষাল আজ একাদিক্রমে চার বছর আছে এই দার্জিলিঙে। সে হাড়ে হাড়ে জানে ভোর সকালে ভিখারী কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথার ঐ দগ্‌দগে ঘা ব্যান্ডেজ-খোলা কুষ্ঠ রুগীর মত সব্বাইকে দেখায়!

দার্জিলিঙ ওদের কাছে পচে গেছে। ঝাঁকার তলায় চেপটে যাওয়া টমেটোর মত লাল ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙের খেলায় আর ওদের কোন আকর্ষণ নেই। দু' বছর ধরে ক্রমাগত বদলির জন্য তদ্‌বির আর দরবার করে এসেছে। এতদিনে মা কালী মুখ তুলে চেয়েছেন। বদলির অর্ডার এসেছে। মায় ওর সাবস্টিট্যুট পর্যন্ত এসে হাজির। এই হতভাগা দার্জিলিঙে আজই ওর শেষদিন। আর মাত্র বারো ঘন্টা—হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম্ বারো ঘন্টা এ নরক যন্ত্রণা ওকে ভোগ করতে হবে। ফোরনুনেই রমেন গুহ ওর কাছ থেকে চার্জ বুঝে নেবে! আঃ! বাঁচা গেল। বদলি হয়েছে খাস কলকাতায়—একেবারে লালবাজারে। বলা যায় একরকম প্রমোশনই। নৃপেন লেপের নিচে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

সুমিতা বিজ্ঞতা প্রকাশ করে, দেখলে তো? বললাম রঙ-ন্যাষ্বার!

—কোথায় আর দেখলাম? লোকটা তো বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিল।

—গরজ থাকলে ছাড়তো না। আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকিন। কাল রাত দুটো পর্যন্ত যা দাপাদাপি করেছ!

তা করেছে। মালপত্র প্যাকিং হয়ে পড়ে আছে ঘর জুড়ে। ঘরে, হল-কামরায়, করিডরে। নানান আকারের প্যাকিং কেস আর ক্রেট। চার-বছরের সংসার, গুছিয়ে তোলা কি সহজ কথা? আজই ও-বেলায় নৃপেনরা নামবে। নামবে মানে কলকাতা-মুখো রওনা দেবে। মালপত্র যাবে ট্রাকে! হরি সিং-এর ট্রাক ঠিক এগারোটার সময় এসে দাঁড়াবে। ওরা যাবে জীপে। শিলিগুড়ি পর্যন্ত। তারপর ট্রেনে। রিজার্ভেশন করানোই আছে।

ওর সাকসেসার রমেন গুহ এসে পৌঁছেছে গত কাল। রমেন ছেলে ভাল, নৃপেন একথা স্বীকার করবে। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দিয়েছে। বস্তুত মাসের শেষদিনে। আর কেউ হলে অন্তত একটা দিন অপেক্ষা করত। মাসমাহিনাটা নগদে হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়ত। রমেন তা করেনি। বেচারি লাস্ট পে সার্টিফিকেট কবে পাবে কে জানে? হীরের টুকরো ছেলে! কাল দুপুরেই এসে পৌঁছেছিল দার্জিলিঙে। হোটেলে মালপত্র নামিয়ে এসে দেখা করেছিল নৃপেনের সঙ্গে। নৃপেন বলেছিল, আবার হোটেলে উঠতে গেলে কেন রমেন? এ ফ্ল্যাটে তো তিনখানা ঘর। অসুবিধা কিছুই হবে না। তুমি হোটেল ছেড়ে এখানে চলে এস।

রমেন গুহ রাজী হয়নি। জবাবে বলেছিল, কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছ ভাই? তুমি বাঁধাছাদায় ব্যস্ত থাকবে, মিসেস ঘোষালও তাঁর বড়ি-আচারের বয়াম নিয়ে বিব্রত থাকবেন—এর মধ্যে উট্‌কো গেস্ট—

বাধা দিয়ে সুমিতা বলেছিল, আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। আমরা যদি ভাতে-ভাত খাই, আপনাকেও তাই খাওয়াব।

—আমি তা খাব কেন?—জবাবে হেসে ও বলেছিল, রীতিমত বিরিয়ানি পোলাও আর মুরগির রোস্ট চাই আমার। কলকাতায় বদলি হচ্ছেন! ইয়ার্কি নাকি?

এক গাল হেসে সুমিতা বলেছিল, বেশ তাই খাওয়াব। হোটেলের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আসুন আপনি।

রমেন মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল; আমারও বদলির চাকরির মিসেস ঘোষাল। শেষ দিনটা কীভাবে কাটে তা কি আমি জানি না? আপনার হাতে পোলাও-মাংস নিশ্চিত খাব, তবে এখানে নয়! আপনারা কলকাতায় গিয়ে গুছিয়ে বসুন; আমি যখন সরকারী কাজে কলকাতায় ট্যুরে যাব, তখন ডব্‌ল্ ডি.এ. ক্লেম করব আর আপনার হাতের রান্না খাব। বুঝলেন?

নৃপেন জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় উঠেছ তুমি? কোন হোটেলে?

—'হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা'। ম্যাল-এর ওপাশে। চেন?

—খুব চিনি। দার্জিলিঙ আমার নখদর্পণে। ওর ম্যানেজার তো একজন সিন্ধি ভদ্রলোক, নয়? কী যেন নাম?

—ম্যানেজারকে দেখিনি, তবে কাউন্টারে যে ছোকরা বসেছিল সে বাঙালী। মালপত্র নামিয়ে রেখেই আমি তোমার এখানে চলে এসেছি—

সুমিতা আবার বলে, বেশ, হোটেলে রাত কাটাতে চান কাটান, রাত্রে কিন্তু আমার এখানেই খেতে হবে।

—কেন ঝুট-ঝামেলা পাকাচ্ছেন সখ করে?

—ঝামেলা নয় মোটেই শুনুন, আমি আজ বাঁধব না। বাসন-পত্রও সব প্যাক হয়ে গেছে। হোটেলে খাবার অর্ডার দেব। আপনার মুখ ফস্‌কে যখন কথাটা বেরিয়ে গেছে তখন আজই আপনাকে খাওয়াব—ঐ বিরিয়ানি পোলাও আর মুরগির রোস্ট! আজই! এখানেই—

রমেন তবু বলে, কিন্তু আমার শর্তটা ছিল অন্যরকম। হোটেলের রান্না নয়, আপনার শ্রীহস্তপক্ক—

বাধা দিয়ে সুমিতা বলে ওঠে, না শর্ত মোটেই তা ছিল না। শর্ত ছিল—আপনি যখন কলকাতায় গিয়ে ডব্‌ল্ ডি.এ ক্লেম করবেন তখন আমার হাতের রান্না খাবেন। তাই নয়?

রমেন হেসে ফেলেছিল; ঠিক কথা! আমারই ভুল!

—ক্রিররং-ক্রিং—ক্রিররং-ক্রিং!

আবার উৎপাত! এ তো মহা বখেড়া হল দেখা যাচ্ছে। নৃপেন কাতরভাবে সুমিতার দিকে তাকায়। সুমিতা উঠে বসে এবার। চীৎকার করে বলে—না, নৃপেনকে নয়, টেলিফোনকে—মশাই শুনছেন! ঘন্টাছয়েক পরে ফোন করবেন! ও.সি-সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন, তখন থাকবেন না!

যন্ত্রটা এ উপদেশে কান দিল না। একগুঁয়েমি চালিয়ে চলে, ক্রিররং-ক্রিং!

—দুত্তোর নিকুচি করেছে! উঠে পড়ে সুমিতা! দুম দুম করে পা ফেলে চলে আসে হল-কামরায়। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলে, বলুন?...হ্যাঁ, আছেন। না, ঘুমোচ্ছেন না। আপনি কোথা থেকে বলছেন?

নৃপেন কর্ণময়।

—কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল থেকে? মিস্টার গুহ বলছেন?...না? কী!...সে কি!!

এবার খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে নৃপেন। ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়াবার কথা আর মনেই থাকে না। সুমিতার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে নৃপেন দৌড়ে এসে বলে, কী হয়েছে সুমিতা?

সুমিতা জবাব দেয় না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে! শীতেই কিনা বোঝা গেল না, সে রীতিমত কাঁপছে। দ্রুতহাতে নৃপেন রিসিভারটা কেড়ে নেয়, বলে, ও.সি সদর বলছি। কে আপনি?...ইয়েস! কী? কী বলছেন মশাই! অসম্ভব!!

সুমিতা ইতিমধ্যে বসে পড়েছে সামনের চেয়ারখানায়।

দীর্ঘ সময় নৃপেন আর কিছু বলে না টেলিফোনে, শুধু শুনে যায়। তারপর বলে, কোন কিছু ছোঁবেন না। ঘরটা তালাবন্ধ করে রাখুন। আমি পনের মিনিটের ভিতর আসছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সে ঘুরে দাঁড়ায়। সুমিতার মুখোমুখি। বলে, শুনলে?

সুমিতা জবাব দেয় না। মাথাটা নাড়ে শুধু।

—কী হতে পারে বলত? হার্টফেল? থ্রম্বোসিস্?

—আমি...আমি এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। কাল রাত্রেও ভদ্রলোক কত হাসি-মশকরা করে গেলেন। ওর ঐটো প্লেটটা পর্যন্ত এখনও—

নৃপেনের দৃষ্টি চলে যায় ডাইনিং টেবিলে। তিনটি ভুক্তাবশিষ্ট প্লেট। রমেন গুহর প্লেটে পাশাপাশি দু'খানা ঠ্যাঙ! রাত পৌনে দশটা নাগাদ রমেন হোটেলে ফিরে যায়। আর আজ সকাল ছ'টা দশে সে লোকটা বেঁচে নেই? ইম্পসিবল্!

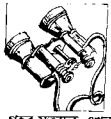

দুই

সকাল সাড়ে সাতটা। হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার ম্যানেজারের ঘরে জমিয়ে বসেছিল নৃপেন। এখন আর ঘুম-ঘুম-চোখ স্লিপিং-সুট পরা নৃপেনবাবু নয়, ধরা-চূড়া-সাঁটা দার্জিলিঙ সদর থানার জাঁদরেল ও.সি.। সমস্ত হোটেলটা সে ইতিমধ্যে মোটামুটি ঘুরে দেখেছে। তন্নতন্ন করে [illegible] করেছে দোতলার তেইশ নম্বর কামরাটা। রমেন গুহর মৃতদেহ এখনও অপসারিত হয়নি। ওর মৃত্যুশীতল পা দুটো দেখে নৃপেনের মনে পড়ে গেল একটু আগে দেখা একটা ডিনার প্লেটে পাশাপাশি শোয়ানো ভুজাবশিষ্ট মুরগির ঠ্যাঙ-জোড়া। পুলিস ফটোগ্রাফার এসে ফটো নিয়ে গেছে। দেহটা ময়না-তদন্তের জন্য পাঠানো হয়নি এখনও। ইতিমধ্যে টেলেক্স চলে গেছে ক'লকাতায়, লালবাজার কন্ট্রোলরুমে। হয়তো রমেন গুহর পরিবারেও এতক্ষণে দুঃসংবাদটা পৌঁছে গেছে। যতক্ষণ না কেউ এসে পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ দেহটা ঠাণ্ডা ঘরে রাখতে হবে। কেসটা আত্মহত্যাই—থ্রম্বোসিস্-টম্বোসিস্ নয়—যদিও এখনও কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবু বড়কর্তার হুকুম ছাড়া দেহটা দাহ করাও চলবে না। সুবীর হেড-কোয়ার্টার্সে থাকলে ভাল হত। ছোকরার মাথাটা এসব বিষয়ে বেশ খেলে। দুর্ভাগ্যবশত সুবীর রায় দিন-তিনেক আগে একটা তদন্তে কার্শিয়াঙে নেমেছে। সুবীর ওর অধীনে পোস্টেড বটে, তবে ক্রিমিনাল-ইনভেস্টিগেশন বিষয়ে সে বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছে। তুখোড় ছোকরা! এসব বিষয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে টেক্কা দিতে পারে।

হার্টফেল যে নয়, কেসটা যে আত্মহত্যাই তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত রমেন গুহ আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে তার খাটে; আর তার ডান হাতে ধরা আছে একটা কাচের গ্লাস। আশ্চর্য! গ্লাসটা কাত হয়ে যায়নি—বস্তুত নৃপেন যখন ওকে পরীক্ষা করে তখনও মৃতদেহের ডান হাতে বজ্রমুষ্টিতে ধরা ছিল ঐ গ্লাসটা—ঐ যে 'রিগর মর্টিস্' না কী যেন বলে! নৃপেনের দৃঢ় বিশ্বাস গ্লাসের তরল পানীয়ে কোন তীব্র বিষ মিশিয়ে রমেন পান করেছে। বিষটা এতই তীব্র যে, তৎক্ষণাৎ ওর মৃত্যু হয়েছে! কিন্তু হঠাৎ এভাবে আত্মহত্যা কেন করল রমেন? কই গতকাল রাত্রেও তো সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। যে লোক মধ্যরাত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে কি সন্ধ্যারাত্রে ওভাবে হাসি-মশকরা করতে পারে? কিন্তু হত্যাই বা হবে কী করে? রমেনের ঘর ছিল তালাবন্ধ! হোটেলে সে সবেমাত্র এসেছে। তার হাতের ঘড়ি, পকেটের পার্স পর্যন্ত খোয়া যায়নি। এখানে কেউ তাকে চেনে না, জানে না। কে, কোন উদ্দেশ্যে তাকে খুন করবে? তাছাড়া তালাবন্ধ ঘরে সে ঢুকবেই বা কী করে?

—স্যার!

—উঁ?—সম্বিত ফিরে পায় নৃপেন দারোগা।

হাত দুটি গরুড় পক্ষীর মত জোড় করে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের ম্যানেজার। বিনীতভাবে বলে, মুর্দাকে এবার হটাবার হুকুম দিয়া যায় সাব্। পূজা মরশুম। হমার সব বোর্ডার ভাগিয়ে যাবে!

একটা বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নৃপেন বলে, মুর্দা! ও লোকটা কে জান? বেঁচে থাকলে ও আজ বসত আমার চেয়ারে! ও একজন দারোগা!

ম্যানেজার জগীন্দর কাপাডিয়া একটি তিনদুর্গ-আঁকা সবুজ টিন বাড়িয়ে ধরে! তার গর্ভে সাদা সিগারেট। যোগীন্দর গলাটা সাফা করে, মুর্দার যে জাত নেই এমন একটা দার্শনিক উক্তি করবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না।

পাশ থেকে ওর অফিস-ক্লার্ক মহেন্দ্র বলে, সে আমরা জানতাম স্যার! দেখুন দেখি, কী কাণ্ড হয়ে গেল!

নৃপেন ত্রি-দুর্গ আঁকা টিন থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এখন বল দিকিন—কে ওকে প্রথম ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করে?

—রুম-বেহারা স্যার। বীর বাহাদুর। বেড-টি দিতে গিয়ে—

বাধা দিয়ে নৃপেন বলে উঠে, নো সেকেন্ড-হ্যান্ড স্টোরি প্লীজ! রুম-বেহারাকো বোলাও!

শুধু রুম-সার্ভিসের বেহারার নয়, ডাক পড়ল অনেকেরই। ক্রমে ক্রমে এল তারা—এজাহার দিতে। কুক, হেডকুক, গেট-কীপার, কাউন্টার ক্লার্ক ইত্যাদি। টুকরো টুকরো জবানবন্দি থেকে সংগৃহীত হল সম্পূর্ণ কাহিনীটা। হোটেল-রেজিস্টার অনুযায়ী রমেন গুহ এসে পৌঁছায় পয়লা তারিখ বেলা বারোটায়। দোতলার তেইশ নম্বরে আশ্রয় নেয়। সাড়ে বারোটায় সে মালপত্র রেখে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে রাত দশটায়। কোনও 'মীল' নেয়নি সে। এমনকি এককাপ চা পর্যন্ত খায়নি। তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে পরদিন সকাল ছটায়।

কাউন্টার-ক্লার্ক মহেন্দ্রের জবানবন্দি অনুসারে কাল দুপুরে একটি ট্যাক্সি চেপে রমেন গুহ আসে। শেয়ারের ট্যাক্সি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে। ট্যাক্সিতে তিনজন লোক ছিল। তিনজনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে ওঠে। দ্বিতলের পাশাপাশি তিনখানা সিঙ্গল-সীটেড রুম ভাড়া নেয়। অথচ ওরা তিনজন পৃথক যাত্রী। ওরা পরস্পরকে চিনত না।

বাধা দিয়ে নৃপেন প্রশ্ন করেছিল, তুমি কেমন করে জানলে ওরা পরস্পরকে চিনত না?

—স্বচক্ষে দেখলাম স্যার! ট্যাক্সি থেকে মালপত্র নামিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার এসে দাঁড়াল। ওরা তিনজনে ট্যাক্সি-ভাড়ার এক-তৃতীয়াংশ দিলেন। তারপর আমার হোটেল-রেজিস্টারে পর পর নাম লেখালেন। ঠিকানা সব আলাদা। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান, একজন খ্রীষ্টান।

—ঠিক আছে। এবার বল—রমেন গুহর সহযাত্রী দু'জন কত নম্বরে আছেন?

মহেন্দ্র মাথা চুলকে বলে, সেইখানেই তো ঝামেলা হয়েছে স্যার। দু'জনেই ইতিমধ্যে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন।

—বল কী! কাল বেলা বারোটায় চেক-ইন করে আজ সকাল সাতটাতেই চেক-আউট?

—দু'জনেই নয় স্যার। মিস্টার মহম্মদ ইব্রাহিম চেক-আউট করেছেন কাল রাত সাড়ে আটটায় আর মিস্ ডিক্রুজা আজ ভোর পাঁচটায়!

—মিস্ ডিক্রুজা! মেমসাহেব?

—না স্যার। দিশি মেমসাহেব। দেখলে বাঙালী বলেই মনে হয়।

—ভোর পাঁচটায়! অত ভোরে?

—হ্যাঁ, স্যার। টাইগার-হিলে সানরাইজ দেখতে গেলেন যে। বললেন আজই নামবেন। মালপত্র নিয়েই চেক-আউট করে বেরিয়ে গেলেন।

সন্দেহজনক! অত্যন্ত সন্দেহজনক! রমেন গুহ মারা গেছে রাত দশটার পরে। তেইশ নম্বর ঘরে। আর ঠিক তার পাশের ঘরের বাসিন্দা কাকডাকা ভোরে হোটেল ছেড়ে দিল! পরবর্তী ঠিকানা না রেখে? অবশ্য মহম্মদ ইব্রাহিমকে সন্দেহ করার কিছু নেই। সে চেক-আউট করেছে রাত সাড়ে আটটায়—রমেন তখনও নৃপেনের বাড়িতে। বহাল তবিয়তে। মহম্মদ ইব্রাহিম আর মিস্ ডিক্রুজার স্থায়ী

ঠিকানা দুটো নৃপেন লিখে নিল তার নোট বইতে। খোদায় মালুম সেগুলো আদৌ সত্য কিনা। কাউন্টার-ক্লার্ক ছোকরাটি বেশ চল্‌তা-পুর্জা! অনেক খবর দিতে পারল সে ঐ দু'জনের সম্বন্ধে। ছোকরা লক্ষ্য করেছে অনেক কিছুই। মিস্ ডিক্রুজার বয়স সাতাশ-আটাশ, যদিও সাজে-সজ্জায় সে নিজেকে বাইশ-তেইশ বলতে চায়। সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। বিজ্ঞের মত বললে—ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স হবে, এই ধরুন 34-28-32। চুল ছোট, বব্ নয়।রঙ মাজা, ফর্সা ঘেঁষা। খুব ভাল বাঙলা বলতে পারে—নাম না বললে বাঙালী বলে ভুল হতে পারে। সিগারেট খায়। 'প্রফেশান'-এর ঘরে লেখা আছে 'হাসিফ'। মিস্ কী করে গৃহকর্ত্রী হয় তা জানে না মহেন্দ্র। তবে সে তাতে আপত্তি করেনি। তার সঙ্গে আছে একটি ভি.আই.পি.-মার্কা সাদা সুটকেস। অপর পক্ষে মহম্মদ ইব্রাহিমের বয়স ত্রিশের উপর, চল্লিশের নিচে। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গঠন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও গোঁফ আছে, চোখে চশমা। পাইপ খান। প্রফেশান—তাঁর স্বীকৃতিমতো—বিজনেস।

হেড-কুক সবিনয়ে নিবেদন করল খাবারে কোনক্রমেই কোন বিষাক্ত পদার্থ মিশে যেতে পারে না। তার যুক্তি প্রাঞ্জল, তাহলে তো হুজুর হোটেল শুদ্ধ লোক আজ মরে ভূত হয়ে থাকত।

নৃপেন ধমক দেয়, বাজে কথা ব'ল না। কে বলেছে খাবারে বিষ ছিল? রমেন তোমার কিচেনের খাবার খায়নি। কিন্তু ওর ঘরে থার্মোফ্লাস্কে জল রয়েছে দেখলাম। গরম জল তুমি সাপ্লাই করেছিলে?

হেডকুক সভয়ে নিবেদন করে, বোর্ডারের ঘরে থার্মোফ্লাস্কে জল থাকলে তা আমার কিচেন থেকেই সাপ্লাই হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু জল তো আমি স্রেফ কল থেকে নিয়ে গরম করেছি স্যার!

—জানি! নর্দমা থেকে নাওনি! কিন্তু জলটা ওর ঘরে কে রেখে এসেছিল?

—তার জিম্মাদারী আমার নয় হুজুর। রুম-সার্ভিস বেহারার কাজ ওটা।

—হুঁ! কী নাম সেই রুম-সার্ভিসের বেহারার?

—বীর বাহাদুর, স্যার!

—বীর বাহাদুর কার নাম?

কেউ সাড়া দেয় না।

নৃপেন প্রচণ্ড ধমক লাগায়; আধঘণ্টা থেকে ডাকছি, বীর বাহাদুর আসছে না কেন? এরা ভেবেছে কি, দারোগা খুন করে পার পাবে! সব কটার মাজায় দড়ি বেঁধে চালান দেব আমি!

একটা রীতিমত শোরগোল পড়ে যায়। দু'তিনজন ছোটে বীর বাহাদুরের খোঁজে। যোগীন্দর কাপাড়িয়া কী করবে ভেবে না পেয়ে আবার থ্রি-কাস্‌লস্-এর টিনটা বাড়িয়ে ধরে। নৃপেন আবার একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়।

তিনচার জনে ইতিমধ্যে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে বীর বাহাদুরকে। বেচারির পিতৃদত্ত নামের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত অবলুপ্ত। বীরত্ব এবং বাহাদুরি। নবমীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালো দারোগা সাহেবের সামনে!

—তোমার নাম বীর বাহাদুর?

—জী হুজুর!

—তোম বীর হ্যায় ইয়া বাহাদুর হ্যায়?

বেঁটে লোকটা কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

অনেক জেরার পরে লোকটা হলফ্ খেয়ে বললে, সে থার্মোফ্লাস্কে বিষ-টিষ কিছু মেশায়নি। তার বিশ বছরের নোকরি! এমনটি এর আগে কখনও হয়েছে?

—তুমি ফ্লাস্কটা নিয়ে কিচেন থেকে সোজা ঐ তেইশ নম্বর ঘরে গিয়েছিলে, না কি ফ্লাস্কটা আর কারও হাতে ধরতে দিয়ে বিড়ি-টিড়ি খেয়েছিলে?

—জী নেহি সাব! ম্যায় বিড়ি নেহি পীতা!

—হেত্তেরি! যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। সিধে তেইশ নম্বররমে গয়া থা ক্যা?

—জী সাব!

—ঠিক আছে! এবার আজ সকালের কথা ব'ল। কখন তুমি প্রথম জানতে পারলে?

বীর বাহাদুর যে বর্ণনা দিল তা সংক্ষেপে এই:

হোটেলের আইন অনুসারে রাত সাড়ে দশটার পর রুম-সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। ভোর সাড়ে চারটের আগে আর রুম-সার্ভিস পাওয়া যায় না। টাইগার-হিলে যাবার বায়নাক্কা থাকায় প্রায় প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু বোর্ডারকে ভোর সাড়ে চারটেয় বেড-টি দিতে হয়। তাই শেষরাত্রে অন্ধকার থাকতেই কিচেনটি কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাধা দিয়ে নৃপেন প্রশ্ন করে, রুম নাম্বার চব্বিশে বেড-টির অর্ডার ছিল আজ?

—জী নেহী! চব্বিশ মে থী বহ্ মেমসাব। উস্‌নে বেড-টি নেহী লি-থি।

নৃপেন মহেন্দ্রর দিকে ফিরে বললে, তবে যে তখন তুমি বললে—মিস ডিক্রুজা আজ সকালে টাইগার-হিলে গেছে?

মহেন্দ্র আমতা আমতা করে বললে, ইয়ে, টাইগার-হিলে যেতে হলে চা যে খেয়ে যেতে হবে, এমন কোন আইন নেই স্যার!

—আমি জানি। বাজে কথা বল না!—ধমক দেয় নৃপেন দারোগা। তারপর বীর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলে, তেইশ নম্বরে বেড-টির অর্ডার ছিল?

—জী সাব! পৌনে ছে বাজে!

ব্যাপারটা বিস্তারিত করে বুঝিয়ে দেয় বীর বাহাদুর। তেইশ নম্বরে ছিলেন এক দারোগা-সাহেব। মানে যিনি মারা গেছেন। তিনি পৌনে ছ'টায় চা চেয়েছিলেন। বীর বাহাদুর ঠিক সময়ে চায়ের ট্রে নিয়ে ওঁর দরজার সামনে এসে নক করে। কেউ সাড়া দেয় না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে। তবু কেউ সাড়া দেয় না। ঐ সময় ওদিককার খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক সাহেব পাইপ খাচ্ছিলেন। তিনি বাহাদুরকে বলে ওঠেন, 'কেন হোটেলশুদ্ধ লোকের সুখনিদ্রায় বাধা দিচ্ছ বাবা? তোমার ঐ কুম্ভকর্ণ-সাহেবের ঘুম যখন ভাঙবে তিনি নিজেই চা চাইবেন।' তখন বাহাদুর সেই পাইপ-মুখো সাহেবকে বলেছিল, 'এমন কাণ্ডটা ঘটলে ম্যানেজার রাগ করবেন স্যার। উনি ভাববেন, আমি মিছে কথা বলছি—সময়মত বেড-টি দিতে আসিনি আমি।' তখন সেই পাইপমুখো সাহেব বললেন, 'তুমি আমাকে সাক্ষী পেলে, বাবা। আমি দরকার হলে আদালতে হলফ নিয়ে বলব—তোমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।'

নৃপেন প্রশ্ন করে, উনি অত ভোরে ঐ ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন?

—বহ্ নেহি জানতা সাব!

মহেন্দ্র উপর পরা হয়ে বলে, ঐ বারান্দা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সান-রাইজ দেখা যায় স্যার। উনি বোধহয়—

—তুমি চুপ কর!—ধমক দিয়ে ওঠে নৃপেন। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলে, তারপর? বলে যাও—

বীর বাহাদুর তার জবানবন্দি শুরু করে। ঠিক ঐ সময়েই নাকি সেই তেইশ নম্বর ঘরের ভিতর একটা অ্যালার্ম ক্লক বেজে ওঠে। পুরো এক মিনিট সেটা বাজে। তাতেও ঘরের ভিতর কোন সাড়া শব্দ জাগে না। পাইপমুখো সাহেব এবার কৌতূহলী হয়ে নিজেই এগিয়ে আসেন। চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বলে ওঠেন, আশ্চর্য! ঘরে আলো জ্বলছে! এরপর উনি একটা দেশলাই জ্বেলে দরজার উপর কার্ড আটকানো খোপটা দেখে বলে ওঠেন, 'রমেন গুহ! পুলিশের লোক নাকি?' বীর বাহাদুর জবাবে বলেছিল, 'জী সাব!' পাইপমুখো তখন বলেন, 'তবে তো আমার চেনা লোক মনে হচ্ছে। তুমি এক কাজ করতো হে! কাউন্টারে গিয়ে এ ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে এস।' বীর বাহাদুর অগত্যা ট্রেটা নামিয়ে রেখে একতলায় কাউন্টারে ফিরে যায়। কাউন্টার-ক্লার্ক মহেন্দ্র বাহাদুরকে একটা 'মাস্টার-কী' দেয়। সেটা

নিয়ে বাহাদুর—

—দাঁড়াও! দাঁড়াও—এখানেই বীর বাহাদুরের জবানবন্দি থামিয়ে নৃপেন মহেন্দ্রের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে—'মাস্টার-কী' বস্তুটা কী?

—প্রতি ঘরের 'ডুপ্লিকেট-কী' ছাড়াও আমার কাছে দুটো মাস্টার-কী আছে। তার একটা চাবি দিয়ে এক তলার সব ঘর খোলা যায়। দ্বিতীয়টা দিয়ে দোতলার সব ঘর খোলা যায়।

—আই সী। তা তুমি বাহাদুরকে ঐ তেইশ নম্বর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা না দিয়ে ফস্ করে 'মাস্টার-কী' দিয়ে বসলে কেন?

—তেইশ নম্বর ঘরের দুটো চাবিই ঐ গুহ-সাহেব আমার কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিলেন।

—দুটো চাবিই তোমরা বোর্ডারকে দাও?

—না স্যার। তবে আমি জানতাম ঐ গুহ-সাহেব আপনার জায়গায় বদলি হয়ে আসছেন। তাই—

—বুঝেছি!—নৃপেন এবার বাহাদুরের দিকে ফিরে বললে, প্রসিড!

বুঝতে অসুবিধা হল না বাহাদুরের। সে তার জবানবন্দির সূত্র তুলে নেয়।

মাস্টার-কী দিয়ে দরজা খুলে ওরা দু'জনে ঘরে ঢোকে—বাহাদুর আর সেই পাইপ-মুখো সাহেব। দেখে, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। টেবিলের উপর মুখ-বন্ধ-করা একটা জলের ফ্লাস্ক, একটা হুইস্কির বোতল, এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট, একটা দেশলাই একটা অ্যাশট্রে আর একটা অ্যালার্ম ক্লক। রমেনের হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা আছে একটা কাচের গ্লাস—তাতে ঈষৎ পীতাভ কিছু তরল পানীয়। সম্ভবত গরমজলে মেশানো হুইস্কি ছিল ঘণ্টাকতক আগে—তখন বরফ-ঠাণ্ডা। বীর বাহাদুর কোনক্রমে চায়ের ট্রেটা নামিয়ে রাখে। পাইপ-মুখো সাহেব রমেনকে পরীক্ষা করেন। নাড়ি দেখেন, কানের নিচে গ্লোয়ালের তলায় কী একটা পরীক্ষা করেন। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলেন, 'মারা গেছে। তোমার ম্যানেজারকে খবর দাও।'—বাহাদুর হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে নিচে।

—সে কী! ঐ পাইপ-মুখো সাহেবকে ঐ ঘরে একা রেখে?

—জী হুজুর। ইয়ে তো বাতায়া বহ্। কহা কি ম্যানেজারকো সেলাম দো!

—সেলাম দেওয়াচ্ছি!—নৃপেন ঘুরে দাঁড়ায় যোগীন্দরের মুখোমুখি। বলে, কী মশাই, তবে যে বললেন মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে ও ঘরে কেউ ঢোকেনি? ওটা তালাবন্ধ পড়ে আছে!

যোগীন্দর আমতা আমতা করে। মহেন্দ্র বলে, ইয়ে—বাহাদুর নিচে এসে খবর দেওয়া মাত্র আমি ওপরে ঐ ঘরে উঠে যাই। মিনিট তিন-চারের বেশি ঐ বোর্ডার-ভদ্রলোক ও ঘরে একা ছিলেন না!

—থাম তুমি! ছুঁঃ! তিন-চার মিনিট! চার-মিনিট কি কম সময়? ওর ভিতর অনেক কিছু করে ফেলা যায়, বুঝেছ! সব কটার মাজায় দড়ি বাঁধব আমি।

যোগীন্দর সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরবে কি না ভেবে পায় না। নৃপেনের আগের সিগারেটটা এখনও শেষ হয়নি।

—ঐ পাইপ-মুখো কি হোটেলে আছেন, না কি তাঁকেও চেক-আউট করিয়ে দিয়েছ?

মহেন্দ্র হাত কচলে বলে, না স্যার, উনি আছেন। একতলায় একটা ডবল-বেড রুম নিয়ে আছেন। সস্ত্রীক।

—দেখবে, যেন তিনি না ইতিমধ্যে কেটে পড়েন। তাঁকে খবর দাও—আমি দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর ঘরে যাচ্ছি। তাঁর এজাহারটা নিতে হবে—

যোগীন্দরের ইঙ্গিতে একজন তখনই চলে গেল পাইপ-মুখোকে রুখতে।

—তারপর? উপরে এসে কী দেখলে? না, তুমি নয়—বাহাদুর তুমি বল। পাঁচ মিনিট পরে যখন তুমি উপরে এলে তখন কী দেখলে? পাইপ-মুখো কী করছিলেন তখন?

—তামাম কামরাঠো তালাশ্ করতা থা!

—বাঃ বাঃ বাঃ! চমৎকার!—নৃপেন দারোগা দম্ভাবশেষ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোগীন্দরের

দিকে ফেরে। বলে, কী মশাই? আপনি অম্লানবদনে বললেন ঘরটা বরাবর তালাবন্ধ আছে! কেউ কিছু টাচ করেনি, ট্যাম্পার করেনি?

যোগীন্দর তৎক্ষণাৎ সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরে।

—দূর মশাই! সিগারেট নিয়ে কী করব? যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন!

যোগীন্দর হাত দুটি জোড় করে বললে, স্যার! বাসু-সাহেবকে আমি বিশ বরিষ ধরে জানি। নাম করা ব্যারিস্টার! উনি কোন কিছু ট্যাম্পার করতেই পারেন না।

—বাসু-সাহেব! কে বাসু-সাহেব?

—ঐ যাঁকে বীর বাহাদুর পাইপ-মুখো সাহেব বলছে। ওঁর নাম পি. কে. বাসু আছে। উনি বহুবার আমার হোটেলে উঠেছেন। একদম শরীফ আদমি! এককালে ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে লাখ লাখ টাকা খিঁচেছেন! এখন প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন।

—লাখ লাখ টাকা খেঁচার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির কোন সম্পর্ক নেই, বুঝেছেন? যাক তাঁর সাথে তো এখনই কথা বলব। তারপর কী হল বলুন?

জবাব দিল মহেন্দ্র—তারপর আর কী? আমরা ঘরটা তালাবন্ধ করে নেমে এলাম। আপনাকে ফোন করলাম। ঠিক ছটা বেজে দশে।

ইতিমধ্যে একজন বেহারা এসে দাঁড়ায়। তার হাতে একটা খালি ব্র্যান্ডির শিশি। নৃপেন সেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, খুব ভাল করে ধুয়েছিস তো?

—হ্যাঁ স্যার! খুব ভাল করে বার বার ধুয়েছি।

—ঠিক আছে। এবার আর একবার ঐ তেইশ নম্বর ঘরে যেতে হবে! চলুন।

তেইশ নম্বর ঘরে এসে নৃপেন স্বহস্তে ঐ কাচের গ্লাস থেকে তরল পদার্থটা শিশিতে ভরে নিল। তারপর ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল। নেমে এল নিচে। সকলকে বিদায় দিয়ে একাই চলে এল নির্দেশমত একতলায় এক নম্বর ঘরে। সব ঘরেই ইয়েল-লক, ছিটকিনি নেই। অর্থাৎ দরজা ঠেলে বন্ধ করলে চাবিছাড়া দরজা খোলা যায় না। এক-নম্বর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ভারী পর্দা ঝুলছে। নৃপেন খোলা দরজায় 'নক্' করল। ভিতর থেকে আহ্বান এল, ইয়েস! কাম ইন প্লিজ্!

পর্দা সরিয়ে নৃপেন প্রবেশ করল ঘরে।

ডবল-বেড বড় ঘর। একজন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন একটা চাকা-ওয়ালা চেয়ারে। তাঁর হাতে একজোড়া উলের কাঁটা। উলের গোয়েটার বুনছিলেন। তাঁর মুখোমুখি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ড্রেসিং গাউন পরে বসেছিলেন ইজি-চেয়ারে। বোধকরি কী একখানা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন স্ত্রীকে। বইটা মুড়ে এদিকে ফিরে বললেন, বসুন। মিস্টার ঘোষাল আই প্রিসিউম? ও.সি. সদর?

—হ্যাঁ। আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।

নট দ্য লীস্ট, নট দ্য লীস্ট! বলুন, কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। বাই দ্য ওয়ে, আপনার হাতে ওটা কী? ব্র্যান্ডি?

—না! মৃতের হাতের গ্লাসে যে তরল পদার্থটা ছিল সেটা নিয়ে যাচ্ছি। কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ করাতে হবে।

—ও! তা করান। তবে কী পাবেন তা আগেই বলে দিতে পারি। অ্যালকহল, অ্যাকোয়া আর কে সি এন!

'কে সিয়েন' মানে? KCN

পটাসিয়াম সায়ানাইড!

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই বিদ্যে জাহির করবার প্রচেষ্টা দেখে নৃপেন মনে মনে হাসে। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারায় এমন একটা আভিজাত্য আছে যে, সে প্রকাশ্যে হেসে উঠতে পারল না। বললে, আপনি ব্যারিস্টার মানুষ! নিশ্চয় বুঝবেন, অমন আপ্তবাক্যে কোনও কোর্টে কখনও কনভিকশন্ হয় না। এটা

এভিডেন্স হিসাবে তখনই গ্রাহ্য হবে যখন কোন বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক তাঁর ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করে একটা রিপোর্ট দেবেন।

—কারেক্ট! কোয়াইট কারেক্ট! এ-ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট সত্ত্বেও ওটা এভিডেন্স হিসাবে গ্রাহ্য হবে না!

হাসি-হাসি মুখে বাসু-সাহেব তাকিয়ে থাকেন নৃপেন দারোগার দিকে। অর্থাৎ এবার আপনি জানতে চান—কেন গ্রাহ্য হবে না? তা কিন্তু জানতে চাইল না নৃপেন। সে মনে মনে রীতিমত চটে উঠেছে এ ভদ্রলোকের অহেতুক মোড়লিতে। ওকে নীরব থাকতে দেখে বাসু-সাহেব নিজেই বলে ওঠেন—কেন গ্রাহ্য হবে না জানেন?

এতক্ষণ রুখে ওঠে নৃপেন, না, জানি না। জানতে চাইও না!

বাসু-সাহেব কিন্তু রাগ করেন না। হেসেই বলেন—গ্র্যাটিস্ লীগ্যাল অ্যাডভাইস আমি দিই না; কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে না হয় ব্যতিক্রমই করলুম! আপনার উচিত ছিল যে-সব সাক্ষীর সামনে ঐ তরল পানীয়টা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের উপস্থিতিতেই ওটা সীলমোহর করা! ডিফেন্স কাউন্সিলারগুলো ভারি পাজি হয়,বুঝেছেন—তারা কিছুতেই মানতে চাইবে না বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে যে লিকুইডটার পরিচয় লেখা আছে সেটাই ঐ মৃত ব্যক্তির হাতে পাওয়া গেছে! বলবে, সীল যখন করা নেই তখন অ্যাকিউসড্‌কে ফাঁদে ফেলতে আপনি নিজেই ওতে কিছুটা পটাসিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছেন। ইন ফ্যাক্ট আপনি ইচ্ছে করলে এখনও তা মেশাতে পারেন। তাই নয়?

কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে ওঠে নৃপেনের!

—যাক ও কথা। আমার কাছে কী জানতে চান বলুন?

অপমানটা গলাধঃকরণ করে নৃপেন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। বলে, আপনিই মৃতদেহটা প্রথম আবিষ্কার করেন?

—নট একজাক্টলি! আমরা দুজন। আমি আর বীর বাহাদুর।

—এবং তার পরেই আপনি বীর বাহাদুরকে নিচে যেতে বলেন?

—অ্যাফার্মেটিভ!

—আপনি কতক্ষণ ঐ ঘরে একা ছিলেন?

—পাঁচ থেকে সাত মিনিট।

—ঐ পাঁচ-সাত মিনিট ধরে আপনি ঘরটা তন্নতন্ন করে সার্চ করেছেন?

—পাঁচ-সাত মিনিটে একটা ঘর তন্ন তন্ন করে সার্চ করা যায় না। মোটামুটি তল্লাশী করেছিলাম।

—কাজটা ভাল করেননি।

মিসেস বাসু তাঁর হুইল চেয়ারটা চালিয়ে পিছনের বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়েন এ-কথায়। বাসু-সাহেব হাসি-হাসি মুখেই বলেন, য়ু থিংক সো?

রূঢ়তর কণ্ঠে নৃপেন বলে, হ্যাঁ, তাই মনে করি আমি। আপনি হয়তো কিছু ফিঙ্গার-প্রিন্ট নষ্ট করে ফেলেছেন, তল্লাশী করতে গিয়ে।

—করিনি। আমার হাতে গ্লাভস পরা ছিল। তা ছাড়া এ-সব কেস কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় আমার জানা আছে!

এবার আর আত্মসংবরণ করতে পারে না নৃপেন। রীতিমত ধমকের সুরে বলে, না! আপনি অন্যায় করেছেন! আপনি ক্রিমিনাল লইয়ার, ডিটেকটিভ নন! তবু লইয়ার হিসাবে আপনার জানা থাকা উচিত যে, পুলিস এসে পৌঁছানোর আগে কোন কিছু পরীক্ষা করার অধিকার আপনার নেই!

মিসেস বাসু শঙ্কাভরা দু'চোখ মেলে বাসু-সাহেবের দিকে তাকালেন। তাঁর স্বামীকে তিনি ভালমতই চিনতেন। বাসু-সাহেবের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। বোধ করি সেজন্যই কোনও বিফোরণ হল না। বাসু-সাহেব শান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, লুক হিয়ার মিস্টার ও.সি. হেড-কোয়ার্টার্স! আমার অধিকার

সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। হিয়ার্স মাই কার্ড! আপনি যা ভাল বোঝেন করতে পারেন!

নৃপেন হাত বাড়িয়ে কার্ডটা গ্রহণ করে না। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

বাসু-সাহেব বলেন, আগেই বলেছি গ্র্যাটিস্ লীগাল অ্যাডভাইস দেওয়া আমার স্বভাব নয়। এ ক্ষেত্রে তবু দিতে বাধ্য হচ্ছি এজন্য যে, রমেন গুহ ছিল আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন!

—রমেন গুহ আপনার পরিচিত?—প্রশ্ন করে নৃপেন।

বাসু-সাহেব সে প্রশ্নের জবাব না নিয়ে বলেন, এটা যে আত্মহত্যা নয়, বরং একটা ফার্স্ট ডিগ্রি ডেলিবারেট মার্ডার তার অকাট্য এভিডেন্স আমি পেয়েছি। যেহেতু কেসটা রমেন গুহর, তাই কতকগুলো ক্লু আপনাকে দিতে চাই। আপনি কি দয়া করে বসবেন?

নৃপেন বসে না। একগুঁয়ে ছেলের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে, কী ক্লু?

বাসু-সাহেব পাইপটা ধরালেন। বললেন, মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা শুনলেই কিন্তু আপনি ভাল করতেন। তাতে আপনার নেহাৎ আপত্তি থাকলে আমি বিপুলকেই সব কথা জানাব। আফটার অল, এটা রমেন গুহর কেস!

—বিপুল! বিপুল কে?

—ডি.সি. দার্জিলিঙ। বিপুল ঘোষ, আই.এ.এস.। তার স্ত্রী মণির মামা হই আমি।

নৃপেন বসে পড়ে। পথে নয়, চেয়ারে। বলে, বলুন, কী বলবেন?

—আপনি তদন্ত করে কী বুঝেছেন? এটা আত্মহত্যার কেস?

—না! রমেনের আত্মহত্যার কোন কারণ খুঁজে পাইনি আমি। গতকাল রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত সে আমার বাড়িতেই ছিল। দিব্যি স্বাভাবিক মানুষ। আমাদের সঙ্গেই রাত্রে খেয়েছে, হাসি-গল্প করেছে—হোটেলে ফিরে এসে সে তার স্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছে তাতেও কোন ইঙ্গিত নেই!

—সুতরাং...?

—কিন্তু ওকে এখানে কে হত্যা করতে চাইবে? ওর হাতঘড়ি, মানিব্যাগ পর্যন্ত খোয়া যায়নি!

—রমেন গুহ দারোগা ছিল। যেখান থেকে ও বদলি হয়ে এসেছে সেখানকার কোর্টে এমন দশ-বিশটা কেসে হয়তো তাকে সাক্ষী দিতে যেতে হত। অন্তত একডজন আসামী খুশি হবে লোকটা বেমক্কা মারা গেলে, নয়? তাদের মধ্যে অন্তত আধডজন পাকা ক্রিমিনাল! খুনী-ডাকাত-ওয়াগনব্রেকার-ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার! তাদের মধ্যে কেউ—

—কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ওর রুদ্ধদ্বার ঘরে মদের পাত্রে বিষ মিশিয়ে দেবার সুযোগ পাবে কেমন করে? রমেন কাল বেলা বারোটায় হোটেলে ঢুকেছে, সাড়ে বারোটায় ঘরে তালা মেরে বেরিয়ে গেছে। ফিরেছে রাত দশটায়! এর মধ্যে তার ঘরে কেউ ঢোকেনি।

—য়ু থিংক সো?

—নিশ্চয়! আপনি হয় তো জানেন না, ও তার ঘরের দুটো চাবিই চেয়ে নিয়েছিল।

—জানি। কিন্তু কেন? দুটো চাবি নিয়ে সে কী করবে? সে তো একা মানুষ!

নৃপেন একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, আমি জানি না।

—আই সী! জানেন না!

আবার রুখে ওঠে নৃপেন, কেন, আপনি জানেন?

—জানি। কিন্তু ও কথা থাক। তার আগে বলুন তো—বীর বাহাদুর ঠিক ক'টার সময় গরম জল ভর্তি ফ্লাস্কটা ওর ঘরে রেখে আসে?

নৃপেন আবার অস্বোয়াস্তি বোধ করে। বলে, আমি জানি না।

—আই সী! জানেন না! সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলাম। রমেন যখন সাড়ে বারোটার সময় বেরিয়ে যায় তখনই বলে যায়, তার ঘরে যেন এক ফ্লাস্ক গরম জল রেখে দেওয়া

হয়। ফ্লাস্কটা তার নিজের। এখন বলুন তো, দুটো চাবিই যখন রমেনের কাছে তখন বীর বাহাদুর কেমন করে ও-ঘরে ঢুকল?

এ সমস্যা অনায়াসে সমাধান করে নৃপেন। বলে, জানি। ঐ মাস্টার-কী দিয়ে।

—ও! জানেন! তাহলে আপনার ঐ আগেকার স্টেটমেন্টটা তো ঠিক নয়। ঐ যে বললেন—বেলা সাড়ে বারোটা থেকে রাত দশটার মধ্যে ও-ঘরে কেউ ঢোকেনি!

নৃপেন অসহিষ্ণুর মত বলে ওঠে, কী আশ্চর্য! বীর বাহাদুর কেন বিষ মেশাবে? সে এ হোটেলে বিশ বছর চাকরি করছে—তার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

—কারেক্ট! কিন্তু বীর বাহাদুর তার মাস্টার-কী দিয়ে যখন ঘরটা খুলেছিল তখন আর কেউ কি ঐ ঘরে ঢুকেছিল তার সঙ্গে?

নৃপেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ-জাতীয় অনুসন্ধান সে করেনি।

বাসু-সাহেব নিজে থেকেই বলেন, ঢোকেনি। আমি বীর বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। সে তালা খুলে একাই ঘরে ঢোকে। ফ্লাস্কটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসে। ঘরটা আবার তালাবন্ধ করে। পুরো এক মিনিটও সে ছিল না ঐ ঘরে। সুতরাং আর কেউ কোন সুযোগই পায়নি।

—তার মানে আপনি বলতে চান, বীর বাহাদুরই একমাত্র সন্দেহজনক ব্যক্তি?

—আমি মোটেই তা বলছি না। কারণ আমার কাছে এভিডেন্স আছে—বীর বাহাদুর ছাড়াও অন্তত দু'জন ঐ ঘরে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছিল, গতকাল বেলা বারোটার পরে এবং আজ সকাল ছ'টার আগে!

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় নৃপেনের। বলে, কী বলছেন! দু'জন ঐ ঘরে ঢুকেছিল?

—ডিড আই সে দ্যাট? আমি বলেছি ঢুকবার সুযোগ পেয়েছিল।

—অর্থাৎ তারা যে ঢুকেছিল তার প্রমাণ নেই?

—আছে! একজন যে ঢুকেছিল তার একটা প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়জনও খুব সম্ভবত ঢুকেছিল। কনক্লুসিভ প্রুফ নেই, কিন্তু অত্যন্ত জোরালো যুক্তি আছে।

নৃপেন বুঝতে পারে এ ভদ্রলোক সহজ মানুষ নন। উনি অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন, বুঝে ফেলেছেন। চোখ তুলে দেখে মিসেস্ বাসু কখন অলক্ষ্যে চলে গেছেন ঘর ছেড়ে, পিছনের বারান্দায়। সাগ্রহে সে বলে, বলুন স্যার, কী প্রমাণ পেয়েছেন! বাই দা ওয়ে, রমেন গুহকে আপনি কেমন করে চিনলেন?

—আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি থাক। প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিই। একটা অনুমান, একটা প্রমাণ। অনুমানের কথাটাই আগে বলি। মহেন্দ্র আমার কাছে স্বীকার করেছে যে গতকাল রাত সাতটা নাগাদ বাইশ-নম্বর ঘরের বোর্ডার মহম্মদ ইব্রাহিম এসে তাকে বলে যে, তার ঘরের চাবিটা ঘরের ভেতর থাকা অবস্থায় সে ভুল করে ইয়েল-লক-ওয়ালা দরজাটা বন্ধ করে ফেলেছে। মহেন্দ্র তখন ওকে মাস্টার-কীটা দেয়। ইব্রাহিম মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে চাবিটা ফেরত দেয়। ফলো?

—ইয়েস!

—এনি কোসচেন?

—কোসচেন! না কোসচেন কিসের?

—তাহলে আমিই প্রশ্ন করি! মহেন্দ্র মাস্টার-কীটা কেন দিল? কেন নয় ঐ বাইশ-নম্বর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা?

নৃপেন বলে, ওতো একই কথা।

—আজ্ঞে না দারোগা-সাহেব! মোটেই এক কথা নয়! মহেন্দ্র আমার কাছে স্বীকার করেছে চেক-ইন করবার সময় রমেন যখন তার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয়, তখন ইব্রাহিমও তার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয়। একজনকে সেটা দিয়ে দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে মহেন্দ্র সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি।

—সো হোয়াট? তাতে হ'লটা কী? ডুপ্লিকেট চাবিতেও বাইশ-নম্বর ঘর খোলা যায়, মাস্টার-কীতেও খোলা যায়! ও তো একই ব্যাপার!

—না! ডুপ্লিকেট চাবিতে শুধু বাইশ-নম্বর ঘরের দরজা খোলা যায়, আর মাস্টার-কী'তে দোতলার সব কটা ঘর খোলা যায়! ইব্রাহিম ঐ পাঁচ মিনিটের ভিতর তেইশ-নম্বর ঘরে ঢুকে থাকতে পারে। তার আধঘণ্টা আগে কিন্তু বীর বাহাদুর ফ্লাস্কটা রেখে গেছে। ফ্লাস্কটা খুলে তার ভিতর একটা ক্রিস্টাল ফেলে বেরিয়ে আসতে বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড লাগার কথা।

নৃপেন জবাব দিতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে বলে, আশ্চর্য! মহেন্দ্র তো এসব কথা আমাকে বলেনি।

—আপনি প্রশ্ন করেননি, তাই বলেনি। সে এখনও জানে না ব্যাপারটার ইমপ্লিকেশন। আপনার মতো সেও বিশ্বাস করে ডুপ্লিকেট চাবি আর মাস্টার-কী একই কথা। দুটোতেই বাইশ নম্বর ঘর খোলা যায়।

একটা ঢোক গিলে নৃপেন বলে, আর আপনার দ্বিতীয় অনুমানটা, স্যার?

—দ্বিতীয়টা অনুমান নয়, আগেই বলেছি—সেটা এভিডেন্স! অকাট্য প্রমাণ! আসুন—

নৃপেনকে নিয়ে বাসু-সাহেব দ্বিতলে উঠে আসেন। তালা খুলে দু'জনে ঐ তেইশ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়েন। রমেন গুহ একইভাবে পড়ে আছে। বাসু-সাহেব পকেট থেকে একটা লোহার সোন্না বার করলেন। এগিয়ে এলেন টেবিলটার কাছে। অতি সাবধানে সোন্না দিয়ে অ্যাশট্রের গর্ভ থেকে উদ্ধার করলেন একটি দগ্ধাবশিষ্ট ফিলটার টিপড সিগারেটের স্টাম্প। আগুনের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেমনভাবে শিককাবাব ভাজা হয় তেমনি ভাবে সোন্নাটা টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। নৃপেন বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে। কী দেখছে তা সেই জানে।

—দেখলেন?—প্রশ্ন করলেন বাসু-সাহেব।

নৃপেন আমতা আমতা করে বললে, হুঁ!

—কী দেখলেন?

এবার নৃপেন বিরক্ত হয়ে বলে, কী আবার দেখব? সিগারেটের স্টাম্প! অ্যাশট্রের ভিতর আবার কী থাকবে?

মাথা নাড়েন বাসু-সাহেব। বলেন, থাকে দারোগা-সাহেব, থাকে! চোখ থাকলে দেখবেন অ্যাশট্রের খোপে সিগারেটের স্টাম্পের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে একটি অভিসারিকা! তার নয়নে মদির কটাক্ষ, সর্বাঙ্গে উদগ্র যৌবন, বিম্বৌষ্ঠে লিপ্‌স্টিক—বোধকরি ম্যাক্সফ্যাকটার-ভার্মিলিয়ান!

নৃপেনের সন্দেহ জাগে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কি মাথায় দু-একটা স্ক্রু আলগা! নাকি এই সাত-সকালেই মদ্যপান করেছেন? কিন্তু এতক্ষণ তো ওঁকে প্রতিভাবান গোয়েন্দার মতো মনে হচ্ছিল।

বাসু-সাহেব নৃপেনের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। ওর বিহ্বল অবস্থাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। আবার মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, একটা কথা খোলাখুলি বলব দারোগা-সাহেব?

—বলুন স্যার!

—আপনার কম্মো নয়!

মিসেস ডি.সি.-র মামা! কী বলতে পারে নৃপেন? একজন সিনিয়ার আই.এ.এস. যাঁকে মামা ডাকেন তাঁর অধিকার আছে এ কথা বলার। সংবিধানের কত নম্বর ধারায় ওটা বলা আছে নৃপেন তা ঠিক জানে না, কিন্তু এটুকু মনে আছে—কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবার সময় অ্যাপ্রিভিয়েশান মুখস্থ করেছিল: I.A.S. শব্দের বিস্তারিতরূপ In Anticipation of Sword! অর্থাৎ এমন একটি শাসকগোষ্ঠী যাঁদের তরোয়ালের প্রয়োজন নেই—যাঁরা হাতে-মাথা-কাটেন! বিপুল ঘোষ সেই আই.এ.এস.-গোষ্ঠীর একজন সিনিয়র অফিসার—দুদিন পরে হয়তো ডিভিশনাল কমিশনার হবেন। এ ভদ্রলোক হচ্ছেন তাঁর বেটার-হাফের মামা!

নৃপেন ঢোক গেলে!

বাসু-সাহেব ওর পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন, দুঃখ করবেন না মিস্টার ঘোষাল। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ক্রিমিনোলজি ইজ এ সায়েন্স! দারোগা মানেই ডিটেকটিভ নয়! আপনাদের আই.জি.-ও এ ভুল করতে পারেন, যদি না তিনি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনে বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে থাকেন। আমার পরামর্শ শুনুন—এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন লোক জানা আছে আপনার? থাকলে তাকেই পাঠান। কেসটা ঘোরালো! এসব কথা তো আর আমি বিপুলকে জানাতে যাচ্ছি না!

নৃপেন মনস্থির করে। একেবারে আত্মসমর্পণ। বলে, অমন লোক আমার কাছেই আছে স্যার। আমার সেকেন্ড অফিসার সুবীর রায়। আজই তার কার্শিয়াং থেকে ফিরে আসার কথা। তাকেই পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে—

—না, না আমার কাছে নয়। আমি শীঘ্রই এ হোটেল ছেড়ে চলে যাব।

—কেন স্যার? আর দু-একটা দিন—

—উপায় নেই ঘোষাল। আমি আজই চলে যাব অন্য একটা হোটেলে। ঘুম-এর কাছে। 'দ্য রিপোস'-এ। পর্শু তার উদ্বোধন। আমাদের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ আছে ওখানে।

উনি যে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরেছেন এতে খুশিই হল নৃপেন। বললে, কিন্তু ঐ 'ম্যাক্সফ্যাকটার ভার্মিলিয়ান' না কী যেন বললেন, ওটা কী? সিগারেটের স্টাম্পে কী দেখতে পেলেন আপনি?

—প্রমাণ! এভিডেন্স! গতকাল রাত্রে এ ঘরে একজন অভিসারিকা প্রবেশ করেছিলেন। দেখছ না? টেবিল-এর উপর পড়ে রয়েছে রমেনের সিগারেটের প্যাকেট। ক্যাপস্টান! এটা ফিলটারটিপ্‌ড স্টাম্প! রমেন যখন ঘরটা ভাড়া নেয় তখন এ অ্যাশট্রেটা নিশ্চয় শূন্যগর্ভ ছিল। সে ক্যাপস্টান খেয়েছে। তাহলে অ্যাশট্রেতে ফিলটার টিপড সিগারেটের স্টাম্প আসে কেমন করে? তাছাড়া এই লাল স্পটটা? ওটা লিপস্টিকের চিহ্ন। ফরেনসিক এক্সপার্ট করোবরেট করবে—তুমি দেখে নিও। আর এই সূত্রেই বোঝা যাচ্ছে কেন রমেন গুহ দুটো চাবিই চেয়ে নেয়, কেন সে কিছুতেই রাজী হয়নি তোমার বাড়িতে রাত্রিবাস করতে!

নৃপেন এখনও একবাঁও মেলে না।

—বুঝলে না? রমেন কিছু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ছিল না। মিস্ ডিক্রুজা ছিল কলগার্ল। রমেনের সঙ্গে তার ভালই আলাপ হয়েছিল ট্যাক্সিতে আসার পথে। ডুপ্লিকেট চাবিটা রমেন দিয়ে রেখেছিল ঐ মিস্ ডিক্রুজাকে। বিশ্বাস না হয় মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—মিস্ ডিক্রুজা কাল সন্ধ্যাবেলায় যে লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলেন সেটা ভার্মিলিয়ান রেড!

নৃপেন বলে, এখানে আমার আর কিছু করণীয় আছে স্যার?

—আছে। দুটো কাজ। প্রথমত তেইশ নম্বর ঘরে যে ফ্লাস্কটা আছে ওটাও এভিডেন্স হিসাবে নিয়ে যাও। তবে এবার আর ভুল কর না। সাক্ষী রেখে ওটা সীল করিয়ে নিও। আমার অনুমান ঐ জলেও পটাসিয়াম সায়ানাইড পাওয়া যাবে। দু-নম্বর কাজ—ঐ তেইশ-নম্বর ঘরের দু-পাশের দুটি ঘর সার্চ করা। বাইশ নম্বরে ছিল ইব্রাহিম আর চব্বিশে মিস ডিক্রুজা। দুজনেই সন্দেহভাজন।

নৃপেন বলে, ইব্রাহিম তো রাত সাড়ে আটটার সময় চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়। তখন তো রমেন গুহ জীবিত।

—আহ! তুমি বড় জ্বালাও! বললাম না তোমাকে? রাত সাড়ে আটটায় সে হোটেল ত্যাগ করে বটে, কিন্তু রাত সাতটায় সে মাস্টার-কী নিয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিল। সে সময় ফ্লাস্কটা রাখা ছিল রমেনের টেবিলে।

—আয়াম সরি! ঠিক কথা! আচ্ছা, ঐ দুটো ঘরই সার্চ করছি আমি; কিন্তু আপনিও সঙ্গে থাকলে ভাল হত না?

—না! আমরা দার্জিলিঙে এসেছি বেড়াতে। আমার স্ত্রী অনেকক্ষণ একা বসে আছেন নিচের ঘরে। ওঁর কাছেই আমি ফিরে যাব এখন। তুমি বরং যাবার আগে আমাকে জানিয়ে যেও ঐ দুটো ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছু পেলে কি না।

বাসু-সাহেব নেমে এলেন একতলায়। নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলেন ওঁর স্ত্রী রানী দেবী চুপ করে বসে আছেন চাকা-দেওয়া চেয়ারে। কোলের উপর পড়ে আছে কন্টকবিদীর্ণ অসমাপ্ত উলের সোয়েটারখানা। উলের গুলিটা পোষমানা বেড়ালছানার মত হাত পা গুটিয়ে বসে আছে ওঁর পায়ের কাছে। বিষাদের মূর্তি যেন!

—অনেকক্ষণ একা একা বসে আছো? নয়?

রানী দেবীর চমক ভাঙে। ম্লান হেসে বলেন, দারোগাবাবা বিদায় হল?

—আপাতত। আবার আসবেন যাবার আগে।

—আমরা কখন বিপোস এ যাচ্ছি?

—হয় আজ বিকালে, নয় কাল সকালে।

—তুমি বরং আগে একবার হোটেলটা দেখে এস। একেবারে দোর পর্যন্ত ট্যাক্সি যদি না যায়—

বাক্যটা উনি শেষ করেন না। প্রয়োজন ছিল না। ওঁরা দুজনেই জানেন মিসেস বাসু চলৎশক্তিহীনা। একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টে রানী দেবীর শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। উনি খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। বস্তুত ঐ দুর্ঘটনার পর থেকেই বাসু-সাহেবের জীবন অন্য খাতে বইছে। প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। এখন ওঁর একমাত্র কাজ পঙ্গু স্ত্রীকে সঙ্গদান করা। সন্তান একটিমাত্রই হয়েছিল ওঁদের। ঐ দুর্ঘটনায় মারা যায়।

বাসু-সাহেব হেসে বলেন, খবর নিয়েছি। গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। না থাকলেও বাধা ছিল না। তোমাকে কোলপাঁজা করে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার আজও আছে। বিশ্বাস না হয় তো বল এখনই পরখ করে দেখাই।

এত দুঃখেও হেসে ফেলেন রানী দেবী।

প্রায় মিনিট পনের পরে ফিরে এল নৃপেন। যথারীতি দরজায় নক্ করে ঘরে ঢুকল। বললে, মিস ডিক্রুজার ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না স্যার; কিন্তু মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘরে একটা জিনিস উদ্ধার করেছি। মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু দেখুন তো স্যার—

একটা কাগজের দলা। সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, কোথায় পেলে এটা?

—বাইশ নম্বর ঘরে, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।

—কাল রাত্রে ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাবার পর ও-ঘরে নতুন বোর্ডার আসেনি?

—না। তবে শুনলাম এখনই আসবে। একুশ নম্বর ঘরের বোর্ডার নাকি ঐ ঘরে শিফ্‌ট্ করছেন!

চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাসু-সাহেব। কাগজটা ওঁর মুঠিতে ধরাই থাকে। বলেন, কে ঐ একুশ নম্বরের বোর্ডার?

—নামটা জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শুনলাম তিনি আর্টিস্ট। একুশ নম্বর ঘরের জানলা থেকে নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা ভাল দেখা যায় না, গাছের আড়াল পড়ে। তাই উনি বাইশ নম্বরে সরে আসতে চান। একটু আগে ঘরটা দেখে পছন্দ করে গেছেন। এখনই শিফ্‌ট্ করবেন।

—বুঝলাম। ধীরে ধীরে কোঁকড়ানো কাগজের দলাটা খুলে ফেলেন। কাগজটা মেলে ধরেন টেবিলের উপর। হঠাৎ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাসুসাহেব। চোখ দু'টি বুঁজে যায়। রানী দেবী ছিলেন পিছনেই। কৌতূহল দমন করতে পারেন না। ঝুঁকে পড়েন কাগজটার উপর। তাতে কালো কালিতে লেখা ছিল:

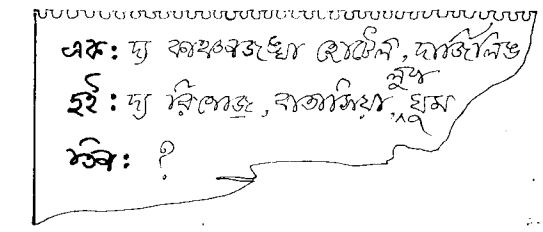

তিন

পয়লা অক্টোবর, মঙ্গলবার, 1968।

দার্জিলিঙ-এর আগের স্টেশন, ঘুম। পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশন। দার্জিলিঙ স্টেশনের চেয়েও তার উচ্চতা বেশী। ঘুমের অদূরে ঐ খেলাঘরের রেললাইনটা জিলাপির প্যাঁচের মত বার দুই পাক খেয়েছে—তার নাম বাতাসিয়া ডবল-লুপ। তারই পাশ দিয়ে একটা পাকা সড়ক উঠে গেছে উপর দিকে—ও পথে যেতে পার ক্যাভেন্টার্স অথবা কাঞ্চন ডেয়ারিতে কিম্বা 'টাইগার হিল'-এ। এই সড়কের উপরেই প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা একটা বাড়ি। এককালে ছিল কোন চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকের আবাসস্থল। বর্তমানে এটাই 'দ্য রিপোস' হোটেল। না, কথাটা ঠিক হল না—আজ নয়, আগামীকাল থেকে সেটা হবে রিপোস হোটেল। আগামীকাল দোশরা তার উদ্বোধন।

মালিক শ্রীমতী সুজাতা মিত্র। সুজাতা বিবাহিতা—স্বামী কৌশিক মিত্র। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বি-ই। সিভিল এঞ্জিনিয়ার। সুজাতার বাবা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। তিনি কী একটা আবিষ্কার করেছিলেন বলে শোনা যায়। সেই আবিষ্কারের পেটেন্টটা স্বনামে নেবার আগেই সন্দেহজনকভাবে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল ভদ্রলোকের। আবিষ্কারের সেই রিসার্চ-পেপারগুলো নিয়ে সুজাতা রীতিমত বিপদের ভিতর জড়িয়ে পড়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক খুনের মামলায়। রিসার্চের কাগজগুলো হাত করতে চেয়েছিলেন একজন কুখ্যাত ধনকুবের—ময়ূরকেতন আগরওয়াল। তিনিই ঘটনাচক্রে খুন হন। কৌশিক এবং সুজাতা বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়ে সেই খুনের মামলায়। বস্তুত ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু এবং অ্যাডভোকেট অরূপরতনের যৌথ চেষ্টায় ওরা দুজনেই মুক্তি পায়। এর মধ্যে বাসু-সাহেবের ভূমিকাটাই ছিল মুখ্য। যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল আগরওয়ালের

হত্যাকারীর নাম—নকুল দুই। সে ছিল আগরওয়ালেরই অধীনস্থ কর্মচারী এবং নানান পাপ-কারবারের সাথী। সে-সব অতীতের ইতিহাস। 'নাগচম্পা' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন অথবা 'যদি জানতেম' ছায়াছবিতে উত্তম-সৌমিত্রের যৌথ অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এসব কথা অজানা নয়।

মোট কথা ইতিমধ্যে সুজাতার সঙ্গে কৌশিকের বিয়ে হয়েছে বছরখানেক আগে। এখনও ঠিক এক বছর হয়নি। আগামী পাঁচই অক্টোবর, শনিবারে ওদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী। বিয়ের পরে কৌশিক ডঃ চ্যাটার্জির ঐ আবিষ্কারটা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে চায়; কিন্তু সুজাতা রাজী হতে পারেনি। ঐ সর্বনাশা আবিষ্কারটা তার কাছে কেমন যেন অভিশপ্ত মনে হয়েছিল। তিন-তিনজন লোকের মৃত্যু ঐ আবিষ্কারটার সঙ্গে জড়িত। প্রথমত ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু, দ্বিতীয়ত গুলিবিদ্ধ হয়ে ময়ূরকেতন আগরওয়ালের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এবং তৃতীয়ত হত্যাকারী নকুল দুই-এর ফাঁসি। হ্যাঁ—আগরওয়ালের হত্যাকারী নকুল দুইকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়। নকুল চেষ্টার ত্রুটি করেনি—সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল—কিন্তু লোয়ার কোর্টের বিচার তিলমাত্র নড়েনি। অর্থলোভে সুপরিকল্পিতভাবে নকুল যে হত্যাকাণ্ডটা করেছিল তার জন্য বিচারক চরমতম দণ্ডই বহাল রেখেছিলেন।

তাই কেমন একটা অবসাদ এসেছিল সুজাতার। ঐ রিসার্চের কাগজগুলো থেকে সে মুক্তি চেয়েছিল। নিজের কুমারী জীবনের ঐ অভিশাপকে বিবাহিত-জীবনে টেনে আনতে চায়নি। কৌশিক এঞ্জিনিয়ার। এসব ভাবালুতার প্রশ্রয় সে প্রথমটা দিতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও মেনে নিয়েছিল। ফলে নগদ দেড় লক্ষ টাকায় ঐ পেটেন্টটা ওরা বিক্রয় করে দিয়েছিল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জীমূতবাহন মহাপাত্রের কাছে। জীমূতবাহন হচ্ছেন অরূপরতনের পিতৃদেব। হয়তো অরূপের প্রতি কৃতজ্ঞতাও এ সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করে থাকবে।

সুজাতা তার সদ্যোবিবাহিত স্বামীকে বলেছিল, ঐ নগদ দেড়লাখ টাকা নিয়ে এবার তুমি ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু কর।

কৌশিক হেসে বলেছিল, তুমি যেমন ঐ রিসার্চ পেপারগুলো থেকে মুক্তি চাইছিলে সুজাতা, আমিও তেমনি আমার ঐ ডিগ্রিটা থেকে মুক্তি চাইছি আজ। আমি ভুলে যেতে চাই যে, আমি একজন সিভিল এঞ্জিনিয়ার!

সুজাতা অবাক হয়ে বলেছিল, ও আবার কী কথা? কেন?

—ভারতবর্ষে এঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন নেই। এদেশে এঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার অথবা কারিগরী কাজ-জানা মানুষের আর কোন দরকার নেই! এদেশের প্রয়োজন এখন শুধু রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার আর আই.এ.এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের!

—হঠাৎ তোমার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত?

—দেখতে পাচ্ছ না দেশের হাল? ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার-বৈজ্ঞানিকেরা এ দেশে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। দলে দলে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ইহুদি হওয়ার অপরাধে নাৎসী জার্মানী যেমন আইনস্টাইনকে দেশত্যাগী করেছিল, বৈজ্ঞানিক হওয়ার অপরাধে আজ তেমনি প্রফেসর খোরানাকে ভারতবর্ষ দেশছাড়া করেছে!

সুজাতা হেসে বলে, এ তোমার রাগের কথা। খোরানা নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁকে পদ্মবিভূষণ খেতাব দেওয়া হয়েছে!

হো-হো করে হেসে উঠেছিল কৌশিক। বলেছিল, ভাগ্যে প্রফেসর খোরানা শিশির ভাদুড়ী কিংবা উৎপল দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি!

—তুমি কী বলতে চাইছ বলত?

—আমি বলতে চাইছি ম্যাট্রিকে আমি তিনটে লেটার পেয়েছিলাম, স্টার পেয়েছিলাম, বি.ই-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম! আমাদের স্কুল-ব্যাচের প্রত্যেকটি ভাল ছেলে ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার অথবা

বৈজ্ঞানিক হতে চেয়েছে। যারা ঐ সব কলেজে ঢুকতে পারেনি সেই সব ঝড়তি-পড়তি মালই গেছে জেনারেল লাইনে। তাদের একটা ভগ্নাংশ আজ আই.এস.আর একটা ভগ্নাংশ আজ এম.এল.এ.!

সুজাতা তর্ক করেছিল। বলেছিল—তা তুমিও আই.এ.এস পরীক্ষা দিলে পারতে? তুমিও ইলেকশানে দাঁড়াতে পারতে!

কৌশিক বিচিত্র হেসে বলেছিল, তুমিও যে মন্ত্রীদের মত কথা বলছ সুজাতা! ছয় বছরের পাঠক্রম শেষ করে আই.এ.এস.পরীক্ষা না দিলে আমার ঠাই হবে না এ পোড়া ভারতবর্ষে? কিন্তু মুরারী মুখার্জির মত একজন সার্জেন, বি.সি. গাঙ্গুলির মত একজন এঞ্জিনিয়ার অথবা খোরানার মত একজন বৈজ্ঞানিক যতদিন ফিনান্স কমিশনার, অথবা চীফ সেক্রেটারী হতে না চাইছেন—

অসহিষ্ণু হয়ে সুজাতা বলে উঠেছিল, মোদ্দা কথাটা কী? তুমি কী করতে চাও? ঐ দেড় লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে রেখে তার সুদের টাকায় আমরা গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াব? না! ব্যবসাই করতে চাই আমি—

—আমিও তো তাই বলছি। ব্যবসাই যদি করতে হয় তবে যে জিনিসটা জান, বোঝ, তার ব্যবসাই করা উচিত। আমি তো তোমাকে চাকরি করতে বলছি না; আমি বলছি ঠিকাদারী করতে—

—কোথায়? পি.ডাবলু.ডি, ইরিগেশান অথবা কোনও পাবলিক আন্ডারটেকিং-এ তো? সর্বত্রই তো ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদল শীর্ষস্থান দখল করে বসে আছেন। তাঁদের তৈলাক্ত করতে না পারলে—

—তবে কিসের ব্যবসা করবে তুমি?

—যে কোন স্বাধীন ব্যবসা। যাতে কাউকে তোষামোদ করতে হবে না। আর সেটা এমন একটা ব্যবসা হবে যেখানে তুমি-আমি দুজনেই খাটব। ইকোয়াল পার্টনার!

—যেমন?

—ধর, আমরা একটা হোটেল খুলতে পারি। তুমি কিচেন-এর ইনচার্জ। কী রঙের পর্দা হবে, কী জাতের বেড-কভার হবে সব তোমার হেপাজতে। আর আমি রাখব হিসাব, ম্যানেজমেন্ট! সারাদিন দুজনে কাছাকাছি থেকে কাজ করব। সকালবেলা দুটো নাকেমুখে গুঁজে ঠিকাদারী করতে বেরিয়ে যাব, আর রাত দশটায় ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসব, তার চেয়ে এটা ভাল নয়?

কথাটা মনে ধরেছিল সুজাতার।

তারই ফলশ্রুতি 'দ্য রিপোস'!

জমি-বাড়ি-ফার্নিচার, ফ্রিজ, কিচেন-গ্যাজেট এবং একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি কিনতেই খরচ হয়ে গেল লাখখানেক টাকা। বাকি টাকা ব্যাঙ্কে রেখে ওরা দুজনে খুলে বসেছে হোটেল বিজনেস। বাড়িটা দোতলা। চারটে ডবল্-বেড বড় ঘর এবং দুটি সিংগল্-বেড। এ-ছাড়া একতলায় বেশ বড় একটা ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম। কিচেন-ব্লক, প্যান্ট্রি, স্টোর ইত্যাদি। রীতিমত বিলাতী কায়দায় প্ল্যানিং। প্রতিটি বেডরুমের সঙ্গেই সংলগ্ন স্নানাগার। কৌশিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটার মেরামতি করিয়েছে। গরম-জলের গীজার বসিয়েছে। সুজাতা ম্যাচকরা পর্দা, বেড-কভার ইত্যাদি কিনেছে। আয়োজন সম্পূর্ণ। আগামীকাল 'দ্য রিপোস'-এর উদ্বোধন। গোটাছয়েক বিজ্ঞাপন মাত্র ছাড়া হয়েছে। দুজন সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছেন। আশা করা যায় পূজা মরশুমে ঘর খালি পড়ে থাকবে না। দার্জিলিঙ-এর হৈ-চৈ এড়িয়ে নিরিবিলিতে ছুটির ক'টা দিন কাটিয়ে যেতে ইচ্ছুক যাত্রী নিশ্চয় জুটবে। যে দুজন বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। দুজনেই কলকাতাবাসী। মিস্টার নিজামুদ্দিন আলি এবং মিস কাবেরী দত্তগুপ্তা। দুজনেই জানিয়েছেন বুধবার, দোশরা, দুপুরে ছোট রেলে ঘুম স্টেশনে এসে পৌঁছাবেন। কৌশিক লিখেছিল স্টেশনেই ওঁদের রিসিভ করা হবে। উদ্বোধনের দিন, প্রথম বোর্ডার—তাই এই খাতির।

উদ্বোধনের আগের দিন। মঙ্গলবার। পয়লা। সকাল থেকেই কালীপদ আর কাঞ্চীকে নিয়ে সুজাতা শেষ বারের মত ঝাড়াপোঁছায় লেগেছে। কালীপদ মেদিনীপুরী—সমতলবাসী। চাকরির লোভে এসেছে

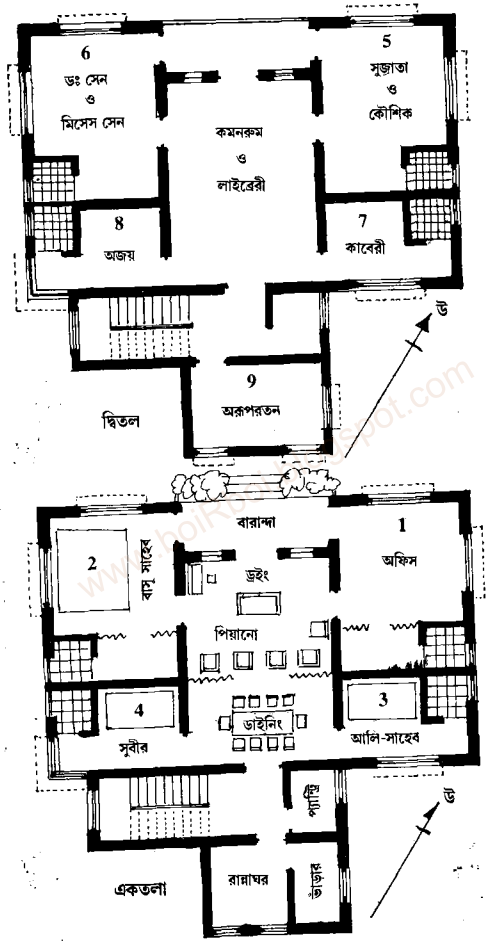

এতদূর। রিপোস-এর একমাত্র বেয়ারা। আর কাঞ্চী হচ্ছে স্থানীয় নেপালী মেয়ে। সামনের গ্রামটায় থাকে।

দু-জন বোর্ডার অ্যাডভান্স পাঠিয়েছেন। এ-ছাড়াও আরও তিনজন আসছেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে। ব্যারিস্টার পি.কে. বাসু সস্ত্রীক এবং অ্যাডভোকেট অরূপরতন। অরূপের জন্য দোতলার নয়-নম্বর ঘরটা ঠিক করা আছে, আর বাসু-সাহেবের জন্য একতলার দু-নম্বর ঘরটা। মিসেস বাসুর পক্ষে একতলা ছাড়া উপায় নেই। আলি-সাহেবের জন্য তিন নম্বর আর কাবেরীর জন্য দোতলার সাত-নম্বর ঘরটা মনে মনে স্থির করে রেখেছে সুজাতা। এখন ওঁদের পছন্দ হলে হয়।

বেলা দশটা নাগাদ কৌশিক গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল কাঞ্চন-ডেয়ারির দিকে। ওখান থেকে মাইলপাঁচেক। গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। কাঞ্চন-ডেয়ারির মালিক মিস্টার সেন ওদের পরিচিত। মিস্টার সেনের ভাইপো অজিত সেন কৌশিকের সহপাঠী। আপাতত ডজন দুই-তিন ডিম, কিছু হ্যাম, সফটমীট আর মাখন নিয়ে আসবে। আলি সাহেব হ্যাম খাবেন কি না জানা নেই। তাই দু-রকম মাংসের ব্যবস্থাই থাকল। ফ্রিজ আছে, নষ্ট হয়ে যাবার ভয় নেই। সুজাতা বলে দিয়েছে কাঞ্চন ডেয়ারির সঙ্গে যেন একটা অন-অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থা করে আসে। একদিন অন্তর কতটা কী মাল লাগবে তার ফিরিস্তিও লিখে দিয়েছে। আজ বিকালে সুজাতার একবার দার্জিলিঙে যাবার ইচ্ছে। কৌশিককে তাই বলে রেখেছে সকাল করে ফিরতে। কিছু টুকিটাকি বাজার এখনও বাকি আছে।

বাসু-সাহেব কাল দার্জিলিঙ থেকে ফোন করেছিলেন। সুজাতা অনুযোগ করেছিল—আবার দার্জিলিঙ গেলেন কেন? সরাসরি এখানে এসে উঠলেই পারতেন?

বাসু-সাহেব সকৌতুকে বলেছিলেন, নেমন্তন্নর গন্ধ পেয়ে আমি দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে যে আগেই এসে পৌঁছেছি।

—তাতে কী? আপনি তো ঘরের লোক! রানু মামিমাও এসেছেন তো?

—নিশ্চয়ই। তোমার 'দ্য রিপোস' পর্যন্ত ট্যাক্সি যাবে তো?

—আসবে। আপনি এখনই চলে আসুন।

—না সুজাতা, কাল আসছি। লাঞ্চ-আওয়ার্সের পরে। ভাল কথা, রমেন গুহকে মনে আছে? আমাদের নাট্যামোদী রমেন দারোগা?

—খুব মনে আছে। কেন বলুন তো?

—বিপুলের কাছে শুনলাম রমেন দার্জিলিঙে বদলি হয়েছে। কাল পর্শুর মধ্যে আসছে।

—তবে তাঁকেও নিমন্ত্রণ করবেন আমার হয়ে। আমি থানায় ফোন করে খবর নেব। মিস্টার ঘোষ আর মিসেস ঘোষ কিছুক্ষণের জন্য আসবেন বলেছেন।

—জানি। কিন্তু বিপুল বোধহয় শেষ পর্যন্ত তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে পারবে না। শুনছি গভর্নর-সাহেব স্বয়ং দার্জিলিঙ আসছেন। ফলে ডি.সি. সাহেবের সব স্যোশাল-অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে।

কালীপদ এসে দাঁড়ায়। জানতে চায়, বড় ফুলদানিটা কোথায় থাকবে?

সুজাতা স্মৃতিচারণ থেকে বর্তমানে ফিরে আসে। ওর হাত থেকে চিনেমাটির ফুলদানিটা নিয়ে আঁচল দিয়ে মোছে। বলে, একতলায় ড্রইংরুমে, পিয়ানোটার উপর। কাল সকালে মনে করে ওতে ফুল দিবি। বুঝলি?

—আজ্ঞে, আচ্ছা।

ঘড়ির দিকে নজর পড়ে। বেলা প্রায় দুটো। এতক্ষণে কৌশিকের ফিরে আসা উচিত ছিল। রান্নাবান্না সেই কখন হয়ে গেছে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সুজাতা আর অপেক্ষা করল না। কালীপদ আর কাঞ্চীকে খাইয়ে ছেড়ে দিল। কালীপদর ওবেলায় ছুটি। কোথায় বুঝি পাহাড়িদের রামলীলা হবে, তাই শুনতে যাবে। তা যাক। সুজাতাও তো ওবেলায় দার্জিলিঙ যাবে। থাকবেনা। হঠাৎ ঝন ঝন করে বেজে উঠল

টেলিফোনটা। কৌশিকই ফোন করছে।

সুজাতা প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার? এত দেরী হচ্ছে যে?

—আরে বল না। গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে। মেরামত করাচ্ছি। ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

—তার মানে ওবেলা দার্জিলিঙ যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যানসেল?

—উপায় কী বল! তুমি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নাও বরং।

—তা তো বুঝলাম; কিন্তু তুমি কোথা থেকে কথা বলছ? দুপুরে খাবে কোথায়?

—কাঞ্চন ডেয়ারি থেকে। সেন-সাহেবের অতিথি হয়েছি। বুঝলে? আমার জন্য অপেক্ষা কর না!

অগত্যা উপায় কী? সুজাতা একাই খেয়ে নিল। ক্রমে বেলা পড়ে এল। বিকালের দিকে কোথা থেকে আকাশে এসে জুটল দার্জিলিঙের কিছু খেয়ালী মেঘ। নামল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগেই ঘনিয়ে এল অন্ধকার। কৌশিকের ফোনটা আসার আগেই কালীপদকে ছুটি দিয়ে বসে আছে। আগে জানলে কালীপদকে ছাড়ত না। কাঞ্চী রাত্রে থাকে না। নির্বান্ধব পুরীতে চুপচাপ বসে রইল সুজাতা। জানলা দিয়ে দেখতে থাকে কার্ট-রোড দিয়ে গাড়ির মিছিল চলেছে—উপর থেকে নিচে আর নিচ থেকে উপরে। বাতাসিয়া ডবল লুপ দিয়ে একটা মালগাড়ি পাক খেতে খেতে নেমে গেল।

ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। অন্যদিন হলে দার্জিলিঙ-এর আলোর রোশনাই দেখা যেত। পাহাড়ের এখানে-ওখানে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে রাতচরা বাতিগুলো তাকিয়ে থাকে। নিত্য দীপাবলীর রূপ-সজ্জা। আজ আকাশ আছে কালো করে। ঝিরঝির করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। আঞ্চলিক পাহাড়ে বৃষ্টি। হয়তো দার্জিলিঙ খটখটে, হয়তো কার্শিয়াঙ রৌদ্রোজ্জ্বল—বৃষ্টি নেমেছে শুধু ঘুমের দেশে। এলোমেলো হাওয়ার খ্যাপামি। সুজাতা সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসে। এমন রাতে আলো ফিউজ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়! সে কথা মনে হতেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে সুজাতার। এই নির্বান্ধব পুরীতে যদি অন্ধকারে তাকে একা বসে থাকতে হয়! তাড়াতাড়ি উঠে মোমবাতি আর দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে হাতের কাছে রাখে। টর্চটাও। কালীপদটার যেমন বুদ্ধি! ঝড় জলে রামলীলার আসর নিশ্চয় ভেঙে গেছে। হতভাগাটা বাড়ি ফিরে এলেই পারে। কিন্তু ওরই বা দোষ কী? হয়তো আশ্রয় নিয়েছে কারও গাড়ি-বারান্দার তলায়। বৃষ্টিটা একটু না ধরলে সে বেচারি আসেই বা কী করে! পাহাড়ে বৃষ্টি, থাকবে না বেশিক্ষণ। দার্জিলিঙের বৃষ্টি ঐ অজাযুদ্ধ-ঋষিশ্রাদ্ধের সগোত্র। আসতেও যেমন যেতেও তেমন। কিন্তু কই, আজ তো তা হচ্ছে না। আবার নজর পড়ল দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর সে সাড়া দেয়। জানিয়ে দিল রাত সাতটা। হঠাৎ বেজে উঠল আবার ফোনটা। গিয়ে ধরল সুজাতা: হ্যালো?

—রিপোস?

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি 'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ' থেকে বলছি। আপনাদের গাড়ি মেরামত হয়ে গেছে। লোক দিয়ে পৌঁছে দেব না কি মিস্টার মিত্র দার্জিলিঙ থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবেন?

—দার্জিলিঙ থেকে! উনি দার্জিলিঙ গেছেন কে বলল?

—বাঃ! দার্জিলিঙেই তো যাচ্ছিলেন উনি। গাড়ি থেমে যেতে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি ধরে চলে গেলেন।

—ও! তা কী বলে গেছেন উনি?

—বলেছেন তো উনি নিজেই নিয়ে যাবেন, তা রাত আটটার সময় আমার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে—

—আমার মনে হয় আটটার আগেই উনি ফিরবেন। নেহাৎ না ফেরেন দোকান বন্ধ করার সময় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

লাইনটা কেটে দিয়ে সুজাতা ভাবতে বসে—ব্যাপার কী? কৌশিক যদি একটা শেয়ারের ট্যাক্সি নিয়ে

দার্জিলিঙ গিয়ে থাকে তাহলে দুপুরে সে টেলিফোন করে মিছে কথা বলল কেন? আর দার্জিলিঙ গেলে সে নিশ্চয় সুজাতাকেও নিয়ে যেত। সেই রকমই তো কথা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে? 'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ'টা আবার ও-দিকে—মানে দার্জিলিঙ যাওয়ার পথেই পড়বে, কাঞ্চন ডেয়ারির দিকে নয়। তাহলে? কিন্তু কৌশিক তো স্পষ্ট বলল সে কাঞ্চন ডেয়ারি থেকে ফোন করছে, মিস্টার সেনের বাড়িতে দুপুরে খাবে! এমন অদ্ভুত আচরণ তো কৌশিক কখনও করেনি এর আগে। সুজাতা শেষ পর্যন্ত আর কৌতূহল দমন করতে পারে না। কৌশিক ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল। কাঞ্চন ডেয়ারির মালিক মিস্টার সেনকে ফোন করল। ফোন ধরলেন সেনসাহেব নিজেই। সুজাতা সরাসরি প্রশ্ন করল আজ তাঁর সঙ্গে কৌশিকের দেখা হয়েছে কি না। সেন-সাহেব জানালেন—হয়েছে, দার্জিলিঙে। তাঁর অফিসে। কৌশিক ডিম-মাখন-মাংস ইত্যাদি খরিদ করেছে তাঁর দার্জিলিঙ-এর দোকান থেকে। সপ্তাহে দু'দিন সাপ্লাই দিতেও তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন কৌশিকের সঙ্গে। তারপর সেনসাহেবই প্রতিপ্রশ্ন করেন, মিস্টার মিত্র কি এখনও ফিরে আসেননি?

—না। তাই তো খোঁজ নিচ্ছি। দার্জিলিঙে বৃষ্টি হয়েছে নাকি?

—আদৌ না। আমি তো এইমাত্র ফিরছি সেখান থেকে।

সুজাতা স্থির করল কৌশিক ফিরলে প্রথমেই সে সরাসরি জানতে চাইবে—কেন এমন অযথা মিথ্যা কথা বলল সে! আরও এক ঘণ্টা কাটল। রাত সওয়া নয়টা। না কৌশিক, না কালীপদ।

শেষ পর্যন্ত পোর্চে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হল। সুজাতা উঠে গেল সদর খুলে দিতে। এতক্ষণে আসা হল বাবুর! বেশ মানুষ যা হোক। হঠাৎ নজর হল—না, ওদের গাড়িটা নয়। একটা ট্যাক্সি। গাড়ি থেকে একটা সুটকেস আর একটা হাতব্যাগ নিয়ে একজন অচেনা ভদ্রলোক নেমে এলেন। ভদ্রলোক সুটের উপর বর্ষাতি চাপিয়েছেন। বৃষ্টি তখনও হচ্ছে। টর্চ জ্বেলে 'দা রিপোস'-এর সাইনবোর্ডটা দেখলেন। ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ট্যাক্সিটা ব্যাক করল। ভদ্রলোক কলিং বেলটা টিপে ধরলেন।

সুজাতার ভীষণ রাগ হচ্ছিল কৌশিকের উপর। কোনও মানে হয়। রাত সওয়া ন'টা। কী করবে সে এখন? লোকটা অচেনা—এই নির্বান্ধব পুরীতে সে একা স্ত্রীলোক। ট্যাক্সিটাও চলে গেল!

দ্বিতীয়বার আর্তনাদ করে উঠল কলিং বেলটা।

উপায় নেই। দরজা খুলতেই হবে। তবে অনেক ঝড়-ঝাপটা এই বয়সেই সয়েছে সুজাতা। ভয়ডর এমনিতেই তার কম। অকুতোভয়ে সে দরজা খুলে মুখ বাড়ায়। ওকে দেখে একটু হকচকিয়ে যান ভদ্রলোক। বলেন, মাপ করবেন, এটা রিপোস হোটেল তো?

—হ্যাঁ। কাকে খুঁজছেন?

—ব্যক্তিকে খুঁজছি না, খুঁজছি বস্তু।

—বস্তু?

—আশ্রয়। আমার নাম এন. আলি—আমার রিজার্ভেশান আছে এখানে।

—ও আপনি! মিস্টার আলি! আসুন, আসুন—আপনার না আগামীকাল আসার কথা?

—কথা তাই ছিল। একদিন আগেই এসে পড়েছি বিশেষ কারণে। অসুবিধা হবে না আশা করি?

—অসুবিধা হবে। আমাদের নয়, আপনার। কিন্তু সে-কথা এখন চিন্তা করে লাভ নেই। এই বর্ষণমুখর রাত্রে আপনি আরাম খুঁজছেন না, খুঁজছেন আশ্রয়!

আলি-সাহেব পাপোশে জুতোটা ঘষে ড্রইংরুমে প্রবেশ করেন। হেসে বলেন, বর্ষণমুখর রাত্রি! কথাটা কাব্যগন্ধী!

সুজাতা কথা ঘোরানোর জন্য বলে, ভিজে গেছেন নাকি?

—বিশেষ নয়। ভাল কথা, আমার নামে যে ঘরটা বুক করা আছে, সেটা কি আজ এই 'বর্ষণমুখর

রাত্রে' ফাঁকা আছে?

সুজাতা একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করে। ঘুরিয়ে বলে, না-থাকলেও শোবার একটা ঘর পাবেন।

—তার মানে হোটেল আপনার 'উপঢৌয়মান'! পূজা মরশুম। তাই নয়?

সুজাতা সত্যিকথাটা স্বীকার করবে কি না বুঝে উঠতে পারে না।

ভদ্রলোক ভিজে বর্ষাতিটা খুলে হ্যাট-র‍্যাকে টাঙিয়ে রাখেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, বেয়ারাদের কাউকে দেখছি না যে?

—আসবে এখনই। কোথা থেকে আসছেন এত রাত্রে?

—দার্জিলিঙ থেকে। আজই সকালে পৌঁছেছিলাম সেখানে।

—তাহলে এই রাত করে বার হলেন যে? 'রিপোস' তো আপনি চিনতেনও না।

—দার্জিলিঙ ওভার-বুকড। কোনও হোটেলে ঠাঁই নেই। ভাবলাম আপনারা একটা-না-একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন। আচ্ছা, মিস্টার মিত্র কোথায়? আমার চিঠির জবাব দিয়েছিলেন তো সাম মিস্টার মিত্র।

—হ্যাঁ, কৌশিক মিত্র। আমি মিসেস মিত্র।

—আমি তা আগেই বুঝেছি। মিস্টার কৌশিক মিত্র কোথায়?

—দোতলায়। অফিসে কাজ করছেন। আসুন, আপনার ঘরটা দেখিয়ে দিই—

আলি ইতস্তত করে। আশা করছিল কোন বেয়ারা এসে ওর ব্যাগটা নেবে।

সুজাতা বলে, স্যুটকেসটা এখানেই থাক। রুম-সার্ভিসের বেহারা পৌঁছে দেবে। আপনি শুধু হাত ব্যাগটা নিয়ে আসুন—

—প্রয়োজন হবে না। নিজের ব্যাগ আমি নিজেই বয়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত। ও-দেশে স্টেশনে-এয়ারপোর্টে এমন কুলির ব্যবস্থা নেই। নিজের মাল নিজেকেই বইতে হয়।

—আপনি বুঝি সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন? চলতে চলতে সুজাতা প্রশ্ন করে।

আলি সে কথা এড়িয়ে বলে, আমি কিন্তু এখন এক কাপ চা খাব মিসেস্ মিত্র। বিকালে চা জোটেনি।

এতক্ষণে মনে পড়ে গেল সুজাতার। বৈকালিক চা পান তার নিজেরও হয়নি।

ড্রইংরুম পার হয়ে পর্দা সরিয়ে ডাইনিং রুম। তার ও দিকে বাড়ির পশ্চিম-কোনার তিন নম্বর ঘরটিতে পৌঁছালো ওরা। সুজাতাই আগে ঢুকল ঘরে, আলোর সুইচটা জ্বেলে দিতে। বললে, ওয়াশ-আপ করতে চান তো গীজারটা চালু করে দিন। মিনিট দশেকের মধ্যেই গরম জল পাবেন। আমি চা-টা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি। মিস্টার মিত্রকেও খবরটা দিই। সরুন—

আলি ঘরে ঢোকেনি। দাঁড়িয়ে ছিল দরজার মুখে। বস্তুত দরজা আগলে। হঠাৎ হাসি-হাসি মুখে লোকটা বলল, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব মিসেস্ মিত্র?

একটু সচকিত হয়ে ওঠে সুজাতা। লোকটা অমন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে কেন? তবু সাহস দেখিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, বলুন?

—এমন 'বর্ষণমুখর রাত্রে' এই নির্বান্ধব বাড়িতে একেবারে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?

হাত-পা হিম হয়ে গেল সুজাতার। মনে হল ওর পিঠের দিকে, ব্লাউজের ভিতর কী-যেন একটা সরীসৃপ কিলবিল করে নেমে গেল।

কার্ট-রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তাদের হেডলাইট বাঁকের মুখে জমাটবাঁধা অন্ধকার-স্তূপে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। অন্ধকার তাতে একটুও কমছে না। গাড়ি বাঁক নিলেই আঁধারে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দু'পাশের আদিম অরণ্য। তা হোক, তবু ঐ গাড়িগুলো মানব সভ্যতার প্রতিনিধি। ওর ভিতর আছে মানুষজন। সুজাতা একা নয়। কিন্তু কার্ট-রোড যে ওখান থেকে তিন-চারশ ফুট!

নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনাচক্র। ঠিক এই মুহূর্তেই ড্রইংরুমে বেজে উঠল টেলিফোন। তার যান্ত্রিক কর্কশ শব্দটা জলতরঙ্গের মত মিঠে মনে হল সুজাতার কাছে। না, সে একা নয়। তাকে ঘিরে আছে এই

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের শুভেচ্ছা! ও তাদের সব্বাইকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ঐ তো ওদেরই মধ্যে একজন যান্ত্রিক দূরভাষণে ওর কুশল জানতে চাইছে। দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে সুজাতা বললে আগেকার শব্দটাই, সরুন!

দরজা থেকে সরে দাঁড়াল আলি। সুজাতা ডাইনিংরুম পার হয়ে চলে এল ড্রইংরুমে। পিয়ানোটার পাশেই টেলিফোন স্ট্যান্ড। ড্রইং আর ডাইনিং রুম-এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পর্দা। বর্তমানে সরানো। তাই তিন-নম্বর ঘরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছিল আলি—শাড়ির আঁচল সামলিয়ে সুজাতা টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিল। রিপোস!

দার্জিলিঙ থেকে মণি-বৌদি ফোন করছেন। ডি.সি. মিস্টার বিপুল ঘোষ, আই.এ.এস.-এর স্ত্রী। জানালেন—সুজাতার নিমন্ত্রণ রাখতে আসা সম্ভবপর হচ্ছে না ওঁদের পক্ষে। গভর্নর দার্জিলিঙে আসছেন। ফলে ডি.সি. ব্যস্ত থাকবেন। তাছাড়া রেডিওতে নাকি খবর দিয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গে আগামী দু'তিনদিন প্রবল বর্ষণ হতে পারে।

সুজাতা অপ্রয়োজনে দীর্ঘায়ত করল তার দূরভাষণ। নানান খেজুরে গল্প জুড়ে সময় কাটালো। লক্ষ্য করে আড়চোখে দেখল—আলি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে অনেকটা। সে এখন ড্রইং-ডাইনিং রুম-এর সঙ্গমস্থলে। মুখ-হাত ধুতে ঘরে যায়নি। বরং পাইপটা জ্বেলেছে।

ঠিক এই সময়ই ফিরে এল কালীপদ। কাক ভেজা হয়ে। তাকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল সুজাতার। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললে, জামাকাপড় ছেড়ে ফেল। চায়ের জল বসা।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আলি-সাহেবের। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুজাতা বলে ওঠে, মাপ করবেন, তখন কী যেন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি? টেলিফোনটা বেজে ওঠায় জবাব দেওয়া হয়নি।

আলি হেসে বললে, প্রশ্নটা এতক্ষণে তামাদি হয়ে গেছে!

—ভুলে গেছেন?

—যাব না? ও.সি., ডি.সি., গভর্নর!...তারপর কি আর কিছু মনে থাকে?

—নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেল আলি।

রাত দশটায় ফিরে এল কৌশিক। বৃষ্টিতে ভিজে। গাড়ির কেরিয়ারে খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে। অভিমান-ক্ষুব্ধা সুজাতাও কোনও কৌতূহল দেখালো না। জানতে চাইল না কেন এত রাত হল। কৌশিক নিজে থেকেই সাতকাহন করে কৈফিয়ৎ দিতে থাকে। বেশ বোঝা গেল—'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ'-এর লোকটা কৌশিককে জানায়নি যে, ইতিমধ্যে সে রিপোস-এ ফোন করেছিল।

রাত্রে খাবার টেবিলে কৌশিকের সঙ্গে পরিচয় হল আলি-সাহেবের। তিনজনে একসঙ্গেই খেতে বসেছিল। ডিনার টেবিলে। সেলফ-হেলপ পরিবেশন ব্যবস্থা। কৌশিক আলি-সাহেবকে বললে, আপনার নিশ্চয় খুব অসুবিধা হয়েছে। আমরা এখনও ঠিকমত প্রস্তুত নই, বুঝেছেন? আগামীকাল থেকে হোটেল চালু হবার কথা।

আলিসাহেব আলুভাজার প্লেটটা নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে বলেন, বুঝেছি। তাই বুঝি গাড়ি নিয়ে শেষবারের মত বাজার করতে দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন?

—না, না, দার্জিলিঙে তো নয়। আমি গিয়েছিলাম কাঞ্চন ডেয়ারিতে। এদিকে—

—ও, তাই বুঝি! আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম—আপনি বুঝি দোতলার অফিসঘরে বসে কাজ করছেন। মিসেস মিত্রই আমার ভুলটা ভেঙে দিলেন। বললেন—না, উনি বাড়িতে একেবারে একা আছেন। চাকরটা পর্যন্ত নেই! আর আপনি নাকি বাজার করতে দার্জিলিঙে গেছেন।

—দার্জিলিঙ! তুমি তাই বলেছ?—কৌশিক প্রশ্ন করে সুজাতাকে।

সুজাতা সে প্রশ্নের জবাব দেয় না। আলিসাহেবকে বলে, আজ কিন্তু সংক্ষিপ্ত মেনু। এই তিনটেই আইটেম—আলুভাজা, ডিমভাজা আর খিচুড়ি।

আলি হেসে বলে, আজ আকাশের যা অবস্থা তাতে অন্যরকম আয়োজন হলে আপনাকে বেরসিকা ভাবতাম মিসেস মিত্র!

কৌশিক বললে, সত্যি—কী বিশ্রী বৃষ্টি শুরু হল!

আলি বিচিত্র হেসে বললে, বিশ্রী! সেটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গির দোষ। বিরহকাতরা কোন বিরহিণী হয়তো এমন রাতেই গান ধরেন 'কৈসে গোঁঙাইবি হরি বিনে দিন-রাতিয়া!' কী বলেন মিসেস মিত্র?

সুজাতা মুখ টিপে বলে, আপনাকে কাব্য রোগে ধরেছে মনে হচ্ছে!

—ধরবে না? আমার কাছে রাতটা যে মোটেই বিশ্রী নয়—আমার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে এটা 'বর্ষণমুখর রাত্রি'!

কৌশিক সন্দিগ্ধভাবে দু'জনের দিকে তাকায়। তার হঠাৎ মনে হয়—সুজাতা লজ্জা পেল। কেন? যেন কথা ঘোরাতেই সুজাতা বললে, মুশকিল হয়েছে কি আমার হেড কুক-এর প্রবল জ্বর হয়েছে!

—কার? কালীপদর?—কৌশিক জানতে চায়।

সুজাতা বলে, হ্যাঁ। বৃষ্টিতে ভিজে।

আলি বলে, তবে তো খুব মুশকিল হল আপনার। কাল সকালেই সব বোর্ডাররা আসবেন তো?

—সকালে না হয় সারাদিনে তো আসবেই।

—তাহলে লোকজন আসার আগে আপনাকে জনান্তিকে একটা খবর দিয়ে রাখি মিসেস মিত্র। আমি ব্যাচেলার—নিজের রান্না নিজে করি। পিকনিকে গেলে বরাবর আমাকে রাঁধতে হয়েছে। প্রয়োজনবোধে আপনার হেড কুকের অ্যাকটিনি করতে পারি। ভাটপাড়া অথবা নবদ্বীপ থেকে কোন পণ্ডিতমশাই নিশ্চয় আপনার বোর্ডার হতে আসছেন না?

কৌশিক তাড়াতাড়ি বলে, না না তার প্রয়োজন হবে না। আমিই তো আছি!

—এখন আছেন। কাল সকালেই হয়তো আবার দার্জিলিঙ ছুটবেন...আই মিন কাঞ্চন ডেয়ারিতে।

কৌশিক বিষম খেল।

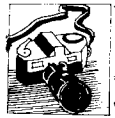

চার

দোশরা অক্টোবর, বুধবার। সন্ধ্যা।

ইতিমধ্যে রিপোস-এ এসে হাজির হয়েছেন বেশ কয়েকজন। সুজাতা চোখে অন্ধকার দেখে। কাল রাত্রি থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তা থামার লক্ষণ নেই। একনাগাড়ে বর্ষণ চলেছে। পাহাড়ে বৃষ্টি। কখন থামবে কেউ জানে না। রেডিওতে তো বলছে সহজে থামবে না। কালীপদ সেই যে শুয়েছে আর ওঠার নাম নেই। সারা রাত প্রবল জ্বর ছটফট করেছে বেচারি। ওদিকে কাঞ্চী আজ সকালে আসেনি—ওদের বস্তির ঘরে হুড়হুড় করে জল ঢুকছে হয়তো। সেই সামলাতেই ওরা হিমসিম। অথচ এদিকে একে-একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন আবাসিকেরা।

সবার আগে এসেছেন মিস্ কাবেরী দত্তগুপ্তা। সকাল ছটায়। তখনও শয্যাত্যাগ করেনি সুজাতারা। কাল রাত্রে সুজাতার ভাল ঘুম হয়নি। কৌশিক হঠাৎ কেন একঝুড়ি মিথ্যা কথা বলল তা ও কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। অপরপক্ষে কৌশিকও একটু গুম মেরে গেছে। খাবার টেবিলে যে কথোপকথনটা হল সেটার কথাই ওর বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। ভাবছিল—সুজাতা কেন আলি-সাহেবকে প্রথম সাক্ষাতেই বলে বসেছিল—বাড়িতে সে একেবারে একা, চাকরটা পর্যন্ত নেই! আর আলি-সাহেব কেন অমন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বললে, 'আমার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে এটা বর্ষণমুখর রাত্রি!' সুজাতাই বা অমন রাঙিয়ে উঠল কেন হঠাৎ? কৌশিকের ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল—সে এসে পৌঁছানোর আগে

সুজাতা আর আলি নির্জন বাড়িতে কী নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। আলি যখন আসে তখন কি সুজাতা গান গাইছিল—'কৈসে গোঁডাইবি হরি বিনে দিন-রাতিয়া!' পাশাপাশি খাটে দুজনেই জেগে শুয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। দুজনেই জেগে আছে। কেউই কিন্তু সাড়া দেয়নি। তারপর কখন দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল! ঘুম ভাঙল নিচের কলিংবেলটা আর্তনাদ করে ওঠায়।

—এই, নিচে কে যেন কলিংবেল বাজাচ্ছে। কাঞ্চী এসেছে বোধহয়—কৌশিক সুজাতাকে ডেকে দেয়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুজাতা। কাঞ্চী তো এত সকালে আসে না। নিচে নেমে আসে। দরজা খুলেই দেখে—কাঞ্চী নয়, আগন্তুক একজন নতুন বোর্ডার। বছর পঁচিশ-ত্রিশ বয়সের একজন মহিলা। চিকনের একটি শাড়ির উপর গরম ওভারকোট। দেখতে ভালই—সুন্দরীই বলা চলে। মেয়েটি বলে, আমার নাম কাবেরী দত্তগুপ্তা।

—সুপ্রভাত! আসুন, আসুন!—এত ভোরবেলা কোথা থেকে? আপনার না আজ দুপুরে আসার কথা?

—তাই স্থির ছিল। রেলওয়ে রিজার্ভেশান পেলাম একদিন আগে। কাল এসেছি—

—কাল এসেছেন! রাত্রে কোথায় ছিলেন?

—কার্শিয়াঙে। ওখানে আমার একজন বন্ধুস্থানীয় লোক আছেন। তাঁর বাড়িতেই রাত্রে ছিলাম। ভোরবেলা উঠেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছি। যা বৃষ্টি—

—আসুন, ভিতরে আসুন—আপনার জামা-কাপড় একদম ভিজে গেছে।

কাবেরীর সঙ্গে কোন বেডিং নেই। আছে, একটা সুন্দর সাদা সুটকেস। কালীপদ অসুস্থ। ফলে সুজাতা আর কাবেরী দুজনে ভাগাভাগি করে সেটা টেনে নিয়ে আসে দোতলায়। কাবেরীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল দোতলার সাত নম্বর ঘরটা। সেটা পছন্দ হল কাবেরীর। ঘরে পৌঁছে কাবেরী বললে, আপনিই তো হোটেলের মালিক, তাই নয়?

—আমি একা নই। আমরা। স্বামী-স্ত্রী। আজই খোলা হল হোটেলটা। পরে ভাল করে আলাপ করা যাবে। চা খাবেন নিশ্চয়। আমরাও এখনও খাইনি।

—চা তো খাবই। একেবারে বাসিমুখে রওনা হয়েছি—

—ঠিক আছে। মুখ হাত ধুয়ে নিন। গীজার আছে, গরম জল পাবেন।

দুপুরে যে ট্রেনটা শিলিগুড়ি থেকে আসে সেটা এসে উপস্থিত হল বেলা চারটেয়। বৃষ্টির জন্য। কাক-ভেজা হয়ে এসে উপস্থিত হলেন অরূপরতন মহাপাত্র। ছোটরেলের ট্রেনটা যে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে এ ভরসাই নাকি ছিল না। প্রবল বর্ষণে অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। তবে লাইন চালু আছে এখনও। অরূপরতনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল দোতলার নয়-নম্বর ঘরটা। কিচেন-ব্লকের উপরে, সিঁড়ির পাশেই। অরূপ ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখলেন। প্রশংসা করলেন—যতটা না বাড়ির, তার চেয়ে বেশি তার রূপসজ্জার। সুজাতার রুচিকেই তারিফ করলেন বারে বারে। সারা বাড়িটা দেখিয়ে ওঁকে পৌঁছে দিচ্ছিল ওঁর সাত নম্বর ঘরে। হঠাৎ সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল কাবেরীর সঙ্গে। সে নিচে নামছিল। সুজাতা ওঁদের পরিচয় করিয়ে দেয়, মিস্ কাবেরী দত্তগুপ্তা, আজই সকালে এসেছেন। আর ইনি মিঃ অরূপরতন মহাপাত্র, ব্যাডভোকেট। আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

কাবেরী কোন কৌতূহল দেখাল না। মামুলী নমস্কার করল শুধু।

অরূপ প্রতিনমস্কার করে বললে, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

—আমাকে! কোথায়?—কেমন যেন চমকে ওঠে কাবেরী।

—মাপ করবেন, আপনি কি ক্রিশ্চিয়ান?

—ক্রিশ্চিয়ান! না, তো! এমন অদ্ভুত কথা মনে হল কেন আপনার?

অরূপ হেসে বলে, আমারই ভুল তাহলে। আমার এক খ্রীষ্টান বন্ধুর বিয়েতে একবার চার্চে

গিয়েছিলাম—বছরখানেক আগে। সেখানে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম—

—না না—আমার বংশের কেউ কখনও গীর্জায় যায়নি। আপনি ভুল করছেন।

কাবেরী তরতরিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

অরূপ একটু হকচকিয়ে যায়। সুজাতাকে বলে, ভদ্রমহিলা কি অফেন্স নিলেন?

—অফেন্স নেওয়ার মত কোন কথা তো আপনি বলেননি।

—না, তা বলিনি! আমারই ভুল।

সুজাতার মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা। সেবারও অরূপরতন একজনকে দেখে বলেছিলেন—'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?' আর সেবার কিন্তু অরূপের ভুল হয়নি।

বিকাল নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন আর একজন আগন্তুক। আসার ঘণ্টাখানেক আগে দার্জিলিঙ থেকে একটা টেলিফোন করে জানতে চাইলেন—সিঙ্গল সীটেড ঘর পাওয়া যাবে কিনা। কৌশিক অবস্থা বেগতিক দেখে আপত্তি করেছিল, কিন্তু সুজাতা শোনেনি। সুজাতার মতে বোর্ডার হচ্ছে ওদের ব্যবসায়ের লক্ষ্মী। উদ্বোধনের দিনেই সে কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না—যতই কেন না অসুবিধা হ'ক। ফলে ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন অজয় চট্টোপাধ্যায়। বৃদ্ধ সরকারী অফিসার ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। বিপত্নীক। ছেলে-মেয়েরা বিবাহিত এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। খেয়ালী মানুষ, মেজাজ একটু তিরিক্ষে। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তিনি ছবি এঁকে বেড়াচ্ছেন। পাহাড়ে এসেছেন ছবি আঁকতে। দ্বিতলের আট-নম্বরে তাঁকে থাকতে দেওয়া হল।

বাসু-সাহেব সস্ত্রীক যখন এসে পৌঁছালেন তখন দিনের আলো মিলিয়ে গেছে।

বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় সবাই জমিয়ে বসেছেন ড্রইংরুমে। আলি-সাহেব, কাবেরী, অরূপ, অজয় চাটুজ্জে এবং কৌশিক। শুধু সুজাতা অনুপস্থিত। সে ছিল কিচেন-ব্লকে। এতগুলি প্রাণীর রান্নার জোগাড় করতে বেচারি হিমসিম খাচ্ছে। কালীপদ শয্যাশায়ী। কাঞ্চী আদৌ আসেনি। ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার অবসর নেই সুজাতার। কৌশিক একবার এসেছিল কোন সাহায্য করতে হবে কি না জানতে; রূঢ়ভাবে সুজাতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুজাতার মেজাজ হঠাৎ এমন বিগড়ে গেল কেন কৌশিক কিছু আন্দাজ করতে পারে না। অতএব সেও গুটিগুটি এসে বসেছে ড্রইংরুমে।

বাইরের দিক থেকে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাসু-সাহেব, চাকা-দেওয়া চেয়ারে সহধর্মিণীকে নিয়ে। কৌশিক সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়, আর ওঁদের বলে—আর এঁদের পরিচয় উনি আমাদের মামা আর মামীমা। মিস্টার পি.কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল আর মিসেস্ রানী বাসু। লেডিজ এ্যান্ড জেন্টেলমেন! আমার একটা ঘোষণা আছে।এমন জমাট বর্ষার সন্ধ্যায় আপনাদের একটি সুখবর দিচ্ছি—আমাদের বাসুমামুর ঝুলিতে অসংখ্য ইন্টারেস্টিং কেস-হিস্ট্রি আছে। উনি ছিলেন ক্রিমিনাল লইয়ার। ফলে উনি যদি একটা গোয়েন্দা গল্প ফাঁদেন আমরা অজান্তে ডিনার টাইমে পৌঁছে যাব!

আলি বলেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং! আপনার ঝুলি ঝেড়ে অতীতদিনের কোনও একটা লোমহর্ষক কাহিনী বার করে ফেলুন বাসু-সাহেব—

বাসু-সাহেব একটা সোফায় সবেমাত্র গুছিয়ে বসেছেন। পাইপ আর পাউচটা বার করে লক্ষ্য করে দেখছিলেন—টোব্যাকোটা ভিজে গেছে কি না। অন্যমনস্কের মত বলেন, উ? অতীতদিনের কোন লোমহর্ষক কাহিনী? নো, আয়াম সরি—

—শোনাবেন না?—হতাশ হয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক!

—না! অতীতের কথা থাক! Let the dead past bury its dead! তবে তোমাদের একেবারে নিরাশও করব না। অতি সাম্প্রতিক কালের একটা লোমহর্ষক কাহিনী তোমাদের শোনাব—

—সে তো আরও ভাল কথা—বলে ওঠে কাবেরী।

—উ? ভাল? তা ভাল-খারাপ জানি না—আজই—এই ধর ঘণ্টা চৌদ্দ আগে দার্জিলিঙে একটা হোটেলে একটা মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী!

সবাই চমকে ওঠে খবরটা শুনে।

কৌশিক বলে, দার্জিলিঙের হোটেল? কোন হোটেলে?

—হোটেল—দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা! রুম নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি! বাই দ্য ওয়ে—হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম আপনারা কেউ শুনেছেন?

দৃষ্টিটা উনি বুলিয়ে নেন ওঁর সোৎসুক দর্শকবৃন্দের উপর।

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কেমন যেন অস্বোয়াস্তি বোধ করে সবাই। কেউ কোনও জবাব দেয় না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট অজয় চাটুজ্জে গলাটা সাফা করে নিয়ে বলেন, আমি চিনি। ইন ফ্যাক্ট, ওখান থেকেই আসছি আমি। আমি কাল রাত্রে ঐ হোটেলে ছিলাম, রুম নম্বর একুশে।

—তাই নাকি! তা এতবড় খবরটা শোনেননি?—প্রশ্নটা পেশ করেন আলি-সাহেব।

অজয়বাবু একটু নড়ে-চড়ে বসেন। বলেন, শুনব না কেন, শুনেছি। তাই তো চলে এলাম এখানে। ওখানে আর ছবি আঁকার পরিবেশ নেই। সওয়াল-জবাব শুরু হয়ে গেছে!

কৌশিক বলে, কী আশ্চর্য! এতক্ষণ তো আমাদের বলেননি কিছু?

—কী বলব? এটা কি একটা বলার মত কথা? আমরা এখানে এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে, স্ফূর্তি করতে। তার মধ্যে দারোগা-খুনের খবরটা জনে জনে বলে বেড়াতে হবে তার অর্থ কী?

—দারোগা! যে লোকটা মারা গেছে সে কি পুলিশের দারোগা ছিল?—প্রশ্নটা আবার পেশ করেন আলি-সাহেব।

বাসু-সাহেব অরূপরতনের দিকে ফিরে বলেন, রমেন গুহকে মনে আছে অরূপ?

—নাট্যামোদী রমেন দারোগা? আলবৎ! কেন কী হয়েছে তার?

—রমেন বদলি হয়ে এসেছিল দার্জিলিঙে। গতকাল বেলা বারটার সময় সে এসে ওঠে ঐ হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। আর আজ সকাল পৌনে ছ-টায় তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নিজের ঘরে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এ কেস অব পয়েজনিং! ওর ফ্লাস্কে কেউ পটাসিয়াম সায়ানাইড ফেলে গেছে!

সকলে ঘনিয়ে আসে। বিস্তারিত জানতে চায় ঘটনাটা। যতদূর জানা ছিল বাসু-সাহেব আনুপূর্বিক বলে যেতে থাকেন। মাঝে মাঝে পাদপূরণ করছিলেন রানী দেবী। ইতিমধ্যে সুজাতাও মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে। আবার ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। রমেন গুহ সুজাতার বিশেষভাবে পরিচিত। বাসু-সাহেব সব কথারই উল্লেখ করলেন। কিন্তু জানালেন না দুটি সংবাদ। তেইশ নম্বর ঘরে অ্যাশট্রে থেকে উদ্ধার করা সিগ্রেটের টুকরার কথা; আর বাইশ-নম্বরের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের কাগজের কথাটা।

আলি-সাহেব বলে, ঐ মহম্মদ ইব্রাহিমের চেহারার কী বর্ণনা পেলেন?

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বাসু-সাহেব বললেন, হাইট এবং স্ট্রাকচার এই ধরুন প্রায় আপনার মত। তবে লোকটার দাড়ি ছিল এবং চোখে চশমা ছিল—

আলি হেসে বললে, ভাগ্যে আমার তা নেই! না হলে আপনারা হয়তো আমাকেই সন্দেহ করতেন। আমি তো কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি, ইব্রাহিম-সাহেব চেক-আউট করবার ঘণ্টা খানেক পরে।

—এবং লোকটা পাইপ খেত!—পাদপূরণ করেন বাসু-সাহেব।

—পাইপ খেত! সেরেছে!—জ্বলন্ত পাইপটা নিয়ে আলি-সাহেব অভিনয় করেন যেন তিনি অত্যন্ত বিড়ম্বিত—কোথায় পাইপটা লুকোবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কাবেরী বলে, মিস্টার আলি, আপনার ভয় নেই। বাসু-সাহেব নিজেও পাইপ খান!

—থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলেন!—আলি-সাহেব পাইপ টানতে থাকেন আবার।

—আর মিস্ ডিক্রুজা?—এবার জানতে চায় অরূপ।

প্রশ্নকর্তার দিকে না তাকিয়ে বাসু-সাহেব সরাসরি তাকালেন কাবেরী দত্তগুপ্তার দিকে। যেন তারই একটা দৈহিক বর্ণনা দেখে দেখে দিচ্ছেন সেইভাবে বলে গেলেন, হাইট—মাঝারি, রঙ—ফর্সা, বয়স কত হবে? এই ধরুন সাতাশ-আঠাশ! সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। মাপ নাকি—34-28-32।

কাবেরীকে প্রথমটায় একটু নার্ভাস লাগছিল, কিন্তু শেষ বর্ণনাটায় সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। রানী দেবীকে বলে, মামীমা, একটু সাবধানে থাকবেন! মামা যেভাবে মেয়েদের দেখা মাত্র তাদের ভাইট্যাল-স্ট্যাটিসটিক্স বুঝে ফেলছেন—

রানী বললেন, উনি মিস্ ডিক্রুজাকে দেখেননি! শোনা কথা বলছেন!

আলি-সাহেব রসিকতা করে, কী দাদা কানে শুনেই এই? চোখে দেখলে—

বাধা দিয়ে রানী বলে ওঠেন, উনি আর একটা কথা বলতে ভুলেছেন! মিস্ ডিক্রুজা ভার্মিলিয়ান রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করে! তবে তোমার ভয় নেই কাবেরী, তুমি একাই তা করনি, সুজাতাও তাই করে। ঐ দেখ—

সুজাতা তখনই এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের দরজায়।

চিত্রকর অজয় চাটুজ্জে এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। আপন মনে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে যাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে বাসু-সাহেব এবার বলেন, আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, আপনি কি একুশ নম্বর ঘরটা ছেড়ে আজ বাইশ নম্বরে আসতে চেয়েছিলেন?

—উঁ?—চমকে বই থেকে মুখ তুলে অজয়বাবু বলেন, আমাকে বলছেন?

প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার পেশ করেন বাসু-সাহেব।

গুছিয়ে জবাব দেবার জন্যই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইলেন কি না বোঝা গেল না, চাটুজ্জে মশাই জবাবে বললেন, হ্যাঁ! চেয়েছিলাম। আমার একুশ নম্বর ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার আনডিস্টার্বড ভিয়ু পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই—

—তাহলে শেষ পর্যন্ত মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘরটা নিলেন না যে?

—ঐ যে বললাম—আমি ও-ঘরে শিফ্‌ট করার আগেই পুলিসে এসে ঘরটা তল্লাশী করল। ভাবলাম—'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'। মানে মানে সরে পড়লাম ওখান থেকে—

—মহম্মদ ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাবার পর আপনি ঐ ঘরটা দেখতে গিয়েছিলেন, নয়?

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম ও-ঘরের জানলা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন দেখতে পাওয়া যায়। মিনিটখানেক ও-ঘরে ছিলাম আমি। কিন্তু, কেন বলুন তো?

—আচ্ছা, মিস্টার চ্যাটার্জি, এমনও তো হতে পারে ঐ এক মিনিটের ভিতর কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিস আপনি ঐ ঘরের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেন? যেমন ধরুন, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, পুরানো ক্যাশমেমো অথবা দলাপাকানো একটা কাগজ—

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান অজয় চাটুজ্জে। কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, আজ রাত হয়ে গেছে; কাল সকালেই আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। আমি চেক-আউট করব!

অরূপ বলে ওঠে, কী হল মশাই? রাগ করছেন কেন?

—রাগ নয়! আমার এসব বরদাস্ত হয় না—এই গোয়েন্দাগিরি আর পুলিসী প্যাঁচ! আমি একটু আনডিস্টার্বড থাকতে চাই। এখানেও সওয়াল-জবাব শুরু হয়ে গেছে—

রীতিমত রাগ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান অজয়বাবু।

অরূপ একটু ঝুঁকে বসে। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার স্যার? ঐ ইব্রাহিমের ঘরের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে কিছু মালকাল পাওয়া গেছে না কি?

বাসু-সাহেব পাইপটায় কামড় দিয়ে বলেন, কী দরকার অরূপ, ওসবের মধ্যে আমাদের যাবার? আমরা এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে আর স্ফূর্তি করতে! কী বলেন?

দর্শকদলের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেন উনি। আলি কী একটা কথা বলতে গেল। তারপর কাবেরীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চুপ করে গেল হঠাৎ।

বাসু-সাহেব অরূপরতনকেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, একটা কথা আমাকে বলতো অরূপ—ঐ নকুল

হুইয়ের কেসটায় তুমি কি ডিফেন্স কাউন্সিলার ছিলে? কেসটার খবর আর আমি কিছু নিইনি।

—না। আমি সরকার পক্ষে ছিলাম।

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, সরকার পক্ষে! সে কি? মার্ডার কেসএ তো পাবলিক প্রসিকিউটার থাকেন সরকার পক্ষে—

—তাই থাকেন।—বুঝিয়ে বলে অরূপ—নকুল হুইয়ের কেসটায় আমাকে সরকার পক্ষ থেকেই পি.পি.-র সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

—তাই নাকি? এ খবর তো বলনি আমাকে?—বাসু-সাহেব বলে ওঠেন।

—বলার সুযোগ পেলাম কোথায়? আপনি তো দীর্ঘদিন না-পাত্তা।

—তাহলে তুমিই হচ্ছ নকুল হুইয়ের দু-নম্বর শত্রু?

অরূপ অবাক হয়ে বলে, তার মানে? নকুল হুই তো মরে ভূত!

—জানি। কিন্তু শুনেছি নকুল সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল। এত মামলা-লড়ার খরচ সে পেল কোথায়?

আলি বাধা দিয়ে বলে ওঠে—মাপ করবেন ব্যারিস্টার-সাহেব, নকুল হুই চরিত্রটা এখনও এস্ট্যাব্লিশড হয়নি। আমরা কাহিনীর ঠিক রসাস্বাদন করতে পারছি না।

কৌশিক এবং অরূপ ভাগাভাগি করে পূর্ব-কাহিনীর মোটামুটি একটা খসড়া পেশ করে।অরূপরতন উপসংহারে বলে, নকুল হুই লোকটাকে আমরা ঠিকমত চিনতে পারিনি। দীর্ঘদিন, ধরে সে আগরওয়াল ইন্ডাস্ট্রিস-এ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অনেক টাকা সে তলে তলে সরিয়েছিল—যেকথা শেষপর্যন্ত জেনে যেতে পারেনি ময়ূরকেতন আগরওয়াল। নকুল থাকত নিতান্ত গরিবের মত—কিন্তু বেশ পুঁজি জমিয়ে ফেলেছিল সে। এমনকি ওর এক ভাইকে নাকি আমেরিকা পাঠিয়ছিল খরচ দিয়ে! ভাইটিও দাদার উপযুক্ত! মার্কিন-মুলুকে নাকি নামকরা গ্যাংস্টার হয়েছিল শেষ পর্যন্ত! সেই ভাইই ওর মামলার খরচ দেয়। শুনেছি, ফাঁসির দিন মার্কিন-মুলুক থেকে ওর সেই ভাই চলে এসেছিল ভারতবর্ষে!

বাসু-সাহেব নির্বাপিত পাইপটি ধরাতে ধরাতে বলেন, কী নাম নকুলের ভায়ের! সহদেব নাকি?

—হ্যাঁ, আপনি কেমন করে জানলেন?

—জানি না। আন্দাজ করছি। এপিক্যাল ইনফারেন্স—মানে মহাভারতের ঐ রকমই নির্দেশ! তা সেই সহদেব বাবাজীবনের দৈহিক বর্ণনাটা কী?—কাবেরীর দিকে ফিরে যোগ করেন,যাকে বলে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স আর কি!

—আমি জানি না। সহদেবকে আমি স্বচক্ষে কোনদিন দেখিনি, বলে অরূপ।

সুজাতা এই সময় এসে ঘোষণা করে, ডিনার রেডি!

সভা ভঙ্গ হল!

আহারাদি মিটতে যার নাম দশটা। ইতিমধ্যে, এক মুহূর্তের জন্যও বৃষ্টি থামেনি। ক্রমাগত বর্ষণ হয়ে চলেছে। খরস্রোতা উপলবন্ধুর জলধারা পাহাড়ের মাথা থেকে সর্পিল গতিতে ছুটে আসছে সমতলের সন্ধানে। বাতি এখনও জ্বলছে। যে কোনও মুহূর্তে ইলেকট্রিক অফ্ হয়ে যেতে পারে।সুজাতা ঘরে ঘরে মোমবাতি রেখে এসেছে। আহারাদি মিটিয়ে যে যার ঘরে চলে গেছেন। কৌশিকও শুতে যাবার উপক্রম করছে এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন রাতের শেষ অতিথি!

আবার একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পোর্চে।

সুজাতা আর কৌশিক দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন একজন মাঝ-বয়েসি ভদ্রলোক। গাড়ির ভিতর বসেছিলেন আর একজন সুবেশিনী সুন্দরী মহিলা।

ভদ্রলোক নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতদুটি এক করে বললেন, রাতটুকুর মত তলায় একখানা করে বালিশ আর উপরে একখানা পাকা ছাদ মিলবে?...আই মীন, আমি আমাদের মাথার কথা বলছি।

কৌশিক প্রতিনমস্কার করে বলে, এমন দুর্যোগের রাত্রে কোন গৃহস্থ 'না' বলতে পারে?

গাড়ির ভিতর থেকে এক-গা-গহনা বলে ওঠেন, তুমি চুপ কর দিকিনি!

কৌশিক আঁৎকে ওঠে, আমায় বলছেন?

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আজ্ঞে না, আমায়। ডায়ালগটা ছাড়তে একটু দেরী হয়েছে ওঁর...আই মীন, আপনার ডায়লগের আগে ওঁর ডায়লগ!...ইয়ে উনি, মানে আমার বেটার-হাফ!

ভদ্রমহিলা সে কথায় কর্ণপাত না করে এবার সরাসরি কৌশিককে প্রশ্ন করেন, এটা হোটেল তো?

কৌশিক সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করে।

—তবে গৃহস্থের কথা উঠছে কেন? ডবল্ বেডরুম হবে?

কৌশিক জবাব দেবার আগেই উপরের ধাপ থেকে সুজাতা বলে, হবে না!

ভদ্রমহিলা সুজাতাকে আপাদমস্তক দেখে নেন একবার। তারপর তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কৌশিককেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, অন্তত দুটো আলাদা সিঙ্গল সিটেড?

কৌশিক যেন শ্রুতিধর। সুজাতার দিকে ফিরে বলে, অন্তত দুটো আলাদা সিঙ্গল সিটেড?

ভদ্রমহিলা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কৌশিক নিরুপায় ভঙ্গিতে ভদ্রলোককে যেন কৈফিয়ৎ দেয়, উনি হলেন গিয়ে আবার আমার বেটার-হাফ।

ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অগত্যা সুজাতার দিকে তাকান।

সুজাতা একই ভাবে বললে, হবে না!

ভদ্রলোক শ্রাগ করলেন। সুজাতা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললে, তবে নিচে একখানা করে বালিশ এবং উপরে একখানা পাকা ছাদ হতে পারে—

ভদ্রলোক চমকে তাকান সুজাতার দিকে।

সুজাতা পাদপূরণ করে, আই মীন, আমি আপনাদের মাথার কথা বলছি।

—এনাফ!—সোৎসাহে ভদ্রলোক মালপত্র নামাবার উদ্দেশ্যে পিছনের কেরিয়ারটা খুলে ফেললেন। কৌশিক হাত লাগায়। সুজাতাও। এক-গা-গহনা শুধু নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে নেমে আসেন। মালপত্র টানাটানিতে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না।

কৌশিক কাজ করতে করতেই বলে, আপাতত আসছেন কোথা থেকে?

—Scylla আর Charybdis-এর মধ্যবিন্দু থেকে—মাল নামাতে নামাতে জবাব দেন ভদ্রলোক।

—আজ্ঞে?—কৌশিক ব্যাখ্যা চায়।

—'হর্নস্ অব দ্য ডাইলেমা' বোঝেন? তারই কেন্দ্রবিন্দু থেকে। এদিকে কার্শিয়াঙের পথে এক বিরাট খাদ, ওদিকে দার্জিলিঙের রাস্তায় এক হোঁদল গর্ত! মাঝখানে স্যান্ডুইচ হয়ে পড়েছিলাম। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন?

—জলের মত। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা আর কি। ঘুম শহরের এই হাল হয়েছে তা আমরা এখনও টের পাইনি!

—আমরা পেয়েছি। অস্থিতে অস্থিতে। দার্জিলিঙ থেকে কলকাতা যাচ্ছিলাম। বাধা পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছিলাম দার্জিলিঙে। দুদিকেই রোড ক্লোসড।

খানকয়েক দশ টাকার নোট বার করে দিলেন তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে, বললেন, তোড়ানি রাখ্ দো ভাইসাব,—তোমার অবস্থাও তো সসেমিরা! আপাতত ঘুমের রাজ্যে কোথায় ঘুমাবে দেখ!

একগাল হেসে ড্রাইভার ব্যাক করল ট্যাক্সিটা।

দ্বিতলের ছয় নম্বর ঘরটা খুলে দিল সুজাতা। এটা সাজানো নেই, ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল না। এক-গা-গহনা এক নজর ঘরটা দেখে নিয়ে বললেন, ও রাম! পর্দা নেই, বেডকভার নেই, ড্রেসিং টেবিল নেই—গুদাম ঘর নাকি?

কৌশিক আমতা আমতা করে বলে, আজ্ঞে না। এটা সবচেয়ে ভাল ডবল্ বেডরুম। আকাশ ফাঁকা হলে ঘরে বসেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাবেন। তবে ইয়ে...এটা ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল না। বেডিং পাঠিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু পর্দা বা ড্রেসিং টেবিল দিতে পারব না।

ভদ্রমহিলা আড়চোখে একবার সুজাতাকে দেখে নিয়ে বলেন, ভাড়া বোধকরি পুরোই নেবেন?

ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আহাহা ভাড়ার কথা কাল হবে। ইয়ে, আপনাদের কিচেন বোধকরি ক্লোসড্ হয়ে গেছে?

কৌশিক সুজাতার দিকে একটা চোরা চাহনি নিক্ষেপ করে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত তো বড় কম হয়নি! সব ছুটি হয়ে গেছে। তবে হেড কুক বোধহয় এখনও জেগে আছে, নয়?—শেষ প্রশ্নটা সুজাতাকে।

সুজাতা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, হেড-বেহারাও জেগে আছে মনে হয়।

—অ! কৌশিক ঢোক গেলে!

ভদ্রলোক সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, লোকে খেতে পেলে শুতে চায়....আই মীন, শুতে পেলে খেতে চায়! হবে কিছু? শুকনো বিস্কুট অবশ্য কিছু আছে আমাদের সঙ্গে।

সুজাতা বললে, ডবল-ডিমের অমলেট আর কফি হতে পারে।

—এনাফ! এনাফ!—ভদ্রলোক খুশিয়াল হয়ে ওঠেন।

তাঁকে আবার থামিয়ে দিয়ে গহনা-ভারাক্রান্তা বলে ওঠেন, তুমি থাম! তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, তাই বলে রাতের ফুল-মীল চার্জ করবেন না তো?

সুজাতা যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। দ্বারের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, ফুল-মীলই চার্জ করা হবে। অসুবিধা থাকে তো দরকার কি?

ভদ্রমহিলাও ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই বেটার-হাফ দুজনকে দেখে নিলেন। দুই ওয়ার্স-হাফ কণ্টকিত হয়ে ওঠেন। ভদ্রমহিলা কৌশিককে প্রশ্ন করেন, হোটেলের ম্যানেজার কে?

—ইয়ে, আমি!—কবুল করে কৌশিক।

—তবে সব কথায় উনি অমন চ্যাটাং চ্যাটাং করছেন কেন?

কৌশিক আমতা আমতা করে বলে, উনি যে আমার এমপ্লয়ার, হোটেলের মালিক!

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আই ফলো!—স্ত্রীকে বলেন, এই তুমি যেমন আমার গার্জেন আর কি?—সুজাতাকে বলেন, তা ফুল-মীল চার্জই দেব। কিচেন যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে বই কি। আমার জন্য এক প্লেট পাঠিয়ে দিন। আর ইয়ে....ওঁর যখন এত আপত্তি, উনি না হয় বিস্কুটই খাবেন রাত্রে।

—থাম তুমি! ডাকাতের হাতে যখন পড়েছি, তখন নাচার!—মহিলা ক্ষুব্ধা!

—আমিও তো তাই বলছি—যাহা বাহান্ন তাহা পঁয়ষট্টি! ও—দু' প্লেটই পাঠিয়ে দিন। আর কড়া দু-কাপ কফি!

—না এক কাপ কফি, এক কাপ চা! রাত্রে কফি খেলে ওঁর ঘুম হয় না!

—নিরুপায় ভদ্রলোক শ্রাগ করলেন শুধু।

সুজাতা নেমে আসে কিচেন-ব্লকে। ভদ্রলোক পকেট থেকে নামাঙ্কিত একটা আইভরি-ফিনিশ্‌ড কার্ড বার করে কৌশিককে দেন। বলেন, আমার নাম ডঃ এ.কে.সেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার। আপনার

রেজিস্টারে কাল সকালে সই করে দেব। কেমন?

কৌশিকও নেমে আসে। পায়ে পায়ে এসে হাজির হয় কিচন-ব্লকে। সুজাতা গুম মেরে আছে। কাল থেকেই তার কী যেন হয়েছে। কৌশিক ইতস্তত করে। ঘুরঘুর করে—সান্ত্বনাবাচক কী বলবে ভেবে পায় না। সুজাতা বলে, ডিমটা ফাটাও!

—ফর্ক দিয়ে ডিমগুলো ফাটাতে ফাটাতে কৌশিক একটা স্বগতোক্তি করে—প্রমোশনই হল আমার! স্বাধীন ব্যবসা! বিয়ের আগে ছিলাম হুজুরাইন-এর ড্রাইভার, বিয়ের পরে হলাম হেড-বেয়ারা।

সুজাতা হাসল না পর্যন্ত!

—ওরা ভেবেছিল কর্মব্যস্ত উদ্বোধনের দিনটার বুঝি এখানেই সমাপ্তি। ভুল ভেবেছিল। হেড-কুক অমলেট নিয়ে, আর হেড-বেয়ারা কফি ও চা নিয়ে দ্বিতলে যখন পৌঁছে দিয়ে এল, ভদ্রলোক তখন সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, সো সরি! আপনাদের চাকর-বেয়ারা পর্যন্ত শুয়ে পড়েছে দেখছি! খুব কষ্ট দিলাম আপনাদের।

সুজাতা অম্লান বদনে বললে, সঙ্কুচিত হবার কী আছে? এক্সট্রা চার্জ তো সেই জন্যেই দিচ্ছেন!

শুভরাত্রি জানিয়ে ওরা নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঠিক তখনই ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। ঘড়ির দিকে নজর গেল স্বভাবতই। রাত পৌনে এগারোটা।

দুজনেই নেমে আসে আবার। সুজাতাই তুলে নিল টেলিফোনটা: হ্যালো! রিপোস হোটেল।...হ্যাঁ, আছেন। কোথা থেকে বলছেন?

শুনে নিয়ে সুজাতা কৌশিককে বলে, তোমাকে খুঁজছে। ও.সি. সদর, দার্জিলিঙ।

—থানা! কেন কী হল আবার?—শঙ্কিত কৌশিকের প্রশ্ন।

—কী হল তা নিজের কানে শোন!—রিসিভারটা হস্তান্তরিত করে সুজাতা পা বাড়ায়। যায় না কিন্তু। অপেক্ষা করে।

—কৌশিক মিত্র বলছি। কে বলছেন?

—নৃপেন ঘোষাল। ও.সি. দার্জিলিঙ সদর। ব্যারিস্টার সাহেব জেগে আছেন?

—না। ঘুমোচ্ছেন। কেন কী হয়েছে? ডেকে দেব?

—না,থাক। তা হলে আপনাকেই বলি। সব কথা টেলিফোনে বলা যাবে না। আকারে-ইঙ্গিতে বলব—বুঝে নেবেন। শুনুন: ব্যারিস্টার-সাহেবের কাছে শুনেছেন নিশ্চয় আজ সকালে দার্জিলিঙ-এর একটি হোটেলে—

—হ্যাঁ, জানি, কাঞ্চনজঙ্ঘায়—

প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে নৃপেন ঘোষাল, প্লীজ ডোন্ট মেনশন এনি নেম!...শুনুন! আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে যে, সন্দেহভাজন লোকটা এখন ঘুমে আছে, রিপোস্-এর কাছাকাছি। হয়তো রিপোস্-এর ভিতরেই! দ্বিতীয়ত যে ঘটনা দার্জিলিঙে ঘটেছে অনুরূপ একটি ঘটনা হয়তো ঘুমে ঘটতে যাচ্ছে। হয়তো রিপোস্-এর ভিতরেই! ফলো?

কৌশিক অকপটে স্বীকার করে, না! আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!

—পারছেন! বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই নয়?—না বোঝার কী আছে?

—এমন সব অদ্ভুত কথা অনুমান করার হেতু?

—সেকথা টেলিফোনে বলা যায় না।...শুনুন...আজ রাত্রেও আপনাদের ওখানে ঐ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে। খুব সতর্ক থাকবেন। বুঝলেন?

কৌশিক বিহ্বল হয়ে বলে, একটু ধরুন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে ফের আপনার সঙ্গে কথা বলছি।

টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে কৌশিক সুজাতাকে ব্যাপারটা জানায়। সুজাতা ওর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে তার মাউথপীসে বলে, মিসেস্ মিত্র বলছি। আপনার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বড় 'ইনসিকিওর্ড' বোধ করছি। কিছু করা যায়?

ও-প্রান্ত ইতস্তত করে বলে, মুশ্‌কিল কী জানেন, কাট-রোড ভেঙে গেছে। ঘুম আউটপোস্টে ব্যাপারটা আমি টেলিফোনে জানিয়েছি। ওরা ওয়াচ রাখবে। আপনারা ওখান থেকে পারতপক্ষে কোন টেলিফোন কল ইনিশিয়েট করবেন না।

মরিয়া হয়ে সুজাতা বলে, থানা থেকে কেউ এসে থাকতে পারে না, আজ রাত্রে?

—ওখানকার লোকাল ফাঁড়িতে তেমন লোক কেউ নেই।...আচ্ছা এক কাজ করছি...আমার একজন অফিসারকে পাঠাচ্ছি। মিস্টার পি.কে. বাসু, তাকে চেনেন। এখান থেকে জীপে বাতাসিয়া লুপ পর্যন্ত যাবে, বাকি পথ হেঁটে যাবে। আপনারা জেগে থাকবেন, যাতে কলিং বেল বাজাতে না হয়।

—ধন্যবাদ। কী নাম বলুন তো তাঁর?

—সুবীর রায়।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ওরা অপেক্ষা করতে থাকে। ঘড়ির কাঁটা টিক্ টিক্ করে এগিয়ে চলেছে। আর বাইরে একটানা ধারাপাত। আর কোথাও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোর্ডাররা যে-যার ঘরে ঘুমে অচেতন। শেষ বাতি নিবেছে ডাক্তার সেন-এর ঘরে। তাও আধঘণ্টা হয়ে গেল। ড্রইংরুমের ঘড়িটা সাড়ে এগারোটায় ঢং করে সাড়া দিল। সারা ঘুম ঘুমে অচেতন।

কৌশিক বললে, যাও তুমি শুয়ে পড়! আমি জেগে আছি।

সুজাতা জবাবে বলে, শুয়ে লাভ নেই! ঘুম হবে না। আর আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন মনে হয়।

ওর অনুমানই ঠিক। রাত বারোটায় সদর দরজার কাচের উপর একটা টর্চের আলোর সঙ্কেত হল। নিঃশব্দে উঠে গেল কৌশিক। পাল্লাটা একটু খুলে প্রশ্ন করল, কে?

—সুবীর রায়!

—আসুন।

আগন্তুক ভিজা বর্ষাতিটা খুলে ফেলে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স ত্রিশের কোঠায়। হাতে একটা অ্যাটাচি। ওদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, মিস্টার আর মিসেস্ মিত্র নিশ্চয়?

কৌশিক ঘাড় নেড়ে জানায় ওর অনুমান সত্য।

—কোন্ ঘরে আমি থাকব দেখিয়ে দিন। কাল সকালে কথা হবে।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—কেন? ও.সি, বলেননি টেলিফোনে?

—বলেছেন। সংক্ষেপে। টেলিফোনে তো সব কথা বলা যায় না। এমন আশঙ্কা করার কারণটা কী?

—সেটা কাল সকালে বলব। আপনাদের জেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যা করার আমিই করব। কিন্তু থাকব কোন ঘরে?

—আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

কৌশিক ওকে ঘরটা দেখিয়ে দিল। এক তলার চার নম্বর ঘর। সুজাতাও এল পিছন পিছন। ঘরে ঢুকেই সুবীর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। অ্যাটাচি কেসটা খুলে একটা ম্যাপ বার করে। বলে, এটা এ বাড়ির প্ল্যান। আমরা আছি এই ঘরে। এবার বলুন—কে কোন ঘরে আছেন?

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, আমাদের হোটেলের প্ল্যান পেলেন কোথায়?

—সুবীর বিরক্ত হয়ে বলে, অবান্তর কথা বলে রাত বাড়ানোর দরকার আছে কি?

—কৌশিক আর প্রশ্ন করে না। উপস্থিত আবাসিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়, আর কে কোন ঘরে

আছেন তা প্ল্যানে দেখিয়ে দিতে থাকে। সুবীর প্ল্যানের গায়ে নামগুলি লিখে নিল। তারপর বললে, গুড নাইট!

অসহিষ্ণুর মত কৌশিক বলে ওঠে, একটা কথা অন্তত বলুন—দার্জিলিঙে যে ঘটনা ঘটেছে তা হঠাৎ রিপোস্-এ ঘটতে পারে এমন ধারণা কেন হল আপনাদের?

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে সুবীর বললে, বিশে ডাকাতের নাম শুনেছেন?

—বিশে ডাকাত! না। কে সে?

—কিম্বদন্তীর বিশে ডাকাত! সে নাকি ডাকাতি করতে যাবার আগে নোটিস দিয়ে আগেভাগেই জানিয়ে দিত। রমেনবাবুকে যে মেরেছে সে ঐ বিশে-ডাকাত-এর উত্তরসূরী! সেও অমন চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে তার সেকেন্ড টার্গেট আছে ঘুম-এ, ঘুম-এর এই রিপোস্ হোটেলে!

সুজাতা বলে, কী বলছেন আপনি! বিংশ শতাব্দীর কোন ক্রিমিনাল এমন মূর্খামি করে?

—তাই তো দেখা যাচ্ছে। মূর্খামি নয়—লোকটা ওভার-কনফিডেন্ট! ইচ্ছা করেই সে এটা করেছে। খুনীর একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নেওয়া। যাকে প্রাণে বধ করবে তাকে আগে-ভাগে জানিয়ে না দিলে যেন তার তৃপ্তি হচ্ছে না। লোকটা অত্যন্ত পাকা ক্রিমিনাল। আমেরিকায় বাফেলো-অঞ্চলে গ্যাংস্টার দলে তার নাম আছে। বেঙ্গল পুলিসের এই আমাদের সে মনে করে চুনোপুঁটি!

—লোকটা কে তা আপনারা জানতে পেরেছেন?

—অন্তত নামটা আন্দাজ করা গেছে। তার নাম সহদেব দুই।

সুজাতার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যায়, সহদেব দুই! নকুল দুইয়ের ভাই?

—হ্যাঁ। তাই আমাদের অনুমান!

একটু ইতস্তত করে সুজাতা বলে, ওর সেকেন্ড টার্গেট কে জানেন?

সুবীর হেসে ফেলে। বলে, না। সহদেব আমাকে বলেনি। তবে নকুল দুইয়ের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের মধ্যেই কেউ একজন হবেন। আপনারা আন্দাজ করতে পারেন?

কৌশিক গম্ভীর হয়ে বলে, পারি! ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু!

সুবীর হেসে বললে, তাও ভাল। আপনাদের মুখ দেখে আমি কিন্তু ভেবেছিলাম বুঝি আপনাদের দুজনের কেউ।

পাঁচ

তেশরা অক্টোবর। বৃহস্পতিবার। বৃষ্টির বিরাম নেই। ক্রমাগত বর্ষণে চরাচর বিলুপ্ত। এদিকে আজ সকাল থেকে 'দ্য রিপোস' রীতিমত হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে। সকালবেলা আবাসিকেরা যখন প্রাতরাশ টেবিল-এ এসে বসলেন তখন নবাগতদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবার কথা মনে হল না কৌশিকের। কালীপদ খাড়া হয়েছে। জ্বর নেই তার। ভোরবেলা থেকে সুজাতার হাতে হাতে কাজ করছে। বৃষ্টি সত্ত্বেও কাঞ্চী এসেছে ভিজতে ভিজতে। বর্ষাবিধ্বস্ত বস্তির একটি মর্মন্তুদ বর্ণনা সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সুস্থির হয়ে শুনবার অবকাশ ছিল না সুজাতার। সে ক্রমাগত টোস্ট-পোচ-অমলেট আর হাফ-বয়েল বানিয়ে চলেছে ফরমায়েশ মত। কাঞ্চী আর কালীপদ পর্যায়ক্রমে পৌঁছে দিয়ে আসছে চা আর কফি। হোটেল জমে উঠেছে।

আবাসিকরা দেখলেন দুটি নতুন মুখ। ডঃ সেন আর সুবীর রায়। মিসেস সেনকে অবশ্য দেখতে পেলেন না ওঁরা। তিনি তাঁর দ্বিতলের কামরা থেকে নামলেন না আদৌ। তাঁর ব্রেকফাস্ট কাঞ্চী পৌঁছে

দিয়ে এল দ্বিতলের ছয় নম্বর ঘরে। বোধকরি এই সাতসকালে তাঁর যথোপযুক্ত প্রসাধন সারা হয়নি—তাই তিনি এই শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করলেন।

সকালে উঠে প্রথম সুযোগেই কৌশিক বাসু-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে। গতকাল রাত্রে যে তিনজন নবীন অতিথির আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ দাখিল করে। বাসু-সাহেব শুনে বলেছিলেন, হ্যাঁ, সুবীর রায় নামটা আমার জানা। তাকে এ ঘরে নিয়ে এস, আর অরূপকেও খবর দাও—সুজাতা বোধকরি রান্নাঘর ছেড়ে আসতে পারবে না, নয়?

কৌশিক বলেছিল, এখন তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তা হোক, আমিই তো রইলাম। এখানে যা কিছু আলোচনা হবে তা আমি তাকে জানিয়ে দেব।

মিনিটদশেক পরে বাসু-সাহেবের ঘরে একটি গোপন বৈঠক বসল। অরূপরতন আর সুবীর রায় যোগ দিল তাতে। কৌশিক সুবীরকে পরিচয় করিয়ে দিল ওঁদের সঙ্গে। বেচারি স্থির হয়ে বসতে পারছিল না আলোচনা সভায়। তাকে বারে বারে দেখে আসতে হচ্ছিল ঘরের চারপাশ। কেউ আড়ি পেতে শুনছে কি না। না, শুনছে না। ডঃ সেন তাঁর উত্তমার্ধের সঙ্গে তাস খেলছেন নিজের ঘরে; আলি-সাহেব নিজের ঘরে একটি ইংরাজি ডিটেকটিভ উপন্যাসে বুঁদ। কাবেরী আর অজয়বাবু আছে দোতলার উত্তরের বারান্দায়। কাবেরী বসে আছে একটি টুলে, উদাস ভঙ্গিতে আকাশ পানে তাকিয়ে। অজয়বাবু ক্রেয়নে তার একটি স্কেচ করছেন। দুজনে ভাব হয়ে গেছে বেশ। সুন্দরী তন্বী কাবেরী দত্তগুপ্তা এবং বৃদ্ধ চিত্রকর অজয় চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে।

বাসু-সাহেব বলেন, মিস্টার রায়, আপনার কথা নৃপেন ঘোষাল আমাকে বলেছিল—

বাধা দিয়ে সুবীর বললে, আপনি স্যার আমাকে 'তুমিই' বলবেন—

—তা না হয় বলব, কিন্তু—

কৌশিক আবার উঠে পড়ে। বলে, আমি বরং বাইরে গিয়ে বসি—

তাকে বাধা দিয়ে রানী বলেন, না। তুমি থাক কৌশিক। আমিই বরং ব্যূহমুখে জয়দ্রথের ভূমিকায় থাকি। তেমন তেমন কাউকে আসতে দেখলেই আমি গান ধরব—

হুইল-চেয়ারে পাক দিয়ে রানী দেবী পার হয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে বারান্দায়। ড্রইংরুমে, যেখানে পিয়ানোটা বসানো আছে তার পাশের দরজার কাছে থামলেন তিনি—যাতে দুদিকেই নজর রাখা যায়।

বাসু-সাহেব বললেন, রিপোস-এর বাসিন্দারা এখন স্পষ্টত দুটি দলে বিভক্ত। প্রথম দলে আছেন একজন ভালনারেব্‌ল্। তিনি যে কে তা আমরা ঠিক জানি না তবে সে দলের সভ্যসংখ্যা পাঁচ—রানী, সুজাতা, কৌশিক, অরূপ আর আমি। দ্বিতীয় দলের মধ্যে আছেন একজন সুচতুর দক্ষ ক্রিমিনাল—তার রেঞ্জ হচ্ছে আলি, কাবেরী, ডঃ অ্যান্ড মিসেস সেন এবং অজয় চট্টোপাধ্যায়।

—এঁরা সবাই?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক।

—সবাই নয়, এঁদের মধ্যে যে কোন একজন অথবা দু'জন। নৃপেন এবং সুবীরের ধারণা—এবং আমিও তাদের সঙ্গে একমত—রমেন গুহের মৃত্যুর পিছনে আছে সহদেব হুই-এর হাত। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ। ইব্রাহিম যদি স্বয়ং সহদেব হয় তবে সন্দেহ করতে হবে আলি এবং ডক্টর সেনকে। আর সহদেব যদি কোন এজেন্ট লাগিয়ে থাকে তবে অজয়বাবুকেও নেড়েচেড়ে দেখতে হবে। অপরপক্ষে মিস্ ডিক্রুজ যদি রমেন গুহর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকে তবে কাবেরী আর মিসেস্ সেনকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলে না।

অরূপ প্রশ্ন করে, প্রথমে বলুন তো—আপনারা কেন মনে করছেন রমেন গুহর মৃত্যুতেই ব্যাপারটার যবনিকাপাত ঘটেনি? রিপোস-এ আমাদের মধ্যে ঐ ঘটনার পুনরাভিনয় হবার কথা আশঙ্কা করা হচ্ছে কেন?

বাসু-সাহেব বলেন, কালকে সে কথার কিছুটা ইঙ্গিত আমি দিয়েছি। ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত ঘরটা সার্চ করতে গিয়ে নৃপেন একখণ্ড কাগজ পায়, ঐঘরের ময়লা-ফেলা কাগজের ঝুড়ি থেকে। কাগজটা আমার

কাছে নেই—নৃপেন নিয়ে গেছে, না হলে তোমাদের দেখাতাম—

বাধা দিয়ে সুবীর বলে, কাগজখানা আমার কাছে আছে—

—তোমার কাছে? নৃপেন দিয়েছে?

—হ্যাঁ, এই দেখুন।

অ্যাটাচি কেস খুলে কাগজখানা সে বাসু-সাহেবকে দেয়। সবাই ঝুঁকে পড়ে। হাতে হাতে কাগজখানা ঘোরে। অবশেষে সেটি বাসু-সাহেবের হাতে আসে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাগজটা পরীক্ষা করেন। আলোর সামনে সেটা ধরেন, যেন একশ-টাকার নোট জাল কি না দেখছেন। কৌশিক লক্ষ্য করে দেখল, কাগজটা দলামচা করা হয়েছিল। কৌচকানোর দাগ আছে। তার উপরপ্রান্তে পারফোরেশনের চিহ্ন—যেন ফুটো-ফুটো করা নোটবইয়ের একটি ছেঁড়া পাতা। একটি প্রান্ত মসৃণ আর দুটি প্রান্তে যেন তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে নেওয়ার চিহ্ন। কাগজটায় কালো কালিতে লেখা:

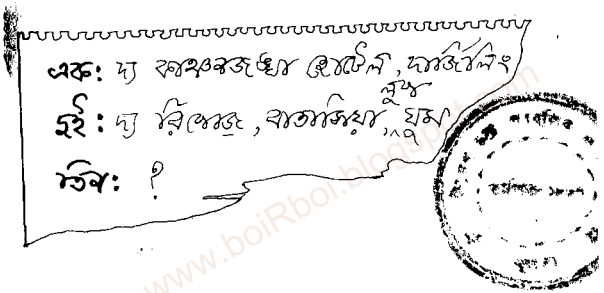

সুবীর বললে, বেশ বোঝা যাচ্ছে—রিপোস-এ দ্বিতীয়বার হত্যা করলেও আততায়ীর প্রতিহিংসাপরায়ণতা নিবৃত্ত হবে না। সে তিন-নম্বর হত্যার কথাও চিন্তা করছে!

কৌশিক বললে, নকুল হুইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য যদি এ পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে তবে আমার মনে হয় আততায়ীর দু'নম্বর টার্গেট হচ্ছেন বাসু-সাহেব। তাই নয়?

অরূপ বললে, তুমি-আমিও হতে পারি। সুজাতা দেবীই বা কেন বাদ যাবেন? আমরা সকলেই নকুল হুইয়ের ফাঁসির জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

—সে কথা ঠিক। কৌশিক মেনে নেয়।

বাসু-সাহেব চোখ বুঁজে আপন মনে পাইপ খাচ্ছিলেন। সুবীর বলে, আপনি স্যার কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে?

বাসু-সাহেব চোখ মেলে তাকান। বিচিত্র হাসেন। বলেন, ভাবছি? হ্যাঁ, ভাবছি বইকি! ভাবনার কি অন্ত আছে! কিন্তু আজ এই পর্যন্তই—উঠে দাঁড়ান তিনি, বলেন—দীর্ঘ আলোচনার কিছু নেই, এভাবে আমরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা চালালে ওপক্ষ সজাগ হয়ে যাবে। সো উই ডিজল্‌ভ্!

বেশ বোঝা গেল সকলেই এ সিদ্ধান্তে মর্মাহত। এত সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হবে তা কেউ ভাবেনি। কিন্তু রায় দিয়ে বাসু-সাহেব উঠে পড়েছিলেন। গুটিগুটি বেরিয়ে এসে বসলেন বারান্দার একান্তে একটি

ইজিচেয়ারে। কৌশিক, অরূপ আর সুবীর একে একে চলে গেল। রানী দেবী তাঁর চাকা-দেওয়া চেয়ারে পাক মেরে ঘনিয়ে এলেন বাসু-সাহেবের পাশে। ধ্যানস্থ বাসু-সাহেব বোধ করি তা টের পাননি। তিনি চমকে উঠলেন রানী দেবীর প্রশ্নে: কী হল? এরই মধ্যে কনফারেন্স শেষ?

—উঁ? হুঁ!—অন্যমনস্কের মত জবাব দিলেন বাসু। মাঝে মাঝে পাইপে টান দিচ্ছেন। কুণ্ডলী পাকিয়ে যে ধোঁয়াটা উঠছে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে।

—কী ভাবছ বলতো?—আবার প্রশ্ন করেন রানী বাসু।

—ভাবছি? ঐ রমেন গুহর মৃত্যু-রহস্যের কথাই ভাবছি। আর কী ভাবব?

সহানুভূতির সুরে রানী বলেন, কে খুন করেছে তার কোন কূলকিনারাই করতে পারছ না, নয়?

বিচিত্র হাসলেন বাসু-সাহেব। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, সেইটেই তো ট্রাজেডি রানু। লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি। কে খুন করেছে, কেন করেছে, এখানেই বা কাকে খুন করতে চাইছে তা বোধহয় সব ঠিকমতই জানতে পেরেছি আমি! অথচ আমার হাত-পা বাঁধা। সব জেনেও কিছু করতে পারছি না! ট্রাজেডিটা বুঝতে পারছ?

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রানী দেবী। স্তব্ধ বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন তাঁর অদ্ভুত-প্রতিভা স্বামীর দিকে! যাঁকে তিনি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে চেনেন—অথচ যে লোকটা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত! তারপর যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলেন, খুনী কে তা তুমি জান?

মুখটা সূচালো করলেন বাসু-সাহেব। সম্মতি-সূচক গ্রীবা সঞ্চালন করলেন শুধু।

—সে এখানে আছে? এই রিপোস-এ?

একই রকম ভঙ্গি করেন উনি।

—আমাকে বলতে পার না?

এবার দুদিকে মাথা নাড়েন উনি।

—আমাকে না পার, অন্তত সুবীরকে বল, নৃপেনকে কিম্বা বিপুলকে?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাসু-সাহেবের। বললেন, উপায় নেই রানু। আমার হাতে যা এভিডেন্স আছে তাতে কনভিকশান হবে না। এখন কেউ আমার কথা বিশ্বাসই করবে না—বলবে পি. কে. বাসু একটা বদ্ধ পাগল! লোকটাকে হাতে-নাতে ধরতে হবে—তার দ্বিতীয় খুনের প্রচেষ্টার পূর্ব-মুহূর্তে।

—ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যাবে না?

—তা কিছুটা যাবে। কিন্তু উপায় কী বল? ওকে গিল্‌টি বলে প্রমাণ করব কী ভাবে? ওর দাড়ি, চশমা নেই—বীর বাহাদুর আইডেন্টিফিকেশান্ প্যারেডে ওকে চিনতে পারবে না। তাছাড়া বীর বাহাদুর অথবা মহেন্দ্র ওকে দেখেছে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। একমাত্র যদি মিস ডিক্রুজাকে খুঁজে বার করতে পারি তবে হতে পারে! সে সারাদিন ইব্রাহিমকে দেখেছে। বাট হু নোস্—ডিক্রুজা ওর পাপের সাথী হতেও পারে, আবার নাও পারে!

রানী দেবী ঝুঁকে পড়ে বললেন, কী ক্লু পেয়েছ তুমি?

—নিজেই গোয়েন্দাগিরি করতে চাও? উঁ?

—বল না?

—সুবীরের হাতে ঐ 'এক: দুই: তিন' লেখা কাগজখানায়। প্রথমবার আমি ভাল করে ওটা পরীক্ষা করিনি। এবার তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করেছি। ওর ভিতরেই সহদেব ভুল করে রেখে গেছে তার আত্মপরিচয়! বেচারি সহদেব দুই!

—তবে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছ না কেন?

—ঐ যে বললাম—যে সূক্ষ্ম যুক্তির বিচারে আমি ইব্রাহিমকে সনাক্ত করছি তাতে খুনী-আসামীর কনভিকশান হয় না! আমাকে জানতে হবে মিস্ ডিক্রুজা ওর পার্টনার-ইন-ক্রাইম ছিল কি না। একমাত্র সেই পারবে ইব্রাহিমকে সনাক্ত করতে। সহদেবকে আমি খুঁজে পেয়েছি; এখন খুঁজছি শুধু মিস্

ডিক্রুজাকে—এই রিপোস হোটেলেই!

—হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে বাহাদুর আর মহেন্দ্রকে আনানো যায় না?

এ-প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই বাসু-সাহেব দেখলেন কৌশিক এগিয়ে আসছে ওঁদের দিকে।

—কী ব্যাপার? এমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন হে তোমাকে?

—কেলেঙ্কারিয়াস্ কাণ্ড স্যার! এক নম্বর: টেলিফোন লাইনটা সকাল থেকে ডেড হয়ে গেছে। দু-নম্বর: কার্ট-রোডের সঙ্গে এ বাড়িটার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—প্রকাণ্ড একটা ধ্বস নেমেছে। আর তিন নম্বর—সুজাতা নোটিস দিয়েছে তার ভাঁড়ারে ডিম-মাংস-রুটি-মাখন সব বাড়ন্ত!

বাসু-সাহেব রানী দেবীর দিকে ফিরে বলেন—এই নাও তোমার প্রশ্নের জবাব!

—কী প্রশ্ন?—জানতে চায় কৌশিক।

—উনি দার্জিলিঙ থেকে আজ আবার দু-জনকে নিমন্ত্রণ করে আনতে চাইছিলেন! সে যাক, মন-খারাপ কর না। যেমন করে হ'ক এ ক'দিন চালিয়ে নিতে হবে আমাদের। দু-তিন দিনের মধ্যেই সভ্যজগতের সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ করা যাবে।

—রেডিওর খবর—তিস্তা ব্রিজ ভেসে গেছে। মহানন্দা, তোরশা, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী সবাই একসঙ্গে ক্ষেপে উঠেছে। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদা—এক কথায় গোটা উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ভেসে গেছে—এতবড় বন্যা নাকি উত্তরবঙ্গে কখনও হয়নি।

বেলা নয়টা নাগাদ বৃষ্টি মাথায় করেই কৌশিক বার হয়ে পড়ল। রেন-কোট চড়িয়ে। গাড়ি চলবে না, পায়ে হেঁটে। স্থানীয় বাজারে কিছু পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ নিতে।

অজয় চাটুজ্জে কাবেরীর স্কেচটা শেষ করে এনেছেন।

আলিও আগাথা ক্রিস্টি শেষ করে আনল প্রায়।

ছয় নম্বর ঘরে মিসেস সেন ক্ষুব্ধা। তৃতীয় এক কাপ চা চেয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন। কিচেন-ব্লক থেকে কাপ্তী এসে জানিয়ে গেছে এখন আর চা পাঠানো সম্ভবপর নয়। প্রাতঃরাশের সময়সীমা অতিক্রান্ত। কিচেন এখন লাঞ্চের ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

বাসু-সাহেব গুটি গুটি এসে হাজির হলেন রান্নাঘরে: কী সুজাতা? আজ কী রান্না হচ্ছে?

—মাংস যা আছে এবেলা হয়ে যাবে। মাংসই করছি। আলুসেদ্ধ এই নামল।

হঠাৎ ওর কাছে ঘনিয়ে এসে বাসু-সাহেব বলেন, একটা কাজ কর তো সুজাতা। চট করে একবার দোতলার সাত নম্বরে চলে যাও। কাবেরীর ঘরে। কাবেরী এখন ঘরে নেই—কিন্তু ওর ঘর তালাবন্ধও নেই! কাবেরী উত্তরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকাচ্ছে। ওর ঘরে গিয়ে চট্ করে ওর অ্যাশট্রেটা নিয়ে এস তো—

—অ্যাশট্রে! অ্যাশট্রে কী হবে?

—তুমি তো আগে এমন ছিলে না সুজাতা! 'কেন' এ প্রশ্ন তো আগে করতে না—

—কিন্তু এদিকে আমার তরকারিটা—

—ওটা আমি দেখছি—

ওর হাত থেকে খুন্তিটা নিয়ে বাসু-সাহেব উনানের উপর বসানো তরকারির ডেক্‌চিটায় মনোনিবেশ করেন।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সুজাতা—ওঁর অনভ্যস্ত হাতে খুন্তি নাড়া দেখে।

—হাসছ কেন?—রোষকষায়িত দৃষ্টিতে বাসু-সাহেব জানতে চান।

হাসি থামিয়ে সুজাতা গম্ভীর হয়ে বলে, অবজেক্‌শান ইয়োর অনার। ইট্‌স্ ইনকম্পিটেন্ট, ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইম্মেটিরিয়্যাল!

বাসু-সাহেব হেসে ফেলেন। বলেন, অবজেক্‌শান ওভার-রুল্‌ড। যাও, ওপরে যাও!

সুজাতা দু-মিনিটের মধ্যেই অ্যাশট্রেটা নিয়ে ফিরে এল। বাসু-সাহেব তার ভিতর থেকে গুটিতিনেক সিগারেটের স্টাম্প উদ্ধার করে বললেন, আশ্চর্য! কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা শূন্যগর্ভ ছিল! যাও, এটা রেখে দিয়ে এস আবার।

আরও মিনিট পনের পরে। বাসু-সাহেবের প্রস্থানের পরে আলি-সাহেব রান্নাঘরে এসে হাজির। প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে বলে, আসতে পারি? অনধিকার প্রবেশ করছি না তো?

সুজাতা চমকে ওঠে: আসুন, আসুন। কী ব্যাপার? একেবারে হেঁসেলে?

—আপনাকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিলাম মহিলাদের হেঁসেল সম্বন্ধে আমার কিছুটা পারদর্শিতা আছে।

—তা বলেছিলেন। ধন্যবাদ। আমার সাহায্যের কোন দরকার হবে না।

আলি একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ে। বলে, চার নম্বরে ঐ যে লম্বামতন ভদ্রলোক এসে উঠেছেন ওঁর নামটা কী বলুন তো?

—মিস্টার রায়।

—কী রায়?

সুজাতা হেসে বললে, তাহলে রেজিস্টার দেখতে হবে। পুরো নামটা মনে নেই।

—কখন এলেন উনি?

—হঠাৎ ওঁর বিষয়ে এত কৌতূহলী হয়ে পড়লেন কেন?—সুজাতা প্রতিপ্রশ্ন করে।

একটু ইতস্তত খেয়ে আলি বলে, না না, শুধু ওঁর সম্বন্ধে নয়, ছয় নম্বর ঘরের দম্পতির বিষয়েও আমার কৌতূহল আছে।

—তা আমার কাছে কেন? ছয় নম্বরে গিয়ে আলাপ জমালেই পারেন।

আলি সে-কথার জবাব দেয় না। আলুর ডেকচিটা টেনে নেয়। তাতে ছিল সিদ্ধ করা আলু। আপনমনে সে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকে। আড়চোখে সুজাতা একবার তাকে দেখে নিল। বোঝা গেল যে কোন কারণেই হ'ক, আলি ভাব জমাতে চায়। সুজাতার তাতে আপত্তি নেই। এবার সে নিজে থেকেই বলে ওঠে, মিস্টার আলি, এবার বলুন তো, আপনি প্রথম সাক্ষাতেই কেমন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে বাড়িতে আমি একেবারে একা আছি? চাকরটা পর্যন্ত নেই?

আলি-সাহেব জবাব দিল না। আপন মনে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকে। সুজাতা একটা প্লেটে কিছু তরকারি তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, দেখুন তো নুন-ঝাল ঠিক আছে কি না?

প্লেটে ফুঁ দিতে দিতে আলি বললে, একসঙ্গে এত লোকের রান্নায় আন্দাজ পাচ্ছেন না, তাই নয়? ছিল দু'জনের ছোট্ট সংসার—হয়ে গেল রাবণের গুষ্টি!

—রাবণের গুষ্টি! আপনি হিন্দুদের এপিক পড়েছেন দেখছি।

—তা পড়েছি। ঐ রামায়ণ না মহাভারতেই আছে না আর একটা কথা—'শত্রু এবং স্ত্রীর কাছে মিথ্যাভাষণে পাপ নেই।'

—হঠাৎ এ-কথা কেন?

তরকারিটা ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হয়েছে। আলি পরখ করে বললে, নুন-ঝাল ঠিক আছে।

—তা তো আছে—কিন্তু হঠাৎ ও কথা কেন বললেন?

আলি হেসে বলে, দেখুন, আমি ব্যাচেলর মানুষ। দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি অত জানি না। আচ্ছা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছে হামেশাই মিছে কথা বলে, তাই নয়?

—কেন ও কথা বলছেন তাই আগে বলুন?

—কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

সুজাতা রাগ দেখিয়ে বললে, বলব না!

আলি হাসে। বলে, নেহাৎ পীড়াপীড়ি করছেন তাই বলছি—পর্শু-রাতে আপনাদের কথাবার্তা শুনে

আমার মনে হয়েছিল যে, বিকালের দিকে দার্জিলিঙ যাবার একটা প্রোগ্রাম আপনাদের করা ছিল, তাই নয়? মিস্টার মিত্র বললেন যে, কাঞ্চন ডেয়ারিতে গিয়ে উনি আটকা পড়েছিলেন। কথাটা উনি সত্য বলেননি। পর্শু-সকালে উনি দার্জিলিঙেই গিয়েছিলেন।

—আপনি কেমন করে জানলেন?

—পর্শু আমি ছিলাম দার্জিলিঙে। বেলা একটার সময় একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ সারছিলাম। আমার থেকে তিন টেবিল দূরে মিস্টার মিত্র দুপুরে ওখানে লাঞ্চ করেন। উনি নিশ্চয় আমাকে লক্ষ্য করেননি—

—দার্জিলিঙ-এ চাইনিস রেস্তোরাঁ? আছে না কি?

—আছে। গ্রেনারির ঠিক উল্টোদিকে। 'সাংহাই' তার নাম।

—ওখানে বসে সে খাচ্ছিল?

বিচিত্র হাসল আলি। বললে, আপনি রাগ না করেন তো আরও কিছু নিবেদন করি। উনি একা খাচ্ছিলেন না—ওঁকে সঙ্গদান করছিলেন একজন বাঙালী ভদ্রমহিলা। বিবাহিতা, বয়স বছর ত্রিশ—আর ভয়ে-বলব-না-নির্ভয়ে-বলব? ভদ্রমহিলা রীতিমত সুন্দরী।

সুজাতা আত্মসংবরণ করে কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, ভয়ে বলতে যাবেন কোন দুঃখে? নির্ভয়েই বলুন। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন মিস্টার আলি,—আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছি। আমার স্বামী কোনও সুন্দরী মহিলার সঙ্গে লাঞ্চ সেরেছেন শুনলে আমি মূর্ছা যাব না।

আলি একটা মোগলাই-কুর্নিশ ঝেড়ে বলে, বেগমসাহেবা মহানুভব। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের ঔদার্যটার সম্বন্ধে আমার ধারণা সীমিত। আচ্ছা ধরুন, যদি সংবাদ পান লাঞ্চান্তে আপনার কর্তা সেই সুন্দরী মহিলাটিকে একটা 'সোনার কাঁটা' উপহার দিচ্ছেন?

—সোনার কাঁটা? সেটা কী জাতীয় বস্তু?

—ও-বস্তুটা আমিও এর আগে কখনও দেখিনি। একটা অলঙ্কার। মেয়েরা খোঁপায় কাঁটা গোঁজে—লোহার, অ্যালুমিনিয়ামের, প্ল্যাস্টিকের। কবরী-বন্ধন যাতে শিথিল না হয়ে যায় তাই তার ব্যবহার—এই যেমন আপনি এখন কাঁটা গুঁজেছেন আপনার খোঁপায়! সোনার কাঁটার মূল্য কবরীবন্ধনে নয়—

—কৃষ্ণা-কবরী-শোভা-বর্ধনে—প্রশ্ন করে সুজাতা।

—অথবা রক্ত-কবরী-সোহাগ-বর্ধনে!—জবাব দেয় আলি।

—সংবাদটা বিচিত্র!

—সন্দেশটা বিস্বাদ না হলেই হল! ভরি-তিনেক ওজনের অমন একটা সোনার কাঁটা মিস্টার মিত্রের পকেট থেকে যাত্রা শুরু করে তাঁর মিত্রাণীর খোঁপা বিদ্ধ করলে বেদনাটা অন্যত্র অনুভূত হবার কারণ নেই! কী বলেন! আফটার-অল, আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছি!

সুজাতা এবারও হেসে বলে, মিস্টার আলি, রামায়ণ তো আপনার পড়া। নিশ্চয় জানেন—রাবণের গুষ্টি শেষ হবার পর বিভীষণ সিংহাসনে বসে—কিন্তু কোনও হিন্দুই সত্যবাদী বিভীষণকে শ্রদ্ধা করে না—তার পরিচয় 'ঘরভেদী বিভীষণ'!

আলি এ জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সামলে নিয়ে কী একটা কথা সে বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দ্বারপথে কে-যেন বলে ওঠে, এক্সকিউজ মি! ভিতরে আসতে পারি?

—কে? ডক্টর সেন! আসুন। এখানে কী মনে করে?

হাসি হাসি মুখে ডঃ সেন ঢুকে পড়েন রান্নাঘরে। অনুনয়ের ভঙ্গিতে সুজাতাকে বলেন, এক কাপ চা কি কিছুতেই হতে পারে না, মিসেস মিত্র? আমার বেটার-হাফ, মানে...

ক্লেশে ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে সুজাতার করুণা হয়। আলি এগিয়ে এসে বলে, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। আমার নাম এ. আলি—আমি আছি তিন নম্বরে।

—সো গ্ল্যাড টু মীট য়ু। একা আছেন, না সস্ত্রীক?

—আজ্ঞে না। স্ত্রীর বালাই নেই। আমি কনফার্মড ব্যাচেলর!

—শুনে সুখী হলাম। বেঁচে গেছেন মশাই!

আলি বলে, কেন? আপনি যে মরে আছেন তা তো মনে হচ্ছে না। 'কপোত-কপোতী যথা' উচ্চনীড়ে সকাল থেকে তো দিব্যি তাস পিটছেন!

—আরে তাতেই তো হয়েছে বখেড়া। এ পর্যন্ত আমার বেটার হাফ সাড়ে বাহান্ন টাকা হেরেছেন। মেজাজ খেপচুরিয়াস! তাতেই তো চায়ের সন্ধানে এসেছি।

আলি অবাক হয়ে বলে, সাড়ে বাহান্ন টাকা! আপনি কি স্ত্রীর সঙ্গে স্টেকে তাস খেলছেন?

—আলবৎ! স্টেক ছাড়া 'ফিশ্' খেলা যায় নাকি!

—তাই বলে স্ত্রীর সঙ্গে?

—কেন নয়? ওঁর রোজগার আর আমার রোজগার আলাদা। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট নেই। এমনকি I.T.O.-র ফাইল নাম্বার পর্যন্ত পৃথক।

—এমনও হয় না কি?

—আজ্ঞে! বে-থা তো করেননি—কী খবর রাখেন!—অম্লানবদনে ডাক্তার-সাহেব ডেকচি থেকে একটি সিদ্ধ আলু নিয়ে মুখে পুরলেন।

সুজাতা হেসে বললে, ঠিক আছে ডাক্তার-সাহেব, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এক কাপ না দুকাপ?

—বানাতে যখন হচ্ছে তখন আর এক কাপ কেন? যাহা সাড়ে বাহান্ন তাহা পঁয়ষট্টি। দু-কাপই হ'ক।—দ্বিতীয় একটি বড়-মাপের আলু তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসান ডাক্তার সেন। বাঁ-হাতে এক চিমটে নুনও তুলে নেন।

সুজাতা বললে, আচ্ছা আপনি যান, আমি দু-কাপ চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—থ্যাঙ্ক! থ্যাঙ্ক! না, না, কষ্ট করে আর পাঠিয়ে দিতে হবে না। আমি অপেক্ষা করছি। নিজেই নিয়ে যাব।

সুজাতা হাসতে হাসতে বলে, ততক্ষণে বোধহয় আমার আলুসেদ্ধর ডেকচি খালি হয়ে যাবে।

—আলুসেদ্ধ! ও আয়াম সরি!—এঁটো আলুটা উনি ফেরত দিতে উদ্যত হন।

—এ কী করছেন! ওটা আপনার এঁটো!

—এঁটো! ও আয়াম সরি—আলুটা কোথায় রাখবেন উনি ভেবে পান না।

—একি! তুমি এখানে বসে আলুসেদ্ধ খাচ্ছ!—প্রবেশ করেন মিসেস সেন।

—আমি? না, মানে, ইয়ে—হঠাৎ বাকি আলুটা মুখে পুরে দিয়ে ডাক্তার-সাহেব আলি-সাহেবের দিকে ফিরে বলতে চাইলেন—'আমার বেটার-হাফ'; কিন্তু মুখে গরম আলুসেদ্ধ থাকায় কথাটা বোঝা গেল না।

—চলে এস উপরে!—রীতিমত ধমকের সুরে ডাকেন মিসেস্ সেন।

—না, মানে তোমার চা-টা—

—থাক। চা আর লাগবে না।

সুজাতার গরম জল তৈরীই ছিল। ইতিমধ্যে সে চা ছেড়েছে 'পট'-এ। বললে, চা যে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

রুখে ওঠেন মিসেস সেন, বলছি লাগবে না! এক ঘণ্টা আগে চা চেয়েছি, এতক্ষণে শোনাচ্ছেন—হয়ে গেছে!

সুজাতা ডক্টর সেনের দিকে ফিরে বললে, না লাগে পাঠাব না। তবে আপনার অর্ডার অনুযায়ী দু-কাপ চা বানানো হয়েছে। বিল-এ দু-কাপ চায়ের দাম কিন্তু ঠিকই উঠবে ডঃ সেন!

—কারেক্ট! তা তো উঠবেই। তবে এক কাজ করুন—আমার কাপটা দিন, নিয়ে যাই। ওঁর যখন

আর লাগবে না—

—থাম তুমি! উঃ কী ডাকাতের রাজ্যে এসে পড়েছি! দাম দেব আর চা খাব না! ইয়ার্কি নাকি! তুমি এস—ওরা বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

ওয়ার্স-হাফকে উদ্ধার করে উপরে উঠে গেলেন মিসেস সেন।

ছয়

বেলা প্রায় এগারোটা। নিজের ঘরে বসে কাবেরী তন্ময় হয়ে একখানা ছবি দেখছিল, ওরই ছবি। সিপিয়া রঙে ক্রেয়নে আঁকা। সদ্য সমাপ্ত। হঠাৎ, দ্বারের কাছে প্রশ্ন হল, ভিতরে আসতে পারি?

সচকিত হয়ে কাবেরী লক্ষ্য করে দ্বারপথে দাঁড়িয়ে আছেন চার-নম্বরের সুদর্শন ভদ্রলোক।

—আসুন, আসুন। কী ব্যাপার?

—কৌতূহলটা দমন করতে পারলাম না। ছবিটা দেখতে পারি?

—দেখুন না! আপত্তি কিসের—ছবিখানা বাড়িয়ে ধরে কাবেরী।

সুবীর জমিয়ে বসে একখানা চেয়ারে। সমঝদারের মত ওর ছবিখানা দেখতে থাকে—কাছে ধরে, দূরে ধরে। দু-একবার কাবেরীর দিকেও তাকায়। তারপর বলে, ছবিটা সুন্দর, তবে অরিজিনালের মত সুন্দর নয়।

কাবেরী একটু রাঙিয়ে ওঠে। কথা ঘোরাবার জন্য বলে, আপনার পরিচয়টা কিন্তু আমি জানি না। আপনি তো আছেন ঐ চার নম্বরে?

—হ্যাঁ। আমার নাম সুবীর রায়। আরে, আপনার সুটকেসটা তো চমৎকার!

—ওপাশে রাখা সাদা রঙের সুটকেসটা লক্ষ্য করে সে। বলে, এগুলোকেই ভি.আই.পি. সুটকেস বলে, তাই নয়?

কাবেরী বলে, সখ করে কিনেছি। যদিও আমি ভি.আই.পি. মোটেই নই।

—বেড়াতে এসেছেন বুঝি দার্জিলিঙে?—প্রশ্ন করে সুবীর সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে।

—হ্যাঁ। ছুটিতে—

—অত সকালে কোথা থেকে এলেন?

ভ্রূ-কুঞ্চিত হল কাবেরীর। বললে, আপনি তো এলেন মধ্যরাত্রে—আমি কখন এসেছি তা জানলেন কেমন করে?

সুবীর মামুলী গলায় বললে, সুজাতা দেবী বলছিলেন আপনি নাকি সেই কাক-ডাকা ভোরে এলেন।

কাবেরীও মামুলী-গলায় জবাব দিল, কাক-ডাকা ভোরই বটে। আমি পর্শু রাত্রে কার্শিয়াঙে হল্ট করেছিলাম। রাত ভোর হতেই এখানে চলে এসেছি।

—কার্শিয়াঙে কোথায় ছিলেন? হোটেলে?

আবার সচকিত হয়ে ওঠে কাবেরী। বলে, কেন বলুন তো?

—না, আমি ফেরার পথে কার্শিয়াঙে দু-দিন থাকব ভাবছি। তাই জানতে চাইছি কোন হোটেলে ছিলেন, তাদের ব্যবস্থা কেমন—

কাবেরী কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, যদি কোন হোটেল ছেড়ে রাত থাকতে বোর্ডার পালিয়ে যাচে সেটায় থাকবার কথা ভাবছেন ফেরার পথে?

সুবীর বললে, তাহলে ধরে নিন ভুল করে সেটাতে উঠে যাতে নাকাল না হতে হয় তাই নামটা

জানতে চাইছি। কার্শিয়াঙে কোন হোটেলে ছিলেন?

কাবেরী আবার প্রশ্নটা এড়িয়ে বলে, আপনি যে পুলিসের মত জেরা করছেন!

—তাই করছি, কারণ পুলিস বিভাগেই কাজ করি আমি। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সে। এসেছি একটা খুনের তদন্তে। সেই প্রসঙ্গেই আমি জানতে চাইছি—পয়লা অক্টোবর রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? রাত দশটার পর থেকে বাকি রাত।

পকেট থেকে একটি নোটবুক বার করে বলে, এবার বলুন—

কাবেরীর মুখটা সাদা হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে, কিন্তু কথা কিছু বলে না। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিনা-নোটিসে ঘরে ঢুকে পড়লেন অজয় চাটুজ্জে। সরাসরি কাবেরীকে বললেন, ও ক্রেয়নে ঠিক এফেক্টটা আসেনি, বুঝলে! আমি অয়েলে আর একখানা আঁকতে চাই। তোমার সময় হবে এখন? কাবেরী তৎক্ষণাৎ সামলে নেয় নিজেকে। বলে, সময় হবে না? কী বলছেন? নিশ্চয় হবে। এখনই বসবেন? চলুন—

এতক্ষণে অজয়বাবু সুবীরকে নজর করেন; বলেন, ঐকে তো ঠিক, মানে—

কাবেরী প্রথম সুযোগেই সুবীরের ট্রাম্প-কার্ডখানা খুলে দেখায়। বলে, উনি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের একজন অফিসার, মিস্টার সুবীর রায়। এসেছেন একটা খুনের তদন্তে।

সুবীর ক্রুদ্ধ আক্রোশে কাবেরীর দিকে তাকায়।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে মুছতে অজয়বাবু বলেন—অ!

—বসুন অজয়বাবু। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে আমার।

অজয় বসেন না। চশমাটা নাকে চড়িয়ে বলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের সেই দারোগার মৃত্যু সংক্রান্ত প্রশ্ন নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, তাই। আপনি তো ঐ হোটেলেই ছিলেন?

—এস কাবেরী—অজয় প্রস্থানোদ্যত।

—আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন না?

—দেব! যখন কোর্টের সমন পাব, সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াব, তখন দেব! উঃ! হরিবল, এস কাবেরী।

কাবেরীর হাতটা ধরে অসঙ্কোচে টানতে টানতে নিয়ে চলেন অজয় চাটুজ্জে। পিছন থেকে সুবীর বলে, কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না। কোর্টের সমন ছাড়াও পুলিস অফিসারের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়—

—হয়, জানি। কিন্তু তার একটা স্থান-কাল-পাত্র আছে! পথে-ঘাটে প্রথম সাক্ষাতেই অমন মোড়লি করার কোন অধিকার পুলিসের নেই! বুঝেছেন!—ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন উনি।

বেলা সওয়া এগারোটা।

সুবীর এসে উপস্থিত হল আলি-সাহেবের ঘরে। দরজায় নক করে বললে, আসতে পারি?

আগাথা ক্রিস্টিকে বালিশের উপর উবুড় করে রেখে আলি বললে স্বচ্ছন্দে! ইন ফ্যাক্ট আপনার সঙ্গে আলাপ করতে যাব ভাবছিলাম। আমার নাম এন. আলি।

সুবীর বললে, আমার নাম সুবীর রায়। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সে আছি। এসেছি একটা খুনের তদন্তে।

ভেবেছিল প্রতিপক্ষ হকচকিয়ে যাবে। তা কিন্তু গেল না আলি। হেসে বললে, তাস খেলেন?

—কেন বলুন তো?—ভ্রূকুঞ্চিত সুবীরের প্রশ্ন!

—প্রথম ডীলেই রঙের টেক্কা পেড়ে লীড দিচ্ছেন তো, তাই বলছি!

—মানে?

—আগাথা ক্রিস্টি পড়ছিলাম কিনা—গোয়েন্দা গল্পে দেখেছি ডিটেকটিভরা সহজে আত্মপরিচয়

দেয় না ওভাবে।

—সকলের পদ্ধতি এক নয়। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

—এ বিনয়ও ডিটেকটিভ-সুলভ নয়। নিশ্চয় করতে পারেন। করুন। আমি প্রস্তুত।

—আপনি তো এখানে এসেছেন পয়লা তারিখ রাত সওয়া নয়টায়। কোথা থেকে এলেন?

—দার্জিলিঙ থেকে।

—দার্জিলিঙে কবে এসেছিলেন?

—ঐ পয়লা তারিখ বেলা বারোটায়। একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে চেপে।

—ঐ ট্যাক্সিতে একজন পুলিস অফিসার আর একজন ভদ্রমহিলাও এসেছিলেন?

—না। কোন পুলিস অফিসার বা মহিলা ছিলেন না আমার সঙ্গে।

—কোন হোটেলে উঠেছিলেন আপনি?

হোটেল কুণ্ডুজ। স্বনামেই উঠেছিলাম—হোটেল রেজিস্টার হাতড়ে দেখতে পারেন সত্য কিনা।

—কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে—স্বনামে হোটেল কুণ্ডুজ-এ ঘর বুক করে আপনি বেনামে অন্য কোনও হোটেলে উঠেছিলেন?

আলি হেসে ফেলে। বলে, যেমন ধরা যাক মহম্মদ ইব্রাহিম এই ছদ্মনামে হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়?

—কেন নয়?

—নয় এজন্য যে সে-ক্ষেত্রে অজয়বাবু এবং ব্যারিস্টার বাসু আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলতেন। ওঁরা দুজনেই ছিলেন ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘায়।

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন—মহম্মদ ইব্রাহিম হোটেলে ছিল মাত্র কয়েক মিনিট। চেক-ইন করেই সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে রাত সাতটায় এবং এক ঘন্টার মধ্যেই চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়। রাত আটটায় দার্জিলিঙ থেকে রওনা হলে রাত ন'টার মধ্যে তার পক্ষে রিপোস-এ এসে পৌঁছানো সম্ভব!

আলি পাইপ ধরালো। বললে, তাইতো হিসাবে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনি একটিমাত্র কাজ করতে পারেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের রুম-সার্ভিসের বেয়ারা বীর বাহাদুরকে এখানে নিয়ে আসুন। সে সনাক্ত করে যাক—ইব্রাহিম বা মিস ডিক্রুজা এখানে আছে কিনা!

সুবীর বলে, বীর বাহাদুর! ও নাম আপনি জানলেন কেমন করে?

—এখানেই কারও কাছে শুনেছি বোধহয়! হোটেল রিপোসে তো দিবারাত্র এই গল্পই হচ্ছে। আসুন—

একটি সিগ্রেট সে বাড়িয়ে ধরে সুবীরের দিকে। পাইপখোর তাহলে সৌজন্যের খাতিরেও সিগ্রেট রাখে!

মোট কথা আলি-সাহেব বিন্দুমাত্র নার্ভাস হন না।

সাড়ে এগারোটায় সুবীর এসে হানা দিল ডক্টর সেনের ঘরে। সেখানেও বিশেষ কিছু সুবিধা হল না। কিন্তু একটা খটকা লাগে সুবীরের। ডক্টর সেনকে অফার করা সিগ্রেটের প্যাকেট থেকে মিসেস সেন অম্লানবদনে একটি সিগ্রেট নিয়ে ধরালেন। দিব্যি হুসহুস করে টানলেন এবং একবারও কাশলেন না। ডক্টর আর মিসেস সেন সুবীরকে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন তাসের আড্ডায় যোগ দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী করাতে পারলেন না। মিসেস সেন এ হোটেলের ব্যবস্থাপনার ভূয়সী নিন্দা করলেন এবং কথা প্রসঙ্গে জানালেন ওঁর এক ভাই আছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়, এক ভাই পশ্চিম জার্মানিতে। উনি নাকি ডক্টর সেনকে পই-পই করে বলছেন চাটি-বাটি গুটিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে—কিন্তু ঘরকুনো ডাক্তার সেন কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না দেশ ছেড়ে যেতে।

মোট কথা সুবীর হালে পানি পেল না।

ঠিক বারোটার সময় সুবীর এসে হানা দিল বাসু-সাহেবের ঘরে।

—এস! আর কিছু ক্লু পাওয়া গেল?—প্রশ্ন করলেন বাসু।

—কিছু না। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

—পারছি। আন্দাজ নয়। অকাট্য প্রমাণ!

ঘনিয়ে আসে সুবীর, বলেন কী স্যার? কে?

—কে নয় সুবীর? কারা? দুজনকেই! ইব্রাহিম এন্ড মিস ডিক্রুজা।

সুবীর অবাক হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ করে ঘনিয়ে আসে। বলে, নৃপেনদা অবশ্য আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন; কিন্তু আপনি যে দুজনকেই... কী ব্যাপার বলুন তো?

বাসু-সাহেব নিবন্ত পাইপে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বলেন, আয়াম সরি! এখনই কিছু বলতে পারছি না। আগে জাল গুটিয়ে আনি—সবটা একসঙ্গে ভাঙব।

হতাশ হয় সুবীর। বলে, তাহলে, মানে—আমি এখন কী করব?

—তোমার অফিসিয়াল ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাও।

আজও সারদিনে বর্ষণ ক্ষান্ত হল না। ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কার্ট রোড দিয়ে গাড়ি যাতায়াত বন্ধ। টেলিফোন তো অনেক আগেই গেছে—এবার গেল ইলেকট্রিক। ব্যাটারি-সেট রেডিও কারও কাছে নেই। রেডিও-র শেষ সংবাদ যা পাওয়া গেল তাতে জানা গেছে যে, সমগ্র উত্তরবঙ্গ একটা ঐতিহাসিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে! মিলিটারিকে ডাকা হয়েছে উদ্ধারের কাজে। তিস্তা ব্রীজ নিশ্চিহ্ন। আরও অনেক ব্রীজ ভেঙে গেছে। মহানন্দা, তিস্তা ফুলে ফেঁপে ডুবিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা।

সন্ধ্যার পর কালীপদ ঘরে ঘরে মোমবাতি রেখে গেল। মিটমিটে আলোয় বাড়িটাতে একটা ভুতুড়ে ভাব এসেছে! সুবীর রায়ের পরিচয় জানতে আর কারও বাকি নেই। সকলেই যেন কিছুটা সতর্ক, সন্দিগ্ধ। একঘেয়ে বৃষ্টির মত রিপোস-এর জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে একেবারে।

বৈচিত্র্য দেখা দিল রাত ঠিক আটটা তেত্রিশে।

তার তিন মিনিট আগের কথা। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায়। ড্রইংরুমের ঘড়িটা ঠিক যখন ঢং করে সময়টা ঘোষণা করল।

সুজাতা তখন ছিল রান্নাঘরে। একাই। রাতের রান্না করছিল সে একা। কালীপদ নিজের কাজে ব্যস্ত। কাঞ্চী বাড়ি চলে গেছে।

আলি-সাহেব নিজের ঘর মোমবাতির আলোয় আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ' গল্পের শেষ ক'টা পাতায় ডুবে আছেন।

সুবীর ছিল তার নিজের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে। গীজারের জল এখনও কিছুটা গরম আছে। সে হট বাথ নেবার একটা চেষ্টা করছে। গরমজল আর পাওয়া যাবে না।

ডক্টর আর মিসেস সেন জোড়া মোমবাতি জ্বেলে ফিশ্ খেলছেন। মিসেস সেন সারাদিনে প্রায় সওয়া শ' টাকা হেরে বসে আছেন!

কৌশিক একটা ছাতি আর টর্চ নিয়ে উঠেছে ছাদে। মই বেয়ে জল-নিকাশী গাটারটা সাফা করতে। গাছের পাতায় জল-নিকাশী গাটারটা আটকে গেছে।

বাসু-সাহেব তাঁর ঘরের সামনে উত্তরের বারান্দায় অন্ধকারে বসেছিলেন একট ইজিচেয়ারে। শুনছিলেন—গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দ।

ঠিক তখনই ঢং করে ড্রইংরুমের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজল।

রানী দেবী ছিলেন নিজের ঘরে। হুইলচেয়ারটা তাঁর ঘরের উত্তরের জানলার কাছে টেনে নিয়ে আপন মনে তিনি গান ধরলেন।এমন অকালবর্ষণের সন্ধ্যায় তিনি কিন্তু কোন বর্ষা-সঙ্গীত ধরলেন না। কী জানি কেন আপন খেয়ালে শুরু করলেন অতি পরিচিত একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত:

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমার জানাতেম—"

ঘরে ঘরে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া শুরু হল।

সুজাতা তার প্রেশার-কুকারের মুখটা খুলে দিল। সোঁ-সোঁ শব্দটা বন্ধ হল।

মিসেস সেন তাস টীল করা বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন, কে গাইছে বল তো?

বাসু-সাহেব দেশলাইটা জ্বালবার উপক্রম করছিলেন থমকে গেলেন তিনি।

সুবীর বোধহয় গানটা শুনতে পায়নি। তার কলের শব্দ বন্ধ হল না।

অরূপ পায়চারি করছিল একতলার দক্ষিণের বারান্দায়। চট করে সে ঢুকে গেল হল-কামরায়। ডাইনিং হল-এ একটা মোমবাতি জ্বলছে। মাঝের পর্দাটা টানা। তাই ড্রইংরুমটা আলো-আঁধারি। অরূপ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। প্রায় হাতড়াতে হাতড়াতে সে সরে এল ড্রইংরুমের উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে। বসল গিয়ে পিয়ানোর টুলে।

গান যখন অন্তরায় পৌঁছালো তখন পিয়ানোর মিঠে আওয়াজ যুক্ত হল কণ্ঠ-সঙ্গীতের সঙ্গে। সমের মাথায় একবার থামলেন রানী দেবী। কান পেতে কী শুনলেন। বুঝে নিলেন—পিয়ানো বাজছে। চুপ করে রইলেন পুরো একটি কলি। পিয়ানো বেজে গেল শুধু। তারপর যুক্ত হল যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে কণ্ঠ-সঙ্গীত। রানীদেবী নিশ্চয় বুঝে উঠতে পারেননি কে এমন আচমকা সঙ্গত করতে বসেছে—কিন্তু এটুকু বুঝে নিয়েছিলেন যে সঙ্গতকার একজন দক্ষ যন্ত্রশিল্পী।

"কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে ফিরি আমি কাহার পিছে
সব কিছু মোর হারিয়েছে পাইনি তাহার দাম।"

কৌশিক সচকিত হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের আকর্ষণে সে নেমে আসে মই বেয়ে। এসে নামে দোতলার বারান্দায়। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওর নজরে পড়ল দক্ষিণের বারান্দার ও-প্রান্তে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, মনে হল স্ত্রীলোক। কাবেরীই হবে নিশ্চয়। ঠিক তার ঘরের সামনেই। কৌশিক একটু ইতস্তত করে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে যায় একতলায়।

সঙ্গীতের আকর্ষণে সত্রীক সেনও উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন উত্তরের বারান্দায়।

গান শেষ হল। সঙ্গীতময়া দ্বিতীয়বার শুরু করলেন 'স্থায়ী'টা:

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতেম"

ড্রইংরুমে ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বেজে তেত্রিশ।

হঠাৎ সমস্ত বাড়ি সচকিত করে একটা ফায়ারিং-এর শব্দ হল ড্রইংরুমে!

তৎক্ষণাৎ কে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল ডাইনিং হল-এর মোমবাতিটা!

একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ। ঐ সঙ্গে ভেঙে পড়ল একটা ফুলদানি। বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড। বাড়িশুদ্ধ সবাই এসে উপস্থিত হল ড্রইংরুমে। প্রায় একসঙ্গেই।

অরূপরতন পড়ে আছে উবুড় হয়ে। তার পাশেই একটা ভাঙা ফুলদানি আর কিছু ছড়ানো ছিটানো ম্যাগাজিনলাই। ডক্টর সেন ঝুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কৌশিক তার হাতের টর্চটা জ্বালল। ডক্টর সেন মুখ তুলে বললেন, থ্যাংক গড। গুলিটা কাঁধে লেগেছে। ফেটাল নয় বোধহয়!

এতক্ষণে সুবীর এসে পৌঁছালো তার বাথরুম থেকে। তার গায়ে একটা তোয়ালের তৈরী ড্রেসিং গাউন। তার চুল বেয়ে জল ঝরছে। বললে—পাশেই দু-নম্বর ঘর। ওখানেই ওঁকে নিয়ে যাওয়া যাক।

ধরা-ধরি করে অচৈতন্য অরূপকে ওরা নিয়ে গেল বাসু-সাহেবের ঘরে।

ডক্টর সেন একেবারে অন্য মানুষ। সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। সুজাতাকে গরম জল আনতে বললেন। আর সবাইকে বললেন, প্লীজ ক্লিয়ার আউট। ঘর ফাঁকা করে দিন। স্ত্রীকে বলেন, আমার ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে এস চট্ করে।

মিসেস সেন ভ্রুকুঞ্চিত করে বলেন, কী দরকার বাপু ওসব খুন-জখমের মধ্যে নাক গলাবার? তুমি চলে এস!

—শাট আপ!!—গর্জন করে উঠলেন ডক্টর সেন। তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, আমার ব্যাগটা প্লীজ—

হ্যাঁ। ডাক্তার সেন মুহূর্তে বদলে গেছেন।

বারান্দার ও-প্রান্তে ইজিচেয়ারে গিয়ে বসেছিলেন ফের বাসু-সাহেব। সুবীর গট গট করে এগিয়ে আসে তাঁর কাছে। কঠিন স্বরে বলেন, আপনিই এজন্য দায়ী!

—আমি! কেন? কী করে?

—কেন তখন সব কথা খুলে বললেন না? হয় তো এ দুর্ঘটনা রোখা যেত!

বাসু-সাহেব বেদনাহত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না।

দুম দুম করে পা ফেলে সুবীর চলে গেল আবার।

রানী দেবী হুইল-চেয়ারটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। সহানুভূতির সুরে বললেন, এ দুর্ঘটনা এড়ানো যেত, তাই নয়!

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বাসু-সাহেব: ইয়েস, ইটস্ মাই মিস্টেক! আমি ভেবেছিলাম—আমিই বুঝি ওর টার্গেট! তাই প্রস্তুত হয়েই বসেছিলাম আমি। বুঝতে পারিনি ও অরূপকে—

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কালো যন্ত্র বার করে দেখালেন স্ত্রীকে।

রানী দেবী স্তম্ভিত হ'য়ে যান।

আধ ঘণ্টা পরে বাসু-সাহেব এসে দাঁড়ালেন রোগীর শিয়রে। অরূপের কাঁধের উপর ব্যান্ডেজ বাঁধা। অরূপ তখনও অচৈতন্য। প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেনকে—কী বুঝছেন?

—বুলেটটা স্ক্যাপুলার খাঁজে আটকে আছে। বার করে দেওয়া দরকার—

—হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটার ছাড়া সম্ভব হবে?

—অসম্ভব! থাক, আপাতত বুলেটটা থাক। শকটা কাটিয়ে উঠুন। বেঁচে যাবেন। অন্তত মেডিকেল-সায়েন্স এক্ষেত্রে যতটুকু করতে পারে তা আমি করব। নিশ্চিন্ত থাকুন।

—থ্যাংক্স!

অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে এল সুবীর। বললে, কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেন। আমি কয়েকটা খোলা কথা বলব। অরূপবাবুকে কে গুলি করেছে তা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের মধ্যেই কেউ একজন তা করেছে—ইয়েস! এনি ওয়ান! আপনি-আমিও হতে পারি!

—সো হোয়াট?—রুখে ওঠেন ডক্টর সেন।

—আপনি ওঁকে কী ওষুধ দিচ্ছেন, কী ইনজেক্শান দিচ্ছেন সব একটা স্টেটমেন্টের আকারে লিখে যাবেন এবং মিসেস বাসুকে দেখিয়ে ওষুধ খাওয়াবেন, ইনজেক্শান দেবেন—

—মিসেস্ বাসুকে! কেন? উনি কী বোঝেন ডাক্তারির?

—সে জন্য নয়। একমাত্র মিসেস্ বাসুই সন্দেহের অতীত।

ডাক্তার সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, ইয়েস ডক্টর সেন। টেক মাই লীগাল অ্যাডভাইস। সুবীর যা বলছে তাই করুন। মেডিক্যাল সায়েন্সে যতখানি সম্ভব আপনি করুন—ক্রিমিনাল জুরিসপ্রুডেন্সে যতখানি সম্ভব আমাকে করতে দিন—

শ্রাগ করলেন ডাক্তার সেন: অ্যাজ য়ু প্লীস্!

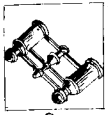

সাত

পরদিন। চৌঠা অক্টোবর। শুক্রবার। সকাল।

সুবীরের ঘরে এসে হাজির হল আলি। পর্দার বাইরে থেকে বললে, ভিতরে আসতে পারি?

সুবীর একটু অবাক হল, বললে, নিশ্চয়! আসুন মিস্টার আলি। কী ব্যাপার?

আলি এসে বসল সামনের চেয়ারটায়। বললে, আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে এলাম।

—বলুন?—ঘনিয়ে আসে সুবীর।

—দেখুন মিস্টার রায়, আপনি কাল যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন আমি জোভিয়াল-মুডে জবাব দিয়েছিলাম। সত্যিকথা বলতে কি আমি বিশ্বাস করিনি যে, দার্জিলিঙ-এর ঘটনা এই রিপোস-এ রিপিটেড হতে যাচ্ছে—ভেবেছিলাম এসব আপনাদের আষাঢ়ে কল্পনা। কিন্তু এখন আর সেটা ভাবা যাচ্ছে না। দু-নম্বর ঘটনা এখানে কাল রাত্রে ঘটে গেছে। ফলে এখন সিরিয়াসলি ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই—

—করুন। আমি কর্ণময়!

—প্রথম কথাই বলব যে, আমি জানি—আমি নিজে আপনার সন্দেহের তালিকায় আছি। আই নো ইট! শুধু আমি নই, আপনি হয়তো ডক্টর সেন এমনকি বৃদ্ধ অজয়বাবুকেও সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন; মিস্ ডিক্রুজার সন্ধানে আপনি কাবেরী দেবী অথবা মিসেস্ সেনকেও নজরে নজরে রেখেছেন—তাই নয়?

—বলে যান—

—আমার আশঙ্কা হচ্ছে আপনি—এ কেস-এ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার—সমস্ত সম্ভাবনা তলিয়ে দেখছেন না, ফলে আপনার সন্দেহের তালিকা থেকে একজন বাদ যাচ্ছেন, যাঁকে ঠিকমত বাজিয়ে দেখা আপনার উচিত। আপনারা কয়েকটি ভুল পূর্বসিদ্ধান্ত করেছেন।

—আর একটু পরিষ্কার করে বলুন—

—আপনারা ধরে নিয়েছেন—পয়লা অক্টোবর ইব্রাহিম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশান থেকে শেয়ারের ট্যাক্সি চেপে রমেন দারোগা আর মিস্ ডিক্রুজার সঙ্গে দার্জিলিঙ-এ এসেছিল। তা তো না-ও হতে পারে? এমনও তো হতে পারে যে, রমেনবাবু আর মিস্ ডিক্রুজা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শেয়ারের ট্যাক্সিতে আসছিল আর ইব্রাহিম মাঝপথে ঐ ট্যাক্সিতে ওঠে, ধরুন পাঙ্খাবাড়ি, কার্শিয়াঙ, সোনাদা কিম্বা এই ঘুম-এই।

—এমনটা মনে করার হেতু?

—আপনাদের ধারণা যে, এই ট্যাক্সিতে আসার সময়েই রমেনবাবু আর মিস্ ডিক্রুজার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়—সেটা এতদূর নিবিড় হয় যাতে হোটেলে পৌঁছেই রমেনবাবু ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয় এবং ডিক্রুজাকে সেটা দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে স্বতঃই ধরে নিতে হয় ট্যাক্সিতে দুজন বেশ কিছুক্ষণ নিভৃত আলাপের সুযোগ পেয়েছিল। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে দুটি পুরুষ ও একটি মহিলা একসঙ্গে রওনা হলে এ জাতীয় ঘনিষ্ঠতা কখনো গড়ে উঠতে পারে দুজনের মধ্যে?

—সো হোয়াট?

—তাতে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইব্রাহিম পয়লা তারিখ সকালে ঐ ট্রেনে কলকাতা থেকে আসেনি। সে মাঝ-রাস্তায় ঐ ট্যাক্সিতে উঠেছিল—

সুবীর বলে, কিন্তু মুশকিল কী হচ্ছে জানেন মিস্টার আলি—আমাদের সন্দেহের তালিকায় যে কজন আছেন, যেমন ধরুন ডক্টর সেন, অজয়বাবু এবং—

—আপনার ইতস্তত করার কিছু নেই—আমরা অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান করছি, ফলে, 'এবং মিস্টার আলি'! আমি নিজেকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেবার শুভেচ্ছা নিয়ে আপনার কাছে আসিনি; আমি শুধু বলতে এসেছি যে, সমস্যাটার আরও একটা দিক আছে, আরও একজনকে সন্দেহের তালিকায় আপনাদের রাখা উচিত।

—আর একটু স্পেসিফিকালি বলবেন?

—বলব। আমি এখানে এসে পৌঁছাই পয়লা তারিখ রাত সওয়া ন'টায়। তখন এখানে মিসেস মিত্র একা ছিলেন। মিস্টার কৌশিক মিত্র ফিরে এলেন রাত দশটায় এবং এসেই তাঁর স্ত্রীকে কৈফিয়ৎ দিলেন যে, তিনি সমস্ত দিন ছিলেন কাঞ্চন ডেয়ারিতে, দার্জিলিঙ-এ তিনি আদৌ যাননি সারাটা দিন—

—তাতে কী হল?

—অথচ আমি নিশ্চিত জানি—কৌশিকবাবু বেলা এগারোটার সময় ঘুম স্টেশানে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে চেপে দার্জিলিঙ-এ যান। সারাটা দিন তিনি দার্জিলিঙ-এ কী করেছেন তা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, তিনি দুপুরে 'সাংগ্রি-লা' নামে একটি চীনা হোটেলে লাঞ্চ করেন—একা নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একটি সুন্দরী মহিলা।

—মহিলা! কে তিনি?

—এ কাহিনীর মিসিং লিংক। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। চুল ছোট, বব নয়। চেহারায় অবাঙালিত্বের ছাপ; কিন্তু চমৎকার বাঙলা বলতে পারেন। মহিলাটি কে হতে পারেন তা মিসেস্ মিত্র আন্দাজ করতে পারছেন না, অথচ আমি স্বচক্ষে দেখেছি কৌশিকবাবু তাকে একটি 'সোনার কাঁটা' উপহার দিচ্ছেন! আর—যদি না আমার চোখ ভুল করে থাকে, মহিলাটির ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স ঐ রকমই 34-28-32।

সুবীরের ভ্রূকুঞ্চিত হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে থাকে আলিকে। তার পর বলে, আপনি কেমন করে জানলেন?

—আমি প্রত্যক্ষদর্শী। তিন টেবিল পিছনে আমি ঐ রেস্তোরাঁতেই খাচ্ছিলাম। একা। ফলে কৌশিকবাবু আমাকে নজর করেননি। আর তাঁর সুন্দরী সঙ্গিনী থাকায় আমি বার বার ওদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

সুবীর বললে, অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশানই যখন করছি তখন বলি—এমনও তো হতে পারে যে, আপনি আদ্যন্ত বানিয়ে বলছেন। আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত করতে।

—কারেক্ট! সেটাও যেমন সম্ভব তেমনি এটাও সম্ভব যে,আমি আদ্যন্ত সত্যকথা বলছি। আমি কোনভাবেই আপনার তদন্তকে প্রভাবিত করতে চাই না। আমি শুধু একথা বলব যে, আমি তদন্তকারী অফিসার হলে এটার সত্যতা যাচাই করে দেখতাম। সত্য হলে কৌশিককে সন্দেহ করতাম, আর মিথ্যা হলে আলিকে আরও সন্দেহের চোখে দেখতাম।

সুবীর বললে—থ্যাংক্স, ফর দ্য টিপস্!

আরও আধঘণ্টা পরের কথা। সুবীর এসে উপস্থিত হল কৌশিকের ঘরে। বললে, কৌশিকবাবু এতক্ষণ আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়নি, এখন আপনার স্টেটমেন্টটা নিতে চাই—

কৌশিক কী একটা হিসাব লিখছিল। খাতাটা বন্ধ করে বললে, বলুন?

—ঐ পয়লা তারিখ আপনি কোথায় ছিলেন? সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত?

কৌশিক চট করে জবাব দেয় না। প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন বলুন তো?

—আমি যদি বলি ঐদিন বেলা এগারটা নাগাদ আপনি ঘুম স্টেশান থেকে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন, সারাদিন দার্জিলিঙ-এই ছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে মিসেস্ মিত্রকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন—আপনি কি অস্বীকার করবেন?

এবারও সরাসরি জবাব দেয় না কৌশিক। বলে, কে বলেছে আপনাকে? সুজাতা?

—কে আমাকে বলেছে সেটা বড় কথা নয়। আপনি আমার প্রশ্নের জবাবটা দেননি এখনও?

কৌশিক তবুও সহজ হতে পারে না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আপনার অভিযোগ সত্য।

—আপনি দুপুরে সাংগ্রি-লাতে লাঞ্চ করেন। আপনার সঙ্গে একটি মহিলা আহার করেছিলেন—সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। অবাঙালী, অথচ তিনি চমৎকার বাঙলা বলতে পারেন। ট্রু?

রীতিমত চমকে ওঠে কৌশিক। বলে, আপনি কী বলতে চান? আমি...আমি রমেন দারোগাকে খুন করেছি?

—আমি কিছু বলতে চাই না কৌশিকবাবু! বলবেন তো আপনি। আমি যা বলছি তা সত্য?

কৌশিক রুখে ওঠে, হ্যাঁ সত্য! সো হোয়াট?

—সেই মহিলাটি কে?

—আমি বলব না!

—আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না।

—বেশ তাই! তারপর?

সুবীর উঠে দাঁড়ায়। বলে, না, তারপর আর কিছু নেই। ধন্যবাদ।

নিঃশব্দে উঠে চলে যায় সুবীর।

কৌশিকও উঠে পড়ে। তার মনে হয়—এর মূলে আছে সুজাতা। কিন্তু সুজাতা কেমন করে আন্দাজ করল সে কাঞ্চন ডেয়ারিতে যায়নি—গিয়েছিল দার্জিলিঙ? সুজাতা কেমন করে জানবে সে কোথায় কার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিল? পায়ে পায়ে ও চলে আসে কিচেন-ব্লকে। ব্যাপারটার ফয়শালা হওয়া দরকার। কেমন করে সুজাতা জানতে পারল এ কথা?

কিচেন-ব্লকে পর্দার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল ওকে। ঘরের ভিতর দুজনে নিম্নস্বরে কথা বলছে। একজন সুজাতা, দ্বিতীয়জন কে? পুরুষকণ্ঠ! ভদ্রলোক তখন বলছিলেন, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন সুজাতা দেবী, আমি তেমন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ও প্রশ্ন করিনি।

—তাহলে আমাদের বিবাহিত জীবন নিয়ে আপনার অত কৌতূহল কেন?

—কী আশ্চর্য! আপনি অফেন্ডেড হচ্ছেন কেন? আমি শুধু জানতে চাইছি অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ যখন হয়নি তখন কতদিন ধরে আপনি কৌশিকবাবুকে চেনেন। এতে অফেন্স নেবার কী আছে?

—অফেন্স নিচ্ছি প্রশ্নটার জন্য নয়, তার পিছনে যে ইঙ্গিতটা আছে সেটায়! হ্যাঁ, আপনি যা জানতে চাইছেন তা ঠিক। মিস্টার মিত্র একবার মার্ডার কেসে অ্যারেস্টেড হয়েছিলেন, ঐ রমেনবাবুই তাকে গ্রেপ্তার করেন। খবরটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না, কিন্তু সংবাদটা অসমাপ্ত—ঐ সঙ্গে এটুকুও জেনে রাখুন, আমিও ঐ কেসে মার্ডার চার্জে অ্যারেস্টেড হয়েছিলাম! কিন্তু প্লীজ মিস্টার আলি, এসব আলোচনা আপনার সঙ্গে আমি করতে চাই না! আপনি এবার আসুন। আমাকে কাজ করতে দিন। আর...কিছু মনে করবেন না, এ কিচেন-ব্লকটা বোর্ডারদের জন্য নয়, এটা হোটেলের প্রাইভেট অংশ। আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে কাঞ্চীকে দিয়ে খবর পাঠাবেন দয়া করে—

কৌশিক নিঃশব্দচরণে ফিরে যায় নিজের ঘরে।

আরও আট দশ ঘণ্টা কেটে গেছে তারপর। সময় যেন থমকে আছে ঐ অভিশপ্ত বাড়িটায়—যেখানে নূতন জীবনের সূত্রপাত করতে সদ্যোবিবাহিত একটি দম্পতি আনন্দের আয়োজন করেছিল। না। ভুল বললাম। সময় থমকে নেই। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সময় বয়ে চলেছে—ড্রইংরুমের পেন্ডুলাম-ওয়ালা ঘড়িটায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। আর শোনা যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারাপাতের শব্দে। বৃষ্টি এখনও পড়ছে—কখনও জোরে, কখনও ঝড়ো-হাওয়ার ক্ষ্যাপামিতে, কখনও বা ইলশে-গুড়ির নৈঃশব্দে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। টেলিফোন যোগাযোগ নেই, ইলেকট্রিক কারেন্ট নেই—স্তব্ধ হয়েছে কার্ট-রোড দিয়ে গাড়ির আনাগোনা' 'ও কোনও মানুষজনের সাড়া শব্দ নেই। এমনকি পাখিটা পর্যন্ত ডাকছে না।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেষ্টনীতে জাহাজ-ডুবির কজন যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে জনমানবশূন্য একটা ছোট্ট দ্বীপে। সংখ্যায় ওরা মাত্র দশজন। চারদিকেই উত্তালতরঙ্গ সমুদ্রের লবণাক্ত বেড়াজাল—পালাবার কোন পথ নেই। ওদের মুক্তির একমাত্র উপায় হয়তো ছিল—সঙ্ঘবদ্ধতায়। বিশ্বাসে, পারস্পরিক সৌহার্দ্যে। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য ওদের—ওরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভদ্রতা বজায় রেখে একসঙ্গে হাসছে, কথা বলছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে—অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহ করছে। ওরা জানে—ওদের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে একজন নৃশংস খুনী—জাত ক্রিমিনাল। ওদেরই মধ্যে একজনকে খুন করবার জন্য সে অবকাশ খুঁজছে। কে কাকে? তা ওরা জানে না; কিন্তু ভুলতেও

পারছে না সেই মারাত্মক তিন নম্বরের জিজ্ঞাসা চিহ্নটিকে।

কৌশিক ওর ঘরে চুপ করে বসেছিল। জানলা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে ধারান্নাত পাইন গাছগুলোর দিকে। সুজাতা ঘরেই আছে। কথাবার্তা হচ্ছে না ওদের। মন খুলে কেউ যেন কিছু বলতে পারছে না এ ক'দিন। এমনিই হয়! প্রেমের ফুল যখন ফোটে তখন কুন্দর মত সুন্দর হয়ে ফোটে; আর প্রেমের কাঁটা যখন ফোটে তখন শজারুর কাঁটার মত সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। শজারুর কাঁটা না সোনার কাঁটা? শেষে কী মনে করে সুজাতা এগিয়ে এল পিছন থেকে। আলতো করে একখানা হাত রাখল কৌশিকের কাঁধে। কৌশিক ফিরে তাকালো না। সুজাতার হাতের উপর হাতটা রাখল।

—একটা কথা সত্যি করে বলবে?

এবারও মুখ ঘোরালো না কৌশিক। একইভাবে বসে বলে, বল?

—তুমি পয়লা-তারিখ কাঞ্চন-ডেয়ারি যাওনি, নয়?

—যাইনি!

—দার্জিলিঙে গিয়েছিলে?

—হুঁ!

—সেখানে সাংগ্রি-লাতে দুপুরে লাঞ্চ করেছিলে?

—হুঁ!

—তোমার সঙ্গে একটি মেয়ে খেয়েছিল। সে কে?

কৌশিক নিরাসক্তভাবে বললে, প্রমীলা ডালমিয়া। আমার সহপাঠী কিশোর ডালমিয়ার স্ত্রী। সাংগ্রি-লাতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।

সুজাতা এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয়। তারপর ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলে, তাহলে সেদিন কেন মিছে কথা বললে আমায়?

কৌশিক ম্লান হাসে। এতক্ষণে ওর দিকে ফিরে বললে, একটা ব্যাপার তোমার কাছে গোপন করতে—

—কী ব্যাপার?

—তোমার জন্য একটা জিনিস কিনতে দার্জিলিঙ গিয়েছিলাম।

—জিনিস? কী জিনিস?

অন্যমনস্কের মত পকেট থেকে একটা গহনার কেস বার করে কৌশিক টেবিলের উপর রাখে। সুজাতা সেটা খুলে দেখে না। বলে, হঠাৎ গহনা কেন?

শূন্যের দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলে, কাল তোমাকে উপহার দেব ভেবেছিলাম। কাল পাঁচই অক্টোবর।

উদাসীনের মত সুজাতা বললে, ও হ্যাঁ। ভুলেই গেছিলাম।

হঠাৎ পর্দার বাইরে থেকে কে যেন বললে, ভিতরে আসতে পারি?

কৌশিক প্যাকেটটা আবার পকেটে ভরে নিয়ে বলে, আসুন—

ঘরে ঢোকে সুবীর। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে, ব্যাড লাক! ঘুম-অঞ্চলের সমস্ত টেলিফোন বিকল। দার্জিলিঙ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না।

—তাহলে?

—না, ব্যবস্থা একটা হয়েছে। ঘুম আউটপোস্ট থেকে একজন বিশেষ সংবাদবহ পাকদণ্ডী পথে আমার চিঠি নিয়ে এই বৃষ্টি মাথায় করেই দার্জিলিঙ চলে গেছে। আজ রাত্রের মধ্যেই সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ও.সি. মিস্টার ঘোষাল হয়তো নিজেই এসে পড়বেন।

সুজাতা প্রশ্ন করে, আপনি কি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে সুবীর বলে, এখনও ডেফিনিট হতে পারিনি। ইব্রাহিম যদি সহদেব

স্বয়ং হয় তবে মিস্টার আলি অথবা ডক্টর সেনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। আর ইব্রাহিম-ডিক্রুজা যদি পার্টনার-ইন-ক্রাইম হয় তাহলে ডক্টর অ্যান্ড মিসেস্ সেন অথবা আলি-কাবেরী গ্রুপকে সন্দেহ করতে হয়। অজয়বাবু একটু রগচটা প্রকৃতির—কিন্তু তাঁকে সন্দেহ করার কোন কারণ দেখছি না। আচ্ছা, ভাল কথা—বাসু-সাহেব আমাকে বলেছেন যে তিনি ইব্রাহিম আর ডিক্রুজাকে নিশ্চিতভাবে স্পট করেছেন। আপনাদের কিছু বলেছেন তিনি?

সুজাতা বলে, বাসু-সাহেব কখন কী ভাবছেন বোঝা মুশকিল; কিন্তু উনি আমার সাহায্যে একটা ছোট্ট তদন্ত করিয়েছিলেন—

—কী তদন্ত?

—কাবেরী দেবীর ঘরের অ্যাশট্রেটা আমাকে দিয়ে আনিয়ে উনি কী-যেন পরীক্ষা করেন।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সুবীর। একটানে পর্দাটা সরিয়ে দেয়। দেখা গেল পর্দার ও পাশে ডক্টর সেন দাঁড়িয়ে ছিলেন। থতমত খেয়ে ডক্টর সেন বলেন, ইয়ে, আজ আর থার্ড কাপ চা পাওয়া যাবে না, না মিসেস্ মিত্র?

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুজাতা বললে, চা-য়ের সন্ধানে এখানে?

—না, মানে রান্নাঘরে আপনাকে দেখতে না পেয়ে—

—আসুন।—সুজাতা ডক্টর সেনকে নিয়ে নিচে নেমে গেল।

ও. সি. দার্জিলিঙের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল অন্য একটি কারণে :

কালরাত্রেই সুবীর জানতে চেয়েছিল কার কার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। বাসু-সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেছিলেন তাঁর কাছে আছে।

সুবীর প্রশ্ন করে, অরূপরতন যখন গুলিবিদ্ধ হয় তখন রিভলভারটা কোথায় ছিল?

—আমার ডান হাতে। আমি রিভলভারটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম ঐ ইজিচেয়ারে। পশ্চিমমুখো—

ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল সুবীরের। বলেছিল, কেন? রিভলভার হাতে বসেছিলেন কেন?

—একটা প্রিমনিশান হয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল এখনই এই মুহূর্তেই একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আমি সহদেবের প্রতীক্ষা করছিলাম।

বাসু একে একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখেন—আলি, অজয়, ডাক্তার সেন, কৌশিক—সকলেই পাথরের মূর্তি। সুবীর বললে, আপনার রিভলভারটা দেখি?

অম্লানবদনে বাসুসাহেব হস্তান্তরিত করলেন আগ্নেয়াস্ত্রটা। বললেন ওটা লোডেড। সুবীর সেটা শুঁকে দেখল। চেম্বারটা খুলে কী যেন দেখল। যন্ত্রটার নম্বর নোটবুকে টুকে নিয়ে ফেরত দিল সেটা। তারপর এদিকে ফিরে বললে, আর কার কাছে রিভলভার আছে?

কেউ জবাব দেয়নি।

—এ-ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে প্রত্যেকের মালপত্র আমাকে সার্চ করতে হবে।

প্রতিবাদ করেছিলেন অজয় চট্টোপাধ্যায়। বলেছিলেন, আগে থানা থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট করিয়ে আনুন তারপর আমার বাক্স ঘাঁটবেন। তার আগে নয়।

—কেন? আমি তো প্রত্যেকের বাক্সই সার্চ করতে চাইছি। আর কেউ তো তাতে আপত্তি করছেন না। আপনি একাই বা কেন—

—করছি। আমারও আপত্তি আছে।—বলেছিল আলি।

বাসু-সাহেব বলেছিলেন—সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তুমি হোটেল তল্লাসী করতে পার না।

গুম মেরে গিয়েছিল সুবীর। আলি হেসে বলেছিল, অর্থাৎ অবজেকশান সাসটেইন্ড।

তাই সকালে উঠেই সুবীর চলে গিয়েছিল ঘুম-আউটপোস্ট-এ। সেখানে গিয়ে জানতে পারে ঘুম অঞ্চলের সমস্ত টেলিফোন বিকল। বাধ্য হয়ে সে নাকি দার্জিলিঙে স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছে। রাত্রের মধ্যেই ও.সি. দার্জিলিঙে এসে যাবেন। সার্চ ওয়ারেন্ট আসবে। আর হয়তো আসবে

কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের রুম সার্ভিসের বেয়ারা বীর-বাহাদুর। যে রিপোস-এর আবাসিকদের দর্শনমাত্র বলে দিতে পারে মহম্মদ ইব্রাহিম অথবা ডিক্রুজা এখানে আছে কি না।

সন্ধ্যাবেলায় সুবীর রায়ের আহ্বানে সকলে সমবেত হলেন ড্রইংরুমে। সুবীর নাকি সকলকে সম্বোধন করে কিছু জানতে চায়। সবাই এসে গুটিগুটি বসেছে ড্রইংরুমে।

দিনের আলো নিবে গেছে। গোটা তিনচার মোমবাতি জ্বলছে ঘরের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে। এলোমেলো হাওয়ায় মোমবাতির শিখা কাঁপছে। সেইসঙ্গে কাঁপছে আতঙ্কতাড়িত আবাসিকদের অতিকায় ছায়া-মিছিল।

গলাটা সাফা করে নিয়ে সুবীর বললে, অপ্রিয় সত্যটা অস্বীকার করে লাভ নেই—আমাদের মধ্যেই একজন আছেন যিনি মিস্টার মহাপাত্রের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। রমেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা যায় কিনা সে কথা ঠিক এখনই বলা যাচ্ছে না; কিন্তু অরূপ মহাপাত্রকে যে লোকটা পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ করে সে এখন বসে আছে এই ঘরেই। আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করে। এ যুক্তিতে আপত্তি আছে কারও?

কেউ কোন জবাব দেয় না।

সুবীর পুনরায় বলে, আপনারা এ যুক্তি মেনে নিলেন। এবার আরও স্পেসিফিক্যালি বলি : আমরা দশ-বারো জন আছি, তার মধ্যে মিসেস বাসুকে আমরা বাদ দিতে পারি। কারণ তাঁর অ্যালেবাই অকাট্য। তিনি নিজের ঘরে বসে গান গাইছিলেন—সে গান আমরা সবাই শুনেছি, গুলির শব্দের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত—ওয়েল, আর যুক্তির প্রয়োজন নেই,—মিসেস বাসু অনারেবলি অ্যাকুইটেড। এগ্রীড?

এবারও কেউ কোন সাড়া দিল না।

—তাহলে বাকি রইলাম আমরা ন-জন। আসুন, এবার আমরা বিচার করে দেখি। এই নয়জন ঘটনার মুহূর্তে কে কোথায় ছিলেন। কারও কোনও অ্যালেবাই আছে কিনা। একে একে আপনারা বলুন—

—নয়জন বলতে? প্রশ্ন করেন অজয়বাবু।

—মিস্টার কৌশিক মিত্র, মিসেস মিত্র, ডক্টর আন্ড মিসেস সেন, মিস্টার অজয় চ্যাটার্জি, কাবেরী দেবী, মিস্টার আলি, মিস্টার বাসু এবং কালীপদ।

—আন্ড হোয়াই নট মিস্টার সুবীর রয়?—প্রশ্নটা অজয় চাটুজ্জের।

—আলি উৎফুল্ল হয়ে বলে, পার্টিনেন্ট কোশ্চেন। হিন্দু-দর্শনে 'দশমস্তমসি' বলে একটা কথা আছে না?

সুবীর হেসে বলে, আছে। বেশ, আমরা দশজন। আমিই বা বাদ যাই কেন অঙ্কের হিসাব থেকে? তাহলে আমিই আগে কৈফিয়ৎটা দিই: আমি ছিলাম বাথরুমে। হট বাথ নিচ্ছিলাম। গান আমি শুনতে পাইনি, তবে গুলির শব্দটা শুনেছি। জামাকাপড় পরে বের হয়ে আসতে আমার মিনিট দুই দেরী হয়েছিল। আমিই বোধহয় সবার শেষে ড্রইংরুমে এসে পৌঁছাই। এবার আপনারা সবাই বলুন। কৌশিকবাবু।

—আমি ছিলাম ছাদে। গান শুরু হতেই শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তখন নেমে আসি।

—ছাদে! ছাদ তো ঢালু ছাদ—সুবীর প্রশ্ন করে।

—না, ঠিক ছাদে নয়, মই বেয়ে উঠে আমি রেনওয়াটার পাইপটা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা দেখছিলাম। দোতলায় নেমে এসে দেখি—দক্ষিণ বারান্দার ও-প্রান্তে একজন মহিলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন জানিনা—তিনি কাবেরী দেবী অথবা মিসেস সেন। সুতাঁতা নয়, কারণ আমি তাকে মীট করি একতলায়, কিচেন-ব্লকের সামনে—

ওর বক্তব্যের সূত্র ধরে কাবেরী বলে ওঠে, ওখানে আমিই দাঁড়িয়েছিলাম। গান শুনছিলাম। আমি

কৌশিকবাবুকে নেমে আসতে দেখেছিলাম। কৌশিকবাবুই কি না হলপ করে বলতে পরব না। কারণ আলো ছিল খুব কম। একজন পুরুষ মানুষকে বর্ষাতি গায়ে এবং টর্চ হাতে দেখেছিলাম মাত্র।

ডক্টর সেন বলেন, অর্থাৎ আপনারা দুজন দুজনের অ্যালেবাই। কেমন?

আলি বলে ওঠেন, ব্যারিস্টার-সাহেব কী বলেন? ওঁরা তো কেউ কাউকে চিনতে পারেননি। ইনি দেখেন নারী মূর্তি, উনি দেখেছেন পুরুষ মূর্তি! তাতে কী প্রমাণ হয়?

বাধা দিয়ে সুবীর বলে, সে বিশ্লেষণ থাক। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

—নিজের ঘরে। একটা ডিকেটিভ গল্প পড়ছিলাম। আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ'।

—অর্থাৎ আপনার কোন অ্যালেবাই নেই?

—আগাথা ক্রিস্টি আমার অ্যালেবাই!

অজয় চট্টোপাধ্যায় চটে উঠে বলেন, এই কি আপনার রসিকতা করবার সময়?

—কেন নয়? আমরা তো এসেছি বেড়াতে, ফূর্তি করতে, পাহাড় দেখতে, তাই নয়?

সুবীর অজয় বাবুকে প্রশ্ন করে, আপনি কোথায় ছিলেন?

—কে আমি?—সচকিত হয়ে ওঠেন অজয় চাটুজ্জে।তারপর সামলে নিয়ে বলেন, আমি ইয়ে, আহ্নিক করছিলাম।

—আহ্নিক! মানে?—প্রশ্ন করে সুবীর রায়।

আবার চটে ওঠেন অজয়বাবু: আপনি হিন্দুর ছেলে, তাই আহ্নিক বোঝেন না! আলি-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন, উনি বুঝিয়ে দেবেন সন্ধ্যাহ্নিক বলতে কী বোঝায়!

সুবীর এ বক্রোক্তি গলাধঃকরণ করে ডাক্তার সেনকে বলে, আপনি কী বলেন?

—ঐ সন্ধ্যাহ্নিক বিষয়ে?—জানতে চান ডক্টর সেন।

ধমক দিয়ে ওঠে সুবীর, আজ্ঞে না। আপনারা দুজন তখন কোথায় ছিলেন?

—তাস খেলছিলাম। উনি আর আমি। আমরা দুজন দুজনের অ্যালেবাই।

আলি হেসে ওঠে: অবজেকশান ইয়োর অনার! স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সাস্‌পেক্‌টেড। এক্ষেত্রে কি ওঁরা পরস্পরের অ্যালেবাই হতে পারেন?

মিসেস্ সেন চীৎকার করে ওঠেন, সাস্‌পেক্‌টেড মানে? হাউ ডেয়ার য়ু—

সুবীর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ব্যারিস্টার-সাহেব কাউকে কিছু প্রশ্ন করবেন?

বাসু-সাহেব বলেন, হ্যাঁ করব। তোমাকেই করব। আজ রাত্রে কি নৃপেন এখানে এসে পৌঁছতে পারবে?

—তাই তো আশা করছি।

—কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের বেহারা বীর বাহাদুরও কি আসবে?

—হ্যাঁ, আসবে। আমাদের মধ্যে ইব্রাহিম অথবা মিস্ ডিক্রুজা আছে কিনা সেটা আজ রাত্রেই জানা যাবে।—বলেই সুবীর একে একে সকলের দিকে তাকায়। এ ঘোষণায় শ্রোতৃবৃন্দের কার মুখে কী অভিব্যক্তি হচ্ছে জেনে নিতে চায়! তারপর সে আবার বলে, আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এবার আমার একটি প্রস্তাব আছে। আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। আশা করি সকলের সহযোগিতা পাব।

—কী জাতের পরীক্ষা?—জানতে চান অজয়বাবু।

জবাবে সুবীর বলে, একটা কথা তো মানবেন যে, আমাদের মধ্যে অন্তত একজন মিথ্যা কথা বলেছেন! ঘটনার মুহূর্তে তিনি বাস্তবে ছিলেন অরূপবাবুর পিছনে! তিনি কে, তা আমরা জানি না—কিন্তু জানতে চাই। তাই আমার প্রস্তাব—আজ রাত ঠিক সাড়ে আটটায় আমরা প্রত্যেকে গতকালকার পজিশানে ফিরে যাব। ড্রইংরুমের ঘড়িতে সাড়ে আটটার শব্দ হতেই রানী দেবী তাঁর ঘরে বসে ঐ গানটাই গাইবেন। আমরা এইমাত্র আমাদের জবানবন্দিতে যে কথা বলেছি ঠিক তাই তাই করে

যাব আটটা তেত্রিশ পর্যন্ত! ঠিক আটটা তেত্রিশে আমি ড্রইংরুমে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করব। আপনারা গতকালকের মত সবাই ছুটে আসবেন ড্রইংরুমে।

অজয়বাবু বলেন, তাতে কোন চতুর্বর্গলাভ হবে?

—যারা সত্য কথা বলেছে, তারা গতকালকার আচরণ অনুযায়ী আজকেও কাজ করে যেতে পারবে। কিন্তু যে মিথ্যা কথা বলেছে তার ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবেই। সে এমন একটা কিছু করে বসবে যাতে সে ধরা পড়ে যাবে। এটা ক্রাইম ডিটেকশানের একটি সাম্প্রতিক পদ্ধতি। অনেক সময়েই এতে সুফল পাওয়া গেছে। না কি বলেন, বাসু-সাহেব?

বাসু-সাহেব বলেন, হতে পারে। আমি ব্যাক-ডেটেড। আমি এ পদ্ধতির কথা শুনিনি।

আলি বলে ওঠে, আমি শুনেছি মিস্টার রায়, আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপে' ঠিক ঐ ধরনের একটা পরীক্ষার কথা আছে—

অজয়বাবু বলেন, দূর মশাই। তাই কি হয় নাকি? কাল যদি আমিই গুলি করে থাকি, তাহলে আজ কি আর সারা বাড়ি দাপাদাপি করে বেড়াবো? আজ তো গ্যাঁটসে নিজের ঘরে বসে সীতারাম জপ করব!

সুবীর বলে, তাই করবেন। তাহলে তো আপনার আপত্তি নেই?

কাবেরী বলে, তবু একটা তফাৎ হবে কিন্তু মিস্টার রায়। আজ আর গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজবে না।

—বাজবে!—সুবীর ওকে আশ্বস্ত করে।

—বাজবে? কেমন করে? কে বাজাবে আজ?

—আমি বাজাব! আমার ঘরে জলের কলটা খোলা থাকবে; কিন্তু আমি বাথরুমে থাকব না। আমি আজ অভিনয় করব অরূপরতনের চরিত্রটা। অর্থাৎ গান অন্তরায় পৌঁছালে আমি পিয়ানো বাজাতে শুরু করব। আপনি, রানী দেবী, গত কালকের মতই এক লাইন আমাকে 'সোলো' বাজাতে দেবেন। তারপর মিউজিকে যোগ দেবেন। কেমন?

আলি বললে, আপনি পিয়ানো বাজাতে জানেন?

—জানি।

—অত ভাল?

—রাত সাড়ে আটটায় এ প্রশ্নের জবাব পাবেন!

আলি বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে, বুঝেছি, মহাভারতে আছে আত্মশ্লাঘা আত্মহত্যার নামান্তর!

মিসেস সেন বলেন, আপনি কথায় কথায় মহাভারত পাড়েন কেন বলুন তো?

—মহাভারত আর রামায়ণ হচ্ছে আমার প্রিয় গ্রন্থ। আর বিভীষণ হচ্ছে আমার হীরো! মন্দোদরী বিভীষণকে নিকা করেছিল কি না ঠিক জানি না। সুজাতা দেবী বলতে পারবেন!

আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছে দেখে সুবীর বলে ওঠে, থ্যাঙ্ক ইউ অল। রাত আটটা হয়েছে। এবার তাহলে আমরা সবাই প্রস্তুত হই।

ডক্টর সেন বলেন, একটা কথা। আটটা তেত্রিশে ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ার শুনে আমরা সবাই ছুটে আসব। তারপর?

সুবীর জবাবে বলে, তার পরেও আপনারা কালকের আচরণ করে যাবেন। আপনারা এসে দেখবেন—আমি ঠিক ঐখানে উবুড় হয়ে পড়ে আছি। অর্থাৎ আমিই যেন অরূপবাবু। আপনি, ডক্টর সেন আমাকে পরীক্ষা করে বলবেন—থ্যাঙ্ক গড! গুলিটা কাঁধে লেগেছে! ফেটাল নয়!

ডক্টর সেন গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়লেন।

—কিন্তু একটা কথা!—সতর্ক করে দেয় সুবীর—কোন কারণেই আজ ঐ তিন মিনিটের জন্য আপনারা অন্য রকম আচরণ করবেন না। ঠিক কাল যা করেছেন, তাই করবেন। অন্যরকম আচরণ

করতে বাধ্য হবে অবশ্য ক্রিমিনাল নিজে!

মিসেস সেন হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠেন: গ্র্যান্ড আইডিয়া! খেলাটা জমবে! ঠিক পার্টিতে যেমন হয়।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

রাত আটটা পঁচিশ।

বাসু-সাহেব রিভলবারটা নিয়ে উত্তরের বারান্দায় চলে গেলেন। বসলেন গিয়ে ইজিচেয়ারে। অরূপ অঘোরে ঘুমাচ্ছে। রানী দেবী তাঁর হুইল চেয়ারে বসে আছেন জানলার দিকে মুখ করে—উৎকর্ণ হয়ে আছেন, কখন ঢং করে বেজে উঠবে হলঘরের দেওয়াল ঘড়িটা।

কৌশিক টর্চ নিয়ে মই বেয়ে ছাদে উঠে গেল। আলি-সাহেব পড়া বইয়ের শেষ-কটা পাতা আবার পড়তে বসেছেন। কাবেরী উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে তার বিছানায়—কখন শুরু হয় গান। সুজাতা রান্নাঘরে। ডক্টর সেন বললেন, কাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় তুমি ডীল করছিলে, তাসটা ধর।

অজয় চাটুজ্জে আহ্নিকে বসেছেন। অন্তত আজকের রাতে।

আটটা আঠাশ। সুবীর রায়ের বাথরুমে কলের জল পড়তে শুরু করল।

দু-নম্বর ঘর।

রানী দেবী নিজের মণিবন্ধে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন: আটটা উনত্রিশ।

খুট করে শব্দ হল পিছনে। রানী হুইলড চেয়ারটা ঘুরিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ওঁর থেকে হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুবীর রায়।

—কী ব্যাপার? আপনি?

—আপনাকে আর গান গাইতে হবে না মিসেস বাসু!

—হবে না! সেকি? বাড়িশুদ্ধ সবাই যে আমার গান শুনতে—

—আপনার গান নয়, ওঁরা উদগ্রীব হয়ে আছেন সত্যিকারের রানী দেবীর গান শুনতে।

—মানে?

—মানে এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সহদেব হুই কে তা জানা গেছে!

—আপনি জানেন!

—জানি! আপনিও এখনই জানবেন—

দো-তলায় সাত নম্বর ঘর।

কাবেরী বসেছিল খাটে। শুনল শুরু হয়ে গেল:

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতেম।"

এক লাইন গান হতেই ঢং করে সাড়ে আটটা বাজল। রানী দেবী কয়েক সেকেন্ড আগেই শুরু করেছেন তাহলে। শুরু হতেই বেজে উঠল পিয়ানো। কালকের মতই রানী দেবী চুপ করে গেলেন। এক লাইন শুধু পিয়ানো বেজে গেল। তারপর শুরু হল যৌথসঙ্গীত। কণ্ঠসঙ্গীত আর যন্ত্রসঙ্গীত। কাবেরী খাট থেকে নামল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। ঠিক কালকের মত রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। গান তখন পৌঁছেছে সঞ্চারীতে:

"এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধরে,
ভুবন ভরে আছে যেন, পাইনে জীবন ভরে।।"

হঠাৎ সচকিত হয়ে কাবেরী লক্ষ্য করে বিদ্যুৎগতিতে মই বেয়ে নেমে আসছে কৌশিক। দ্বিতলে সে মুহূর্তের জন্যও দাঁড়ালো না, কালকের মত। যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করেছে উদ্যত-পিস্তল এক খুনী আসামী। প্রাণপণে সে ছুটে নেমে গেল একতলায়। কী ব্যাপার! কৌশিক তো নিয়ম মানছে না।

গতকালকার আচরণের পুনরভিনয় তো সে করল না! চকিতে কাবেরীর মনে হল তবে কি কৌশিক—

কৌশিকের দোষ নেই। বেচারি নির্দেশমত মই বেয়ে ছাদে উঠে গিয়েছিল ঠিকই! কিন্তু গান শুরু হতেই ওর কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। ওর মনে হল ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত সেই 'এক: দুই: তিন' লেখা কাগজখানার কথা। ওর মনে হল—আততায়ী কাল যে সুযোগ পেয়েছিল ঠিক সেই সুযোগ ওরা যৌথভাবে তাকে পাইয়ে দিচ্ছে! হুবহু এক পরিবেশ! খুনীটা কি এই সুযোগ নেবে না? যদি নেয়? কে তার তিন নম্বর টার্গেট?

ভেসে আসছে অস্ফুট সঙ্গীত:

"কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে ফিরি আমি কাহার পিছে
সব কিছু মোর বিকিয়েছে, পাইনি তাহার দাম।।"

কৌশিকের মনে হল এই মুহূর্তেই বুঝি তার সব কিছু বিকিয়ে যেতে বসেছে! হয়তো এতক্ষণে খুনীটা কিচেন-ব্লকে ঢুকে—!

সব কিছু ভুল হয়ে গেল কৌশিকের! সে বিদ্যুৎবেগে নেমে এল একতলায়!

আবার ঐ দু-নম্বর ঘর। রানী দেবী আর সুবীর রায়। মুখোমুখি। রানী রীতিমত আতঙ্কতাড়িত। বলছে, এসব কী বলছেন আপনি! আমি...আমি কী দোষ করলাম?

নেপথ্যে তখন শোনা যাচ্ছে গান এবং যন্ত্রসঙ্গীত।

সুবীর বললে, দোষ করেছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু! প্রায়শ্চিত্ত করবেন তাঁর স্ত্রী! আপনি!

পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করল সুবীর।

রানী আর্তনাদ করতে গেলেন। স্বর ফুটল না তাঁর কণ্ঠে।

কিচেন-ব্লকটা অন্ধকার। মোমবাতি নিবে গেছে ঝোড়ো হাওয়ায়। কৌশিক টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখল। সুজাতা কোথাও নেই। অস্ফুটে একবার ডাকল, সুজাতা!

কেউ সাড়া দিল না।

কৌশিক ঘুরে দাঁড়ায়। ছুটে বেরিয়ে আসে দক্ষিণের বারান্দায়।পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ে ডাইনিং রুমে। সেখানেও কেউ নেই—কিন্তু ও কী! পিয়ানোর টুলে তো সুবীর রায় বসে নেই। অথচ কী আশ্চর্য! গান হচ্ছে! পিয়ানো বাজছে! যন্ত্রসঙ্গীত আর কণ্ঠসঙ্গীত যৌথভাবে ফিরে এসেছে স্থায়ীতে:

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা—"

হঠাৎ কে যেন স্পর্শ করল ওর বাহুমূল। চমকে উঠল কৌশিক। দেখে সুজাতা। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সুজাতা ওর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করছে। কৌশিক ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসে। চার-নম্বর ঘরের পর্দা সরিয়ে সুজাতা প্রবেশ করল সুবীর রায়ের ঘরে। কৌশিক তার পিছন পিছন। ঘর নীরন্ধ্র অন্ধকার—কিন্তু সেই ঘরই হচ্ছে সঙ্গীতের উৎস। টর্চ জ্বালল সুজাতা:

টেবিলের উপর একটা ব্যাটারি-সেট টেপ-রেকর্ডার চক্রাবর্তনের পথে গাইছে: "—তোমায় জানাতেম!

কে যে আমায় কাঁদায় আমি কি জানি তার নাম।।"

কৌশিক সুজাতার বাহুমূল ধরে এবার টানে। বলে, কুইক!

—কী?

—বাসু-সাহেব অথবা রানী দেবী!

ওরা ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়। ঠিক তখনই হল একটা ফায়ারিঙের শব্দ! ঠিক পাশের ঘর থেকে। কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে। গুলিটা যেন তারই পাঁজরে বিঁধেছে।

সুজাতা শুধু বললে, সব শেষ হয়ে গেল!

গুলির শব্দ শুনে সকলেই নেমে এসেছে। ডক্টর আর মিসেস সেন, কাবেরী, আলি আর অজয়বাবু প্রায় একই সঙ্গে প্রবেশ করলেন ডাইনিং রুম পার হয়ে ড্রইংরুমে। আলি টর্চ জ্বাললেন। আশ্চর্য! পিয়ানোর টুলে কেউ নেই। ভূতলেও নেই!

ঠিক তখনই চার-নম্বর ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল কৌশিক আর সুজাতা। কৌশিক বললে, কুইক! আসুন আপনারা—

ওরা হুড়মুড়িয়ে বার হয়ে এল উত্তরের বারান্দায়। টর্চের আলো পড়ল বাসু-সাহেবের চিহ্নিত ইজিচেয়ারে। সেটা ফাঁকা। এবার ওরা সদলবলে ঢুকে পড়ে বাসু-সাহেবের ঘরে।

ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই লাইট কানেকশানটা ফিরে এল। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল 'দ্য রিপোস'।

অল্পপরতন শুয়েছিল বাসু-সাহেবের খাটে। বালিশে ভর দিয়ে মাথাটা তুলেছে সে। দু-হাতে মুখ ঢেকে রানী দেবী নিথর হয়ে বসে আছেন তাঁর চাকা দেওয়া চেয়ারে! ড্রেসিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলভার।

আর মেজেতে লোটাচ্ছে সুবীর রায়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে।

হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েন ডাক্তার সেন। পরমুহূর্তেই মুখ তুলে বলেন, থ্যাঙ্ক গড! গুলিটা পেলভিক বোনে লেগেছে। ফেটাল নয়!

গতকালকার উক্তির সজ্ঞান অভিনয় নয়। অরিজিনাল ডায়ালগ!

সুবীরের জ্ঞান ছিল। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছে।

কৌশিক সবিস্ময়ে বাসু-সাহেবকে বলে, কী ব্যাপার?

বাসু-সাহেব গম্ভীরমুখে বলেন, আস্ক সহদেব!

—সহদেব! মানে?

রিভলভারটা দিয়ে ভূলুণ্ঠিত সুবীর রায়কে নির্দেশ করে বাসু বলেন, সহদেব দুই! আর্চ-গ্যাংস্টার, বাফেলো, ম্যারিকা!

আট

অক্টোবরের পাঁচ তারিখ, শনিবার।

ঝলমলে রোদ উঠেছে আজ। মেঘ সরে গেছে। গাঁইতা আর কোদাল নিয়ে গ্যাংকুলিরা নেমেছে কার্ট-রোড মেরামত করতে। উৎপাটিত টেলিগ্রাফ পোল আবার মাথা তুলে খাড়া হচ্ছে। মিলিটারি জীপ নাচতে নাচতে চলতে শুরু করেছে, গর্তে-ভরা কার্ট-রোড দিয়ে অনেক কষ্টে অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান এসে নিয়ে গেছে দু-জন আহত মানুষকে রিপোস থেকে হাসপাতালে।

আজ মেঘভাঙা সকালে সবাই আবার গোল হয়ে বসেছে ড্রইং রুমে। বাসু-সাহেবকে ঘিরে। পরিচিত দলের মধ্যে যোগ হয়েছে একটি নতুন মুখ—দার্জিলিঙ থানার ও. সি. নৃপেন ঘোষাল। সে কোন টেলিফোন পেয়ে আসেনি। রাস্তায় জীপ চলতে শুরু করা মাত্র নৃপেন চলে এসেছিল ঘুমে। খবর নিতে, রিপোসে অবস্থা! নৃপেন প্রশ্ন করে, আপনি স্যার ঠিক কখন বুঝতে পারলেন?

—একেবারে প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্তেই!

—প্রথম সাক্ষাতেই!—চমকে উঠে কৌশিক: কেমন করে?

—মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছিল সুবীর, আই মীন সহদেব। দোশরা তারিখে রাত এগারোটায় নিজেই ফোন করে তোমাদের বলেছিল—'আমি নৃপেন ঘোষাল, ও. সি. দার্জিলিঙ বলছি।' তারপর মধ্যরাত্রে এখানে আসবার আগে সে বাড়ির বাইরে টেলিফোনের লাইনটা ছিঁড়ে ফেলে, যাতে

www.boiRboi.blogspot.com

আমরা আর থানার সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারি।

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, সে তো বুঝলাম; কিন্তু আপনি কেমন করে বুঝলেন—ও জাল?

—বলছি। পরদিন সকালে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। প্রথম সাক্ষাতেই আমি ইব্রাহিমের সেই 'এক : দুই : তিন' লেখা কাগজটার প্রসঙ্গ তুললাম। সুবীরবেশী সহদেব তখন একটা দুঃসাহসের দেখিয়ে বসে। ও চেয়েছিল আমাদের, মানে তোমাদের ভয় দেখাতে। ভয়ে নার্ভাস করে দিতে। বেড়াল যেমন খেলিয়ে নিয়ে ইঁদুরছানাকে মারে! তাই সে ঐ 'এক : দুই :তিন' লেখা কাগজখানা তোমাদের দেখাতে চাইল। আগেথেকেই সেটা ও নতুন করে লিখে এনেছিল। ও তাই কাগজখানা সকলকে দেখাবার লোভ সামলাতে পারল না। হয়তো ও আমাকে ঐভাবে ঠকাতে চেয়েছিল। পাছে আমি ওর আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাই, তাই ওভাবে ওর অভিজ্ঞানঅঙ্গুরীয় মেলে ধরেছিল আমার কাছে—প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, ও নৃপেনের কাছ থেকে আসছে। আর তাতেই ও ধরা পড়ে গেল।

সুজাতা বলে, কেমন করে? কাগজখানা তো আমরাও দেখেছি—

—দেখেছ। কিন্তু তোমরা দেখেছ মাত্র একবার। আমি দেখেছি দুবার। আমার ক্রিমিনাল লইয়ারের চোখ ভুল করেনি। কাগজখানা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম—ওই লোকটাই সহদেব! ও নৃপেনের সহকারী সুবীর রায় নয়!

—কেমন করে?

—নৃপেন যে কাগজটা দেখিয়েছিল সেখানা আর এই কাগজটা হুবহু এক। দুটোই চব্বিশ পাউন্ডের ব্যাঙ্ক পেপার, একই কালো কালি, একই হস্তাক্ষর, একইভাবে উপর দিকে পারফোরেটেড এবং ডান কোনায় ছেঁড়া। তবু একটি অতি সূক্ষ্ম তফাৎ ছিল। প্রথমবার 'দার্জিলিঙ' শব্দটার শেষ অক্ষরটা ছিল 'ঙ'; দ্বিতীয়বার 'ং'। ব্যস! চূড়ান্ত ভাবে ধরা পড়ে গেল সহদেব।

সুজাতা আবার বলে, কিন্তু কেমন করে?

—বুঝলে না 'ঙ' মুছে গিয়ে 'ং' এল কেমন করে? ফলে এখানা নতুন করে লেখা। কে লিখেছে? নিঃসন্দেহে যে সেটা দাখিল করছে। কিন্তু দুটি কাগজের হস্তাক্ষর এক হয় কী করে? অর্থাৎ ঐ লোকটাই আবার ইব্রাহিম—যে লোকটা পয়লা তারিখ কয়েক মিনিটের জন্য ঐ মাস্টার কী দিয়ে তেইশ নম্বর ঘরে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছিল! রানু, তোমার মনে আছে আমি তখনই বলেছিলাম সহদেবকে আমি চিনতে পেরেছি, কিন্তু প্রমাণ এমন পাক্কা নয় যাতে খুনী আসামীর কনভিক্শান হতে পারে।

মিসেস সেন বলেন, ঈস! তাই সব জেনে-শুনে আপনি ঘাপটি মেরে বসেছিলেন?

—ইয়েস ম্যাডাম! তাই সব জেনে-শুনে আমি ঘাপটি মেরে বসেছিলাম। কিন্তু আমার ভুল কোথায় হল জান? আমি ভেবেছিলাম—আমিই ওর সেকেন্ড টার্গেট। অরূপ নয়। ওখানেই সে আমাকে টেক্কা মেরেছে। কিন্তু তৃতীয়বার আমি আর ভুল করিনি, বুঝতে পেরেছিলাম—এবার ওর টার্গেট হচ্ছে রানু।

কাবেরী প্রশ্ন করে, কেন? মিসেস বাসু কেন?

—কারণ সহদেব জানত আমি সশস্ত্র আছি। ও বুঝতে পেরেছিল, আমি ওর নাগালের বাইরে, গুলি করতে গেলে গুলি খেতে হতে পারে! তাছাড়া ও জানত রানুর মৃত্যু আমার কাছে মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক হবে, কারণ—

—কারণ?—সুজাতা জানতে চায়।

বাসু-সাহেব রানীর দিকে ফিরে বলেন, সবার সামনে বলব?

হতচকিত হয়ে রানী বলেন, কী?

—রানুকে আমি ভীষণ ভালবাসি!

সবাই হেসে ওঠে ওঁর ভঙ্গিতে। মিসেস বাসুও রাঙিয়ে ওঠেন। বলেন, ছাই বাস! আচ্ছা ঐ লোকটা যখন আমাকে বলছিল যে, সে আমাকে খুন করতে চায় তখন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি কী করে চুপ করে ছিলে! তুমি পারলে ঐ খুনীটার সামনে আমাকে ওভাবে বসিয়ে রাখতে?

বাসু-সাহেব মুখটা সূচালো করেন। নীরবে মাথাটা নাড়েন সম্মতিসূচকভাবে।

—তোমার একটুও মায়া হল না?

—কই আর হল রানু? মিস্ ডিক্রুজাকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ওর নিজ মুখে কনফেশান। সেটা তোমার কাছে স্বীকার করার আগে কি আর ওকে নিরস্ত্র করতে পারি? যতই কেন না ভালবাসি তোমাকে—আমি যে ক্রিমিনাল লইয়ার!

কৌশিক জানতে চায়, আচ্ছা সহদেবের প্ল্যানটা কী ছিল?

—এখনও বুঝতে পারনি? রানী প্রথমবার যখন গানটা গায় তখন সহদেব ছিল তার নিজের ঘরে। চট করে সে গানটা টেপ রেকর্ড করতে শুরু করে। তখনও ওর তৃতীয় এমনকি দ্বিতীয় খুনের পরিকল্পনাও করা ছিল না। গানটা রেকর্ড করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনমত আমাদের ভবিষ্যতে বিভ্রান্ত করা। মিনিটখানেক পরেই সহদেব শোনে অরূপ এসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। মুহূর্তমধ্যে সে মনস্থির করে—বাথরুমের কলটা খুলে দেয় এবং অরূপকে গুলি করে বাথরুমে ঢুকে যায়। তারপর ধীরে-সুস্থে সে তৃতীয় খুনের পরিকল্পনা করে। ও চেয়েছিল—দ্বিতীয়বার রানীর গান টেপ-রেকর্ডে "তোমায় জানাতেম" শব্দটায় পৌঁছানোমাত্র সে রানীকে গুলি করে ছুটে বেরিয়ে যাবে ড্রইংরুমে। ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে পিয়ানোর টুলটা ফুট চারেক দূরে, পাশের ঘরে। তোমরা এসে ওকে দেখতে পেতে ড্রইংরুমে পড়ে থাকতে। পরে রানীর মৃত্যুর তদন্ত যখন হত তখন ওর মোক্ষম অ্যালেবাই থাকত পিয়ানোর শব্দ। রানী যে আদৌ গায়নি আর ও বাজায়নি তা কেউ কোনদিন জানতে পারত না—একমাত্র রানীই হতে পারত সে ঘটনার সাক্ষী; কিন্তু তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত যখন হত তখন রানীর এজাহার আর নেওয়া যেত না—

নৃপেন বলে, কিন্তু ওর টেপ রেকর্ডার আর ডিসচার্জড রিভলভারটা তো আমরা তদন্তের সময় খুঁজে পেতাম। ও যে আদৌ পিয়ানো বাজাতে জানে না এটা প্রমাণ করতাম!

—না, দারোগা-সাহেব, তা পেতে না! ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী পেতে না। সে রাত দশটার মধ্যেই 'থানায় যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে যেত। তাকে আমরা সবাই পুলিস-অফিসার বলে মেনে নিয়েছিলাম—ফলে আমরা তাতে আপত্তি করতাম না। সহদেব অনায়াসে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত!

কাবেরী বলে, উঃ! কী ভীষণ!

বাসু-সাহেব বলেন, তুমিই কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছ কাবেরী!

—আমি! ওমা, কেন! কী করে?

—কার্শিয়াঙে তোমার বান্ধবী অথবা বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করে!

কাবেরী অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষে সামলে নিয়ে বলে, আপনি কেমন করে জানলেন?

—জানি না। আন্দাজ করছি। তুমি নিজেই সুজাতাকে বলেছিলে যে, কার্শিয়াঙে তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে 'বন্ধুস্থানীয় একজনের' কাছে। রাত থাকতেই বাসিমুখে কেউ বন্ধুস্থানীয় লোকের বাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়ে বের হয় না। তাই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—একটা রাগারাগি নিশ্চয় হয়েছিল। অবশ্য 'রাগ' শব্দটা বাঙলা না সংস্কৃতে সেটা হলপ করে বলতে পারব না। ওটা 'অভিমান'ও হতে পারে। তিনি 'বান্ধবী' না 'বন্ধু' তা জানা না থাকায় সঠিক কনক্লুশনে আসা যাচ্ছে না—

কাবেরী একেবারে লাল হয়ে যায়।

বাসু-সাহেব তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে বলেন, তাছাড়া এখানে ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার সময় নিজের ঘরটা তালাবন্ধ না করেও তুমি ব্যাপারটা গুলিয়ে তুলেছ। তুমি জান না—তোমার ঘরে অ্যাশট্রের ভিতর সহদেব ক্রমাগত ফিল্টার টিপড সিগারেটের স্টাম্প ফেলে গেছে?

—সে কী! কেন?

—যাতে তোমাকে মিস্ ডিক্রুজা বলে আমি ভুল করি।

—আপনি আমাকে তাই ভেবেছিলেন?

—না ভাবিনি। অরূপ তোমাকে চার্চে দেখা একটি ক্রিশ্চিয়ান মেয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায় একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম অবশ্য—কিন্তু ক্রমশঃ আমি বুঝতে পারলাম সহদেব নিজেই লুকিয়ে ঐ সিগারেটের স্টাম্প ফেলে আসছে। তাই সহদেবকে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমি ওর ফাঁদে পা দিয়েছি। তাকে তাই বলেছিলাম—মিস্ ডিক্রুজাকেও আমি সনাক্ত করেছি এই হোটেলে!

নৃপেন বলে, মিস্ ডিক্রুজা তাহলে নিরপরাধ?

—একটা অপরাধ সে করেছে। মেয়েটা ছিল কল কার্ল। রমেনের সঙ্গে তার একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই রমেন তোমার বাড়িতে রাতে থাকতে রাজী হয়নি। পয়লা তারিখ গভীর রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে মেয়েটা রমেনের ঘরে ঢোকে। হয়তো অনেকক্ষণ বসেও ছিল। সিগ্রেট যে খেয়েছিল তার প্রমাণই তো আছে। হয়তো তার চোখের সামনেই মদ্যপান করতে গিয়ে রমেন গুহ মারা যায়। মিস ডিক্রুজার একমাত্র অপরাধ তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর না দিয়ে সে রাত ভোর হতেই পালিয়ে যায়।

নৃপেন গম্ভীরভাবে বলে, গুরুতর অপরাধ!

বাসু-সাহেব বলেন, কিন্তু তার অবস্থাটাও বোঝ! বেচারি ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে ঘরে ঢুকেছে—খুনের দায়ে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ত। তাছাড়া অমন মেয়ে নিশ্চিত মদ খায়—হয়তো একচুলের জন্য সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে—যাকে বলে slip between the cup and the lip!

অধিবেশন ভঙ্গ হলে নৃপেন বাসু-সাহেবকে জনান্তিকে বলে, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট-কথা ছিল স্যার—

বাসু-সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, মনে আছে! আমি বলব!

নৃপেন অবাক হয়ে বলে, মানে! কাকে কী বলবেন?

—বিপুলকে তোমার সাবস্টিটুটের কথা তো? বলব আমি!

—নৃপেন যেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে এসেছে! লোকটা কি অন্তর্যামী!

ঘন্টাখানেক পরে।

সুজাতা কিচেনে ব্যস্ত। আজ পোলাও হবে! জবর খানার আয়োজন। কৌশিক নিঃশব্দে প্রবেশ করল পিছন থেকে। সুজাতা তখন কাজ করতে করতে গুনগুন করে তান ভাঁজছিল: মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি—

—এতক্ষণে গান বেরিয়েছে গলায়?

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় সুজাতা। বলে, ও তুমি! আমি ভেবেছি—বিভীষণ!

—বিভীষণ!

সে কথার জবাব না দিয়ে সুজাতা ঘনিয়ে আসে। বলে, এই! আজ না পাঁচুই অক্টোবর?

—হুঁ! তাই কি?

—বা-রে আমার সেই সোনার কাঁটাটা?

—ও আয়াম সরি। ওটা আমার পকেটেই রয়ে গেছে, নয়?

কৌশিক পকেট থেকে বার করে গহনার বাক্সটা। □

মাছের কাঁটা
রচনাকাল: 1974
প্রথম প্রকাশ: মার্চ 1975
প্রচ্ছদশিল্পী: খালেদ চৌধুরী
উৎসর্গ: শ্রী সমরজিৎ গুপ্ত

"মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্তে বলে উঠলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' যার দ্বারা আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কী করব।... উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রী-কণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায়নি—সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম, এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে...."

হঠাৎ রবীন্দ্র রচনাবলীটা বন্ধ করে বাসু-সাহেব তাঁর একক শ্রোতার দিকে তাকিয়ে দেখেন। দেখেন, রানী দেবী তাঁর হুইল-চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন। চোখ দুটি বোজা।

—ঘুম পাচ্ছে?—প্রশ্ন করলেন বাসু-সাহেব।

চমকে উঠে রানী দেবী বললেন, না, শুনছি, পড় তুমি—

—ভাল লাগছ না, নয়?

ম্লান হাসলেন রানী দেবী। মাথাটা নেড়ে সত্যি কথা স্বীকার করলেন।

—তবে থাক! এস কিছু গান শোনা যাক। বল, কী বাজাব?

উঠে গেলেন রেডিওগ্রামের দিকে।

—গান থাক। তুমি এখানে এসে বস তো। কয়েকটা কথা বলার ছিল।

সন্দিগ্ধ চোখে বাসু-সাহেব তাকিয়ে দেখলেন একবার স্ত্রীর দিকে। এসে বসলেন তাঁর পরিত্যক্ত চেয়ারে ঃ বল?

—দেখ, আমাদের যা গেছে তা আর কোনদিন ফিরবে না। আমি না হয় পঙ্গু হয়ে পড়েছি, তুমি তো

হওনি! তুমি কেন এভাবে জীবনটাকে বরবাদ করছ?

বাসু-সাহেব নিরুত্তর স্তব্ধতায় বসে থাকেন। পাইপটা পর্যন্ত জ্বালেন না। একটা দম নিয়ে মিসেস বাসু বলেন, তুমি আবার প্র্যাক্‌টিস শুরু কর।

হঠাৎ কৃত্রিম হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন পি.কে.বাসু। পাইপটা ধরাতে ধরাতে বলেন, এই কথা! আমি ভাবছি, না জানি কোন সিরিয়াস্ প্রসঙ্গ তুললে তুমি।

মিসেস বাসু জবাব দিলেন না। বাসু মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলেন, বললেন, কী হল আবার?

—আমি সিরিয়াসলিই কথাটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে থাক—হুইল-চেয়ারের চাকাটায় পাক মারতে যান। বাসু হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন তাঁকে। বলেন, কী বলছ রানু! তা কি হয়?

—কেন হবে না? মাইথনে সেদিন মিঠুর সঙ্গে যদি তার মা-ও মারা যেত তাহলে তুমি এমন করতে পারতে? এমন সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত...না, না, আমাকে বলতে দাও, প্লীজ,আমি সেন্টিমেন্টাল কথা বলব না, প্র্যাক্‌টিকাল কথাই বলব।

বাসু পাইপটা কামড়ে ধরে বলেন, বেশ বল।

—আমি কী বলব? এবার তো তোমার বলার কথা। কেন প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দেবে তুমি?

—কী হবে প্র্যাকটিস্ করে, রানু? টাকা আমাদের যা আছে, দুজনের দুটো জীবন কেটে যাবে। নাম-ডাক? ও নিয়ে কোন মোহ আমার নেই। তা-ছাড়া এই অবস্থায় তোমাকে একলা বাড়িতে ফেলে রেখে আমি কোর্ট-কাছারি করতে পারি?

—না, টাকার জন্যে নয়। নাম-ডাকও নয়—কিন্তু তোমার শিরদাঁড়াটা যে ভাঙেনি এটা আমাকে বুঝে নিতে দাও!... তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছ। তোমার কি বিশ্বাস চোখের উপর এটা প্রতিনিয়ত দেখেও আমি মনে শান্তি পেতে পারি?

এবার আর রসিকতা করলেন না বাসু-সাহেব। বললেন, কথাটা যখন তুললে রানু, তখন খোলাখুলিই বলি। কথাটা আমিও ভেবেছি। তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে। 'নেগেশান' দিয়ে অত বড় ফাঁকটা ভরিয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের বাঁচতে হবে। এভাবে নয়—বই পড়ে, গান শুনে, দাবা খেলে—মানে জীবনকে অস্বীকার করে নয়। কাজের মাধ্যমেই আমরা অতীতকে ভুলতে পারব—'আমরা' মানে আমি আর তুমি! কিন্তু সে জীবন-সঙ্গীতে ঐকতান চাই। রেজনেন্স হওয়া চাই। তুমি গাইবে, আমি শুনব, আমি বাজাব, তুমি শুনবে—তা নয়। পারবে?

—তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও! তুমি তো জান আমার কতটুকু শক্তি।

—জানি! কিন্তু তোমার মনে কতখানি জোর তাও আমি জানি! বেশ সেই পথেই চিন্তা করি। দু-চারদিন পরে তোমাকে জানাব। কিছু একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

—নিশ্চয়ই খুঁজে পাব আমরা।

ব্যারিস্টার পি.কে.বাসুকে যাঁরা চেনেন না তাঁদের জন্য কিছু পূর্বকথন দরকার। এখন ওঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এককালে দুর্ধর্ষ প্র্যাকটিস্ ছিল ওঁর। কলকাতার বারে সবচেয়ে নামকরা ক্রিমিনাল লইয়ার। কোর্ট, বার অ্যাসোসিয়েশান, ক্লাব, টেনিস এই নিয়ে ছিল তাঁর জীবন। সহধর্মিণী রানী বাসুও স্বনামধন্যা। গানের আসরে শৌখীন গাইয়ে হিসাবে তাঁর ছোটাছুটিরও অন্ত ছিল না। রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত মাসে পাঁচ-সাতখানা তাঁকে গাইতেই হত। অ্যাপয়েন্টমেন্টে ঠাসা থাকত কর্তা-গিন্নির দিনপঞ্জিকা।

তারপর একদিন। একটি খণ্ডমুহূর্তে একেবারে বদলে গেল সব। মাইথনে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওঁরা। কর্তা-গিন্নি আর ওঁদের দশ বছরের একমাত্র মেয়ে সুবর্ণ বা মিঠু। পথ-দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মিঠু শেষ হয়ে গেল। বাসু-সাহেব বেঁচে ফিরে এলেন প্রায় অক্ষত, আর তিন মাস পরে যখন মিসেস বাসু

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এলেন তখন জানা গেল, তাঁর মেরুদণ্ডের একটি অস্থি কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি আর কোনোদিন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। সন্তানের জননী হতে পারবেন না।

প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছিলেন বাসু-সাহেব। স্ত্রীকে সাহচর্য দেওয়াই হল এর পর থেকে তাঁর দৈনন্দিন কাজ। অদ্ভুত আমুদে লোক—প্রথম পরিচয়ে কেউ বুঝতেই পারত না—ওঁর জীবনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এতবড় একটা ট্র্যাজেডি। পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন এখানে-ওখানে। রানী দেবীকেও হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না তিনি উত্থানশক্তি-রহিত—কিন্তু তাঁর মুখখানা বিষাদ মাখানো।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও না কি ধান ভানে। এই ধুরন্ধর প্রতিভাশালী ক্রিমিনাল লইয়ারটিও নাকি তেমনি বেড়াতে গিয়েও তাঁর পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন দু-একবার। আগরওয়াল ইন্ডাষ্ট্রিজের মালিক ময়ূরকেতন আগরওয়ালের মৃত্যু-রহস্যের কথা হয়তো কেউ কেউ শুনে থাকবেন। সেখানে ঐ খুনের মামলায় সুজাতা চট্টোপাধ্যায় আর কৌশিক মিত্র নামে দুজন জড়িয়ে পড়েছিল। বাসু-সাহেব তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে ঐ দুজনকেই সে মামলা থেকে উদ্ধার করে আনেন। এসব খবর একদিন খবরের কাগজে ফলাও করে বার হয়েছিল তা হয়তো আপনাদের নজরে পড়েছে। তারপরেও আরেকটি খুনের কিনারা তিনি করেছিলেন দার্জিলিঙের এক হোটেলে। হোটেলটার নাম 'দ্য রিপোজ'—সদ্য খোলা হয়েছিল। বস্তুত ঐ হোটেল খোলার উদ্বোধনের দিনেই অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে। হোটেলের মালিক ঐ সুজাতাই—সুজাতা চট্টোপাধ্যায় নয়, সুজাতা মিত্র। ইতিমধ্যে কৌশিক মিত্রকে সে বিয়ে করেছে। সুজাতার বাবা নাকি কী একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। সেসব এঞ্জিনিয়ারিং ঘটঘট ব্যাপার! আমার ঠিক মনে নেই; মোটকথা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সেই আবিষ্কারের পেটেন্টটা বেচে সুজাতা লাখ-দেড়েক টাকা পায়। সেই টাকাতেই হোটেল-বিজনেস্ শুরু করেছিল ওরা স্বামী-স্ত্রী। বাসু-সাহেব আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে হোটেলের উদ্বোধনের দিন ওখানে যান। হোটেলে থাকতেই ঐ খুনের কিনারা করেন। শুনেছি, সেই ঘটনাটার উপর ভিত্তি করে একটি গল্পের বইও লেখা হয়েছে—তার নাম "সোনার কাঁটা"।

যাক্ ওসব অবান্তর কথা। যে কথা বলছিলাম। স্বামী-স্ত্রীর ঐ কথোপকথনের পর থেকেই বাসু-সাহেব ভাবছিলেন কী করে নতুনভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করা যায়। উত্থানশক্তিরহিতা স্ত্রীকে জড়িয়ে কেমন করে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়া যায়। ঠিক এমনই সময়ে ওঁদের বাড়িতে এসে দেখা করল কৌশিক আর সুজাতা। বাসু-সাহেবের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। বাসু-সাহেব ওদের আপ্যায়ন করে বসালেন। সুজাতা আর কৌশিক দুজনেই ওঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন। খুশিয়াল হয়ে ওঠেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বলেন, খুব খুশি হয়েছি তোমরা দেখা করতে আসায়। কবে এসেছ দার্জিলিঙ থেকে? হোটেল কেমন চলছে?

সে কথার জবাব না দিয়ে সুজাতা বলে, রানু-মামীমা কোথায়?

বাসু-সাহেব আসলে বিপুল ঘোষ, আই.এ.এস.-এর মামাশ্বশুর। সেই সূত্রে সকলে তাঁকে 'মামু' বলে ডাকত। বিপুল ঘোষ ছিলেন ডি. এম.। যে জেলা-সদরে কৌশিক আর সুজাতার সঙ্গে তাঁর আলাপ সেখানকার অফিসার্স ক্লাবে বাসু-সাহেব হয়ে পড়েছিলেন সার্বজনীন মামু। সেই সুবাদেই কৌশিক-সুজাতা ওঁকে 'বাসুমামা' বলে ডাকে।

বাসু-সাহেব বলেন, আছে ভিতরে। খবর পাঠাচ্ছি, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। হোটেল রিপোজ্ কেমন চলছে? এবার গ্রীষ্মকালে ওখানে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসব ভাবছি। এবার কিন্তু গেস্ট হিসাবে নয়, রেগুলার বোর্ডার হিসাবে

কৌশিক বললে, আমরা দুঃখিত বাসুমামু। আমাদের হোটেলে আপনার ঠাঁই হবে না। অন্য কোন হোটেল বুক করুন।

হো হো করে হেসে ওঠেন পি.কে.বাসু। বলেন, ওরে বাবা! এত রাগ! পয়সা দিয়ে থাকব বলায়? একেবারে—'ঠাঁই হবে না?'

কৌশিক বললে, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। শুধু সেজন্য নয়। হোটেলটা আমরা বিক্রি করে দিয়েছি।

—বিক্রি করে দিয়েছ! সে কি গো! কেন?

—চলছিল না। পুজোর সময় কিছুদিন, আর গরমের সময় কয়েক সপ্তাহ—ব্যস্! বাকি সাত-আট মাস তীর্থের কাকের মত হাপিত্যেস করে বসে থাকা। সবচেয়ে হরিবল্ শীতকালের কটা মাস। দেড় বছর চালালাম—এস্টাব্লিশমেন্ট খরচই ওঠে না। তাই সুযোগমত একটা অফার পাওয়া মাত্র লক-স্টক-ব্যারেল বেচে দিলাম!

—বেশ করেছ! তুমি হলে পাশ করা এঞ্জিনীয়ার। হোটেল-বিজনেস কি তোমার পোষায়? তা নতুন কি বিজনেস ধরেছ?

—ধরিনি কিছু। সব বেচে-বুচে ঝাড়া-হাত-পা হয়ে কলকাতায় চলে এসেছি!

—উঠেছ কোথায়?

—হোটেলে। একটা বাসা খুঁজছি। আর একটা বিজনেস। লাখ-দেড়েক টাকা ক্যাপিটাল আছে। তাই সুজাতা বললে, চল, বাসুমামার কাছ থেকে একটু লীগ্যাল অ্যাডভাইস্ নিয়ে আসি।

বাসু-সাহেব সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, তোমাদের বাসুমামা চেম্বার অফ কমার্স-এর কেউ নন সুজাতা। এখানে আমি কী পরামর্শ দেব? খুন-জখম রাহাজানি যদি কখনও করে ফেল তখন বাসুমামার কাছে এস। পরামর্শ দেব।

সুজাতা মাথা নেড়ে বললে, উঁহু! খুন-জখম রাহাজানি যদি কখনও করে বসি তবে আর যার কাছেই যাই, আপনার কাছে আসব না। ভরাডুবি হবে তাহলে!

—কেন, কেন? এভাবে আমার বদনাম করার মানে?

—বদনাম নয়, বাসুমামু—আপনিই বলেছিলেন একদিন যে, যখন প্র্যাক্টিস্ করতেন তখন সত্যিকারের অপরাধীর কেস নাকি আপনি নিতেন না!

—কারেক্ট।

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, নিতেন না! কেন?

চুরুটটা ধরাতে ধরাতে বাসু-সাহেব বলেন, ওটাই ছিল আমার প্রফেশনাল এথিক্স। যার এজাহার শুনে বুঝতাম সে নিরপরাধ, তার কেসই আমি নিতাম। যাকে মনে হত সত্যিকারের অপরাধী তাকে বলতাম—হয় 'গিলটি প্লীড' করে সাজা নাও, নয় অন্য কোনও উকিলের কাছে যাও।

কৌশিক বলে, সেরেছে! সব উকিল যদি তাই বলে তবে অপরাধীগুলো ডিফেন্স পাবে কোথায়?

—পাবে না।

—কিন্তু পিনাল কোড তো বলছে যে, অপরাধীরও ডিফেন্স পাবার অধিকার আছে। যে অপরাধীর আর্থিক সঙ্গতি নেই তাকে তো সরকারী খরচে ডিফেন্স পাইয়ে দেওয়া হয়!

—তুমি ভুল করছ কৌশিক। পিনাল কোড একথা বলছে না যে, অপরাধীর ডিফেন্স পাওয়ার অধিকার আছে, বলছে অভিযুক্তের আছে, আসামীর আছে। 'অভিযুক্ত আসামী' আর 'অপরাধী' শব্দ দুটোর অর্থ পৃথক। কিন্তু এসব আইনের কচকচি বন্ধ কর। দাঁড়াও, তোমাদের রানু মামীমাকে আগে খবরটা দিই।

বাসু-সাহেব টেবিলের তলায় একটা ইলেকট্রিক বেল টিপলেন। এসে হাজির হল একটি বছর দশ-বারোর চটপটে ছোকরা।

—এই বিশে! ঐদের চিনিস?

—বিশু কৌশিক আর সুজাতাকে এক নজর দেখে নিয়ে বললে, হুঁ। সিনেমা করেন।

সুজাতা হেসে ওঠে। বাসু-সাহেব বলেন, দূর গরু! না, ঐরা সিনেমা করেন না। তুই ভিতরে গিয়ে তোর মা-কে বলে আয়, দার্জিলিঙ থেকে সুজাতা আর কৌশিক এসেছে।

সায় দিয়ে বিশু ভিতর দিকে চলে যাচ্ছিল। বাসু-সাহেব তাকে ফিরে ডাকেন—এই বিশে, দাঁড়া! কী বলবি?

—বলব কি, যে দার্জিলিঙ থেকে সুজাতা আর কৌশিক এসেছে।

—তাই বলবি! বেটাচ্ছেলে! কী শেখাচ্ছি এতদিন ধরে?

—তাই তো বললেন আপনে!

—আমি বললাম বলে তুইও বলবি? না! তুই গিয়ে বলবি দার্জিলিঙ থেকে সুজাতা দেবী আর কৌশিকবাবু এসেছেন। বুঝেছিস?

—আজ্ঞে আচ্ছা—এক ছুটে চলে যায় ভিতরে।

কৌশিক প্রশ্ন করে, নিউ রিক্রুট?

—সদ্য আমদানি। তবে ইন্টেলিজেন্ট খুব—

সুজাতা বলে, তাহলে আপনি ও বিষয়ে কোনও পরামর্শ দেবেন না? ঐ আমাদের নতুন ব্যবসা কী জাতীয় হবে সেই প্রসঙ্গে?

—কে বলেছে দেব না? ক্রিমিনাল লইয়ার হিসাবে আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু তোমাদের মামু-হিসাবে পরামর্শ দিতে দোষ কী? বল, কিসের বিজনেস করতে চাও তোমরা? কৌশিক তো শিবপুরের বি. ই.। ঠিকাদারী পোষাবে?

কৌশিক মাথা নেড়ে বললে, না! আমরা যৌথভাবে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। এমন একটা পথের নির্দেশ দিন যাতে আমরা দুজনেই ব্যবসায়ে খাটতে পারি। ঠিকাদারী ব্যবসায়ে প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজই টেকনিকাল—তাছাড়া ও ঠিকাদারী আমার পোষাবেও না।

বাসু-সাহেব বিচিত্র হেসে বললেন, তবে কী পোষাবে? গোয়েন্দাগিরি?

একটু বক্রোক্তি ছিল কথাটার ভিতর। কৌশিক, সাময়িক ভাবে, ঘটনাচক্রেই বলতে পারি, সুজাতার বাড়ি গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েছিল। এই সূত্রেই সুজাতার সঙ্গে তার পরিচয়, প্রণয় ও পরে পরিণয়। কৌশিক কিন্তু রসিকতার ধার দিয়েও গেল না। বললে, কথাটা আপনি মন্দ বলেননি। বক্সীমশায়ের তিরোধানের পর কলকাতা শহরে নামকরা প্রাইভেট গোয়েন্দা আর কেউ নেই। ফিল্ড আছে, কম্পিটিটার কেউ নেই।

সুজাতা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে, বক্সী মশাই মানে?

—ব্যোমকেশ বক্সী! নাম শোননি?

—ও! ব্যোমকেশ বক্সী! তুমি কি তাঁর শূন্য আসনে বসতে চাও নাকি?

কৌশিক উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ছোঁয়ালো। বললে, আমি তো পাগল নই। ব্যোমকেশ বক্সী ছিলেন দুর্লভ প্রতিভা। তাঁর মত গোয়েন্দা আর হবে না; কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর কেউ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না, এটাই বা কি কথা?

—কিন্তু আমার সেখানে ভূমিকা কী?—জানতে চায় সুজাতা।

—যুগ পাল্টে গেছে সুজাতা। ব্যোমকেশবাবু যে-যুগের মানুষ তখনও 'উইমেনস্ লিব্' কথাটার জন্ম হয়নি। এখন যদি আমি ঐ জাতের একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে বসি তাহলে তুমি-আমি সমান পার্টনার হিসাবে কাজ করতে পারি। বাসুমামু কী বলেন?

—তোমাদের ব্যাপার তোমরা বলবে, আমি কী বলব?

—সুজাতা ছদ্ম-অভিমান করে বললে, বা রে! গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিচ্ছেন?

—মোটেই নয়! তোমরা যদি চাও—তলা থেকে ঐ মইটা আমিই ধরে থাকতে রাজী আছি!

—সুজাতা আর কৌশিক পরস্পরের দিকে তাকায়। বলে, কী রকম?

বাসু-সাহেব গম্ভীর হয়ে বলেন, জোক্স্ অ্যাপার্ট, কয়েকটা কথা তোমাদের বলে নিতে চাই রানু এসে পড়ার আগে। রানু কিছুদিন থেকে খোঁচাচ্ছে আমি যেন আবার প্র্যাক্টিস্ শুরু করি। আমি রাজী

হইনি—ওর কথা ভেবেই। তোমরা যদি সিরিয়াসলি এই প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর তাহলে আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে এই রকম ঃ আমার বাড়িটা দোতলা। ইংরাজি 'U' অক্ষরের মত। একতলায় দুটো উইং। পুবদিকের উইং-এ হবে আমার ল-অফিস আর লাইব্রেরী। মাঝখানের অংশটা আমাদের রেসিডেন্স। পশ্চিমদিকের উইংটা হবে তোমাদের প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির অফিস। একতলা কমপ্লিট। এবার এস দোতলায়। উপর তলায় তিনখানি ঘর। তোমাদের ফ্ল্যাট। গোটা বাড়িটা হচ্ছে আমাদের দুজনের রেসিডেন্স-কাম-অফিস। তোমাদের কাছে যারা কেস নিয়ে আসবে তাদের লীগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে হবে। তাদের তোমরা পাঠিয়ে দেবে ইস্টার্ন-উইং-এ, আমার অফিসে। আবার আমার কাছে যারা ফৌজদারী মামলায় পরামর্শ করতে আসবে তাদের হামেশাই দরকার হবে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দার সাহায্য—আমার টেকনিকের জন্য। ঐ জুনিয়ার ব্রীফ্ সাজিয়ে দেবে আর কোর্টে দাঁড়িয়ে কথার মারপ্যাঁচে লীগ্যাল রেফারেন্স দিয়ে কর্তব্য শেষ করার পাত্র আমি নই। ফলে আমরা হতে পারব পরস্পরের পরিপূরক।

কৌশিক বলে ওঠে, গ্র্যান্ড আইডিয়া।

—সুজাতা বলে, কিন্তু একটা শর্ত আছে। আপনি এখনই বলছিলেন, এবার গ্রীষ্মকালে আপনি হোটেল রিপোজে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন—আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে নয়, রেগুলার বোর্ডার হিসাবে। আমরা যদি এ বাড়ির দোতলায় থাকি তবে ভাড়া দিয়ে থাকব।

বাসু-সাহেব বলেন, রাজী আছি। তবে শর্ত একটা কেন হবে? অনেকগুলি শর্ত হবে।

—যেমন?

—ধর—আমি তোমাদের কেস্ দিলে তোমরা কমিশন চার্জ দেবে। তোমরা আমাকে কেস পাঠালে আমি কমিশন দেব। এসব তো গেল বিজনেসের ডিটেলস। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে—ফৈসেল হবে একটা। সুজাতা তার ইনচার্জ। তৃতীয়ত দুটি অফিসের জন্য একটিমাত্র রিসেপ্‌শান কাউন্টার—এই সেন্ট্রাল ব্লক-এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কম্বাইন্ড রিসেপ্‌শানিস্ট একজনই হবেন—তিনি তোমাদের রানু-মামীমা!—ঐ যে নাম করতে করতেই এসে গেছেন উনি।

সুজাতা উঠে আসে তাঁকে প্রণাম করতে। রানী বলেন, থাক, থাক।

কৌশিক বলে, থাক নয়, মামীমা—আজকে প্রণাম করতে দিতেই হবে। আপনার পায়ের ধূলোর বিশেষ প্রয়োজন আমাদের নতুন বিজনেস-এর উদ্বোধন দিনে।

—আবার উদ্বোধন! কিসের বিজনেস্ তোমাদের?

—শুধু আমাদের নয়, আপনাদেরও। আপনি আর মামুও আমাদের পার্টনার।

রানী দেবী আকাশ থেকে পড়েন। বাসু তখন মিটিমিটি হাসছেন।

সুজাতাই পরিকল্পনাটা সাড়ম্বরে পেশ করে। রানী উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বলেন, এ খুব ভাল হবে। এই নির্বান্ধব পুরীতে তাহলে কথা বলার লোক পাব এবার থেকে! এস সুজাতা, তোমাকে ফৈসেলের চার্জ বুঝিয়ে দিই!

সুজাতা বলে, সে কি মামীমা, শুভস্য শীঘ্রম্ মানে এই মুহূর্ত থেকেই নয়! আমরা আজকালের মধ্যেই চলে আসব। একটা কাজ কিন্তু এখনও বাকি আছে। আমাদের প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ ফার্মটার একটা নামকরণ করতে হবে। মামীমা, আপনিই নাম দিন।

রানী দেবী আঁৎকে ওঠার ভঙ্গি করেন। বলেন, ওরে বাবা! ও আমার কর্ম নয়। তোমরা বরং তোমার মামাকে ধর।

—বেশ আপনিই নাম দিন—সুজাতা ঘুরে বসে বাসু-সাহেবের মুখোমুখী।

বাসু পাইপটা ধরাচ্ছিলেন। বলেন—উঁ? নাম দিতে হবে? বেশ দিচ্ছি। তোমাদের প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির নাম হবে—'সুকৌশলী'!

সুজাতা এবং কৌশিক দুজনেই লাফিয়ে ওঠে—গ্র্যান্ড নাম!

—উঁহু-হু! তোমরা নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটা না বুঝেই লাফাচ্ছ মনে হচ্ছে!

—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ! মানে?

—লেডিজ-ফার্স্ট আইনে প্রথমেই সুজাতার 'সু', তার পিছনে পিছনে যথারীতি অনুগামী কৌশিকের-'কৌ'। বাকি 'শলী'টা হচ্ছে 'খলু পাদপূরণে'! সমস্ত কথাটার একটা ব্যঞ্জনা দিতে!

দুই

মাসখানেক পরের কথা।

এই একমাসে নিউ আলিপুরের ও-ব্লকের বাড়িটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এতদিন অধিকাংশ ঘরই তালাবন্ধ হয়ে পড়েছিল। মিসেস বাসুর গতিবিধি শুধুমাত্র একতলাতেই সীমিত। দোতলাটা ভাড়া দেবার কথা হয়েছে মাঝে মাঝে—কিন্তু অজানা উটকো লোক এসে ঝামেলা না বাধায় মাথার উপর বসে—এ জন্যই এতদিন দোতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়নি। অর্থের প্রয়োজন তো আর ওঁদের নেই। প্রথম জীবনে মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছেন বাসু-সাহেব।

বাড়ির পূর্বদিকের অংশে দুখানি ঘর। পিছনের ঘরটা হচ্ছে লাইব্রেরী, সামনেটা দুটি অংশে বিভক্ত। সামনের দিকটা ল-অফিস—ভিতরে বাসু-সাহেবের চেম্বার। একজন সদ্য-পাশ উকিল, প্রদ্যোত নাথ, জুনিয়ার হিসাবে কাজ শিখতে এসেছে। এছাড়া আর দ্বিতীয় কর্মী নেই। বাসু-সাহেব বলেন, অনেকদিন পর শুরু করেছি তো—প্রথমেই কতগুলো লোককে চাকরি দেব না। প্র্যাকটিস্ যেমন যেমন জমবে, অফিসে লোকও বাড়াব।

পশ্চিমদিকের অংশটাতেও দুখানি ঘর। 'সুকৌশলী'ও কোনও বাড়তি লোক নেয়নি। সুজাতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা পোর্টেবল্ টাইপরাইটারে ধীরে ধীরে টাইপ করে। কৌশিক প্রথম মাসে একটাও বিজনেস্ পায়নি। কীভাবে বিজ্ঞাপন দেবে তাই শুধু ভাবছে। বাসু-সাহেব একটা কেস্ পাঠিয়েছিলেন—ডিভোর্স কেস! মেয়েটির অভিযোগ তার স্বামী অসৎচরিত্র। তাই কৌশিককে কদিন তার পিছনে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে! খারাপ পাড়ায়।

তারপর একদিন। শুক্রবার বারই এপ্রিল। বাসু-সাহেব নিজের ঘরে বসে একটা আইনের বই পড়ছিলেন। হঠাৎ ইন্টারকমটা বেজে উঠল। সুইচটা টিপে বাসু-সাহেব বলেন, কী ব্যাপার, ব্রেকফাস্ট রেডি ?

—না। তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছেন। মিস্টার জীবন কুমার বিশ্বাস। প্রয়োজন বলছেন, আইনঘটিত পরামর্শ। পাঠিয়ে দেব?

বইটা সরিয়ে রেখে বাসু-সাহেব বললেন, দাও।

সকাল সাড়ে আটটা। অফিস আজ ছুটি, গুড ফাইডে। প্রদ্যোত আসবে না আজ। কাছারী বন্ধ। একটু পরে বিশু পথ দেখিয়ে একজন ভদ্রলোককে নিয়ে এল। ভদ্রলোক খোলা-দরজার সামনে একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন—দেখলেন, ব্যারিস্টার বাসু সামনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। ভদ্রলোক কাশলেন। বাসু-সাহেব এবার ওঁর দিকে ফিরে বললেন, আসুন। বসুন ঐ সোফাটায়।

আগন্তুক ভদ্রলোক জানতেন না বাসু-সাহেবের টেক্‌নিক। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পি.কে.বাসু জানেন উকিলের সাক্ষাৎমাত্র লোকে একটা আবরণ টেনে দেয় তার মনের উপর। ঠিক যে মুহূর্তে সে উকিলের দিকে চোখে-চোখ তুলে তাকায় তখনই সেই পর্দাটা সে টেনে দেয়—ঠিক তার আগের মুহূর্তটাতেই সে সব চেয়ে দুর্বল—যখন সে ছদ্মবেশ ধারণ করতে চাইছে। তাই বাসু-সাহেবের চেম্বারে ওঁর সামনেই অন্ধকারে টাঙানো আছে একটা আয়না, আর প্রবেশ পথের উপর ফেলা আছে একটা জোরালো আলো। আগন্তুক ধ্যানস্থ ব্যারিস্টার সাহেবকে দেখে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না—তিনি

সামনের দিকে তাকিয়ে আয়নার ভিতর দিয়ে ওকেই লক্ষ্য করছিলেন। ঘরে ঢুকে পরে হয়তো সে এটা লক্ষ্য করে—কিন্তু ততক্ষণে প্রথম প্রবেশ-মুহূর্তটি অতিক্রান্ত।

—বলুন, কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

আগন্তুক ধুতি-পাঞ্জাবি পরা—বেশবাসে আভিজাত্য নেই কিছু। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখে চশমা, ঝোলা গোঁফ, হাতে একটি ফোলিও ব্যাগ।

—ব্যাগটা পাশে রেখে জীবনবাবু বসলেন সোফাটায়। হাত দুটো জোড় করে নমস্কার করলেন। বললেন, তার আগে স্যার, একটা কথা জানতে চাই। আপনাকে কত ফি দিতে হবে? আমি মধ্যবিত্ত ছাপোষা মানুষ, বিপদে পড়ে এসেছি। আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি; কিন্তু আপনাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার আর্থিক ক্ষমতা আমার নেই।

—কী করেন আপনি?

—আমি স্যার বোম্বাই-এর কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ক্যাশিয়ার। কুল্লে চারশ পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই, আর থ্রি কোয়ার্টার্স। ব্যবসায়ের কাজেই কলকাতায় এসেছি—মানে মালিকের নির্দেশে। আমি আজ দশ বছর কলকাতা ছাড়া—পথ-ঘাটও ভাল চিনি না। এখানে এসেই বিপদে পড়ে গেছি। আত্মীয়-বন্ধু কেউ নেই যে পরামর্শ করি। আপনার নাম জানা ছিল। টেলিফোন গাইড খুঁজে ঠিকানা দেখে চলে এসেছি।

—তাহলে আগে একটা টেলিফোন করলেই পারতেন?

—টেলিফোনে ও সব কথা বলতে চাই না স্যার।

—কী আশ্চর্য! টেলিফোনে তো শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতেন। যাক সে কথা, আপনার বিপদটা কী জাতীয়?

—স্যার, আপনার ফি-এর কথাটা—

—ফি-এর অঙ্কটা নির্ভর করবে আপনার কেস-এর উপর। তবে কেসটা শোনার জন্য আমি কিছু চার্জ করব না। আপনি বিস্তারিত বলে যান। ফি-এর কথা অত ভাববেন না, প্রয়োজন হলে আপনাকে পরামর্শও দেব, ফি চার্জ করব না।—বলুন—

—আপনি আমাকে বাঁচালেন স্যার! তাহলে খুলেই বলি সব কথা।

জীবন বিশ্বাস মাড়োয়ারী সওদাগরী অফিসের ক্যাশিয়ার। কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া একটি কোটিপতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। মালিকের নির্দেশে জীবনবাবু কলকাতায় এসেছেন দিন-সাতেক আগে। একা নয়, সঙ্গে আছেন ম্যানেজার সুপ্রিয় দাশগুপ্ত। ম্যানেজারের নতুন চাকরি, এম.এ. পাশ। চাকরি নতুন হলেও বড়কর্তার প্রিয় পাত্র। ওঁরা এসে উঠেছেন পার্ক স্ট্রীটের পার্ক হোটেলে—

বাসু-সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ঐ সুপ্রিয় কত টাকা মাইনে পায়?

—কাটাকুটি করে পে-প্যাকেট পায় এগারো শো টাকার, লোন নেওয়া আছে বলে বেশ কিছু কাটা যায়!

—বুঝলাম। পার্ক হোটেলে দৈনিক কত খরচ পড়ছে আপনাদের?

জীবনবাবু রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার। খুলেই বলি। আমরা ঠিক কোম্পানির কাজে আসিনি—এসেছি আমাদের বড়কর্তা মোহনস্বরূপ কাপাডিয়ার ব্যক্তিগত কাজে—যাবতীয় খরচ তাঁরই। বড়কর্তার সার্দান অ্যাভিন্যুতে একটা বাড়ি আছে। সেটা বিক্রির ব্যাপারে। বিক্রি হল সাড়ে ছয় লাখ টাকায়। রেজেস্ট্রি ডীডে কিন্তু লেখা হল সাড়ে চার। দুই লাখ হচ্ছে কালো টাকা। এটা আমরা নগদ নিয়েছি। টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখা চলবে না, ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ করানো চলবে না। বড়কর্তার নির্দেশ আছে ওটা নগদে বড়বাজারে একজনের কাছে জমা দিয়ে হুণ্ডি করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নগদ দু'লাখ টাকা হয়তো দু-একদিন হোটেলে লুকিয়ে রাখতে হতে পারে। তাই বড়কর্তা আমাদের দুজনকে কোন খানদানী বড় হোটেলেই উঠতে বলেছিলেন। দিন চার-পাঁচের তো ব্যাপার—

—বুঝলাম। তারপর? লেনদেন হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ স্যার, কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছে কি, সুপ্রিয়বাবুর মতি-গতি সন্দেহজনক লাগছে আমার কাছে। উনি টাকাটা নগদেই বোম্বাই নিয়ে যেতে চাইছেন। কারণ, বলছেন, যাঁর কাছ থেকে হুণ্ডি করানোর কথা তিনি এখন কলকাতায় নেই—

—এ কথাটা সত্যি? আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন?

—হ্যাঁ স্যার। সত্যি।

—তাহলে আপনার বড়কর্তার সঙ্গে ট্রাংক লাইনে কথাবার্তা বলে নির্দেশ নিন না।

—ঐখানেই তো হয়েছে মুশ্‌কিল স্যার। বড়কর্তা বোম্বাইয়ে নেই—এমনকি ভারতবর্ষে নেই। উনি এখন আছেন ব্যাঙ্ককে। আর সবচেয়ে ঝামেলা হয়েছে এই যে, বড়কর্তা এই সম্পত্তিটা বেচে দিচ্ছেন গোপনে—মানে তাঁর পরিবারের লোকেরাও জানে না। ওঁর স্ত্রী পর্যন্ত না।

—স্ত্রী পর্যন্ত না? আপনি সেটা কেমন করে জানলেন?

—হাসলেন জীবনবাবু। বললেন, ও আপনি শুনতে চাইবেন না স্যার—মেয়েছেলে-ঘটিত ব্যাপার। টাকাটা উনি ওঁর রক্ষিতাকে দিচ্ছেন। মানে ওড়াচ্ছেন!

—বেশ তো, তাঁর টাকা তিনি ওড়াচ্ছেন—তাতে আপনার আমার কী?

—না, তা তো বটেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে ঐ দু'লাখ টাকা নগদে নিয়ে যাবার সময় যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়, তবে আমি ফেঁসে যাব না তো?

বাসু-সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, দায়িত্বটা আপনার বড়কর্তা কার উপর দিয়েছেন?

—ম্যানেজারের উপর স্যার। আমি তো ক্যাশিয়ার মাত্র। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া আছে ম্যানেজারকে। দলিলে, রসিদে সইও করেছেন তিনি—আমি শুধু সঙ্গে আছি। উনিই আমার উপরওয়ালা—

—তবে আর কী? আপনার ভয়টা কী?

জীবনবাবু ইতস্তত করে বললেন, এর মধ্যে স্যার আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। ম্যানেজার-সাহেব আমাকে ট্রেনের টিকিট কাটতে পাঠিয়েছিলেন। বোম্বে মেলে একটা ফার্স্ট ক্লাস ক্যুপেতে দুখানা টিকিট আমি কেটে এনেছি—কিন্তু টিকিটটা কাটা হয়েছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস দাসগুপ্তের নামে।

—তাতে কী? মিসেস দাসগুপ্তাও ঐ ট্রেনে যাচ্ছেন বুঝি? আর আপনার টিকিট হয়েছে কি পাশের কামরায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, মিসেস দাশগুপ্তা বর্তমানে বোম্বাইতে আছেন।

—তার মানে? আপনি আপনার ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেননি এমন করার অর্থটা কী?

—করেছিলাম। উনি বললেন, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ না বললে ক্যুপে পাওয়া যাবে না। তাই উনি তিনখানা টিকিট কাটতে বলেছেন। ট্রেন ছাড়ার সময় আমি বসবো পাশের কামরায়। ক্যুপের একটা সীট ফাঁকা থাকবে। তারপর আমি চলে আসব ক্যুপেতে।

বাসু-সাহেব জবাব দিলেন না। কী যেন ভাবছেন তিনি। জীবনবাবু বলেন, ইতিমধ্যে আরও এক ব্যাপার হয়েছে স্যার। আমাদের হোটেলে পাশের ঘরেই একজন মহিলা এসে উঠেছেন। তিনি ম্যানেজারের সঙ্গে মাঝে মাঝে গুজগুজ ফুসফুস করছেন। তিনি যে কে, তা আমি জানি না। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি বুঝি বাঙালী। কিন্তু ম্যানেজার-সাহেব বললেন, ওঁর নাম মিস্ ডিক্রুজা এবং জানালেন তিনিও নাকি ঐ একই ট্রেনে বোম্বাই যাচ্ছেন।

—ইন্টারেস্টিং কেস! ঐ একই ক্যুপেতে?

—হঠাৎ লজ্জা পেলেন জীবনবাবু। মুখটা নীচু করে বললেন, সেটা আমি জিজ্ঞাসা করিনি স্যার। হাজার হোক উনি আমার ওপরওয়ালা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন রহস্যময় মনে

হচ্ছে। এক নম্বর—কেন উনি এভাবে অতগুলো নগদ টাকা ট্রেনে করে নিয়ে যাচ্ছেন? দু নম্বর—কেন আমাকে পাশের ঘরে পাচার করলেন, তিন নম্বর—ঐ অচেনা মেয়েটা যদি সত্যিই ওঁর সঙ্গে এক ক্যুপেতে—সঙ্কোচে মাঝখানেই থেমে গেলেন জীবনবাবু।

—বুঝলাম। তা আপনি কী করতে চান?

—সেই পরামর্শই তো করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।

—কবে আপনাদের রওনা হওয়ার কথা?

—আজ রাত্রে সাড়ে সাতটার বম্বে মেল-এ।

—টাকাটা বর্তমানে কোথায় আছে? হোটেলে আপনাদের ঘরে?

—হোটেলেই; তবে আমাদের ঘরে নয়। হোটেলের সেফ-ডিপজিট ভল্টে।

—টাকাটা কি একশ' টাকার নোটে?

—আজ্ঞে না। দশ টাকার নোটে। স্যুটকেস বোঝাই!

—ঠিক আছে। আপনি এক কাজ করুন—আমাকে যা যা বললেন তা একটা বিবৃতির আকারে লিখে ফেলুন। সেটা আমাকে দিয়ে যান। যাতে প্রমাণ হবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটার পর আপনি বানিয়ে কিছু বলছেন না।

জীবনবাবু গোঁজ হয়ে বসে কী ভাবতে থাকেন।

—কী ভাবছেন বলুন তো?

—ভাবছিলাম কি স্যার, আপনি যা বলছেন তা খুবই ভাল—কিন্তু একটা মুশকিল আছে। ধরুন যদি ভালমন্দ কিছু হয়েই যায় তখন আপনি হবেন আমার পক্ষের উকিল। সে ক্ষেত্রে তো আপনি নিজেই সাক্ষী দিতে পারবেন না। তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? আমি এখন হোটেলে ফিরে যাই। সব কথা একটা বিবৃতির আকারে লিখে ফেলি। তারপর পোস্ট-অফিস থেকে রেজিস্ট্রি ডাকে আপনাকে পাঠাই। সীল মোহর করে। আমি ভাল করে দেখে দেব যাতে পোস্ট-অফিসে তারিখের ছাপটা খামের উপর পড়ে। সে ক্ষেত্রে আপনি সীলটা ভাঙবেন না। চিঠিটাও পড়বেন না। ভালমন্দ কিছু ঘটলে সীল-মোহর করা খামটাই আপনি প্রমাণ হিসাবে দাখিল করবেন!

বাসু-সাহেব বুঝতে পারেন এই ক্যাশিয়ার একটি ধুরন্ধর ব্যক্তি। বললেন, কিন্তু পোস্ট-অফিস তো আজ বন্ধ। গুড-ফ্রাইডের ছুটি।

—জি.পি.ও. তে রেজিস্ট্রেশন খোলা। সে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—ঠিক আছে। তাই করুন।

—আপনি আমাকে বাঁচালেন স্যার।

বাসু-সাহেব তাঁর ডায়েরিতে ওঁদের নাম, ধাম, পার্ক হোটেলের রুম নম্বর, রেলওয়ে টিকিট তিনটের নম্বর এবং বোম্বাইয়ের ঠিকানা লিখে নিলেন। জীবনবাবু প্রশ্ন করেন, আপনাকে কী দেব স্যার?

—কিছু দিতে হবে না আপনাকে। এবার আসুন আপনি।

জীবনবাবু যেন এই জবাবই আশা করছিলেন। নমস্কার করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন তিনি। জীবনবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র বাসু-সাহেব ইন্টারকমে সকলকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। পূর্বাংশ, পশ্চিমাংশ এবং মধ্যমাংশের রিসেপ্‌শান কাউন্টারের মধ্যে ইন্টারকম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই বাসু-সাহেবের ঘরে এসে বসলেন মিসেস বাসু, কৌশিক আর সুজাতা। বাসু-সাহেব বললেন, তোমাদের পরামর্শ চাইছি, বল আমার কী করা উচিত? ওয়ান ইজটু টোয়েন্টি রেশিওতে একটা বাজি ধরার সুযোগ এসেছে আমার সামনে। পাঁচশ' টাকা ঢালতে হবে—পেলে পাব দশহাজার, না পেলে পাঁচশ' টাকাই বরবাদ হবে! এখন তোমরা বল, আমার কী করা উচিত?

কৌশিক বললে, ওয়ান ইজ-টু টোয়েন্টি! নিশ্চয় বাজি ধরবেন!

সুজাতা বলে, আগে বলুন জেতার চান্স কত পার্সেন্ট?

রানী বললেন, করছ ওকালতি, এর মধ্যে বাজি ধরাধরির কী আছে?

বাসু-সাহেব নিরুপায়ভাবে শ্রাগ্ করলেন শুধু।

ওদের পীড়াপীড়িতে খুলে বলতে হল সব কথা। শেষে বললেন, আমার অভিজ্ঞতা বলছে—ব্যাপারটা ঘোরালো! ঈশান কোণে যে ছোট্ট কালো স্পটটা দেখা যাচ্ছে ওটা কালবৈশাখী হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। খুন, তহবিল তছরুপ, রাহাজানি, ডাকাতি যা হোক কিছু একটা হবে। কেসটা তাহলে অনিবার্যভাবে আসবে আমার কাছে। দু-লাখ টাকা ইনভলভড হলে পাঁচ পার্সেন্ট হিসাবে আমার কমিশন হবে দশ হাজার টাকা। কিন্তু এখনই আমাকে সেই আশায় শ'পাঁচেক টাকা ইনভেস্ট করতে হয়। আমার প্রশ্ন ঃ করব?

কৌশিক আবার বললে, আলবৎ!

সুজাতা বলে, এটা গাছে-কাঁঠাল-গোঁফে-তেল হচ্ছে না কি?

বাসু-সাহেব বলেন, আর রানু? তোমার মত?

রানী বলেন, আমার মতে সুজাতা একটু বেশী আশাবাদী। গাছে কাঁঠাল নজরে পড়ছে না আমার! বরং বলতে পার 'ট্যাকে-বিচি, গোঁফে তেল!'

—সেটা আবার কী?

—তুমি কাঁঠালের বিচি পকেটে নিয়ে ঘুরছ! পুঁতলেই গাছ হবে, গাছ হলেই কাঁঠাল, পাকলেই পেড়ে খেতে হবে—তাই গোঁফে তেল দিতে শুরু করেছ!

হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই। মায় বাসু-সাহেব পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু বাসু-সাহেবকে রোখা গেল না। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস, হয় জীবনবাবু, না হয় ঐ সুপ্রিয়-ডিক্রুজা টাকাটা হাতাবার তালে আছে। এখন থেকে ব্যবস্থা করলে এ দুর্ঘটনা এড়ানো চলতে পারে। কৌশিককে উনি বললেন, তুমি এখনই একটা স্যুটকেস্ নিয়ে পার্ক হোটেলে চলে যাও। ওরা আছে রুম নম্বর 39-এ। তার কাছাকাছি একটা ঘর একদিনের জন্য ভাড়া নিও। ঘরটা নেওয়ার আগে দেখে নিও ওখান থেকে রুম 39 নজরে আসে কি না। তারপর সারাদিন ঐ ক্যাশিয়ার-ম্যানেজারের উপর নজর রাখ। কে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে, ঢুকছে, কোনও বাইরের ভিজিটার্স আসছে কি না, কোথায় লাঞ্চ করছে ইত্যাদি।

কৌশিক বলে, আর কিছু?

—হ্যাঁ। এছাড়া তুমি বম্বে মেলে-এ একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কাট। রিজার্ভেশান যদি না পাও তাহলেও টিকিট কাটবে। সুপ্রিয় যে কথা জীবন বিশ্বাসকে বলেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে একটা বার্থ শেষ মুহূর্তে খালি পাবেই। যদি নাও পাও তবে কন্ডাকটার গার্ড-এর সঙ্গে ম্যানেজ করে নিও। শেষ পর্যন্ত দরকার হলে প্যাসেজে বসেই যেতে হবে। মোটকথা ঐ বগিতে তোমাকে বোম্বাই যেতে হবে।

—বুঝলাম। বোম্বাই গেলাম। তারপর?

—ঐ ম্যানেজার আর ক্যাশিয়ার নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেই তোমার ছুটি। ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে সহযাত্রী হিসাবে ওদের দু-জনের সঙ্গেই যতটা পার আলাপ জমাবে।

—আর কিছু নির্দেশ?

—আছে। প্রথম কথা, পার্ক হোটেলে যখন উঠবে তখন তোমার ছদ্মবেশ থাকবে। ট্রেনে স্বাভাবিক চেহারায়। যাতে ওরা দুজন বুঝতে না পারে যে, ওদের ট্রেনের সহযাত্রী ভদ্রলোক ঐ পার্ক-হোটেলেরই বোর্ডার ছিল। দ্বিতীয় কথা, ট্রেন ছাড়ার আগে তুমি সুজাতার সঙ্গে কথা বলবে না।

—সুজাতা! সুজাতাকে কোথায় পাব?

বাসু-সাহেব এবার সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, তুমি সুজাতা, সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া স্টেশানে চলে যাবে। সঙ্গে নেবে শুধু একটা লেডিজ হাত-ব্যাগ। স্টেশানে পৌঁছে একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটবে। বম্বে মেল নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রাত সাড়ে সাতটার সময় ছাড়ে। কিন্তু

সেটাকে বেদবাক্য বলে ধরে নিও না। কানখাড়া করে শুনে নিও ঘোষক বলছে কি না ঃ কৃপা কর্ শুনিয়ে থ্রি-আপ বোম্বাই মেল নও নম্বরকে বদলে—

সুজাতা বাধা দিয়ে বলে, আপনি কি আমাকে বাচ্চা খুকিটি পেয়েছেন?

—না। সব সম্ভাবনাই ভেবে দেখছি আমি। মোটকথা ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভেশান চার্টে দেখবে 3542 এবং 3543 টিকিটধারী মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ দাসগুপ্তের ক্যুপে কোন্ বগীতে আছে। ঐ ক্যুপেতে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে। কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখবে।

—আর কন্ডাকটার গার্ড যখন আমার রিজার্ভেশান টিকিট দেখতে চাইবে?

—তখন বলবে, তুমি মিসেস দাসগুপ্তা। তোমার কর্তা টিকিট আর মালপত্র নিয়ে পিছনের ট্যাক্সিতে আসছেন। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত ঐ অজুহাতে কামরায় বসে থাকবে। তারপর বাধ্য হয়ে নেবে পড়ে কর্তাকে খুঁজবার অভিনয় করবে। এনি কোশ্চেন?

—ধরুন যদি ঐ সুপ্রিয় দাসগুপ্ত একটি মহিলাকে নিয়ে এসে কন্ডাকটার গার্ডকে তাদের রিজার্ভেশান দেখায়?

—তা তো দেখাবেই। তবু তুমি সীট ছাড়বে না। ঝগড়া-চেঁচামেচি করবে—যাতে ভীড় জমে যায়।...অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন সুজাতা? এ জাতীয় কাজ তো তোমরা হামেশাই অহেতুক করে থাক, আজ প্রয়োজনে পারবে না?

—কী করে থাকি?

—অবুঝের মত অহেতুক চেঁচামেচি! আবদেরে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বলা—'আগে আমার মিস্টার আসুন, না হলে আমি সীট ছাড়ব না।'

সুজাতা হেসে ফেলে। বলে, আপনার উদ্দেশ্যটা কী বলুন তো?

—ভীড় জমানো। যাতে আশপাশের কামরার প্যাসেঞ্জার কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা দেখতে আসে। অন্তত কন্ডাকটার গার্ড যাতে ঐ তথাকথিত মিসেস্ দাসগুপ্তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে ঐ কন্ডাকটার গার্ড বা অন্য কোন সহযাত্রী সহজেই মেয়েটিকে সনাক্ত করতে পারবে।

রানী বলেন, আর আমার কাজ? কড়ায় তেল বসিয়ে দেব?

—তেল?

—ভ্যারেণ্ডা ভাজতে?

—না! তুমি হচ্ছ আমাদের কন্ট্রোলরুম। কৌশিক প্রতি দু'তিন ঘণ্টা অন্তর রিপোর্ট দেবে। তুমি সেই রিপোর্ট সময়-চিহ্ন দিয়ে নোট করে যাবে। আমাদের তিনজনকে গাইড করবে ওর রিপোর্ট অনুযায়ী।

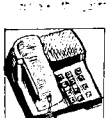

তিন

রানী দেবীর সমস্ত দিনটাই কর্মব্যস্ত গেল। কৌশিক পর পর চার পাঁচবার ফোন করেছে। বেলা দশটায় প্রথমবার—পার্ক হোটেল থেকে। খবর ঃ ও একচল্লিশ নম্বর ঘরে উঠেছে। ওখান থেকে উনচল্লিশ নম্বর ঘর নজর রাখা যাচ্ছে। সেটাতে দুজন বোর্ডার আছেন। ডবল-বেড রুম। হোটেল রেজিস্টারে দেখেছে তাঁদের নাম জীবনকুমার বিশ্বাস আর সুপ্রিয় দাশগুপ্ত। স্থায়ী ঠিকানা—কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানি, বোম্বাই। জীবনবাবু মধ্যবয়সী। দোহারা চেহারা, গোঁফ আছে। তিনি ঘর ছেড়ে দু-তিনবার বের হয়েছেন। সুপ্রিয় একবার মাত্র বার হয়েছিল। বারান্দায় বেরিয়ে এসেই আবার ঘরে ঢুকে যায়। সে যে ঘরে আছে তার আরও প্রমাণ আছে। কারণ জীবনবাবু যতবারই বার হচ্ছেন ঘরে তালা দিয়ে যাচ্ছেন না। ফিরে এসে নক করছেন। ভিতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিচ্ছে।

রানী দেবী রিপোর্টটা বিশুর হাতে পাঠিয়ে দিলেন বাসু-সাহেবকে। বাসু সেটা পড়ে তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন পার্ক হোটেলের একচল্লিশ নম্বর ঘরে—দশটা বারোয়।

কৌশিক ফোন ধরতেই বললেন, তোমার রিপোর্ট পেয়েছি। শোন, এবার জীবন ঘর ছেড়ে বার হলেই তুমি উনচল্লিশে ফোন কর। সাড়া দিলেই বলবে, তুমি জীবন বিশ্বাসকে খুঁজছ। ন্যাচারালি লোকটা বলবে, তিনি ঘরে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রশ্ন করবে, আপনি কি সুপ্রিয়বাবু? সে উত্তর দেওয়ামাত্র লাইন কেটে দেবে। রিপোর্ট ব্যাক রেজাল্ট।

—কৌশিক দ্বিতীয়বার ফোন করল দশটা কুড়িতে। বলল, জীবন সওয়া দশটায় ঘর ছেড়ে বার হতেই ও ফোন করে। উনচল্লিশ নম্বরে কেউ সেটা ধরে। কৌশিক প্রশ্ন করে, 'জীবনবাবু আছেন?' লোকটা জবাবে প্রতিপ্রশ্ন করে, 'আপনি কে?' কৌশিক বলে, 'আপনি কি সুপ্রিয়বাবু?' লোকটা যেন পিন-আটকে-যাওয়া-রেকর্ড—বলে, 'আপনি কে?' সব শুনে বাসু-সাহেব বলেন, ঠিক আছে। জীবন ঘরে ফিরলেই আমাকে ফোনে জানিও।

এগারোটার সময় কৌশিক জানালো সুপ্রিয় দাসগুপ্তকে এখনও দেখা যায়নি; এবং জীবন বিশ্বাস ঘরে ফিরেছে। বাসু তখন নিজেই ফোন করলেন ঐ উনচল্লিশ নম্বর ঘরে। ফোন ধরল সুপ্রিয়। বাসু বললেন, 'জীবনবাবু আছেন?'

লোকটা বলল, আপনি কে?

—বাসু বললেন, আমি যেই হই না মশাই, তাতে আপনার কী? জীবনবাবু যদি থাকেন ডেকে দিন, থাকেন—বলুন, নেই।

একটু নীরবতার পর বাসু শুনলেন, হ্যালো, জীবনকুমার বিশ্বাস বলছি।

—আমি পি.কে.বাসু। ফোন ধরেছিল কে বলুন তো? দু-দুবার—

জীবন ওঁকে শেষ করতে দিল না। বললে, বুঝতেই তো পারছেন। বলুন, কেন ফোন করছিলেন?

—রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, এই মাত্র।

—দু-লাখ টাকা ব্ল্যাক মানির কথাটাও লিখেছেন নাকি?

—না। শুধু লিখেছি অনেক টাকা নগদে নিয়ে যাচ্ছি।

—ঠিক আছে।—লাইন কেটে দিলেন বাসু।

এরপর কৌশিকের ফোন এল বিকেল চারটেয়। সে টিকিট পেয়েছে, ঘটনাচক্রে রিজার্ভেশানও। সুপ্রিয় আর একবারও ঘর ছেড়ে বার হয়নি। এমনকি লাঞ্চ খেতেও নয়। বোধহয় লোকটা অসুস্থ। না হলে অন্তত দ্বিপ্রাহরিক আহার করতে একবার বার হত। অথচ সে যে ঘরে আছে এটা নিঃসন্দেহ। এ-ছাড়া আর একটা খবরও পাওয়া গেছে। আটত্রিশ নম্বর ঘরে দিন তিনেক আগে একজন ভদ্রমহিলা তাঁর অসুস্থ ভাইকে নিয়ে নাকি উঠেছিলেন। হোটেল রেজিস্টার অনুযায়ী তাঁদের নাম মিস্টার এবং মিস্ ডিসিলভা—ভাই বোন। ভাইটি নাকি বিকৃতমস্তিষ্ক। ইন্টারেস্টিং কেস। রাঁচি থেকে ভাইকে নিয়ে উনি এ হোটেলে উঠেছিলেন। আজ সকাল ছয়টায় চলে গেছেন। পাগল ভাইকে নিয়ে এই কদিন একটা গাড়িতে বারেবারেই বার হতেন চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে। ভাইটা কেমন যেন জড়দগব, ধন্ধ-ধরা। চেঁচামেচি গণ্ডগোল করত না। দিবারাত্র পড়ে পড়ে ঘুমাতো। খবরটা ওকে দিয়েছে রুম-সার্ভিসের বেয়ারা হরিমোহন। সে পাগলটাকে দেখেছে। দু-একবার তাকে ধরে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেও দিয়ে এসেছে। লোকটা ঘুমোতে ঘুমোতেই হাঁটত। চোখ খুলে বড় একটা তাকাতোই না। এত খবর ও জানাচ্ছে এজন্য যে, মিসিং-লিঙ্ক মিস্ ডিক্রুজার সঙ্গে ঐ ডিসিলভার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় সে ফোন করে জানালো—পাশের ঘরের দুই-বাসিন্দা রওনা হলেন। সঙ্গে দুটো বেডিং, চারটে স্যুটকেস। দুটো স্যুটকেস হোটেলের সেফ ডিপজিট লকার থেকে এইমাত্র ডেলিভারি নেওয়া হল। সুপ্রিয়কে ও এক নজর মাত্র দেখেছে। লোকটা ঘর থেকে বেশ তাড়াহুড়ো করেই হঠাৎ

বেরিয়ে এল। কৌশিকও ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল। কিন্তু ভাল করে তাকে সনাক্ত করার আগেই লোকটা গিয়ে বসল ট্যাক্সিতে। তবু এক নজরে সে তাকে যা দেখেছে দরকার হলে সনাক্ত করতে পারবে। লম্বা একহারা, রঙ ফর্সা। গোঁফ-দাড়ি কামানো, বড় বড় জুলফি। কৌশিক টেলিফোনে জানালো যে, সে-ও রওনা হচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে গিয়ে সে ছদ্মবেশ পালটাবে।

সুজাতাও হাতব্যাগ নিয়ে রওনা হয়ে গেল সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ।

যথেষ্ট সময় থাকতে সুজাতা স্টেশনে পৌঁচেছে। থ্রি-আপ বোম্বাই-মেল নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকেই ছাড়ছে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে স্টেশনে ঢুকে সে রিজার্ভেশান চার্টটা দেখল। 7852 বগীতে সি-চিহ্নিত ক্যুপে-কামরায় মিস্টার এবং মিসেস দাসগুপ্তার আসন সংরক্ষিত। সুজাতা গট্‌গটিয়ে যেই কামরায় উঠতে যাবে, কন্ডাকটার গার্ড রুখল ঃ আপনার টিকিটটা প্লীজ?

অত্যন্ত সপ্রতিভ-ভঙ্গিতে ও বললে, আমার নাম মিসেস অঞ্জলি দাসগুপ্তা। টিকেট আমার স্বামীর কাছে আছে, উনি পিছনে আসছেন। আমাদের টিকিট নম্বর হচ্ছে 3542 এবং 3543। দেখুন তো সি-কম্পার্টমেন্ট কি?

কন্ডাকটার-গার্ড তাঁর হাতের চার্ট দেখে বললেন, হ্যাঁ, সি-কম্পার্টমেন্ট। যান বসুন।

সুজাতা উঠল বগীতে। সি-কম্পার্টমেন্টে ছোট্ট ক্যুপে। দরজা বন্ধ ছিল। টেনে খুলতেই দেখে ভিতরে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। একা। বছর চল্লিশ বয়স, স্যুট-পরা। ওকে দেখেই বললেন, মিসেস দাসগুপ্তা নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

—না, আমিও আপনাকে চিনি না। ক্যুপেটা মিস্টার অ্যান্ড মি:েস দাসগুপ্তের নামে রিজার্ভ করা তো—

—ও! তা আপনার কোন্ কম্পার্টমেন্ট?

—এখনও জানি না। আপনি ততক্ষণ আমার ব্যাগটা দেখুন, আমি কন্ডাকটার গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে আসি।—ব্যাগটা রেখেই নেমে গেলেন ভদ্রলোক। ব্যাগটা হচ্ছে BOAC-এর এয়ার ব্যাগ। সেটা রাখা ছিল জানলার ধারে। জানলার কাচটা বন্ধ। সুজাতা ব্যাগটা সরিয়ে দিল বেঞ্চির মাঝ বরাবর। জানলার ধারে গিয়ে বসল। কাচটা তুলে দিল। ঘড়িতে দেখল সাতটা পনের হয়েছে।

ঠিক তখনই কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। বছর ত্রিশেক বয়স। সুন্দর একহারা চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো। লম্বা জুলফি। নিঃসন্দেহে সুপ্রিয় দাসগুপ্ত। সুজাতাকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, ঐ ব্যাগটা আপনার?

সুজাতা বললেন, না। ঐ ভদ্রলোক রেখে গেছেন।—হাত বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো স্যুটপরা ভদ্রলোককে সে দেখিয়ে দেয়। ভদ্রলোক এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনছিলেন। আগন্তুক মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোককে একনজর দেখে নিলেন। তারপর সুজাতার দিকে ফিরে বললেন, আপনার রিজার্ভেশান কোথায়?

—এই ক্যুপেতেই। আপনার?

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে বাঙ্কটা পেতে ফেলেছেন। কুলি তার উপর বেডিংটা রাখছে। তার হাত থেকে মালপত্র নিয়ে ঘরটা সাজাতে সাজাতে ভদ্রলোক বললেন, আপনি ভুল করছেন। কন্ডাকটার গার্ডকে টিকিটটা দেখান, উনি আপনার কামরা দেখিয়ে দেবেন।

—উনিই আমার টিকিট দেখে বললেন, এই ক্যুপে।

কুলি পয়সা চাইল। ভদ্রলোক সে-কথা কানে তুললেন না। সুজাতাকে বলেন, কই দেখি আপনার টিকিট?

—আপনাকে টিকিট দেখাতে যাব কোন্ দুঃখে?

এই সময় দ্বারপথে এসে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সুজাতার বুঝতে অসুবিধা হল না,—উনি জীবন বিশ্বাস! ঝোলা গোঁফেই তাঁর পরিচয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, কী হল স্যার?

—কন্ডাকটার গার্ডকে ডাকুন তো। এ ভদ্রমহিলা অহেতুক ঝামেলা করছেন।

জীবনবাবুর বক্তাস্তটা শুনে সুজাতাকে বোঝাতে চাইলেন সে ভুল করছে। সুজাতা কোন পাত্তাই দিল না। অগত্যা ওঁরা ডেকে নিয়ে এলেন কন্ডাকটকর গার্ডকে।

—কী হল আবার আপনাদের?—দ্বারপথে এসে দাঁড়ায় কন্ডাকটার গার্ড।

সুপ্রিয় বললে, এ ভদ্রমহিলার কোন্ ঘরে রিজার্ভেশান আছে দেখে দিন তো?

—কই দিন তো আপনার টিকিট?—কন্ডাকটার গার্ড হাত বাড়ায়।

—বললাম না তখন, আমি মিসেস দাসগুপ্তা? টিকিট আমার স্বামীর কাছে আছে। আমাদের টিকিট নম্বর 3542 এবং 3543।

কন্ডাকটার গার্ড আবার তার চার্ট মেলাতে থাকে। সুপ্রিয় বাধা দিয়ে বলে, ওটা দেখতে হবে না। এই দেখুন, টিকিট নম্বর 3542 এবং 3543!

কন্ডাকটার গার্ড ফ্যালফ্যাল করে দুজনের দিকে তাকায়।

—ঐকে নামিয়ে দিন!—কঠিন কণ্ঠে সুপ্রিয় বলে।

—আপনি কাইন্ডলি নেমে আসুন—কন্ডাকটার গার্ড সুজাতাকে অনুরোধ করে।

—ইয়ার্কি নাকি! আগে আমার স্বামী আসুন, তার আগে আমি নামব না।

—কী আশ্চর্য! আপনার কাছে টিকিট নেই—

—কে বলল টিকিট নেই? টিকিট আমার স্বামীর কাছে আছে। উনি আসুন আগে—

—আমিও তো তাই বলছি, তিনি যতক্ষণ না আসেন—

—বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, বেশ তো, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না, মিসেস দাসগুপ্তা কোথায়? ঐ গুঁপো ভদ্রলোক কি মিসেস দাসগুপ্তা? ওঁর স্ত্রী কোথায়?

জীবনবাবু সুট করে সরে পড়েন।

কন্ডাকটার গার্ড-এর মনে হল সশরীরে টিকিটধারী ভদ্রলোকের স্ত্রীকে হাজির করতে পারলে হয়তো সমস্যার সুরাহা হবে। সুপ্রিয়কে বলে, ইয়েস, আপনার স্ত্রী কই?

—উনি এখনই আসবেন। টয়লেটে গেছেন।

সুজাতাও গম্ভীর হয়ে বলে, আমার কর্তাও এখনই আসবেন। টয়লেটে গেছেন।

ভীড়ের মধ্যে একজন যাত্রী কন্ডাকটার গার্ডকে বলে, সাতটা পঁচিশ হয়ে গেছে স্যার! জি.আর.পি.-কে ডাকুন। না হলে ট্রেন ছাড়তে দেরী হয়ে যাবে।

সুজাতা মুখ তুলে দেখল বক্তা আর কেউ নয়, কৌশিক মিত্র। ইতিমধ্যে বেশ ভীড় জমে গেছে। একজন পুলিস অফিসার মুখ বাড়িয়ে বলেন, এনি ট্রাবল্?

ইন্সপেক্টরের আবির্ভাবমাত্র অবস্থাটা পালটে গেল। প্রথমেই তিনি ভিড়টা হটিয়ে দিলেন—প্লীজ ক্লিয়ার আউট! ট্রেন এখনই ছাড়বে। যে-যার সীটে গিয়ে বসুন।

তারপর ঘরে ঢুকে তিনি কন্ডাকটার গার্ডের কাছে ব্যাপারটা সংক্ষেপে শুনে সুজাতার বিবুদ্ধেই রায় দিলেন। বললেন, আপনি নেবে আসুন। বোনাফাইড টিকেট-হোল্ডারকে সীট ছেড়ে দিন।

সুজাতা বোঝে আর দেরী করা ঠিক নয়। উঠে দাঁড়ায় সে। লেডিজ হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। পুলিস অফিসার BOAC মার্কা ব্যাগের পেটটা চেপে ধরে নেমে আসেন। সুজাতা বলে, ও ব্যাগটা আমার নয়।

—আই সী! আপনার?—পুলিস অফিসার প্রশ্ন করে সুপ্রিয়কে।

—হুঁ!—গম্ভীরভাবে সুপ্রিয় বলে, অন্য দিকে তাকিয়ে।

পুলিস অফিসার ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে কী ভেবে থেমে পড়েন। বলেন, কী আছে ব্যাগটায়? খুলুন তো?

সুপ্রিয় বুঝে ওঠে, কেন বলুন তো?

ইন্সপেক্টার মুখ তুলে একবার তাকায় তার দিকে। তারপর কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে খোলা ব্যাগের জিপটা টেনে ফেলে। হাত ঢুকিয়ে কী যেন স্পর্শ করে। পুনরায় বলে, ব্যাগটা আপনার?

সুপ্রিয় খিঁচিয়ে ওঠে, বলছি তো, না! কেন, কী হয়েছে?

ইন্সপেক্টর কন্ডাকটার গার্ডকে বলে, কুইক! গার্ডকে বলুন, গাড়ি যেন না ছাড়ে। সামথিং ফিশি! আমার নাম করে বলুন।

সুপ্রিয়র মুখটা সাদা হয়ে যায়। কৌশিক এবং ঝোলা গোঁফ না-পাত্তা। সুজাতা তখনও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কন্ডাকটার গার্ড ছুটে বেরিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর সুজাতা এবং সুপ্রিয় দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে বললে, এই ব্যাগটা কার? আইদার অফ য়ু! বলুন কার?

সুজাতা বললে, আমার নয়। আমি জানি না কার।

সুপ্রিয় বললে, আমি যখন ঘরে ঢুকি তখন ব্যাগটা এখানেই ছিল। উনি তখন ঘরে একা ছিলেন। ফলে ব্যাগটা ওঁর!

ইন্সপেক্টর ধমক দিয়ে ওঠেন। তাহলে তখন কেন বললেন ব্যাগটা আপনার?

—আমি সে কথা বলিনি।—সুপ্রিয় জবাবে জানায়।

—বলেছেন! উনি যখন বললেন ব্যাগটা ওঁর নয়। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনার?' আপনি বললেন 'হুঁ।' বলেননি?

—আমি তখন অন্যদিকে তাকিয়েছিলাম। দেখিনি, আপনি কোন্ ব্যাগটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। কেন, কী হয়েছে?

ইন্সপেক্টর ওদের দু'জনকে ভালভাবে দেখে নিল একবার। সুজাতাকে বললে, আপনার নাম অঞ্জলি দাসগুপ্তা? ঠিকানা?

সুজাতা অম্লানবদনে বললে, না, আমার নাম সুজাতা মিত্র।

—সুজাতা মিত্র! গুড গড! তাহলে এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলেছিলেন কেন?

—আমি বলব না!

—আই মে হ্যাভ টু অ্যারেস্ট য়ু!—হাত বাড়িয়ে ইন্সপেক্টর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। বলে, এ ব্যাগের ভিতর কী আছে জানেন?

হাত ঢুকিয়ে সে বার করে একটা লোডেড রিভলভার!

—কেন এতক্ষণ নিজেকে অঞ্জলি দাসগুপ্তা বলে চালাচ্ছিলেন? বলুন? জবাব দিন?

সুজাতা একটুও ঘাবড়ায় না। তার লেডিজ হ্যান্ড-ব্যাগের জিপটা খুলে ফেলে। একটা ছোট্ট আইডেন্টিটি কার্ড বার করে ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে বলে, আই রিপ্রেজেন্ট 'সুকৌশলী'! আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থে মিথ্যা কথা বলছিলাম। আমি জানতাম, এই কামরায় আজ একটা বিশ্রী কাণ্ড হতে যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর স্তম্ভিত হয়ে যায়। আইডেন্টিটি কার্ডটা পরীক্ষা করে বলে, 'সুকৌশলী!' এমন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফার্ম কলকাতা শহরে আছে বলে আমি জানতামই না!

—লালবাজারের সীলটা নিশ্চয় চিনবেন?

কার্ডটা পকেটে রেখে ইন্সপেক্টর সুপ্রিয়র দিকে ফেরে। বলে, আপনার নাম মিস্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত তা প্রমাণ করতে পারেন?

—নিশ্চয়ই। স্যুটকেসে আমার লেটার-হেড প্যাড আছে। ভিজিটিং কার্ড আছে।

—স্যুটকেসটা খুলুন!

—তার কি কোন প্রয়োজন আছে? অলরেডি পাঁচমিনিট লেট হয়ে গেছে ট্রেনটা ছাড়তে!

—আই সে ওপন ইয়োর স্যুটকেস।

সুপ্রিয় রুমাল দিয়ে মুখটা মুছল। তারপর বেঞ্চির নিচ থেকে টেনে বার করল স্যুটকেসটা। চাবি দিয়ে স্যুটকেসের ডালাটা খুলল। ওর হাত রীতিমত কাঁপছে। অতি সন্তর্পণে সে জামা-কাপড়ের নিচে হাত চালিয়ে লেটার-হেড প্যাডটা খুঁজতে থাকে। স্যুটকেসের উপর চাপা দেওয়া ছিল একটা নতুন তোয়ালে। হঠাৎ ক্ষিপ্র হাতে ইন্সপেক্টর তুলে ফেলল সেই তোয়ালেটা।

তার নিচে থাক দেওয়া দশটাকার নোট! এক স্যুটকেস বোঝাই!

—মাই গড! কত টাকা আছে ওখানে?

একটা ঢোক গিলে সুপ্রিয় বললে, এক লাখ টাকা।

—সব দশ টাকায়?

—হুঁ!

—বাক্সটা বন্ধ করুন!

আদেশ পালন করে সুপ্রিয়।

ইন্সপেক্টর সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, আপনি জানতেন, উনি একলাখ টাকা নগদে এবং দশটাকার নোটে নিয়ে যাচ্ছেন?

—না! আমার ইনফর্মেশান ছিল উনি দু-লাখ টাকা নগদে এবং দশটাকার নোটে নিয়ে যাচ্ছেন!

—আই সী।—ইন্সপেক্টার ঘুরে দাঁড়ায় সুপ্রিয়র মুখোমুখি, এ টাকা কোন্ ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন?

—ব্যাঙ্ক থেকে তুলিনি।

—ব্ল্যাক-মানি?

সুপ্রিয় মাথা নাড়ে—নেতিবাচক।

—মিস্টার দাসগুপ্ত, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে, নগদ এক লাখ টাকা আপনি দশটাকার নোটে নিয়ে যাচ্ছেন—উইথ এ লোডেড রিভলভার—

—ওটা আমার নয়।

—আয়াম সরি! য়ু আর আন্ডার অ্যারেস্ট! নেমে আসুন আপনি!

আবার বুঝে ওঠে সুপ্রিয়, আপনি—আপনি এভাবে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না! আমি বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার! আমি হিউজ কম্পেন্সেশন ক্লেম করব।

—করবেন! তার আগে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ওটা ব্ল্যাক-মানি নয়। নেমে আসুন আপনি! না হলে কিন্তু আমি আপনাকে হ্যান্ডকাফ দিয়ে মাজায় দড়ি বেঁধে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাব!

কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল সুপ্রিয়। পাশের কেবিন থেকে জীবন বিশ্বাস। সুজাতা মুখ তুলে দেখল, কৌশিকও নেমে পড়েছে ট্রেন থেকে। অগত্যা সেও নামল।

দশ মিনিট দেরীতে অনুমতি পেয়ে গুডফ্রাইডের সন্ধ্যায় রওনা হল বোম্বাই মেল। তার চার-চারটে ফার্স্ট ক্লাস বার্থ খালি!

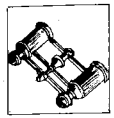

চার

শনিবার তের তারিখ সন্ধ্যায় জীবন বিশ্বাস এসে হাজির হল বাসু-সাহেবের চেম্বারে। একদিনেই লোকটা যেন অর্ধেক হয়ে গেছে। ভেঙে পড়ল সে একেবারে, হুজুর এবার বাঁচান আমাদের!

—কী হল আবার? আপনার না গতকাল বোম্বাই চলে যাবার কথা?

—তাই তো কথা ছিল স্যার। ট্রেন ছাড়ার আগে নেমে পড়তে হল আমাকে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বলি শুনুন ঃ

জীবন বিশ্বাস বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন ঘটনাটার। হোটেল থেকে যথাসময়ে ওঁরা স্টেশনে এসেছিলেন। কথা ছিল, মিস্টার দাসগুপ্ত ক্যুপেতে একা থাকবেন ট্রেন ছাড়ার সময়; এবং ট্রেন চলতে শুরু করলে পাশের কামরা থেকে জীবনবাবু এসে ওটাতে রাত্রে শোবেন। কিন্তু ঝামেলা বাধালেন এক ভদ্রমহিলা। জীবন তাঁকে চেনেন না, তিনি নাকি আগেভাগেই ঐ ক্যুপের একটা সীট দখল করে বসেছিলেন। বললেন, তাঁর নাম মিসেস্ অঞ্জলি দাসগুপ্তা। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার সেই ভদ্রমহিলা ওদের টিকিটের নম্বর দুটোও কী করে জানি সংগ্রহ করেছিলেন।

বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, সে আর শক্ত কী? ফার্স্ট-ক্লাস রিজার্ভেশান চার্টেই তো নামের পাশে টিকিট নম্বর লেখা থাকে।

—তবে তাই হবে স্যার; কিন্তু ভদ্রমহিলা ব্যাগে করে একটা লোডেড রিভলভার নিয়ে এসেছিলেন—

আনুপূর্বিক ঘটনার একটা বর্ণনা দাখিল করলেন জীবনবাবু। শোনা গেল, সুপ্রিয় দাসগুপ্ত জামিন পায়নি। তার বিরুদ্ধে পুলিস নাকি হত্যার অভিযোগ আনছে।

—মার্ডার কেস? খুন হল কে আবার? কখন?

জীবনবাবু তখন বিস্তারিত জানালেন সেই পূর্ব ইতিহাস। তিনি থানা থেকে মোটামুটি জেনে এসেছেন।

এগারই তারিখ, বৃহস্পতিবার রাত পৌনে আটটার সময় বড় বাজারে নিজের গদিতে খুন হয়েছেন একজন ধনী ব্যবসায়ী—এম. পি. জৈন। আটটায় দোকান বন্ধ হয়। ওঁরা ঝাঁপ ফেলার উদ্যোগ করছেন এমন সময় তিন-চারজন মুখোশধারী লোক হঠাৎ ঢুকে পড়ে দোকানে। তাদের একজনের হাতে ছিল রিভলভার আর সকলের ছোরা। গেটে ছিল দারোয়ান। সে বাধা দেবার চেষ্টা করায় প্রথমেই গুলিবিদ্ধ হয়ে উল্টে পড়ে। ডাকাতেরা দোকানে ঢুকে পড়ে। ক্যাশিয়ারের কাছে চাবি চায়। ক্যাশিয়ার ইতস্তত করে। তখন একজন ডাকাত তার কপালে রিভলভার উদ্যত করে ধরে। বাধ্য হয়ে ক্যাশিয়ার চাবির থোকাটা বার করে দেয়।

মালিক এম. পি. জৈনের একটা নিজস্ব রিভলভার ছিল তাঁর ড্রয়ারে। ডাকাতগুলো আয়রন সেফ খুলে নোট বার করতে ব্যস্ত আছে দেখে তিনি চট করে টানা ড্রয়ারটা খুলে রিভলভার বার করে ফায়ার করেন। কেউই তাতে গুলিবিদ্ধ হয় না। অপর পক্ষে ডাকাতদের একজন তখন মিস্টার জৈনকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। জৈন উল্টে পড়ে যান। তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ে। তখন আর একজন ডাকাত সেই রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়েই জৈনকে গুলি করে। তিন-চার মিনিটের ব্যাপার। ওরা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটা কালো অ্যাম্বাসাডার চেপে উধাও হয়ে যায়। তখন লোকজন ছুটে আসে। দেখা যায় এম. পি. জৈন মৃত। দারোয়ানটার আঘাত মারাত্মক নয়। ডাকাতেরা নগদে প্রায় ষাট হাজার টাকা নিয়ে যায়, এবং মৃত এম. পি. জৈনের রিভলভারটাও নিয়ে যায়!

এখন নম্বর মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে গতকাল বোম্বাই মেলের ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় ঐ BOAC মার্কা ব্যাগের ভিতর যে রিভলভারটা পাওয়া গেছে সেটা জৈনসাহেবের রিভলভার।

সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে তাই চার্জ হচ্ছে, ডাকাতি আর খুনের।

বাসু-সাহেব সমস্ত শুনে বললেন, কেসটা খারাপ। কাল রাত্রে ঐ পুলিস ইন্সপেক্টর যখন জিজ্ঞাসা করেছিল—'ব্যাগটা আপনার'? তখন সুপ্রিয় কেন বলেছিল, 'হুঁ'?

—ও অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিল স্যার। বুঝতে পারেনি কোন্ ব্যাগটার কথা হচ্ছে।

—আপমাকে ও তাই বলল?

—তার দেখা পেলাম কোথায় স্যার? হাজতে আমাকে যেতেই দিল না। বললে, একমাত্র ওর উকিল ছাড়া আর কারও সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেবে না। এখন আপনি যদি ওর কেসটা হাতে নেন স্যার!

একটু ভেবে নিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, নেব, কিন্তু এবার আর মৌফৎসে নয়।

—নিশ্চয় নয় স্যার, নিশ্চয় নয়—বলুন এবার কত দিতে হবে?

—আমার মোট ফি হবে দশহাজার টাকা, তার অগ্রিম পাঁচ হাজার এখনই দিতে হবে!

—দ-শ-হা-জা-র টাকা! কী বলছেন স্যার?

গম্ভীর হয়ে বাসু বললেন, জীবনবাবু, ফি নিয়ে দরাদরি আমি করি না। কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ক্রিমিনাল লইয়ার অনেকে আছেন এ-শহরে। অনেক কমেও হয়তো অনেকে রাজী হয়ে যাবেন। চেষ্টা করে দেখুন।

—না স্যার। আমিও বাজার যাচাই করতে যাব না। বেশ, ঐ দশ হাজারই দেব। টাকা তো আমার নয়, কোম্পানির! তবে স্যার আপনাকে আর একটা কাজও করে দিতে হবে। মামলায় যেন ঐ ব্ল্যাক-মানির প্রসঙ্গটা না ওঠে!

—সেটা অসম্ভব। এক লাখটাকা দশ টাকার নোটে ওর ব্যাগে কেন এল একথা উঠবেই। ভাল কথা, বাকি এক লাখ কি আপনার কাছে ছিল?

—হ্যাঁ স্যার। সেটা আবার ঐ হোটেলের ভল্টেই রেখেছি।

—পার্ক-হোটেলেই উঠেছেন ফের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অত টাকা নিয়ে আর কোথায় উঠব? এবার রুম নম্বর 78।

—আর একটা কথা। ঠিক খুনের সময়, অর্থাৎ এগারো তারিখ রাত পৌনে আটটায় আপনি আর মিস্টার দাসগুপ্ত কে কোথায় ছিলেন?

—দুজনেই মোকাম্বো রেস্তোঁরাতে খাচ্ছিলাম স্যার!

—মোকাম্বো! কেন পার্ক-হোটেলের খানা কি পছন্দ হচ্ছিল না?

—কী যে বলেন স্যার? আমি ছাপোষা গরিব মানুষ—ওসব খাবার কি চোখে দেখেছি কখনও? এগারো তারিখ রাতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে মোকাম্বোতে খাইয়েছিলেন ঐ রঘুপতি সিঙ্ঘানিয়া সাহেবের বড় ছেলে যদুপতিজী।

—ওঁরা কে?

—আজ্ঞে বড়কর্তার বাড়িটা রঘুপতিজী তাঁর বড় ছেলের নামে কিনলেন। ঐ এগারো তারিখের দুপুরেই রেজিস্ট্রি হল কিনা, তা আমি বললাম যদুপতিজী, অতবড় সম্পত্তি কিনলেন, আমাদের মিষ্টিমুখ করাবেন না? উনি তৎক্ষণাৎ আমাদের মোকাম্বোতে নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা সন্ধ্যা সাতটায় ঐ রেস্তোঁরাতে যাই এবং রাত সাড়ে নয়টায় বার হয়ে আসি। আমরা তিনজনেই খেয়েছিলাম।

—তিনজন বলতে আপনি, সুপ্রিয় এবং ঐ যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার!

—তাহলে কেসটা অনেক সরল। যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া একজন নামকরা ধনী নিশ্চয়—

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম-ট্যাক্স দেন!

—তাঁর সাক্ষীটা জোরালো হবে। ঠিক আছে, আমি এ-কেস নেব। রিটেনারটা দিয়ে যান।

—রিটেনার কী স্যার?

—অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা।

ক্যাশিয়ার জীবনবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মাজার কষি আলগা করে একটা কোমরবন্ধ বার করে আনেন। পাঁচ থাক নোটের বাণ্ডিল নামিয়ে রাখেন টেবিলে। বাসু-সাহেব টেলিফোনে রানী দেবীকে ডাকলেন। অল্প পরেই হুইল্-চেয়ারে মিসেস্ বাসু এসে উপস্থিত হলেন ওঁর ঘরে। বাসু বললেন, এঁকে একটা পাঁচ হাজার টাকার রসিদ লিখে দাও। রসিদটা হবে মিস্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত, ম্যানেজার, কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানির নামে।

জীবন বিশ্বাস চমকে উঠে বললে, কেন স্যার? টাকা দিচ্ছি আমি, রসিদ কেন ম্যানেজারের নামে হবে?

—কারণ সুপ্রিয় দাসগুপ্তই আমার ক্লায়েন্ট । আপনি নন।

জীবন বিশ্বাস ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, তার মানে কি এটাই ধরে নেব স্যার, যে আপনি ইঙ্গিত করতে চাইছেন আপনার ক্লায়েন্টের স্বার্থে আপনি আমারও বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন?

—না! ইঙ্গিত করছি না। স্পষ্টাক্ষরে সে-কথা জানাচ্ছি! টাকা আপনি টেবিলে রেখেছেন। আমি তা নিইনি এখনও। ঐ শর্তেই আমি কাজটা হাতে নেব।

জীবন বিশ্বাস গোঁজ হয়ে বসে রইলেন কয়েক সেকেন্ড! তারপর বললেন। ঠিক আছে, রাখলেও আপনি, মারলেও আপনি—

রানী দেবী বললেন, আসুন আপনি। রসিদটা নিয়ে যাবেন।

পরদিন রবিবার। সকালবেলা প্রাতরাশের টেবিলে বসেছিলেন বাসু-সাহেব,সুজাতা আর রানী দেবী। কৌশিক অনুপস্থিত। সুজাতাই এখন রান্নাঘরের হেপাজতে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন রানী দেবী। তার চেয়েও বড় কথা নিঃসঙ্গতাটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। অনেক—অনেকদিন পরে বাড়িটা কলমুখর হয়ে উঠেছে।

সুজাতা প্রশ্ন করে, আপনার ক্লায়েন্ট কী বলল শেষ পর্যন্ত?

বাসু-সাহেব শনিবার বিকালেই হাজতে গিয়ে দেখা করেছিলেন সুপ্রিয়র সঙ্গে। জামিন দেওয়া হয়নি তাকে। কথাবার্তা বলে বাসু-সাহেবের মনে হয়েছে খুনের মামলায় সে বেচারি বেমক্কা জড়িয়ে পড়েছে। সুপ্রিয় দাসগুপ্ত বোম্বাইয়ের একটা নামকরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। বিবাহিত। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া সে কলকাতার সমাজের খবর বড় একটা রাখে না। প্রবাসী বাঙালী। তার পক্ষে সাতদিনের জন্য কলকাতায় এসে ডাকাতির দলে ভীড়ে পড়া একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে ব্যাগটার মধ্যে রিভলভারটা পাওয়া গেছে ওটা সুপ্রিয় সঙ্গে করে আনেনি। সুজাতা নিজেই তার সাক্ষী। সুজাতা ডিফেন্স-এর তরফে সাক্ষী দিলে সুপ্রিয়র ঐ অন্যমনস্কভাবে 'হুঁ' বলার অপরাধটা গুরুত্ব পাবে না। তাছাড়া সুপ্রিয়র অকাট্য অ্যালিবাই আছে। দু-দুজন সাক্ষীর সঙ্গে সে মোকাম্বোতে নৈশ-আহার করছিল ঠিক যে-সময়ে বড়বাজারে খুনটা সংঘটিত হয়। দু-জন সাক্ষীর একজন অবশ্য ওরই অধীনস্থ কর্মচারী—কিন্তু দ্বিতীয়জন বিশিষ্ট নাগরিক।

রানী দেবী বলেন, তাহলে কাল থেকে এত কী ভাবছ তুমি?

—ভাবছি? হ্যাঁ ভাবছি অন্যদিক থেকে। দুটো কথা আমি ভাবছি। প্রথম, ঐ মিস ডিক্রুজার ব্যাপারটা। মিস ডিক্রুজা নামটা তোমার মনে আছে সুজাতা?

—আছে। দার্জিলিঙ-এর খুনের কেসটার প্রসঙ্গে এক মিস্ ডিক্রুজাকে আমরা খুঁজছিলাম; কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—কারেক্ট! কিন্তু এটুকু বোঝা গিয়েছিল মেয়েটা নষ্ট-স্বভাবের।

রানী দেবী বলেন, কিন্তু মিস্ ডিক্রুজা নামে কলকাতায় কি একটিই মেয়ে আছে?

—না নেই। কিন্তু ঐ নামটা আমাকে কেমন যেন হন্ট করছে।

—আর আপনার দ্বিতীয় চিন্তার কারণ?

—মাইতি হঠাৎ এত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কেন?

মিসেস বাসু বলেন, মাইতিটা কে?

বাসু-সাহেব বুঝিয়ে বলেন, নিরঞ্জন মাইতি হচ্ছেন পাবলিক প্রসিকিউটার। অর্থাৎ কোর্টে যখন কেস উঠবে তখন নিরঞ্জন মাইতি ওঁর বিরুদ্ধে সওয়াল করবেন, সরকার পক্ষে। মাইতি নাকি গতকাল বার-অ্যাসোসিয়েশানের আড্ডায় বলেছেন, বাসু-সাহেব কেন যে এই বুড়ো বয়সে তাঁর নিজের রেকর্ডটা ভাঙতে এলেন! বেচারি!

সুজাতা বলে, নিজের রেকর্ডটা ভাঙতে মানে?

বাসু জবাব দিলেন না। জোড়া পোচের প্লেটটা টেনে নিলেন।

রানী বললেন, উনি আজ পর্যন্ত কোনও কেসে হারেননি। মানে, মার্ডার কেসে!

সুজাতা প্রশ্ন করে, সত্যি কথা বাসু-মামা?

শ্রাগ করে ব্যারিস্টার বাসু বলেন, এ ফ্যাক্ট কান্ট বি ডিনায়েড! হ্যাঁ, ঘটনাচক্রে কোনও মার্ডার কেসেই আমি কখনও হারিনি সুজাতা। তাই আমি শুধু ভাবছি, মাইতি ও কথা বলল কেন? সে নিশ্চয়ই এমন কিছু প্রমাণ পেয়েছে, এমন সাক্ষীর খোঁজ পেয়েছে যাতে কোর্টে আমাকে হঠাৎ চমকে দেবে! সেটা যে কী, তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না! বাট হি মাস্ট বি হ্যাভিং সামথিং আপ হিজ স্লিভ!

মিসেস বাসু প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললেন, কৌশিককে কোথায় পাঠালে?

—রাঁচি।

—রাঁচিতে কেন?

বাসু-সাহেব দাখিল করেন তাঁর যুক্তি। পার্ক-হোটেলের আটত্রিশ নম্বর ঘরের ঐ ভদ্রমহিলা আসলে কে, সেটা তাঁকে জানতে হবে। ঐ মেয়েটার সম্বন্ধে দুজনে দু-রকম কথা কেন বলছে?

—'দুজনে দু-রকম কথা' মানে?

—জীবন বিশ্বাস বলছে পাশের কামরায় ডি-সিল্‌ভাকে সে দেখেছে এবং ঐ মেয়েটির সঙ্গে সে সুপ্রিয়কে কথা বলতেও দেখেছে। অথচ সুপ্রিয় সরাসরি অস্বীকার করছে। পাশের ঘরের ঐ মেয়েটির অস্তিত্বই না কি সে জানে না।

—কেসটা কবে কোর্টে উঠবে?

—চার্জ ফ্রেম করা হয়ে গেছে। প্রাথমিক শুনানিও। কেস উঠবে বৃহস্পতিবার।

—এত তাড়াতাড়ি আপনি তৈরি হতে পারবেন?

—তৈরি আমাকে হতেই হবে সুজাতা। আমার মক্কেল জামিন পায়নি!

সোমবার সকালে বাসু-সাহেবের জুনিয়ার প্রদ্যোৎ নাথ এসে জানালো—জীবন বিশ্বাসকে সামন করা হয়েছে স্যার; কিন্তু তার আগেই ওকে থানা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে একটা এজাহার দিয়ে এসেছে—

—তাই নাকি? তা এজাহারে কী বলেছে সে?

—আমাদের কাছে যা বলেছে সেই সব কথাই। তবে ব্ল্যাক-মানির কথা স্বীকার করেনি!

—অ্যালিবাই-এর কথা?

—তা বলেছে। জীবনবাবু বললেন, থানা অফিসার ঐ মোকাম্বোর ব্যাপারে খুব বিস্তারিত প্রশ্ন করেছে। কখন ওঁরা আসেন, কখন যান—মায় কে কোন্ আইটেম খেয়েছেন তাও।

—সব কথাই সে সত্যি বলেছে তো?

—তাইতো বললেন আমাকে।

—আর যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া? তাকে সমন ধরানো হয়েছে তো?

—না স্যার? তিনি বাড়ি ছেড়ে একেবারে নিরুদ্দেশ।

—নিরুদ্দেশ! মানে? কেউ জানে না তিনি কোথায়?

—আজ্ঞে না। আমার মনে হয় পাছে আদালতে ঐ দু-লাখ টাকা ব্ল্যাক-মানির প্রসঙ্গটা উঠে পড়ে, তাই তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন।

বাসু-সাহেব বলেন, তবে তো কেসটা আবার কাঁচিয়ে গেল?

রাত্রের ট্রেনে কৌশিক ফিরে এল। রাঁচি থেকে সে জেনে এসেছে—মিস্টার ডি.সিল্‌ভাকে সত্যই

আট তারিখে ওখানকার মানসিক হাসপাতাল থেকে মুক্ত করা হয়। তাকে নিয়ে যায় তারই দিদি মিস্ ডি.সিল্‌ভা। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ মেয়েটির যা বর্ণনা দিয়েছেন, পার্ক-হোটেলের বেয়ারা হরিমোহনও তাই দিয়েছে। সুতরাং ওখানে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

—কিন্তু তাহলে সুপ্রিয় কেন তার অস্তিত্বটাই অস্বীকার করছে?

সন্ধ্যাবেলা গাড়িটা বার করে বাসু-সাহেব কৌশিককে নিয়ে চলে গেলেন চৌরঙ্গী অঞ্চলে। প্রথমে মোকাম্বো। সেখানে কিছুই সুবিধা হল না। না ওঁদের ম্যানেজার, না কোনও বেয়ারা—কেউই ধনকুবের যদুপতি সিঙ্ঘানিয়াকে চেনে না। সেটাই স্বাভাবিক। এমন কত লক্ষপতি আছে কলকাতা শহরে যারা নিত্য মোকাম্বোতে এসে সান্ধ্য আসর জমায়—খাদ্যে আর পানীয়ে।

দ্বিতীয়ত পার্ক-হোটেলে। এখানে হরিমোহন বরং কিছু খবর দিতে পারল। হ্যাঁ, আটত্রিশ নম্বরের সেই মেম-সাহেবকে তার মনে আছে; তার পাগল ভাইকেও। না, সে চেঁচামেচি কিছু করত না। কেমন যেন জড়বুদ্ধি, ধন্ধধরা মানুষ। সবসময় গোঁজ হয়ে বসে থাকত একটা চেয়ারে। মেমসাহেব তাকে নিয়ে দিবারাত্র একটা গাড়িতে করে ঘুরত। তার চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্যই হবে হয়তো। কবে তারা চলে যায়?—বারো তারিখ সকালে। ঠিক কখন তা সে জানে না। তখন সে ওখানে ছিল না। দারোয়ান বলতে পারে।

দারোয়ানকেও প্রশ্ন করা হল। তারও মনে আছে ওদের প্রস্থান পর্বটা। সে ঐ মেমসাহেব বা সাহেবকে আগে দেখেনি। তবে মনে আছে এজন্য যে, সাহেবটাকে প্রায় ধরাধরি করে এনে গাড়িতে তোলা হয়েছিল। তখন দারোয়ান ভেবেছিল সাহেবটা মাতোয়ালা। পরে শুনেছে—না, সে পাগল।

—আর কিছু মনে পড়ছে না তোমার?

—নগদ পাঁচ টাকা বকশিশ পেয়েছে দারোয়ান। অনেক চিন্তা করে বলল, আরও একটা কথা মনে পড়ছে স্যার। ঠিক রওনা হবার আগে ড্রাইভার মেমসাহেবকে বলেছিল, জি. টি. রোড খারাপ আছে। আমরা দিল্লী রোড হয়ে যাই বরং।

—ট্যাক্সি না প্রাইভেট গাড়ি?

—না, সাব, প্রাইভেট গাড়ি।

বাসু-সাহেব মানি ব্যাগ খুলে আরও পাঁচটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, থ্যাঙ্কু!

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন উনি। কৌশিক বললে, ব্যাপার কি? আপনি যে আজ দাতাকর্ণ!

বাসু রোষ-কষায়িত নেত্রে একবার তাকালেন কৌশিকের দিকে। কোন কথা বললেন না। বাড়িতে ফিরে এসেও নয়। সোজা ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে। ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে বাইরে গেলেন। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, সুজাতা, দুটো ট্রাঙ্ককল বুক কর। একটা বোম্বাই। লাইটনিং কল। নম্বর এই নাও। পি. পি. মিস্টার সি. বরুয়া। দ্বিতীয়টা বর্ধমানের সদর থানার ও. সি! ওটাও পি. পি. এবং লাইটনিং! নাম নৃপেন ঘোষাল। নম্বরটা 183 ডায়াল করে জেনে নাও।

সুজাতা ওঁর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কোন প্রশ্ন করল না। এগিয়ে গেল টেলিফোনটার দিকে।

দুটি লাইনই পাওয়া গেল অল্পকালের মধ্যে। প্রথমে এল বর্ধমান।

রিসিভারটা তুলে বাসু-সাহেব বললেন, কে নৃপেন? আমি পি. কে. বাসু; চিনতে পারছ?...হ্যাঁ, একটা উপকার করতে হবে। খোঁজ নিয়ে জানাও তো, যে, শুক্রবার বারো তারিখে বর্ধমানে সাম মিস্টার ডি.সিল্‌ভা এবং মিসেস ডি. সিল্‌ভা কোথায় উঠেছেন।...না, না একটু শোন ডিটেলস্‌টা। মিস্টার সিল্‌ভার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, লম্বা একহারা। বিকৃতমস্তিষ্ক...ইয়েস, ম্যাড! তার দিদি তাকে একটা কালো অ্যাম্বাসাডারে নিয়ে যায় বারো তারিখ, বেলা আটটায়। তার মানে এগারোটা নাগাদ ওরা বর্ধমানে পৌঁচেছে। চেক অল্ দা হোটেলস্, রেস্ট হাউসেস্, অ্যান্ড য়ু নো বেটার হোয়্যার। ভাড়া বাড়িতেও উঠতে পারে। কালো রঙের অ্যাম্বাসাডারটাকে স্পট করার চেষ্টা কর বরং।...কী? না! বর্ধমান ছেড়ে যায়নি। গেলেও কাছে-পিঠে কোনখানে আছে।...ইয়েস! খবর পেলেই আমাকে জানাবে। থ্যাঙ্কু!

নৃপেন ঘোষাল একটি বদলি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাসু-সাহেবের কাছে প্রভূতভাবে উপকৃত। বেচারিকে নৌকায় পা দিয়ে চলতে হয়—সরকারী চাকরি আর ডিফেন্স কাউন্সিলার প্রতাপশালী ব্যারিস্টার . কে. বাসু।

দ্বিতীয় ফোনটা ধরলেন বাসু-সাহেবের বোম্বাই-প্রবাসী এক বন্ধু—চন্দ্রকান্ত বরুয়া। তাঁকে বললেন, একটু কষ্ট দিচ্ছি। বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে তাদের ম্যানেজার সুপ্রিয় দাসগুপ্তর স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। বেচারি বোধহয় এখনও জানে না, তার স্বামী কলকাতায় এসে একটা বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। ...কী? না, মার্ডার চার্জ! তোমাকেই বললাম ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে। তুমি মেয়েটিকে মার্ডার-চার্জের কথা বল না। আমার নাম করে বল, তার সাক্ষী খুব জরুরী দরকার। সে যেন নেক্‌স্ট অ্যাভেইলেবল্ প্লেনে ক'লকাতা চলে আসে। প্যাসেজ-মানি তার কাছে যদি না থাকে, তুমি আমার হয়ে দিয়ে দেবে। মেয়েটি যদি পারে তবে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যেন সোজা আমার বাড়িতে চলে আসে। যদি পার, তবে ওকে প্লেনে তুলে দিয়ে আমাকে একটা ফোন কর। ...ইয়েস্ ইয়েস্... অল এক্সপেনসেস আর মাইন! চিয়ারিও!

পাঁচ

বৃহস্পতিবার সকাল। প্রতিবাদী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের আজ প্রাথমিক হিয়ারিং হবে। বাসু-সাহেব আর সুজাতা তৈরি হয়ে নিল। সুজাতা প্রতিবাদী পক্ষের সমন পেয়েছে। প্রদ্যোৎ নাথ সরাসরি কোর্টে যাবে। ওঁরা রওনা হতে যাবেন এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু-সাহেব ধরলেন।

'ফোন করছেন প্রবীণ ব্যারিস্টার এ. কে. রে। এখন বয়স আশির কোঠায়। ত্রিশ বছর হল তিনি প্র্যাক্‌টিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর আমলে রে-সাহেব ছিলেন কলকাতার সবচেয়ে নামকরা ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার মহলে তাঁকে বলা হত 'বারওয়েল দ্য সেকেন্ড'। বারওয়েল ছিলেন কলকাতা বারের বিখ্যাত শেষ ইংরাজ ব্যারিস্টার। পি. কে. বাসু প্রথম যৌবনে ঐর কাছেই জুনিয়ার হিসাবে কাজ শিখেছেন, ব্যারিস্টারী পড়তে যাবার আগে। রে-সাহেব ওঁকে শুভেচ্ছা জানালেন, বললেন, অনেক অনেকদিন পর কোর্টে বের হচ্ছ, তাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি!

বাসু বললেন, শুভেচ্ছা কেন স্যার? বলুন আশীর্বাদ!

—বেশ আশীর্বাদই। কিন্তু একটা কথা, বাসু। গতকাল নিরঞ্জন মাইতি হঠাৎ আমার কাছে এসেছিল। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেল আজ কোর্টে উপস্থিত থাকতে। আমি তো আজ বিশ-ত্রিশ বছর কোর্টে যাইনি। হঠাৎ এ নিমন্ত্রণটা হল কেন বল তো?

—জানি না। আন্দাজ করতে পারি। সে কী বলল?

—বলল, অনেকদিন পর আপনার শিষ্য আজ সওয়াল করছে, আপনি আসবেন স্যার। আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছি! কিন্তু ওর মুখ-চোখ দেখে আমার মনে হল, মানে...

—আপনার দৃষ্টি ভুল করে না, স্যার। আপনি ঠিকই ভেবেছেন—মাইতি বার অ্যাসোসিয়েশানেও বলে এসেছে এই কেস-এ সে আমার রেকর্ড ভাঙবে! অর্থাৎ অ্যাকিউস্‌ড-এর কনভিকশান হবে!

—কেসটা কী? তিনশ দুই?

—ইয়েস স্যার!

—কী বুঝছ? কেসটা কী খারাপ?

—ফিফটি ফিফটি! কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মাইতি এমন কিছু এভিডেন্স পেয়েছে যার কোন হদিসই আমি এখনও পাইনি—হি হ্যাজ্ সামথিং আপ হিজ্ স্লিভ! কোর্ট-এর ভিতর ড্রামাটিক্যালি সেটা সে পেশ করতে চায়—তাতেই আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করছে!

—আমারও তাই মনে হল। এনি ওয়ে—যদি প্রয়োজন মনে কর তাহলে কোর্ট থেকে ফেরার পথে আমার সঙ্গে কনসাল্ট কর। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, য়ু ক্যান ওয়েল অ্যাপ্রিশিয়েট, বাসু—আই জাস্ট কান্ট অ্যাফোর্ড টু সি মাই হিদারটু আনডিফিটেড কোলীগ—

—কোলীগ নয় স্যার, শিষ্য বলুন!

—ওয়েল মাই বয়! শিষ্যই। ...যাক্ তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেস্ট অফ লাক!

প্রবীণ গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে বাসু-সাহেব যখন কোর্টে এসে উপস্থিত হলেন তখন কোর্ট বসেছে। আদালতে তিল ধারণের স্থান নেই। ব্যারিস্টার পি.কে.বাসু নতুন করে প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করছেন এ খবর আইনজীবী মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। বার অ্যাসোসিয়েশান ভেঙে পড়েছে। দর্শকদের আসন অনেক আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে। অনেকে দেওয়াল ঘেঁষে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু প্রেসের লোকও এসেছে। কোর্ট থেকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আদালত চলা কালে কোন ফটো না তোলা হয়।

বিচক্ষণ বিচারক জাস্টিস্ সদানন্দ ভাদুড়ী নিজের আসনে এসে বসলেন। জুরির মাধ্যমে আজকাল আর বিচার হয় না। জুরি নেই। একটু নিচের ধাপে বসে আছে দুজন কোর্ট পেশকার। প্রথা-মাফিক বাদী ও প্রতিবাদী প্রস্তুত আছেন কিনা জেনে নিয়ে বিচারক বিচার আরম্ভ ঘোষণা করলেন। পাবলিক প্রসিকিউটার বিশালায়তন প্রবীণ আইনজীবী নিরঞ্জন মাইতির দিকে তাকিয়ে বলেন, প্রারম্ভিক ভাষণ?

মাইতি খুশিতে ডগমগ। উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বললেন, আদালত যদি অনুমতি দেন, আমি একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে ইচ্ছুক। আমরা আশা রাখি যে, আমরা প্রমাণ করব—আসামী সুপ্রিয় দাশগুপ্ত গত এগারোই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রাত প্রায় পৌনে আটটার সময় বড়বাজারে মিস্টার এম. পি. জৈনের গদীতে আরও তিনটি সঙ্গীর সঙ্গে অনধিকার প্রবেশ করে। আমরা প্রমাণ করব যে, সে ভয় দেখিয়ে ঐ দোকানের ক্যাশিয়ার সুকুমার বসুর কাছ থেকে ষাট হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং মিস্টার এম. পি. জৈনের নিজের রিভালভারটি তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে। আমরা আশা রাখি, আসামী সুপ্রিয় দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ, ডাকাতি, আনলাইসেন্সড্ রিভলভার রাখা ও হত্যার অপরাধ প্রমাণিত হবে। এবং আমরা আশা রাখি, মহামান্য আদালত এ ক্ষেত্রে আসামীর প্রতি চরমদণ্ড বিধান করবেন!

এই কথা বলে নিরঞ্জন মাইতি আসন গ্রহণ করলেন। উকিল মহলে একটা গুঞ্জন উঠল। পি. পি. নিরঞ্জন মাইতিও শুরুতেই একটি রেকর্ড করলেন! এত সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ নাকি তিনি জীবনে দেননি।

জজ-সাহেবও বোধকরি এটা আশা করেননি। মাইতি শেষ করার পরেও তিনি আশা করেছিলেন, মাইতি বুঝি আবার উঠে কিছু বলবেন। মাইতি সত্যই উঠলেন আবার। হেসে বললেন, দ্যাটস্ অল মি' লর্ড!

জাস্টিস্ ভাদুড়ী এবার প্রতিবাদী আইনজীবীদের দিকে ফিরলেন। পাশাপাশি বসে আছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু এবং তাঁর সহকারী প্রদ্যোৎ নাথ। জাস্টিস্ ভাদুড়ী বললেন, এবার আপনারা প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে পারেন।

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কিছু একটা বলতে গেলেন! হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল আদালতের প্রবেশ-দ্বারের দিকে। চমকে উঠলেন উনি। সংক্ষেপে বিচারককে বললেন, দ্যাটস্ অল মি' লর্ড! আমি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দেব না!

বিচারকের দিকে একটি বাও করে বাসু-সাহেব তাঁর আসন ছেড়ে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে। শুভ্রকেশ অতি বৃদ্ধ এ.কে.রে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর হাতটা ধরলেন। হাসলেন রে সাহেব। বাসু ওঁকে নিয়ে এসে বসালেন নিজ আসনের পাশে। বৃদ্ধ এ.কে.রে স্থির থাকতে পারেননি। এসে উপস্থিত হয়েছেন আদালতে। কোর্টে একটা গুঞ্জন উঠল। জুনিয়র উকিল যাঁরা

এ. কে. রে-র নাম শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখেনি, তারা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে দেখতে চায়। জাস্টিস ভাদুড়ী তাঁর হাতুড়িটা ঠুকলেন। এ. কে. রে বিচারককে একটা থাও করে আসন গ্রহণ করলেন। বিচারক ভাদুড়ীও হাত নেড়ে প্রত্যভিবাদন করলেন হেসে।

জজ-সাহেব মাইতিকে বললেন, আপনি প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

প্রথম সাক্ষী ঃ ডাঃ রামকুমার অধিকারী।

রামকুমার যথারীতি শপথ নিয়ে সাক্ষীর মঞ্চ থেকে তাঁর নাম, পরিচয়, পেশা ইত্যাদি জানালেন মাইতি মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে। স্বীকার করলেন, তাঁর ডিস্‌পেনসারি ঐ জৈন-সাহেবের গদীর কাছেই। ঘটনার দিন রাত আটটা বেজে তিন মিনিটে একজন লোক ছুটে এসে বলে জৈন-সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শুনেই তিনি দেখতে যান। ওঁর ডাক্তারখানা থেকে যেতে ওঁর আন্দাজ দু'মিনিট লাগে। সুতরাং আটটা পাঁচ মিনিটে তিনি প্রথমে জৈন-সাহেব এবং পরে দারোয়ানকে পরীক্ষা করেন। জৈন মারা গেছেন, আর দারোয়ানের বাঁ-কাঁধে গুলি বিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তিনি জানতে চান যে, পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে কি না। ভীড়ের মধ্যে একজন, কে তা তিনি বলতে পারবেন না—জানায় যে, থানা এবং অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা হয়েছে। মিনিট দশেকের ভিতরেই অ্যাম্বুলেন্স এসে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিসও।

মাইতি প্রশ্ন করেন, মিস্টার জৈন কখন মারা গেছেন বলে আপনার বিশ্বাস?

—এগার তারিখ রাত আটটা পাঁচ মিনিটের আগে।

—না না, কত আগে? রাত আটটা পাঁচ মিনিটে তাঁকে যখন মৃত অবস্থায় দেখেছেন তখন ও-জবাব আমি চাইছি না।

দেখা গেল রামকুমার অত্যন্ত সতর্ক সাক্ষী। জবাবে বললেন, কত আগে তা অটোপ্সি সার্জেন বলতে পারেন। আমি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিনি।

মাইতি বিরক্ত হয়ে বলেন, কী আশ্চর্য! আপনার পাশের দোকানে ডাকাতি হল, চেঁচামেচি হল, গুলির আওয়াজ হল—

—গুলির আওয়াজ স্বকর্ণে শুনেছি, একথা আমি বলিনি।

—তা শোনেননি, কিন্তু হৈ-চৈ চেঁচামেচি তো শুনেছেন?

—শুনেছি। কিন্তু সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি বলি যে, মৃত্যু রাত পৌনে আটটার পরে হয়েছে তবে ঐ উনি কোর্টের মধ্যে আমার প্যান্টলুন খুলে নেবেন! ওঁকে আমি চিনি—

সাক্ষী ডিফেন্স-কাউন্সিলার পি. কে. বাসুকে ইঙ্গিত করেন। বাসু-সাহেব তখন একদৃষ্টে একটা নথি পড়ছিলেন। চোখ তুলে দেখলেন না। কোর্টে একটা মৃদু হাস্যরোল উঠতেই জাস্টিস্ ভাদুড়ী হাতুড়ি পিটলেন। বিচারক সাক্ষীকে বললেন, আপনি অবান্তর কথা বলবেন না। প্রশ্নের যা রেঞ্জ উত্তর তার মধ্যেই সীমিত রাখুন।

মাইতি বললেন, দ্যাট্‌স্ অল মি' লর্ড।

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, নো ক্রস্ এক্সামিনেশান।

এবার সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন সরকারপক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী অটোপ্সি সার্জেন ডাঃ অতুলকৃষ্ণ স্যান্যাল। তিনিও তাঁর পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে স্বীকার করলেন, মৃত মিস্টার জৈনের শবদেহ তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সীসার গোলকটি মৃতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁজরের মাঝামাঝি অংশ দিয়ে হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে, ঠিক যেখানে 'সুপিরিয়র ভেনা কাভা' এবং দক্ষিণ দিকস্থ 'পালমোনারি আর্টারি' এসে পড়েছে হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ আটিয়ামে। ফলে দক্ষিণ আটিয়াম বিদ্ধ হয়, তারপর ঐ সুপিরিয়র ভেনা কাভাকে ফুটো করে এবং দক্ষিণ পালমোনারি আর্টারিদ্বয়ের উপর দিকের ধমনীটি বিচ্ছিন্ন করে সীসার গোলকটি পিঠের দিকে চলে যায়। শিরদাঁড়ার একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রাতে আহত হয়ে সেটা হৃদপিণ্ড অঞ্চলেই আটকে থাকে। যেহেতু 'সুপিরিয়ার ভেনা কাভা' এবং হৃদপিণ্ডের আর্টিয়াম

মানবদেহে অতি আবশ্যিক প্রত্যঙ্গ—যাকে বলে ভাইটাল-অর্গান, তাই কয়েক মিনিটের ভিতরেই গুলিবিদ্ধ জৈনের মৃত্যু হয়েছিল বলে তাঁর বিশ্বাস।

মাইতি প্রশ্ন করেন, আপনি যা বললেন তা থেকে বোঝা যাচ্ছে গুলিটা জমির সমান্তরালে যায়নি, ক্রমশঃ উঁচু থেকে নিচু দিকে গিয়েছে। তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বুকের যেখান দিয়ে ঢুকেছে এবং পিঠের যেখানে আটকেছে এতে গুলিটা কতখানি নেমেছে?

—পাঁচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ প্রায় দু-ইঞ্চি।

—এ থেকে কি আপনার ধারণা যে-লোকটা গুলি করেছে, সে মৃত ব্যক্তির চেয়ে উচ্চতায় বেশি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার উত্তরের সাধারণ-বোধ্য বৈজ্ঞানিক একটা ব্যাখ্যা দিন—

ডাক্তার সান্যাল মনে হয় এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি মানব-কঙ্কালের একটি বড় চার্ট পিছনের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। লম্বা একটা লাঠি দিয়ে দেখালেন ঠিক কোন্ স্থানে গুলিটা বুকে প্রবেশ করেছে এবং কোন্ অস্থিতে আটকে ছিল। উনি বললেন, মানুষে সচরাচর গুলি করে নিজের বুকের সমতলে রিভলভারটা ধরে। ফলে আহত ব্যক্তির ঠিক বুকেই যদি গুলিবিদ্ধ হয় এবং দেখা যায় সেটা ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমেছে তবে আন্দাজ করতে পারা যায় হত্যাকারীর উচ্চতা আহতের চেয়ে বেশী ছিল।

—মিস্টার জৈন-এর উচ্চতা কত ছিল?

—ঠিক পাঁচ ফুট।

—আপনার হিসাবমত আততায়ীর উচ্চতা কত হবে?

—তা ঠিক করে বলা শক্ত। তবে আন্দাজে বলা যায়, সাড়ে পাঁচ ফুটের উপরে তো বটেই।

—আমার জেরা এখানেই শেষ—বসে পড়েন মাইতি।

ব্যারিস্টার বাসু জেরা করতে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ডক্টর সান্যাল—ঐ যে বললেন, আপনার মতে আততায়ীর উচ্চতা আহত জৈন-এর চেয়ে বেশী ছিল—এটা আপনার আন্দাজ, বিশ্বাস না স্থির সিদ্ধান্ত।

—না, স্থির সিদ্ধান্ত নয়, আবার আন্দাজও নয়—ওটা আমার যুক্তি-নির্ভর অনুমান!

—আই সী! যুক্তি-নির্ভর অনুমান! কী যুক্তি?

—তাই তো আমি বোঝালাম এতক্ষণ।

—আমি বুঝিনি।

—সেটা আমার দুর্ভাগ্য! আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

—তা বললে তো চলবে না ডক্টর সান্যাল। আপনি মানবদেহ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ; কিন্তু আমি শারীর-বিদ্যার কিছুই জানি না। আমাদের বোধগম্য ভাষায় আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বইকি। আচ্ছা, আমি একে একে প্রশ্ন করি। আমাকে বুঝিয়ে দিন।—ধরুন গুলি করার মুহূর্তে যদি আততায়ী বা আহতের মধ্যে একজন বসে থাকত অথবা কুঁজো হয়ে দাঁড়াত তাহলে আপনার যুক্তিনির্ভর অনুমানটা টেকে না, কেমন?

—না, টেকে না।

—আততায়ী যদি তার নিজের বুকের সমতলে রিভলভারটা না ধরে তাহলেও ও-যুক্তি টেকে না? কারেক্ট?

—ইয়েস!

—আপনি জানেন যে, আয়রন সেফটায় পৌঁছতে গেলে দুটি ধাপ উঠতে হয়। সেক্ষেত্রে আততায়ী যদি সেই সিঁড়ির উপর থেকে গুলি ছুঁড়ে থাকে তবে বামন হওয়া সত্ত্বেও গুলি ঐ ভাবে মৃতের দেহে

ঢুকতে পারত। অ্যাম আই কারেক্ট?

একটু ইতস্তত করে সাক্ষী বলেন, কারেক্ট!

—তা সত্ত্বেও আপনি মনে করেন আপনার ঐ সিদ্ধান্ত যুক্তি-নির্ভর অনুমান?

—ও-গুলো তো এক্সেপশানাল কেস!

—এক্সেপশানাল! আপনি তো বিজ্ঞান-শিক্ষিত! পার্মুটেশন কম্বিনেশান অঙ্ক নিশ্চয় কষেছেন! ধরুন—দুজন লোক আছে। একজন আততায়ী একজন আহত; তাদের চারটি অবস্থা হতে পারে—শোয়া, বসা, দাঁড়ানো এবং কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো। এক্ষেত্রে দুজনের সমান হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কত পার্সেন্ট?

মাইতি উঠে দাঁড়ান, অবজেকশান য়োর অনার! সাক্ষী একজন শারীর-বিদ্যা বিশারদ। অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত নন! এ প্রশ্ন অবৈধ!

বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অঙ্কে র‍্যাংলার হবার দরকার নেই। ইন্টারমিডিয়েট অঙ্ক না থাকলে ডাক্তারী কলেজে ভর্তি হওয়া যেত না। যে প্রশ্ন আমি করেছি,উনি যখন পাশ করেছেন তখন তা আই. এস সি.-তে কষানো হত। এই রুডিমেন্টাল অঙ্ক উনি ভুলে গিয়ে না থাকলে ওঁর বলা উচিত, মাত্র 6.25 পার্সেন্ট!

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, অবজেকশান ওভাররুলড!

সাক্ষী রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললেন, খাতা পেন্সিল ছাড়া ওটা আমি কষে বার করতে পারব না। তবে মনে হয় শতকরা দশ পার্সেন্টের কম!

—যে পার্সেন্টেজটা এখন বলছেন, সেটা আপনার আন্দাজ, স্থির সিদ্ধান্ত না যুক্তি-নির্ভর অনুমান?

—আন্দাজ!

—ঠিক আছে ! অঙ্কশাস্ত্র থাক। ডাক্তারী প্রশ্নেরই জবাব দিন। থোরাসিক অথবা ডর্সাল ভার্টিব্রার সংখ্যা বারোটা—অ্যাম আই কারেক্ট?

—ইয়েস।

—একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রার অবস্থান প্রায় নাভিকুণ্ডের সম-উচ্চতায়? অ্যাম আই কারেক্ট?

—আমি তখন একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রার কথা বলিনি, স্পাইনাল কলমের একাদশতম অস্থির—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, আনসার মি! একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রার অবস্থান প্রায় নাভিকুণ্ডের সম-উচ্চতায়? ইয়েস আর নো?

—কী আশ্চর্য! আমি তখন—

—আই অস্ক ফর দ্য থার্ড টাইম—একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রার—প্রশ্নটা শেষ করতে দেন না সাক্ষী। তার আগেই বলেন, ইয়েস।

—আহতের বুকে যেখানে গুলি লেগেছে সেখান থেকে তার একাদশতম থোরাসিক অস্থির অবস্থিতি—সোজা হয়ে দাঁড়ালে—অন্তত এক ফুট নিচে! ঠিক কথা?

—কিন্তু আমি তা—

—বড় বাজে কথা বলছেন আপনি! বলুন—'হ্যাঁ', না 'না'!

—ইয়েস!

—আপনার যুক্তি-নির্ভর থিয়োরী অনুযায়ী—অর্থাৎ ঐ 6.25 পার্সেন্ট সম্ভাবনা যদি কোনক্রমে কার্যকরী হয়, আই মীন দুজনেই যদি খাড়া হয়ে দাঁড়ায় এবং আততায়ী তার বুকের লেভেল থেকে গুলি করে, সে ক্ষেত্রে আততায়ীর উচ্চতা দশ থেকে বারো ফুট হওয়া উচিত? বলুন—'হ্যাঁ', না 'না'?

মরিয়া হয়ে সাক্ষী বলেন, আপনি শুধু শুধু ব্যাপারটা গুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি একাদশ থোরাসিক ভার্টিব্রার কথা আদৌ বলিনি—

বাসু-সাহেব হাত তুলে সাক্ষীকে থামতে বলেন, জজসাহেবকে বলেন, মহামান্য আদালতকে অনুরোধ করছি, সাক্ষীর জবানবন্দির ঐ অংশ তাঁকে পড়ে শোনানো হোক—ঐ যেখানে উনি সীসার গোলকটা শব-ব্যবচ্ছেদের সময় পেয়েছেন।—বাসু-সাহেব বসে পড়েন, রুমাল দিয়ে চশমার কাচটা মোছেন।

বিচারকের অনুমতি অনুসারে কোর্ট পেশ্‌কার পড়ে শোনায়, "ফলে দক্ষিণ আর্টিয়াম বিদ্ধ হয়, তারপর ঐ সুপিরিয়ার ভেনা কাভাকে ফুটো করে এবং দক্ষিণ পালমোনারি আর্টারিদ্বয়ের উপর দিকের ধমনীটি বিচ্ছিন্ন করে সীসার গোলকটি পিঠের দিকে চলে যায়। শিরদাঁড়ার একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রাতে আহত হয়ে সেটা হৃদ্‌পিণ্ড অঞ্চলেই আটকে থাকে।"

জবানবন্দি পাঠ শেষ হতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ান বাসু-সাহেব—নাউ আনসার মি! আপনার যুক্তি-নির্ভর অনুমান মতো আততায়ীর উচ্চতা দশ থেকে বারো ফুট হওয়া উচিত?

মাইতি আপত্তি জানান, বলেন, সাক্ষী ইতিপূর্বে একাদশ থোরাসিক ভার্টিব্রার কথা মোটেই বলতে চাননি। শিরদাঁড়ার একাদশতম অস্থির কথা বলতে চেয়েছেন। শিরদাঁড়ার উপর দিকের প্রথম সাতটি অস্থি থোরাসিক নয়।

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বিচারককে বলেন, মাননীয় সহযোগী যদি নিজেকেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করেন তবে তাঁকেই জেরা করার অনুমতি চাইছি—on voir dire!

কোর্টে একটা হাস্যরোল ওঠে।

জাস্টিস ভাদুড়ী গম্ভীর হয়ে বলেন, আদালত এসব ব্যঙ্গোক্তি পছন্দ করেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে ডিফেন্স কাউন্সেলের সঙ্গে আমি একমত। সাক্ষী কী বলতে চান তার ব্যাখ্যা আমরা বাদীপক্ষের উকিলের কাছে শুনতে চাই না, বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি কী বলেছেন তা আমরা শুনেছি। মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেলার, য়ু মে প্রসীড—

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আমি মাননীয় আদালতকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে বলব যে সাক্ষী শুধু অস্ত্রশাস্ত্র নয়, ডাক্তারী শাস্ত্র বিষয়েও বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করতে পারেন না। স্পাইনাল কর্ডের একাদশতম অস্থিকে যিনি অষ্টাদশতম অস্থি বলতে পারেন তাঁর পক্ষে ফার্স্ট এম. বি. পাশ করাও অসম্ভব!

জাস্টিস ভাদুড়ী কঠিনস্বরে বলেন, আদালত কোন্ সিদ্ধান্তে আসবেন সেটা আদালতের বিচার্য!

—আই এগ্রি, মি' লর্ড! কিন্তু একথাও আমি আদালতকে ভেবে দেখতে বলব যে, বিশেষজ্ঞ হিসাবে সাক্ষী যে বলেছেন আততায়ীর উচ্চতা পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি তার কোন যুক্তি নেই।

জাস্টিস ভাদুড়ী একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, মিস্টার পি. পি.! আপনার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকুন।

পরবর্তী সাক্ষী ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট জীতেন বসাক। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, এ. পি. জৈনের মৃত্যু হয়েছে যে গুলিতে সেটা .38 বোর রিভলভারের। জৈনের নিজের রিভলভারটি ছিল ঐ বোরের স্যাক্সবি কোম্পানির; তার নম্বর 759362 এবং আসামীর নামে রিজার্ভ করা ক্যুপে থেকে যে রিভলভারটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটারও ঐ বোর এবং ঐ নম্বর। অর্থাৎ সেটা জৈনের রিভলভার। রিভলভারটি পিপল্‌স্ একজিবিট হিসাবে চিহ্নিত হল।

বাসু-সাহেব তাঁকে কোনও প্রশ্ন করলেন না।

প্রদ্যোত নাথ জনান্তিতে তাঁকে বলে, ব্যালাস্টিক এক্সপার্টকে ক্রস করবেন না?

বাসু নিম্নস্বরে বললেন, পণ্ডশ্রম! লোকটা আদ্যন্ত সত্যি কথা বলছে!

পাশে বসেছিলেন এ. কে. রে। তিনি শুধু বললেন, কারেক্ট!

চতুর্থ সাক্ষী জৈনের ক্যাশিয়ার সুকুমার বসু। মাইতির প্রশ্নে সে নিজের নাম, ধাম, পরিচয় দিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রের ঘটনার একটি নিখুঁত বিবরণ দিল। বলল, তিনজন ডাকাতেরই মুখে রুমাল

বাঁধা ছিল। তাদের চোখ দেখা যাচ্ছিল। মাইতি প্রশ্ন করেন, যে লোকটা গুলি করেছিল তাকে আপনি দেখেছেন?

—নিশ্চয়ই! আমার চোখের সামনেই তো সে গুলি করল।

—তার আকৃতির একটা বর্ণনা দিন।

সাক্ষী আসামীর দিকে তাকিয়ে বললে, উচ্চতা পাঁচফুট দশ ইঞ্চি হবে; একহারা ফর্সা—

—ওদিকে কি দেখছেন? যিনি প্রশ্ন করছেন তাঁর দিকে তাকান—বাধা দেন বাসু-সাহেব!

সাক্ষী থতমত খেয়ে যায়। আসামীর দিকে আর তাকায় না। বলে, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, বড় বড় জুলফি ছিল, চোখে কালো চশমা—

মাইতি ওকে ভরসা দিয়ে বলেন, আমার দিকে কেন? ওদিকেই তাকিয়ে দেখুন। আপনার কি মনে হয়, আততায়ীর চেহারার সঙ্গে আসামীর চেহারার সাদৃশ্য আছে?

—আছে।

—কী সাদৃশ্য?

—দুজনের উচ্চতা এক, বয়স এক, দুজনেই ফর্সা এবং দুজনেরই বড় বড় জুলফি আছে।

—আপনার কি অনুমান আসামীই সেই আততায়ী?

—অবজেক্‌শান য়োর অনার! সাক্ষী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারেন। তাঁর অনুমান কোন এভিডেন্স নয়।

মাইতি হেসে বলেন, আচ্ছা আমি প্রশ্নটা অন্যভাবে করছি—আপনি আততায়ীকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আসামীকেও প্রত্যক্ষ করছেন। এখন বলুন, দুজনের আকৃতি কি একই রকম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য কোথায় লক্ষ্য করছেন?

—ঐ বড় বড় জুলফি।

—য়ু মে ক্রস এক্সামিন—বাসুকে অনুমতি দিয়ে আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন। সুকুমারবাবু, আপনার নিজের 'হাইট' কত?

প্রথম প্রশ্নেই আপত্তি জানালেন পি. পি.। এ প্রশ্ন নাকি অবৈধ। সাক্ষীর উচ্চতার সঙ্গে মামলার কোন সম্পর্ক নাকি নেই। বাসু জজ-সাহেবকে বললেন, য়োর অনার, সাক্ষীকে দিয়ে বলাতে চাইছি যে, তাঁর নিজের উচ্চতাও ঐ পাঁচ-ফুট দশ ইঞ্চির কাছে, তিনিও একহারা, হোয়াইটেক্স মাখলে তিনিও আসামীর মত ফর্সা হয়ে যাবেন এবং তাঁর নিজেরও বড় বড় জুলফি আছে! অর্থাৎ আসামীর মঞ্চে যদি আসামীর পরিবর্তে একটি প্রমাণ সাইজ আয়না থাকত তাহলেও তাঁর জবাব এক রকমই হত! যাই হোক, সহযোগী যখন আপত্তি করছেন তখন আমি না হয় অন্য প্রশ্ন করছি। বলুন, সুকুমারবাবু—আপনি এখনই বলেছেন আসামীকে আততায়ীরূপে চিহ্নিত করবার সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে তার বড় বড় জুলফি। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই বলেছি।

—আপনি কেন অতবড় জুলফি রেখেছেন?

—অবজেক্‌শান য়োর অনার! ইরেলিভ্যান্ট....

বিচারক বললেন, অবজেক্‌শান সাসটেন্‌ড্।

বাসু হেসে বলেন, বড় বড় জুলফি রাখা আজকের দিনে একটা ফ্যাসান, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পাই।

—তাহলে শিকারী বিড়ালকে যেমন গোঁফ দেখে চেনা যায়, মানুষ শিকারীকে তেমনি জুলফি দেখে চেনা যায়, না?

মাইতি আজ পান থেকে চুন খসতে দেবেন না। তড়াক করে উঠে দাঁড়ান আবার। আপত্তি জানিয়ে বলেন, সাক্ষী একথা বলেননি যে, গোঁফ দেখে কিছু চেনা যায়।

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, না, গোঁফ দেখে চেনার কথা সাক্ষী সুকুমার বোস বলেননি, বলেছিলেন সুকুমার রায়।

মাইতি অবাক হয়ে বলেন, মানে! সুকুমার রায়! তিনি কে?

বাসু গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলেন, না, সুকুমার রায় নিজে ও কথা বলেননি। বলেছিলেন তাঁর হেড অফিসের বড়বাবু। বড়বাবুর বদলে ক্যাশিয়ার বরং বলেছেন ঃ 'জুলফির আমি, জুলফির তুমি—তাই নিয়ে যায় চেনা!'

আদালতে হাস্যরোল ওঠে।

জাস্টিস ভাদুড়ী তাঁর হাতুড়ি পিটিয়ে গণ্ডগোল থামালেন। বাসুকে বললেন, আই অ্যাডভাইস দ্য কাউন্সেল নট টু বি ফ্রিভলাস!

বাসু একটি বাও করে বললেন, পার্ডন মি' লর্ড! আমার মনে আছে, এটা তিনশ দুই ধারার মামলা। কিন্তু বর্তমান সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যকে ক্রমশঃ ঐ ফ্রিভলিটির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন,—আমি নাচার। মাননীয় আদালত সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে প্রণিধান করবেন, ঐ বয়সের শতকরা চল্লিশজনের বড় বড় জুলপি আছে।

জাস্টিস ভাদুড়ী শুধু বললেন, য়ু মেটার প্রসীড উইথ য়োর ক্রস একজামিনেশনস্।

বাসু পুনরায় সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন ঃ আসামী যখন হাজতে ছিল তখন পুলিস আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ঐ আসামীকে চিনিয়ে দিয়েছিল। তাই নয়?

—না তো!

—আপনি বলতে চান আপনাকে পুলিস আগেভাগে ঐ আসামীকে দেখিয়ে দেয়নি? চিনিয়ে দেয়নি?

—আজ্ঞে না, কখনও না!

—কেন বাজে কথা বলছেন? আপনি কি বলতে চান আজ এই আদালতে এসে ঐ কাঠগড়ার লোকটাকে জীবনে প্রথম দেখলেন?

—নিশ্চয়ই!

—তাই বলুন। তার মানে দাঁড়াচ্ছে গত এগারো তারিখ রাত আটটা নাগাদ ঐ আসামীকে আপনি দেখেননি—যেহেতু আজই তাকে জীবনে প্রথম দেখলেন। তাই না!

—না, মানে, আমি সেকথা বলিনি!

—বলেছেন! আপনি যা বলেছেন তা সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যাচ্ছে। শুনতে চান?

—না, না, আমি যা বলেছি তার মানে হচ্ছে—

—মানে হচ্ছে 'কনক্লুশান'। সেটা আদালত করবেন। আপনি নন।

একটি 'বাও' করে বাসু বলেন, থ্যাঙ্ক মি' লর্ড। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন মাইতি। বলেন, পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকার আগে আমি বর্তমান সাক্ষীকে রি-ডাইরেক্ট-এক্সামিনেশানে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

—করুন।

মাইতি বললেন, সুকুমারবাবু, আপনি এইমাত্র বলেন যে, আসামীকে সুপ্রিয় দাশগুপ্তরূপে আজই জীবনে প্রথম দেখলেন—

—অবজেকশান য়োর অনার! সাক্ষী সে কথা আদৌ বলেননি।

—ব্যাট হি মেক্ট্স ইট!—ঘুরে দাঁড়ান মাইতি।

জজ-সাহেব নিরাসক্ত কণ্ঠে বলেন, আপনার সহযোগী ও-প্রসঙ্গে শেষ কথা বলে দিয়েছেন। সাক্ষী কী বলেছেন আদালত তা শুনেছেন, তার কী অর্থ আদালত তা বুঝে নেবেন। আপনি সরাসরি প্রশ্ন করুন। সাক্ষীর মুখে নিজ অভিপ্রায়মতো শব্দ বসাবেন না।

মাইতির মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। সামলে নিয়ে বললেন, সুকুমারবাবু, আপনি কি আসামী সুপ্রিয় দাশগুপ্তের সঙ্গে কখনও টেলিফোনে কথাবার্তা বলেছেন? বলে থাকলে কবে?

—বলেছি। ঘটনার দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, এ বছরের এগারোই এপ্রিল।

—কখন?

—বিকাল পাঁচটায়।

—কী কথা হয়েছিল?

—উনি টেলিফোনে আমার মালিকের খোঁজ করলেন —তিনি গদীতে নেই শুনে উনি নিজের নাম আর পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—জাস্ট এ মিনিট। নিজ নাম আর পরিচয় বলতে?

—উনি বললেন, উনি সুপ্রিয় দাশগুপ্ত, বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার। আরও বললেন, মালিক ফিরে এলে আমি যেন তাঁকে জানাই যে, সুপ্রিয়বাবু ফোন করেছিলেন, তিনি পরদিন বেলা এগারোটার সময় ছুটিটা নিতে আসবেন।

—আই সী! ছুটিটা! আর কিছু প্রশ্ন করেননি তিনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, করেছিলেন। আমি ক্যাশিয়ার বলে পরিচয় দেবার পর উনি জানতে চান, আমার ক্যাশে তখন কত টাকা আছে!

মাইতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বলেন কী! আপনার ক্যাশে কত টাকা আছে তা উনি কেন জানতে চাইছেন তা আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?

—করেছিলাম। তাতে উনি বলেন, পরদিন গুডফ্রাইডের ছুটি; ব্যাঙ্ক ভল্ট বন্ধ। তাই জানতে চাইছেন?

—তার মানে কী?

—মানে আমি জানি না।

—দ্যাট্স্ অল মি' লর্ড।—আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসু-সাহেব তখন সাক্ষীকে রি-ক্রস-এক্সামিনেশান শুরু করলেন ঃ আচ্ছা সুকুমারবাবু, টেলিফোনে যে আপনি আসামীর সঙ্গেই কথা বলেছিলেন সেটা কেমন করে বুঝলেন?

—উনিই তো তাঁর নাম, ধাম টেলিফোনে বললেন!

—সে তো টেলিফোনে যে কেউ বলতে পারে। পারে না?

—পারে।

—আপনি বলেছেন, আসামীকে আপনি জীবনে কখনও আজকের আগে দেখেননি, কণ্ঠস্বরও শোনেননি নিশ্চয়? শুনেছেন?

—আজ্ঞে না।

—তার মানে যে-কেউ আসামীর নাম পরিচয় নিয়ে ও কথা বলতে পারত?

—তা পারত!

—তাহলে কেন হলপ নিয়ে বললেন—আসামী সুপ্রিয় দাশগুপ্তের সঙ্গে আপনি টেলিফোনে কথা বলেছেন?

—স্যার, আমি ভেবেছিলাম—

—ভেবেছিলেন! আই সী!—বসে পড়েন বাসু।

আদালত বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বন্ধ রইল। মধ্যাহ্ন বিরতি।

www.boiRboi.blogspot.com

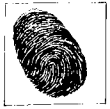

ছয়

কৌশিক আদালতে যায়নি। বাড়িতেই ছিল। বেলা বারোটা নাগাদ একটা টেলিফোন এল বাসু-সাহেবের অফিসে। ব্যারিস্টার সাহেব অনুপস্থিত শুনে লোকটা সুকৌশলীর কৌশিক মিত্রের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কৌশিকের সঙ্গে তার নিম্নোক্ত কথোপকথন হল—

—আপনি কি সুকৌশলীর মিস্টার কৌশিক মিত্র আছেন?

কৌশিক ওর খাজা বাংলা শুনে বললে, আছি। আপনি কে?

—আমার নাম আছে যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া। নামটা পহ্চানতে পারেন?

—পারি। আপনি গত এগারো তারিখে কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানির একটা বাড়ি সাড়ে ছয় লাখ টাকায় কিনেছেন।

—দু-দুটো টেক্‌নিক্যাল গল্‌তি হইয়ে গেল, সুকৌশলী দাদা। সাড়ে ছয় না আছে, সাড়ে চার লাখ; ঔর বাড়ির মালিক কাপাডিয়া কোম্পানি না আছে। মালিকের খাস সম্পত্তি ছিল। আর শুনেন—যো মমলাটা বাসু-সাহেব হাতে নিয়েছেন, আই মীন সুপারিও দাশগুপ্তের মামলা—এঁটার বিষয়ে কুছ জরুরী টিপ্‌স্ আমি বাসু-সাহেবকে দিতে চাই। তা বাসু-সাহেব তো দফতরে না-আছেন না? তাই আপনাকে বাৎলিয়ে দিচ্ছি। অগর জরুরৎ হোয় তো ফিন লিখিয়ে নিন—

—কিন্তু আপনিই যে মিস্টার যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া তা আমি বুঝব কী করে? আপনি বাড়ি থেকে বলছেন তো? লাইন কেটে দিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আপনার বাড়িতে ফোন করছি—

টেলিফোনে খুকখুক করে হাসির শব্দ ভেসে এল। লোকটা বললে, সুকৌশলী দাদা। আমি ভি কুছকুছ সুকৌশলী আছি। আমি একটা পাবলিক বুথ থিকে টেলিফোন করছি, ঘর থিকে নয়। লেকিন আমি আপনার বাৎ মানিয়ে নিলাম—আমি যে, জেনুইন যদুপতি আছি, সিটা প্রমাণ করার 'ওনাস' আমার আছে। একটা কোড-নাম্বার বাৎলাচ্ছি, লিখে নিন—795630।...লিখেছেন? আমার সঙ্গে বাতচিতের পিছে আপনি হামার বাড়িতে হামার 'ফাদার'কে ফোন করবেন। তিনি ঐ কোড-নম্বরটা বাৎলিয়ে দেবেন। ব্যস! আমার আইডেন্টিটি ইস্ট্যাবলিশ হইয়ে যাবে। সমঝ্‌লেন?

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, এমন কাণ্ড করার অর্থ?

লোকটা হেসে বললে, আগর বাসু-সাহেব হলে এ বাৎ পুছতেন না। সমঝিয়ে নিতেন। মালুম হল না?...এ মামলার ফয়সালা যবতক না হচ্ছে তবতক্ আমি শালা ছিপিয়ে থাকব। আমার পাত্তা মিলে গেলেই বাসু-সাহেব আমাকে 'নেওতা' করে বসবেন—

—নেওতা! মানে নিমন্ত্রণ! কিসের?

—কোর্টের 'সমন', সুকৌশলী দাদা! ব্যস! খতম! শালার আদালতে উঠলেই আমাকে কাবুল খেতে হবে কি আমি দো-লাখ রূপেয়া ব্ল্যাক-মানি সুপারিও বাবুকে দিয়েছি! কবুল খেলে ইনকাম ট্যাক্সে ফাঁসব!...হর্নস অব এ ডাইনামো সমঝেন?

—হর্নস্ অব এ ডায়নামো!

—জী হাঁ! ডাইনামো ভি চার্জ নিচ্ছে না, ব্যাটারি ভি ডিসচার্জড! আমার ঐ হালৎ! তাই ছিপিয়ে বসে আছি!

ইংরাজি জ্ঞান যেমনই হ'ক লোকটা যে খলিফা এটা বোঝা গেল। কৌশিক বললে, তাহলে নিজে থেকে টেলিফোন করছেন কেন?

—সিটা কেমন করে আপনাকে সমঝাই সুকৌশলীদাদা? আমার গলায় যে মছলির কাঁটা বিঁধিয়ে গেল! হর্নস্ অব এ ডাইনামো—শালার কাঁটা না নামছে না উগড়াচ্ছে!

—মছলির কাঁটা! সেটা আবার কী?

—আপনি বাংগালি আছেন, ফির 'মাছের কাঁটা' বুঝেন না?...আপনার ক্লায়েন্ট শালা সাচ্চা মাল আছে। এমন ইমানদার বুড়বক আমি জিন্দগিভর দুটি দেখি নাই! শালা যদি খালাস পায় ঔর কাপাডিয়া কোম্পানি যদি ওকে বরখাস্ত করে তবে ঐ শালা ইমানদার বুড়বককে আমি দেড়া মাইনা দিয়ে আমার ম্যানেজার বানিয়ে লিব!

কৌশিক হেসে বলে, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি মিস্টার...?

লোকটা গম্ভীরস্বরে বললে, জী নেহি! তাহলে সেই কোথাই শুনাই ঃ মোহনস্বরূপ কাপাডিয়া তাঁর ম্যানেজারকে সিরফ স্পেশাল পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দেননি—দরটা ফাইনাল করবার এক্তিয়ারও দিয়েছিলেন। মোহনস্বরূপজী লেনদেনটা খুব গোপন রাখতে চেয়েছিলেন—আমি জানি, চার লাখ টাকাতে তিনি ক্লোজ ডাউন করতেন। লেকিন তা হতে পারেনি ঐ শালা ইমানদার বুড়বকটার জন্য। সে কলকাতা বাজারে যাচাই করে সমঝে নিয়েছিল কি হোয়াইট মানিতে সাত লাখ দর উঠবে। আমি তখন ঐ ম্যানেজারকে সিধা অফার দিয়েছিলাম কি সে যদি ভাও কমিয়ে দেয় তবে টুইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন দিব। লোকটা এত বড় বুড়বক্ যে, রাজী হল না! আমি দাদা নাক্‌তক্ কালোটাকায় ডুবে আছি, লেকিন ঐসব বুড়বকের জন্য আজও আমি মাথার টুপি খুলি। সমঝ্‌লেন?

—বলে যান। আমি শুনছি—

—আদালতে দাঁড়িয়ে আমি এজাহার দিতে সেক্‌ব না; লেকিন ঐ জান-কবুল বুড়বকটাকে বাঁচাবার জন্য আমি তৈয়ার! কাপাডিয়া কোম্পানি যদি মামলা খরচ না দেয় তবে আমি এ মামলা চালাতে প্রস্তুত—

—কালো টাকায়?

—সে বাৎ পুছিয়ে কেন লজ্জা দিচ্ছেন দাদা! বাসু-সাহেবকে আমার নাম বাতাবেন।

—কিন্তু বাসু-সাহেব আপনার পাত্তা পাবেন কেমন করে?

—ঐ তো মুশ্‌কিল আছে দাদা। তো ঠিক হ্যায়, আমি ফিন রাত আট বাজে ফোন করব।

—তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো? প্রথম কথা, গত বৃহস্পতিবার, আই মীন এগারোই এপ্রিল রাত্রে আপনারা তিনজনে মোকাম্বোতে খেয়েছিলেন?

—তিনজন না আছে দাদা, দু'জন। আমি আর ঐ সুপারিও দাশগুপ্তা। রাত সাড়ে সাত বাজে মোকাম্বোতে ঘুষেছিলাম, সাড়ে নও বাজে নিকলে আসি। জৈনসাব যখন বড়বাজারে ফৌত হল তখন সুপারিও শালা আমার সামনে বসে মুরগির টেংরি চুষছে! আপন গড্!

—সেখানে ঐ ক্যাশিয়ার জীবন বিশ্বাস ছিল না?

—সুকৌশলীদাদা—

—আমার নাম সুকৌশলী নয়, কৌশিক—

—একই বাৎ আছে দাদা। লেকিন এটা তো মানবেন কি ঐ গন্দাকামিজ পিনহেবোলা বিশ্‌ওয়াসবাবুকে নিয়ে আমি মোকাম্বোতে ঘুষবো না? সে পান খেতে চেয়েছিল, তাকে পান-শ' রূপেয়ার পান খাইয়েছি। 'পান খাওয়া' সমঝেন?

কৌশিক বলে, আর একটা কথা বলুন তো? ওরা ঐ বাড়তি দু'লাখ টাকা কী ভাবে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল?

—কালোটাকার লেন-দেন কী ভাবে হয় আপনি জানেন না সুকৌশলীদাদা? হুন্ডি! হুন্ডির চোরা গলিতে। আমি খোদ ইন্তাজাম করে দিয়েছিলাম। জৈনসাব ঐ হুন্ডি দিত। লেকিন তার আগেই লোকটা ফৌত হইয়ে গেল। ইমানদার বেওকুফটা রোডে সিট-ডাউন হইয়ে গেল!

—কৌশিক ধমক দিয়ে ওঠে, বার বার লোকটাকে ইমানদার বেওকুফ বলছেন, সেই ইমানদার লোকটাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানোর জন্যে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস আপনার নেই?

—দাদা! দো-লাখ রূপিয়ার ঝামেলা আছে। আমি বিলকুল গড্ডায় গিরে যাব—

—তবে ফোন করছেন কেন?

—ওহি তো বাতাচ্ছি! হর্নস অব এ ডাইনামো! ইদিকে আই.টি.ও. উদিকে মছলির কাঁটা—

—কৌশিক উত্তেজিত হয়ে বলে, আপনি কী মশাই? আপনি....আপনি একটা—

কথাটা তার শেষ হয় না। যদুপতি বলে ওঠে, সুকৌশলীদাদা! এখন আপনি আমাকে শালা-বাহানচোৎ শুরু করবেন। আমি লাইন কাটিয়ে দিলাম...

সত্যই সে টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিল।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল কৌশিক। যদুপতি সিঙ্ঘানিয়ার চরিত্রটাকে বুঝবার চেষ্টা করল। লোকটা নিজেই স্বীকার করছে তার নাক পর্যন্ত ডুবে আছে কালো টাকায়। তাহলে 'মাছের কাঁটা' বলতে সে কী বোঝাতে চায়? কোথায় বাধছে তার ঐ কাঁটাটা? বিবেক? বিবেক বলে ঐ জাতীয় লোকের সত্যই কিছু থাকে না কি?

একটু পরে সে টেলিফোন ডাইরেক্টোরি হাতড়ে ফোন করল যদুপতির বাবা রঘুপতি সিঙ্ঘানিয়াকে। বাপ ছেলের মত বাংলা বলতে পারেন না। কৌশিক যেইমাত্র বলল যে, সে ব্যারিস্টার বাসুর বাড়ি থেকে ফোন করছে, ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ বললেন, তব ঠাহরিয়ে!

মিনিটখানেক টেলিফোনে আর মনুষ্যকণ্ঠ শোনা গেল না। ক্ষীণ সুরে বিবিধ-ভারতীর হিন্দী প্রোগ্রামের গানের সঙ্গে একটা অ্যালেসেশিয়ানের গর্জন ভেসে এল শুধু। তারপর শুনল ঃ অব শুনিয়ে! ম্যায় রঘুপতি সিঙ্ঘানিয়া বোল্‌তা হুঁ। মুঝকো কহনে কা মৎলব ইয়ে হ্যায় কি ঃ সেবুন-নাইন-ফাইভ-সিকস্-থিরি ঔর ইয়ে ক্যা হ্যায়? জিরো হোগা সায়েদ্! রাম রাম....

লাইন কেটে দিলেন রঘুপতি।

কিন্তু কৌশিক ছাড়বার পাত্র নয়। পুনরায় ফোন করল সে। এবার বৃদ্ধ সিঙ্ঘানিয়া সিংহমূর্তি ধরলেন। অনর্গল মাতৃভাষায় যে ঝড় বইয়ে দিলেন তার নির্গলিতার্থ ঃ তিনি এ ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানেন না—তাঁর পুত্রের নির্দেশ আছে, ব্যারিস্টার বাসুর ফোন এলে ঐ অদ্ভুত নাম্বারটা তাঁকে শুধু শুনিয়ে দিতে হবে। কেন, কী বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না। ঐ সঙ্গে আরও বললেন—এসব হচ্ছে ঐ 'জিরো-জিরো-সেবুন' মার্কা পিকচারের কুফল! তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমানে জেমস্ বন্ডের ভূমিকায় না-পাত্তা হয়ে গেছেন। ফলে তাঁর মন-মেজাজ খারাপ। নিজেকেই গদিতে বসতে হচ্ছে! তাঁকে যেন এ নিয়ে আর বিরক্ত করা না হয়। পুনরায় রাম-নামের দ্বিতপ্রয়োগান্তে তিনি দূরভাষণে ক্ষান্ত হলেন।

কৌশিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। বেলা বারোটা। এখনই বার হলে মধ্যাহ্ন-অবকাশের মধ্যে বাসু-সাহেবকে খবরগুলো জানানো যায়। সে তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সি নিয়ে আদালতের দিকে রওনা দেয়।

সাত

আদালতের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই কৌশিকের সঙ্গে বাসু-সাহেবের দেখা হল। ওর কাছে আদ্যোপান্ত শুনে উনি তখনই গিয়ে দেখা করলেন আসামী সুপ্রিয়র সঙ্গে। বললেন, তুমি কি সখ করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে চাও?

লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

—এগারো তারিখ রাত্রে মোকাম্বোতে তুমি আর যদুপতি খেতে গিয়েছিলে—তাহলে কেন বললে জীবন বিশ্বাসও তোমাদের সঙ্গে ছিল।

—সুপ্রিয় চোখটা নিচু করে বলল, জীবনই এ পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল, যদুপতি কিছুতেই সাক্ষী দিতে আসবে না। জীবন ছাড়া আর কে আমার অ্যালিবাইটা প্রতিষ্ঠিত করবে?

—তাই বলে তোমাদের কাউন্সেলকেও তোমরা জানাবে না যে, মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছ?

—আমি জানতাম আপনি এতে রাজী হবেন না!

—হব না তো বটেই! জীবনকে নতুন করে তালিম দিতে হবে; তাছাড়া ঐ সুকুমারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলে? সেটা এতক্ষণ স্বীকার করনি কেন?

সুপ্রিয় মাথা নিচু করে বসে রইল।

—ওর ক্যাশে কত টাকা আছে তা টেলিফোনে জানতে চেয়েছিলে?

মাথা নেড়ে সায় দিল সুপ্রিয়। অস্ফুটে বলল, পরদিন ছিল গুডফ্রাইডের ছুটি। ব্যাঙ্কের ভল্ট বন্ধ। সেই অজুহাতে দু'-লাখ টাকা নগদ নিতে জৈন-সাহেব রাজী হবে না আমার এই আশঙ্কা ছিল। অথচ ঐ গুডফ্রাইডের রাতের ট্রেনেই আমাদের টিকিট কাটা ছিল। তার উপর যদি জৈন-সাহেবের ক্যাশে আগে থেকেই মোটা টাকা থেকে থাকে তাহলে ছুটির দিন তিনি হয়তো মুশ্‌কিলে পড়বেন। তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

বাসু-সাহেব ধমকে ওঠেন, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাকে বলনি কেন?

সুপ্রিয় অধোবদনে বসেই রইল।

—বোম্বাইয়ে তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখেছ?

নেতিবাচক শিরশ্চালন করল সুপ্রিয়

—তোমার স্ত্রী আজ-কালের মধ্যেই আসছে।

একেবারে শিউরে উঠল সুপ্রিয়, সর্বনাশ! তার নাম-ঠিকানা কেমন করে পেলেন আপনি?

—সেটা পরের কথা। সর্বনাশ কেন?

—ও ভয়ানক নার্ভাস! সে আপনি বুঝবেন না। জীবনকে একবার আমার কাছে আনতে পারবেন?

বাসু-সাহেব বললেন, অসম্ভব! তোমার উকিল ছাড়া আর কারও সঙ্গে এ অবস্থায় তোমাকে দেখা করতে দেবে না। তোমার স্ত্রী এলে, হয়তো দিতে পারে।

ঠিক এই সময়েই প্রহরী এসে জানালো—আদালত এবার বসবে। বাসু-সাহেব ফিরে এলেন। কোর্টে গিয়ে বসলেন। প্রদ্যোৎকে বললেন, জীবনকে ডাক তো?

জীবন গরুড়পক্ষীর মত হাত দুটি জোড় করে এসে দাঁড়ায়। বাসু বলেন, তোমাকে এখনই সাক্ষী দিতে ডাকব। মোকাম্বোতে তুমি ঐ রাত্রে সুপ্রিয়র সঙ্গে খেয়েছ এ মিথ্যা কথা বলবে না, বুঝলে?

মাথা চুলকে জীবন বলে, ঐটেই আমাদের একমাত্র ভরসা স্যার! অকাট্য অ্যালিবাই!

ধমক দিয়ে ওঠেন বাসু, বেশি পণ্ডিতেমি কর না। মিথ্যে সাক্ষী তোমাকে দিতে হবে না।

—কিন্তু স্যার আমি যে থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে বসে আছি।

—সেটা অন্য জিনিস। থানায় মিথ্যে এজাহার দেওয়া, আর আদালতে হলপ নিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

জীবনবাবু বলে, আপনি মিছে ডরাচ্ছেন স্যার। ঐ মাইতির বাবার ক্ষমতা হবে না—জেরায় আমাকে কাৎ করে! আমি মোকাম্বোতে ঢুকে সব খুঁটিয়ে দেখে এসেছি কাল সন্ধ্যাবেলায়।

বাসু-সাহেব আর কিছু বলবার সুযোগ পেলেন না। জাস্টিস ভাদুড়ী পুনরায় বিচারারম্ভ ঘোষণা করলেন। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য নেওয়া শেষ হয়নি। সাক্ষ্য দিতে উঠলেন ইস্টার্ন রেলওয়ের স্টাফ—বোম্বাই মেল-এর কন্ডাকটার-গার্ড হেমন্ত মজুমদার। মাইতি সাহেবের প্রশ্নে তিনি গুডফ্রাইডের সন্ধ্যায় বোম্বাই মেল-এ সি-নং ক্যুপেতে যে ঘটনা ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলেন। সুজাতা ফিরে এসে যা বলেছিল হুবুহু তাই।

বাসু তাঁকে কোন জেরা করলেন না।

পরবর্তী সাক্ষী নেপালচন্দ্র বসু। জি.আর.পি-র ইন্সপেক্টার। তিনিও তাঁর সাক্ষ্যে ঐ ঘটনার পাদপূরণ করলেন। বাসু-সাহেব তাঁকে ক্রস এগজামিনে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার বোস, আপনি যখন জিজ্ঞাসা

করলেন, 'ব্যাগটা আপনার?' আর আসামী বলল, 'হুঁ' তখন সে কি ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল?

—না, দেখেনি, কিন্তু তার পূর্বমুহূর্তে যখন সুজাতা বললেন, ও ব্যাগটা আমার নয়, তখন সে ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

—আপনার কি মনে হয় সেটা 'ভেকেন্ট লুক'—মানে সে অন্য কথা ভাবতে ভাবতে ঐদিকে তাকিয়ে ছিল?

—অবজেকশান! সাক্ষী কি মনে করেছিল তা আমরা শুনতে চাই না!—মাইতির কণ্ঠস্বর।

—অবজেকশান সাসটেন্ড—জজসাহেবের নির্দেশ।

—বেশ, দ্বিতীয়বার যখন আপনি প্রশ্ন করেন তখন ও অস্বীকার করেছিল? বলেছিল, ব্যাগটা ওর নয়?

—হ্যাঁ, তাই বলেছিল।

—তখনও তো আপনি রিভলভারটা ব্যাগ থেকে বার করে দেখাননি?

—না।

—তার মানে আসামী তখনও জানত না যে, ব্যাগের ভিতর কী আছে?

—তা কেন? আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন যে, ব্যাগটা সে নিজেই সঙ্গে করে আনেনি?

—আপনি কি তাই ধরে নিতে চান?

—কেন নয়?

—'কেন নয়', আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমার প্রশ্ন 'আপনি কি তাই ধরে নিতে চান', ইয়েস অর নো?

—ইয়েস!

—আপনি কি এখনই এটা ভাবছেন, না প্রথম থেকেই ওটা ধরে নিয়েছেন?

—প্রথম থেকেই!

—তাই বলুন! তার মানে ব্যাগটা যে আসামীর এই রকম একটা পূর্বসিদ্ধান্ত প্রথম থেকে ধরে নিয়ে আপনি সাক্ষী দিতে এসেছেন? যা দেখেছেন তা বলছেন না, যা আপনার প্রথম থেকে ধরে নেওয়া পূর্ব-সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে যায় তাই সাক্ষী দিচ্ছেন।

—কী আশ্চর্য! আমি কি তাই বলেছি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ঠিক তাই বলেছেন!—দ্যাটস্ অল্ মি লর্ড!

সরকার পক্ষের সাক্ষী এখানেই শেষ।

প্রতিবাদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী মিসেস্ সুজাতা মিত্র।

হলপ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে উঠল সুজাতা। বাসু-সাহেব প্রশ্নের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন, সুজাতা ঐ সি-চিহ্নিত ক্যুপেতে প্রথম প্রবেশ করে। বন্ধ দরজা খুলেই সে দেখতে পায় একজন স্যুটপরা ভদ্রলোককে। তাঁর সঙ্গে সুজাতার কী কথা হয়েছিল তা নথিবদ্ধ করা হল। ভদ্রলোকের চলে যাওয়ার সময় ব্যাগ রেখে যাওয়ার কথাও সুজাতা বলল এবং বলল—সুপ্রিয় কামরায় ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন করেছিল, ব্যাগটা আপনার?

মাইতি জেরা করতে উঠলেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, আপনি কোথায় থাকেন সুজাতা দেবী? সুজাতা তার ঠিকানা দিল।

—ঐ বাড়িতে এ মামলার প্রতিবাদী ব্যারিস্টার পি.কে.বাসুও থাকেন না?

—হ্যাঁ, থাকেন।

—আপনি যে ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠানের পার্টনার তার সঙ্গে ঐ ব্যারিস্টার সাহেবের একটা পার্সেন্টেজ ব্যবস্থা আছে, না? কমিশনের ব্যবস্থা?

—আছে!

—অর্থাৎ এ মামলায় বাসু-সাহেব যা ফি পাবেন তার একটা অংশ আপনারও জুটবে, কেমন?

সুজাতার মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

—বলুন, বলুন, লজ্জা পাচ্ছেন কেন? এ মামলা বাবদ কমিশন পাবেন না?

—পাব।

—তার মানে এ মামলায় বাসু-সাহেব জিতুন এই আপনি চান?

—না। আমি চাই সত্যের জয় হোক!

—চমৎকার। আর্থিক লোকসান করেও?

—ওঁর কেস জেতা-হারার সঙ্গে আমাদের কমিশনের কোনও সম্পর্ক নেই। উনি 'স্পেসিফিক জব' দেন, 'স্পেসিফায়েড ফি' দেন। হারলেও দেন, জিতলেও দেন।

—তাই বুঝি? আচ্ছা সুজাতা দেবী আপনি নিজে কখনও ঐ 320-ধারায় আসামী হয়েছিলেন? খুনের মামলায়?

—না।

—না? কিন্তু আমি যদি প্রমাণ করতে পারি—

—উকিল হিসাবে আপনার জানা উচিত সে-ক্ষেত্রে আপনি আমার বিরুদ্ধে পার্জারির মামলা আনতে পারেন। আপনার আরও জানা উচিত আদালতের বাইরে ওকথা বললে আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা আনতে পারি—সুজাতার দৃপ্ত জবাব।

মাইতি চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললেন, রামচন্দ্রপুরের ময়ূরকেতন আগরওয়াল হত্যা-মামলায় আপনি খুনের মামলায় আসামী ছিলেন না?

—না! আমার বিরুদ্ধে কোন চার্জ ফ্রেম করার আগেই প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে। আমার বিরুদ্ধে খুনের মামলা তো ছাড়, আদৌ কোনও চার্জ ফ্রেম করা হয়নি!

—কিন্তু আপনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তো?

—বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান, এনাফ অব ইট! অবজেকশান য়োর অনার। এ-সব প্রশ্নের সঙ্গে বর্তমান মামলার কোন সম্পর্ক নেই। অনেক আগেই আমি আপত্তি করতাম—করিনি এজন্য যে, ভেবেছিলাম—মাননীয় সহযোগীর যে-কোন মুহূর্তে মনে পড়ে যাবে যে, সে মামলায় প্রকৃত আসামীকে গ্রেপ্তার না করে তিনি ক্রমাগত রাম-শ্যাম-যদুকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। উনি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'লজ্জা পাচ্ছেন কেন?' তাই ভেবেছিলাম, সে-সব কথা মনে পড়ে গেলে উনি নিজেই লজ্জায় থেমে যাবেন। কিন্তু উনি থামছেন না মি' লর্ড!

জাস্টিস ভাদুড়ী সংক্ষেপে শুধু বলেন, অবজেকশান সাসটেন্ড। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই—বসে পড়েন নিরঞ্জন মাইতি।

এরপর সাক্ষী দিতে এলেন জীবন বিশ্বাস।

এগারো তারিখের প্রসঙ্গ আসামাত্র সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানিয়ে দিল ঐ দিন সন্ধ্যায় সে, আসামী এবং তৃতীয় একজনের সঙ্গে মোকাম্বোতে নৈশ-আহার করেছে।

বাসু-সাহেবের মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ সওয়াল বন্ধ করে বললেন, 'দ্যাটস্ অল্ মি' লর্ড'।

মাইতি ডাইরেক্ট এভিডেন্সের সূত্রটি তুলে নিয়ে বললেন, জীবনে কতবার মোকাম্বোতে খেয়েছেন, জীবনবাবু?

—ঐ একবারই স্যার।

—ঐ এগারোই তারিখে রাত্রেই, জীবনে একবার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—তার পরে গতকাল আপনি মোকাম্বোতে যাননি? সন্ধ্যা সাতটা পাঁচে?

জীবনবাবুর চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ে।

—বলুন, বলুন—আমি আপনার টনসিল দেখতে চাইছি না।

কোর্টে হাস্যরোল উঠল।

ঢোক গিলে জীবন বিশ্বাস বলে, গিয়েছিলাম স্যার।

—কেন গিয়েছিলেন? হোটেলের ভিতরটা দেখে আসতে? যাতে জেরায় আপনার ঐ অ্যালিবাইটা ফেঁসে না যায়?

সামলে নিয়েছে জীবন। বললে, আজ্ঞে না, আমি দেখতে গিয়েছিলাম যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া ওখানে আছেন কিনা। সেই মর্মে একটা খবর পেয়েছিলাম।

—তাই বুঝি। তাহলে মিথ্যা কথা বললেন কেন? জীবনে একবার মাত্র মোকাম্বোতে গিয়েছিলেন।

জীবন বলে, আপনি আমার মুখে নিজের ইচ্ছে মত কথা বসাবেন না স্যার।

ভ্রূকুঞ্চিত করে মাইতি বলেন, তার মানে! আপনি ও কথা বলেননি?

জীবন এতক্ষণে বেশ সহজ হয়েছে। বললে, আজ্ঞে না। আপনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'জীবনে কতবার মোকাম্বোতে খেয়েছেন, জীবনবাবু?' তাতে আমি বলেছিলাম, 'ঐ একবারই স্যার'। কাল সন্ধ্যায় আমি মোকাম্বোতে থাইনি কিন্তু!

একটা মোক্ষম আন্ডারকাট সাক্ষী অতি সুন্দরভাবে এড়িয়ে গেল সেটা এতক্ষণে অনুধাবন করলেন নিরঞ্জন মাইতি। জীবন বিশ্বাসের পিছনে টিকটিকি লাগিয়ে এমন সুন্দর একটা সূত্র আবিষ্কার করলেন, কিন্তু লোকটা পিছলে গেল। জীবন হাসি-হাসি মুখে বললে, আমিও স্যার আপনার টনসিল দেখতে চাইছি না। বিশ্বাস না হয় পেশকারবাবুকে শুধোন!

প্রচণ্ড হাস্যরোল উঠল আদালতে।

জোরে হাতুড়িটা ঠুকলেন জাস্টিস্ ভাদুড়ী। দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা যদি আদালতের কাজে বাধা দেন তাহলে আমি আদালত ফাঁকা করে দিতে বাধ্য হব।

তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধতা ফিরে এল কোর্ট-রুমে। সাক্ষীর দিকে ফিরে জাস্টিস্ বললেন, আপনি বাজে কথা বলবেন না একদম।

হাত দুটি জোড় করে জীবন বিশ্বাস বললে, টনসিলের কথাটা কিন্তু হুজুর আমি আগে তুলিনি।

—স্টপ ইট! য়ু মে প্রসীড।

মাইতি পুনরায় শুরু করেন, কী খেয়েছিলেন আপনারা?

—বিরিয়ানি পোলাও, তন্দুরি চিকেন, ফ্রায়েড প্রন, সুইট অ্যান্ড সাওয়ার। ও ভুলে গেছি স্যার—তার আগে আমি খেয়েছিলাম চিকেন সুপ আর ডিনার রোল। সব শেষে কুলফি!

—সবাই তাই খেয়েছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাগ করে। ওঁরা দুজন সুপ খাননি।

—ড্রিংকস্ নেননি?

মাথা চুলকে জীবন বিশ্বাস বললে, আজ্ঞে আমি খাইনি স্যার। ছাপোষা মানুষ, ওসব আমার পোষায় না। আমি সুপ খেয়েছিলাম শুধু।

—আর ওঁরা দুজন?

—ওরা এক এক পেগ চড়িয়ে ছিলেন!

বাসু-সাহেব দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, ইডিয়ট!

মাইতিও স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছেন। বড়শি-ছেঁড়া মাছটা আবার টোপ গিলেছে। এখন খেলিয়ে তুলতে হবে। বললেন, মাত্র এক এক পেগ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার!

—কী খেয়েছিলেন ওঁরা জানেন? না কি মদের নামও জানেন না আপনি?

প্রদ্যোত বাসু-সাহেবের কানে কানে বললে—অবজেকশান দিন! মামলার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক? বাসু-সাহেব বললেন, ও আমার মক্কেল নয়! লোকটা আত্মহত্যা করছে। করুক, আমার কী?

ব্যারিস্টার রে-সাহেব অস্ফুটে বললেন, ট্রু!

—কেন? রে-ফাঁস কী বলল ও?—প্রশ্ন করে প্রদ্যোৎ।

ব্যারিস্টার রে অস্ফুটে বললেন, ডোণ্ট ফলো ইয়ার ম্যান? ঘটনাটা গুডফ্রাইডের আগের সন্ধ্যা।

প্রদ্যোত হালে পানি পায় না। ওদিকে আরও কয়েকটি প্রশ্নোত্তর হয়ে গেছে মাইতি তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী করে বুঝলেন ইনি ব্ল্যাকনাইট হুইস্কি খেলেন, আর উনি জিন-উইথ-লাইম? একটু পরখ করে দেখেছিলেন নাকি?

জীবন বিশ্বাস একগাল হেসে বললে, আজ্ঞে না স্যার! আমার সামনে অর্ডার দিলেন, বিল মেটালেন, আমি জানব না?

—তা তো বটেই। তাহলে আপনি নিঃসন্দেহ যে, আসামী সে-রাত্রে জিন-উইথ-লাইম আর মিস্টার যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া ব্ল্যাক-নাইট হুইস্কি খেয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাইতি হেসে বলেন, এবার বলুন তো বিশ্বাস মশাই, 'পার্জারি' মানে কী?

—আজ্ঞে আমি জানি না। জোলাপ নেওয়া বোধহয়।

—কিন্তু এটা তো জানেন যে, সেটা ছিল গুর্ডফ্রাইডের আগের সন্ধ্যা।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা জানি বইকি।

—সেদিন কি বার ছিল?

—বৃহস্পতিবার।

—ক'লকাতার কোন খানদানি দোকানে বৃহস্পতিবার মদ বিক্রি হয়?

টনসিলের প্রশ্নটা মাইতি আবার তুলতে পারতেন। তা কিন্তু তুললেন না তিনি। বললেন, আপনি আগাগোড়া মিছে কথা বলেছেন! মোকাম্বোতে আপনি ঐ দিন আদৌ যাননি এবং সেখানে ঐ আসামীর সঙ্গে খানা খাননি! বলুন! স্বীকার করুন!

জীবন হাত দুটি জোড় করে বললে, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি যাইনি। কিন্তু ওঁরা দুজন গিয়েছিলেন! ঐ সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ওঁরা ওখানে ছিলেন!

—দ্যাটস্ অল মি' লর্ড!—মাইতি আসন গ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ একজন সাব ইন্সপেক্টার তাঁর কানে কানে কী যেন বলে। উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মাইতি। উঠে দাঁড়িয়ে জজ-সাহেবকে একটি সাড়ম্বর 'বাও' করে বলেন, আদালত যদি অনুমতি করেন, তবে আমি একটি নিবেদন করতে চাই। এই মাত্র ইনভেস্টিগেটিং অফিসার আমাকে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পেশ করেছেন—যা এই মামলায় সত্য নির্ধারণে প্রভূতভাবে সাহায্য করবে। বস্তুত গত এক সপ্তাহ ধরেই আমরা অনুসন্ধান কার্য চালাচ্ছিলাম—চূড়ান্ত তথ্য এইমাত্র জানা গেছে। আদালত অনুমতি করলে আমি আর একজন সাক্ষীকে প্রসিকিউশনের তরফে সাক্ষ্য দিতে ডাকতে পারি।

জজ-সাহেব বলেন, আদালত এটা পছন্দ করেন না। বাদীপক্ষ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত না হয়ে মামলায় 'ডেট' নিলেন কেন? বিবাদী পক্ষের সাক্ষী নেওয়া হয়ে গেছে, এখন, ওয়েল—আমি রুলিং দেবার আগে জানতে চাই এ বিষয়ে প্রতিবাদীর কাউন্সেল কী বলেন?

বাসু বলেন, সত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ক এটাই আমরা চাই। আমাদের আপত্তি নেই।

মাইতির আহ্বানে অতঃপর সাক্ষ্য দিতে উঠে দাঁড়ালেন সি. বি. আই-এর ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট মিস্টার এম. পান্ডে। মাইতি খুশিতে ডগমগ। প্রশ্ন করেন, মিস্টার পান্ডে, আপনি ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট হিসাবে কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন? কতদিনের?

—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। দু'বছরের।

—আপনাকে গত বারই এপ্রিল আসামীর একটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট দিয়ে অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছিল কি?

—হয়েছিল।

—আসামীর সেই ফিঙ্গার-প্রিন্টটি কি আপনি দয়া করে আমাদের দেখাবেন?

সাক্ষী তাঁর ব্যাগ খুলে নম্বর দেওয়া একটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট বার করে দিলেন। মাইতি সেটি আদালতে নথিভুক্ত করলেন—"এফ-পি-ওয়ান" রূপে। তারপর বললেন, এবার আপনার তদন্তের ফলাফল বলুন।

সাক্ষী জবাবে বললেন যে, তিনি লালবাজার ফিঙ্গার-প্রিন্ট লাইব্রেরীতে বসে গত চার-পাঁচদিন ঐটা মেলাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যান। গত পনের তারিখে তাঁর সন্দেহ হয়, একজন দাগী আসামীর সঙ্গে ফিঙ্গার-প্রিন্টটি মিলে যাচ্ছে। দাগী আসামীর নাম লালু, ওরফে খোকন। সে বহরমপুরের একটি ডাকাতি কেসে ইতিপূর্বে ধরা পড়েছিল আরও সাতজনের সঙ্গে। তাদের ভিতর পাঁচজনের মেয়াদ হয়—দুজন যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে ছাড়া পায়। সেই দুজনের ভিতর একজন ঐ খোকন ওরফে লালু। ঘটনা ছয় মাস আগেকার। সাক্ষী ঐ দিনই বহরমপুরে চলে যান। সেখানকার থানায় রাখা ফিঙ্গার-প্রিন্ট-এর সঙ্গে ঐ 'এফ-পি-ওয়ান' ছাপটি মিলিয়ে দেখেন। দেখে নিঃসন্দেহ হন যে, বর্তমান মামলার আসামী সুপ্রিয় দাশগুপ্ত আর খোকন ওরফে লালু অভিন্ন ব্যক্তি!

মাইতি প্রশ্ন করেন, বহরমপুর থানা থেকে কী খবর পেলেন? সেই লালু ওরফে খোকন বর্তমানে কোথায়?

—ওঁরা তা বলতে পারলেন না। আজ ছয় সাতমাস সে বহরমপুরে যায়নি।

—তাহলে আপনি নিঃসন্দেহ যে, খোকন ওরফে লালুই হচ্ছে ঐ আসামী সুপ্রিয়?

—হ্যাঁ, আমি নিঃসন্দেহ!

—আচ্ছা, এমনও হতে পারে যে দুটো ফিঙ্গার-প্রিন্ট হুবহু মিলে গেল, অথচ পরে দেখা গেল সে দুটো বিভিন্ন লোকের?

—না, তা হতে পারে না!

—এমন রেকর্ড কোথাও নেই?

—না নেই!

—কিন্তু 'আনব্রোকন রেকর্ড'ও ক্ষেত্র-বিশেষে তো 'ব্রোকন' হয়?

—সাক্ষী ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন, আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না?

—পারছেন না? আচ্ছা, আমি একটা উদাহরণ দিই,—হয়তো বুঝবেন কী বলতে চাইছি—ধরুন আজ আমি বিশ বছর ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে প্র্যাকটিস করছি এবং এই বিশ বছরের ভিতর আমার কোনও মক্কেলের কখনও 'কনভিকশন' হয়নি। তখন হয়তো আমি বড়াই করে বলতে পারি, এটা হচ্ছে 'আনব্রোকন রেকর্ড'! এ রেকর্ড কখনও ভাঙা যায়নি, ভাঙা যাবে না!

পাণ্ডে সাহেব কলকাতার লোক নন। প্রশ্নটার তীব্র ব্যঙ্গের মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না। সহজভাবে বলে ওঠেন, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই! সমস্ত দুনিয়া মেনে নিয়েছে দুটি মানুষের কখনও হুবহু এক রকম ফিঙ্গার-প্রিন্ট হতে পারে না।

প্রদ্যোৎ লক্ষ্য করে দেখে বাসু-সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আসামীর দিকে! যে লোকটাকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছেন, এখন যেন তাকেই খুন করতে চান উনি! তার পরেই প্রদ্যোতের নজরে পড়ল বাসু-সাহেবের পাশের চেয়ারখানায়। সেটা ফাঁকা। বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. রে কখন নিঃশব্দে উঠে চলে গেছেন।

মাইতি একেবারে বিনয়ের অবতার। ঝুঁকে পড়ে বাসুকে বলেন, য়ু মে ক্রস-এক্সামিন হিম, ইফ য়ু প্লীজ!

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। আদালত কর্ণময়। বার অ্যাসোসিয়েশানের অনেকেই এসেছে আজ। এমন

অবস্থায় বাসু-সাহেবকে কেউ কখনও দেখেনি। সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। বাসু-সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, সহযোগী পাবলিক প্রসিকিউটার যে বারো তারিখ থেকে এ জাতীয় অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন সে খবরটা তিনি এতাবৎকাল আদালতকে জানাননি। বস্তুত তদন্ত শেষ না করে মামলায় উপস্থিত হওয়া যে তাঁর পক্ষে উচিত হয়নি একথা মহামান্য আদালত ইতিপূর্বেই বলেছেন। সে যাই হোক, আমরা এ তথ্য এইমাত্র শুনলাম। তাই প্রতিবাদী পক্ষ আদালতের কাছে কিছু সময় চাইছেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। প্রতিবাদী আগামী কাল জেরা করবেন। নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই আদালত বন্ধ হয়ে গেল।

বাসু-সাহেবের গরম লাগছিল। গাউনটা খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিলেন। চকিতে তাকিয়ে দেখলেন পাশের চেয়ারখানার দিকে। সেটা ফাঁকা। ধীর পদে আদালত ছেড়ে বার হয়ে এলেন। পিছন পিছন এল সুজাতা। প্রদ্যোৎ না বলে পারল না—সুপ্রিয়র সঙ্গে একবার দেখা করবেন না স্যার?

—নো! হি ইজ এ ডাউন-রাইট ড্যাম লায়ার! এক নম্বর মিথ্যাবাদী!

—কিন্তু যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া তাহলে কেন ওকে—

—যদুপতি কিছু যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা নয়! একটা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার! এমনও হতে পারে ঐ খোকন ওরফে লালু—অর্থাৎ সুপ্রিয়, ওর পোষা গুণ্ডা! পাপের সাথী!

কোর্ট থেকে ফিরে এলেন ওঁরা।

আট

বাড়িতে যখন এসে পৌঁছালেন তখন বিকাল সাড়ে পাঁচটা। গাড়ি থেকে নেমে উনি ধীরে ধীরে ঢুকে গেলেন নিজের চেম্বারে। অন্যদিন সচরাচর প্রথমেই গিয়ে রানীর সঙ্গে দেখা করেন। দু-চারটে খোশ-গল্প করতে করতেই এক কাপ কফি খান। তারপর স্নান করেন, এবং তারপর নিজের চেম্বারে গিয়ে বসেন। পিছনে থাক-দেওয়া আইনের বই—নিচেকার লকারে থাকে লিকার-গ্লাস। বিশু রেখে যায় বরফের কুচির প্লেট। রাত নটায় ডিনার। কিন্তু তারপর আবার শুরু হয় পড়াশুনা। আবার গিয়ে বসেন চেম্বারে—তখন আর মদ্যপান করেন না। ক্বচিৎ কোনদিন হয়তো একটা ড্রাই মার্টিনী নিলেন—সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কখন শুতে যাবেন সেটা নির্ভর করে পরদিনের মামলার গুরুত্বের উপর—অথবা হয়তো নির্ভর করে কতক্ষণে একটা চাকা দেওয়া চেয়ার এসে থামবে ঐ চেম্বারের দ্বারপথে। শোনা যাবে প্রশ্ন, রাত অনেক হল যে, শোবে না?

আজ তার ব্যতিক্রম হল। বাসু স্নান করলেন না, কফি খেলেন না। রানী দেবীর সঙ্গে দুটো হাল্‌কা-রসিকতাও করলেন না। এমনকি জামা জুতো পর্যন্ত ছাড়লেন না। ঢুকে গেলেন চেম্বারে।

মিনিট দশেক পরে ইন্টারকমটা সাড়া দিয়ে উঠল। কাচের গবলেটটা সরিয়ে রেখে বাসু সুইচ টিপে বললেন, বল, শুনছি।

—কফি খাবে না? ভিতরে আসবে না?

—আসব রানু—ভিতরে আসব বই কি। একটু পরে—

—শোন, ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হয়েছে। একটু আগে সুবর্ণ এসেছে—

চমকে উঠলেন বাসু। অস্বাভাবিকভাবে। হয়তো আনমনা ছিলেন, কিম্বা অত্যন্ত দ্রুত মদটা খাচ্ছিলেন—প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, কে? কে এসেছে বললে?

—ঐ সুপ্রিয়র স্ত্রী। যাকে আসতে বলেছিলে তুমি—

—হ্যাঁ, কিন্তু কী নাম বললে তাঁর?

বেদনাহত কণ্ঠ ভেসে এল রানী দেবীর, হ্যাঁ, ঐ নামই! আশ্চর্য কোয়েন্সিডেন্স নয়?

দুজনেই নীরব। প্রায় আধ মিনিট। শেষে রানী বললেন, আমি ও-ঘরে আসব?

—তাই এস। আমি ঐ মেয়েটার সামনে দাঁড়াতে...তুমি চলে এস—

নিতান্ত কাকতালীয় ব্যাপার। বছর সাতেক আগে ম্যাসানজোর বাঁধ দেখতে গিয়ে পথ-দুর্ঘটনায় বাসু-সাহেবের যে মেয়েটি মারা যায় তার নাম এবং ঐ 'দাগী আসামী' সুপ্রিয় দাশগুপ্তের স্ত্রীর নাম অভিন্ন। দুজনেই সুবর্ণ!

একটু পরে চেম্বারের দরজাটা খুলে গেল। চাকা-দেওয়া চেয়ারে এসে উপস্থিত হলেন মিসেস বাসু। বললেন, সৃজাতার কাছে সব শুনলাম। আজকের মামলার খবর।—একটু থেমে আবার বলেন, ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না, নয়?

অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন বাসুসাহেব।

দুজনেই কিছুটা নীরব। তারপর বাসু বললেন, তুমি যা ভাবছ তা নয় রানু। আমার আনব্রোকন রেকর্ড আজ ভেঙে যাচ্ছে বলে আজ ভেঙে পড়িনি আমি। আফটার অল, হোয়াট্‌স দ্যাট আনব্রোকন রেকর্ড? মিয়ার চান্স! আমি বরাবর জিতেছি। কেন জিতেছি? আমার বাকপটুতার জন্যে? বুদ্ধির জন্যে? আইনজ্ঞানের জন্যে? না! নিতান্ত কোয়েন্সিডেন্স। ঘটনাচক্রে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সত্য ছিল আমার পক্ষে। আমি যাদের হয়ে লড়েছি তারা প্রতিক্ষেত্রেই ছিল নির্দোষ! হ্যাঁ, একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে—তোমার মনে আছে নিশ্চয়। সেই মারোয়াড়ি ছেলেটার কেস—যে তার বাপকে খুন করেছিল! কিন্তু আমি যখন তার কেস লড়েছিলাম তখন আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলাম তার কথায়—যে, সে নির্দোষ! সেও বেকসুর খালাস হয়েছিল। খালাস পাবার পর আনন্দের আতিশয্যে সে এসে আমার কাছে স্বীকার করেছিল—সে নিজেই তার বাপকে খুন করেছে!

রানী বললেন, মনে আছে আমার। তারপরে বহুদিন তুমি কোর্টে যাওনি।

—সেবার তবু একটা সান্ত্বনা ছিল রানী—আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলাম যে, ছেলেটা নির্দোষ! বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার ছিলাম। কিন্তু এবার? এবার যে আমি নিজেই বুঝতে পারছি লোকটা একটা পাকা ক্রিমিনাল!

—সন্দেহের কোন অবকাশ নেই?

—থাকলে এভাবে ভেঙে পড়ি আমি? আগামীকাল জীবনে প্রথম কোর্ট থেকে হেরে ফিরব—সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই। অতটা আত্মকেন্দ্রিক নই আমি। কোর্ট থেকে ফেরার কথা ভাবছি না আমি। কোর্টে যাবার কথাই ভাবছি। লোকটা দোষী জেনেও কেমন করে তার পক্ষে সওয়াল করব? সেখানেই যে আমার সত্যিকারের আনব্রোকন রেকর্ড সজ্ঞানে ভাঙব আমি।

—উপায় কী বল? এ অবস্থায় কি তুমি আইনত ওর পক্ষ ত্যাগ করতে পার?

—পারি! আইনত পারি—প্রফেশনাল এথিক্সে পারি না। সমস্ত বার অ্যাসোসিয়েশান একবাক্যে বলবে—নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে বাসু-সাহেব পালিয়ে গেল!

—ওরা তোমার আসল বেদনার কথাটা বুঝবে না?

—কেমন করে বুঝবে রানু? তুমি ওদের সাইকলিজিটা দেখছ না? ওদের সবারই একবার না একবার নেজ কাটা গেছে। দল-ছুট এই লাঙ্গুল-যুক্ত শৃগালটিকে কেমন করে ওরা ক্ষমা করতে পারবে? আর তাছাড়া কথাটাও তো ঠিক! নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে সবাই যদি এমনভাবে সরে দাঁড়ায় তবে মক্কেলরা কোথায় দাঁড়াবে?

—মিঠুর সঙ্গে দেখা করবে না?

—মিঠু!—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান বাসু-সাহেব!

অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে যান রানী দেবী, না, না। ওটা আমারই ভুল! ওর নাম মিঠু নয়। ওর...ওর ডাক নাম আমি জানি না! আমার...আমার...

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই মুখে আঁচল চাপা দিলেন রানী বাসু।

অনেক অনেক দিন পর ঐ দুটো নাম—'সুবর্ণ' আর 'মিঠু' এ বাড়িতে উচ্চারিত হল। বাসু-সাহেব বুঝতে পারেন—রানী অজান্তে ঐ নামের সাযুজ্য ধরে অজানা অচেনা মেয়েটাকে আপন করে নিয়েছে। তাই সুপ্রিয় দাসগুপ্তের স্ত্রী সুবর্ণ হঠাৎ 'মিঠু'ও হয়ে গেছে তাঁর কাছে। বাসু উঠে এসে ওঁর পিঠে একটা হাত রাখেন। রানী ততক্ষণে সামলেছেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চল, ভিতরে যাই।

সুপ্রিয় বলেছিল তার স্ত্রী নার্ভাস প্রকৃতির। কিন্তু তেমন কিছু নার্ভাস প্রকৃতির বলে মনে হল না বাসু-সাহেবের। এমন দুঃসংবাদ আচমকা পেলে সবাই কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়ে। তার বেশি কিছু নয়। সে নিজেই এসেছে। প্লেনে নয়, ট্রেনেই। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে নিউ আলিপুরে। বাসু-সাহেব ওকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিলেন। ওঁদের মেয়ে সুবর্ণ মারা গেছে সাত বছর আগে। তখন তার বয়স ছিল আট-নয়—অর্থাৎ থাকলে আজ সেই সুবর্ণের বয়স হত ষোলো। এ মেয়েটি ষোড়শী নয়। বছর-বাইশ বয়স ওর। দুই সুবর্ণের আকৃতিগত পার্থক্যও যথেষ্ট। সে ছিল ফর্সা, এ শ্যামলা। সে ছিল রোগা একহারা, এ দোহারা, স্বাস্থ্যবতী। একমাত্র নাম—সাযুজ্য ছাড়া আর কোন সাদৃশ্য নেই!

না! ভুল হল! আর একটা সাদৃশ্য আছে! সেই সুবর্ণের মাথা লক্ষ্য করে যখন এক নিষ্ঠুর অলক্ষ্যচারী বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন তখন বাসু-সাহেব বুক পেতে দিয়েও তাকে রক্ষা করতে পারেননি। ওঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিপত্তি, অর্থ সব-কিছু নিষ্ফল হয়ে গিয়েছিল সেই অসহায় ছোট্ট মেয়েটার শেষ-সংগ্রামে। আজ এই সুবর্ণের অবস্থাও তাই। ওঁর বিদ্যা-বুদ্ধি-আইনজ্ঞান কোন কিছুই ঐ আশ্রিতা মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারবে না!

—কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের?—প্রশ্ন করলেন বাসু।

—দু'বছর।

—বাচ্চা-টাচ্চা হয়নি?

মেয়েটি মুখ নিচু করল। রানী দেবী পাশ থেকে বলে ওঠেন, পেটে এসেছিল, থাকেনি।

—বাবা-মা আছেন? বাপের বাড়ি কোথায়?

মেয়েটি মুখ তুলল না। টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল কোলের উপর।

রানী দেবীই জবাব দিলেন এ প্রশ্নের। বললেন—বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কোথাও ওকে নেবে না। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ নয়—অসবর্ণ বিয়ে। ওরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল!

কোথায় এ রোমান্টিক সংবাদে খুশিয়াল হয়ে উঠবেন আধুনিকমনা ব্যারিস্টার-সাহেব, তা নয় খিঁচিয়ে ওঠেন উনি, প্রেম করে বিয়ে! তা প্রেম করার আগে ওর ফিঙ্গার-প্রিন্টটা নিয়ে যাচাই করাওনি?—চেয়ার ছেড়ে উঠে পদচারণা শুরু করেন।

বেদনাহত জলভরা দু-চোখ তুলে মেয়েটি বললে, ও খুন করেনি! আপনি বিশ্বাস করুন!

বাসু-সাহেব বাঁ-হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা মুষ্টাঘাত করলেন শুধু।

—ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে...আপনি...আপনি ওকে বাঁচান!—মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে চায়। ওর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ত—কিংবা—

বাসু-সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন ঃ সিট ডাউন!

থতমত খেয়ে মেয়েটি আবার চেয়ারে বসে পড়ে।

—আজ থেকে ছ'মাস আগে—ধর, গত বছর অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বরে সুপ্রিয় বোম্বাই থেকে ক'লকাতা এসেছিল?

সুবর্ণ মনে মনে কী হিসাব করে বলল, হ্যাঁ, অফিসের কাজে। মাসখানেকের জন্য। কেন?

—'কেন' সে-কথা থাক। তুমি কি কোনদিন এমন আশঙ্কা করনি যে, ওর কোন 'শেডি-পাস্ট' থাকতে পারে?

—ওর কোনও শেডি-পাস্ট নেই!

—কাকে কী বলছ সুবর্ণ? মায়ের কাছে মাসীর গল্প?

রানী দেবী এবার প্রতিবাদ করে ওঠেন, তুমি কথায় কথায় ওকে অমন ধমক দেবে না কিন্তু—

বাসু-সাহেবের একবার সুবর্ণের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। শ্রাগ করলেন। গিয়ে বসলেন তাঁর ইজিচেয়ারে। পাইপটা ধরালেন।

সুবর্ণ বললে, আমি ওর সঙ্গে দেখা করব।

—তাতো করবেই। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাব।

ঠিক তখনই বিশু এনে দিল একটা ওভার-সীজ টেলিগ্রাফ। খামটা খুলে বাসু দেখলেন তারবার্তাটা আসছে ব্যাঙ্কক থেকে। তাতে লেখা ঃ

"সুপ্রিয় দাশগুপ্তকে ডিফেন্ড করুন এএএ তার সততা এবং কর্মদক্ষতা সন্দেহের অতীত এএএ যাবতীয় খরচ আমার এএএ আকাশ হচ্ছে খরচের ঊর্ধ্বসীমা এএএ রবিবারে দমদম পৌছাব এএএ মোহনস্বরূপ কাপাডিয়া।"

বাসু-সাহেব টেলিগ্রাফখানা বাড়িয়ে ধরলেন সুবর্ণের দিকে। বললেন, আই নাউ বেগ য়োর পার্ডন, সুবর্ণ! আমি অন্যায় কথা বলেছিলাম। তুমি প্রেমে পড়ে যে ভুল করেছ তোমার স্বামীর এমপ্লয়ার ধুরন্ধর কোটিপতি হওয়া সত্ত্বেও সেই একই ভুল করেছেন!

নিজের ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলেন বাসু। পার্ক-হোটেলের নাম্বার চাইলেন। অপারেটারকে বললেন, রুম নম্বর 78 প্লীজ।

একটু পরে রিঙিং টোন শোনা গেল। ওপ্রান্ত বলল, হ্যালো, জীবন বিশ্বাস বলছি—

—আমাকে না বলে কোর্ট ছেড়ে চলে এলেন কেন?

—আপনি কে? বাসু-সাহেব?

—হ্যাঁ, আমি। কোর্ট থেকে পালিয়ে এলে কেন?

—পালিয়ে তো আসিনি স্যার। কেন, কৌন দরকার আছে?

—আছে! তুমি ইচ্ছে করে তোমার বন্ধুকে ফাঁসাচ্ছে!

—কী যে বলেন স্যার! আমি কেন ফাঁসাব? আমি তো তার জন্যে পার্জারির কেসে ফাঁসতে পর্যন্ত রাজী হয়েছিলাম?

বাসু-সাহেব একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি ঘন্টাখানেক হোটেল ছেড়ে বের হয়ো না। তোমাকে একটা জরুরী খবর দেব। বুঝলে?

—আজ্ঞে আচ্ছা!

বাসু-সাহেব টেলিফোনটা রেখে টানা-ড্রয়ারটা খুললেন। বার করে নিলেন আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র। সুজাতা এসে দাঁড়ালো দরজায়। বললে, বের হচ্ছেন নাকি আবার?

—হ্যাঁ, সুজাতা! আবার এক মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। পার্ক-হোটেলে ফোন করে এইমাত্র জীবন বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললাম। লোকটা জীবন বিশ্বাস নয়। আই মাস্ট ফাইন্ড আউট—লোকটা কে!

—সে কী! লোকটা বলল যে, সে জীবন বিশ্বাস?

—তাই সে বলল। গলাটা নকল করবার চেষ্টাও করছিল—কিন্তু পারেনি।

গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি। একাই।

আধঘন্টা পরে পার্ক হোটেলের নিচে গাড়িটা রেখে এগিয়ে গেলেন রিসেপশান কাউন্টারের দিকে। জীবন বিশ্বাসের রুম নম্বর জেনে নিয়ে লিফট্ ধরে উপরে উঠলেন। চিহ্নিত দরজায় যখন ঘাঁ-হাতে টোকা মারলেন তখন তাঁর ডান হাতটা ছিল পকেটে—যে পকেটে আছে তাঁর আত্মরক্ষার অস্ত্রটা।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক।

—তুমি! তুমিই তখন ফোন ধরেছিলে?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে বললেন আবার ফোন করবেন?

বাসু-সাহেব দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। হাসতে হাসতে গিয়ে বসলেন একটা চেয়ারে। বললেন, টিকটিকিগিরি ভালই করছ। কিন্তু একটা ভুল হয়েছিল তোমার। তুমি ভুলে গিয়েছিলে জীবন বিশ্বাসের কাছে 'পার্জারির' অর্থ জোলাপ নেওয়া।

এবার কৌশিকও হেসে ওঠে উচ্চকণ্ঠে। বলে, আয়াম সরি!

কৌশিক তার এই অদ্ভুত আচরণের কৈফিয়ৎ দিল—

মিথ্যা-সাক্ষী ধরা পড়ার পরেই জীবন আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কৌশিকের সন্দেহ হয় যে, সে আত্মগোপন করতে চাইছে। সে পিছন পিছন বেরিয়ে আসে। জীবন একটি ফ্লাইং ট্যাক্সি ধরে রওনা দেয়। দ্বিতীয় ট্যাক্সি পেতে প্রায় মিনিট দশেক দেরী হয়ে যায় তার। দুর্ভাগ্যক্রমে পথে একটা মিছিল পড়ে আরও দশ মিনিট দেরী হয়ে যায়। কৌশিক এসে পৌছায় পার্ক-হোটেলে। রুম বেয়ারা হরিমোহনের খোঁজ পেতে বিলম্ব হয় না। তার মাধ্যমে রিসেপশান কাউন্টারে খবর নিয়ে জানতে পারে, মিনিট পাঁচেক আগে জীবন বিশ্বাস চেক আউট করে বেরিয়ে গেছে। ও তার রুম নাম্বারটা জেনে নেয় এবং জে.বিশ্বাস নামে তখনই ঘরটা বুক করে।

—কেন?

—আমি একটা চান্স নিলাম স্যার, আর অদ্ভুত ফল ফলেছে তাতে!

—কী রকম?

কৌশিক নাকি ঘরে এসেই টেলিফোনটা তুলে নিয়েছিল। অপারেটারকে বলে,রুম নাম্বার 78 থেকে মিস্টার বিশ্বাস বলছি—আমার কোন ট্রাংক কল এসেছিল ইতিমধ্যে?

মেয়েটি বললে, না স্যার। কাল বিকালে সেই যে ট্রাংক কল এসেছিল তারপর তো আসেনি।

—কৌশিক বলেছিল, আচ্ছা কালকে আমি যে কলটা রিসিভ করেছিলাম সেটা বর্ধমান থেকে, না দুর্গাপুর থেকে? মনে আছে আপনার?

—আপনার মনে নেই? আসানসোল থেকে। কলার-এর নাম্বারটা চান?

—আছে আপনার কাছে? আমাকে উনি বলেছিলেন, লিখেও রেখেছি; কিন্তু কোথায় যে ফেললাম!

—এক মিনিট। আপনি লাইনটা ছেড়ে দিন। এখুনি জানাব আপনাকে। সমস্ত ইন-কামিং আর আউট-গোয়িং ট্রাংক কল লেখা থাকে একটা রেজিস্টারে।

—তাই নাকি? তা তো জানতাম না!

—নাহলে এত চার্জ আপনারা দেন কেন পার্ক-হোটেলে?

কৌশিক টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। সে মনে মনে হাসছিল—মেয়েটা ধরতে পারেনি যে, রুম নম্বর 78-এর বাসিন্দা গত দশ মিনিটের ভিতর বদলে গেছে! 'বিশ্বাস' উপাধিটাই কি ওর বিশ্বাস উৎপাদন করল? মেয়েটিও তখন ও-প্রান্তে মনে মনে হাসছিল—রুম 78-এর ভদ্রলোকের কাছে হোটেলের বিজ্ঞাপনটা সে ভালই করেছে। সে জানে এ বাবস্থার জন্য আসলে দায়ী কলকাতার পুলিস কমিশনার! খানদানী হোটেলেই খানদানী ষড়যন্ত্রকারীরা ওঠে। তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যই এই আদেশ দিয়েছে আত্মরক্ষা বিভাগ।

এক মিনিট পরে মেয়েটি ফোন করে জানাল, কাল আপনার কলার ছিলেন আসানসোল...

—থ্যাঙ্ক। আপনি আর কতক্ষণ বোর্ডে আছেন?

—কেন বলুন তো? কোন ইন্সট্রাকশান থাকলে আমার সাকসেসরকে বলে যাব।

—সে জন্য নয়। কারণটা না জানালে বলতে আপত্তি আছে?

—না না, তা কেন? আমার এখনই ডিউটি শেষ হল। আবার কাল বেলা দশটায় আসব আমি। এবার বলুন, কেন জানতে চাইছিলেন।

কৌশিক অম্লান বদনে বললে, তাহলে কাল দশটার সময় আবার আপনাকে বিরক্ত করব। আপনার কণ্ঠস্বরটা আমার খুব ভাল লাগছে। ডোন্ট টেক ইট আদার-ওয়াইজ—আমার এক নিকট আত্মীয়া, আত্মীয়া ঠিক নয় বান্ধবীর সঙ্গে আপনার কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত মিল।

মেয়েটির হাসির জলতরঙ্গ ভেসে এসেছিল টেলিফোনে। বলেছিল, গুডনাইট স্যার। সুইট ড্রিমস্!

—সেম টু য়ু। লাইন কেটে দিয়েছিল কৌশিক।

তারপর আধঘণ্টা অপেক্ষা করে সে আবার ফোনটা তুলেছিল। এবার কণ্ঠস্বর অনেক ভারী, অনেক ভরাট! কৌশিক বর্ধমান সদর থানার ও.সি.-কে একটা পি.পি.কল বুক করে। লাইটনিং কল। তৎক্ষণাৎ লাইন পায়। সে নৃপেন ঘোষালকে জানায় যে, বাসু-সাহেব যে মিস ডিক্রুজাকে খুঁজছেন সে আসানসোলের 'অমুক' নম্বর থেকে গতকাল ফোন করেছিল। নৃপেন ওকে বলে—এরপর যদি মেয়েটাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাকড়াও করতে না পারি তবে আমার নামটা পালটে রাখবেন।

কৌশিকের এতবড় কৃতিত্বেও কিন্তু বাসু-সাহেবের কোন ভাবান্তর হল না। তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন। যেন ধ্যানস্থ। এতক্ষণ শুনছিলেন কিনা তাই বোঝা গেল না। কৌশিক বুঝতে পারে উনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে কোন সাড়াশব্দ দেয় না। পুরো পাঁচ মিনিট কী চিন্তা করে হঠাৎ নড়েচড়ে বসলেন উনি। বলেন, কৌশিক, আমি কোন চান্স নেব না! মনে হচ্ছে সমাধান হয়ে গেছে। এখনও দু-চারটে ছোট ছোট অসঙ্গতি রয়েছে বটে, কিন্তু মূল সমস্যাটার মীমাংসা হয়ে গেছে।

—কী বুঝেছেন আপনি?

—দুই আর দুইয়ে চার!

—তার মানে?

—তার মানে তুমি এখান থেকেই আমার এই গাড়িটা নিয়ে আসানসোল চলে যাও। এখন সন্ধ্যা সাতটা। রাত দশটা নাগাদ তুমি বর্ধমানে পৌঁছাবে। সেখানে যদি নৃপেনের দেখা পাও ভাল, না পাও প্রসীড টু আসানসোল। রাত একটা নাগাদ সেখানে পৌঁছাবে। সোজা কোতোয়ালিতে চলে যাবে। সেখানে আমার পরবর্তী নির্দেশ পাবে।

—কার কাছে?

—ডিউটি অফিসারের কাছে। আমি বাড়ি ফিরে এ. ডি. এম্ আসানসোল, ডি. এস. পি. অথবা এস. ডি. ও. সদর যাকে কনট্যাক্ট করতে পারব তাঁকে ব্যাপারটা জানাব। মার্ডার-কেস। ওরা তোমাকে সাহায্য করবেই।

কৌশিক বলে, আর যে-সে মার্ডার নয়! লক্ষপতি এস.পি.জৈনের মার্ডার-কেস!

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওর কাঁধে একখানা হাত রেখে বলেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ কৌশিক। আমি হত্যা তদন্তের কথা বলছি না—হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে চাইছি! আজ রাত্রেই আসানসোলে দ্বিতীয় একটা মার্ডার হবার আশঙ্কা আছে!

কৌশিক স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

বাসু-সাহেব পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে ওর হাতে দেন, ধর!

—সে কী! এর লাইসেন্স যে আপনার নামে!

—সে দায়িত্ব আমার, কৌশিক। কিন্তু মৃত্যুর মুখে তোমাকে তো আমি নিরস্ত্র যেতে বলতে পারি না। আমি নিজে যেতে পারছি না। কাল দশটায় আমার কেস আবার উঠবে। আশা করছি, তার আগেই ভোররাত্রে তোমার একটা ফোন পাব। আমার অনুমান যদি সত্যি হয় মিঠুকে এবার বাঁচাতে পারব!

কৌশিক অবাক বিস্ময়ে বলে, মিঠু কে?

ম্লান হাসলেন বাসু। নিজেকেই বললেন যেন, আই বেগ য়োর পার্ডন! মিসেস্ সুপ্রিয় দাসগুপ্ত। সে এসে উঠেছে আমার বাড়িতে।

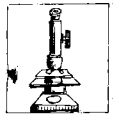

নয়

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে আলিপুর কোর্ট। গাড়িতে যেতে দুই থেকে তিন মিনিট লাগার কথা। কিন্তু ওঁদের লাগল আধঘণ্টা। সাড়ে ন'টায় ট্যাক্সি নিয়ে বার হয়েছিলেন জেলখানার ফটক থেকে, আর আদালতের সামনে এসে যখন উপস্থিত হলেন তখন ঠিক দশটা। কারণ ছিল। জেলখানা থেকে ট্যাক্সিটা নিয়ে ওঁরা চলে এসেছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। গাড়িটা বাগানের ধারে রেখে ড্রাইভারের পাশে বসা বাসু-সাহেব পিছন ফিরে বলেছিলেন, একটু নেমে এস, ঐ গাছতলায় বসে কয়েকটা কথা বলব।

পিছনের দিক থেকে সুজাতা আর সুবর্ণ নেমে পড়েছিল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার—

মানিব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বাসু বলেন, এটা তোমার মিটারের উপর। আধঘণ্টা দাঁড়াতে হবে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বুদ্ধিমান। তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়, মালদার শাঁসালো প্যাসেঞ্জার জুটেছে আজ তার বরাতে। সে কৃতার্থ হয়ে বলে, ঠিক আছে স্যার।

ঘাসের উপর ওঁরা তিনজন বসলেন। বাসু বললেন, সুবর্ণ, বুঝতে পারছি সুপ্রিয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী না হওয়াতে তুমি মর্মাহত হয়েছ—কিন্তু এতে তোমার দুঃখ করার কিছু নেই, এতে তোমার আনন্দিত হওয়ার কথা।

সুজাতা অবাক হয়ে তাকায়। আসামী সুপ্রিয় দাশগুপ্ত হাজতে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে না-চাওয়াটা বোম্বাই থেকে ছুটে আসা তার হতভাগ্য স্ত্রীর কাছে কোন্ যুক্তিতে আনন্দের হতে পারে এটা তার মাথায় ঢোকে না। বাসু-সাহেব বলে চলেন, কাল যখন কোর্ট থেকে ফিরে এসেছিলাম, তখন আমার জয়ের সম্ভাবনা ছিল শূন্য—কেসটা হারার আশঙ্কা ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট। তারপর সন্ধ্যা সাতটার সময় কৌশিক একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করে বসল। এক লাফে আমার জেতার সম্ভাবনাটা হয়ে গেল শতকরা পঁচিশ ভাগ! আজ দুরু দুরু বুকে তোমাকে নিয়ে আলিপুর জেলে এসেছিলাম। তুমি হয়তো শুনলে রাগ করবে, আমি মনে মনে ভগবানকে বলছিলাম—হে ঈশ্বর! সুপ্রিয় যেন তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে রাজী না হয়! শেষ পর্যন্ত দয়াময় আমার প্রার্থনাতে কর্ণপাত করেছেন। আয়াম হ্যাপি টু সে—ঠিক এই মুহূর্তে আমার জয়ের সম্ভাবনা সেভেন্টিফাইভ পার্সেন্ট!

সুবর্ণ তার অশ্রুধৌত চোখজোড়া তুলে তাকায়। কথা বলে না।

সুজাতা কিন্তু স্থির থাকতে পারে না। বলে, কী বলছেন আপনি! সুপ্রিয়বাবু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী না হওয়ায় আপনার এ মামলা জেতার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেল?

—ইফ নট মোর!

—কেন?

—সেটা আমি এখন বলব না। বলতে পারি না। সুবর্ণকে আমি আশা দিয়ে হতাশ করতে চাই না। কিন্তু একটা কথা বলব সুবর্ণ, মন দিয়ে শোন—

—বলুন?

—আদালতে মনকে খুব শক্ত করে রেখ। যত বড় মানসিক আঘাতই আসুক তুমি ভেঙে পড়বে না। পারবে?

সুবর্ণের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠল। বললে, আমাকে পারতেই হবে।

—ধর যদি আসামীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাও হয়, ভেঙে পড়বে না?

সুবর্ণ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে নির্বাক বসে রইল।

বাসু-সাহেব বললেন, তোমাকে সাক্ষী দেবার জন্য ডাকব আমি। পাঁচ-সাতটা প্রশ্ন করব। কিন্তু জেরায় বিপক্ষের উকিল তোমাকে খুব নাকাল করতে চাইবে। তুমি খুব শক্ত হয়ে থাকবে আর জবাবে যা বলবে তাতে নির্জলা সত্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। পারবে? উত্তরে তোমার স্বামীর ভাল হবে কি মন্দ হবে তা বিবেচনা করবে না—আদ্যন্ত সত্য কথা বলবে!

—তাই বলব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কোর্টে যত বড় আঘাতই আসুক না কেন আমি অটল থাকব।

—দ্যাট্স এ গুড গার্ল। কিন্তু তারও আগে হয়তো একটা শক পাবে তুমি। কোর্টে বসার আগে, মানে তোমাকে সাক্ষী দিতে ডাকার আগে তোমার কানে কানে একটা প্রশ্ন করব আমি। তুমি আমার কানে কানে তার সত্য জবাব দেবে। এগ্রীড?

সুজাতা বলল, এখনই সে উত্তরটা জেনে নিন না?

—সব জিনিসেরই একটা নিজস্ব সময় আছে সুজাতা। এগ্রীড?

—হ্যাঁ!

—তবে ওঠ, চল, সময় হয়ে গেছে।

আদালত-প্রাঙ্গণে ওঁরা প্রবেশ করলেন দশটায়। সেখানে বাসু-সাহেবের জন্য দুটি বিস্ময় ইতিপূর্বেই উপস্থিত। প্রথমত তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ.কে.রে। প্রবেশপথেই দেখতে পেলেন বাসু-সাহেব। উনি ভেবেছিলেন, ব্যারিস্টার রে আজ আসবেন না। দ্বিতীয়ত প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে ছিল কৌশিক।

—কী খবর?

—কৌশিক ওঁকে হাত ধরে বারান্দার একান্তে নিয়ে গেল। নিজের হাতঘড়িতে সময়টা দেখল। দশটা বেজে এক। বললে, ভোড় সাড়ে চারটেয় আসানসোল থেকে রওনা হয়েছি। মিনিট দশেক আগে এখানে পৌঁচেছি। শুনুন—জীবন বিশ্বাস ফেরার, তার এক লাখ টাকা সমেত—

—আই নো। নেক্সট?

—মিস্.ডি.সিল্ভার আস্তানা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেও ভেগেছে!

—লেট হার গো টু হেল্। তার ভাই? বিকৃতমস্তিষ্ক ছেলেটা?

—তাকে উদ্ধার করে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কোর্টে বসিয়েছি, দর্শকদের গ্যালারিতে— কিন্তু সে পাগল নয় মোটেই।

কৌশিক থেমে পড়ল। কে একজন এগিয়ে এসে বললেন, জজসাহেব এসে গেছেন।

বাসু বলেন, চলুন আমি যাচ্ছি—

কৌশিক বলে, আসল কথাটাই আমার বলা হয়নি—

—আসল কথাটা আমি জানি কৌশিক! তুমি মিস্টার ডি.সিল্ভার কাছে যাও। বেচারি অনেক ধকল সয়েছেন এ-কদিন। ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

একজন কোর্ট পেয়াদা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, স্যার!

—ঠিক আছে, চল।

দ্রুত পায়ে বাসু এসে প্রবেশ করলেন। নিজ আসনের কাছে এসে জজ-সাহেবকে বাও করে বললেন, আয়াম সরি!

জাস্টিস ভাদুড়ী বললেন, য়ু অট টু বি! আমাদের প্রতিটি মিনিট হচ্ছে পাবলিক টাইম। এনি ওয়ে। আর উই অল রেডি নাউ?

বাদীপক্ষে নিরঞ্জন মাইতি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা তো অনেকক্ষণ আগে থেকেই প্রস্তুত!

—তাহলে আদালত বসছে। গতকাল মিস্টার পান্ডের ক্রস-একজামিনেশনের আগেই অধিবেশন শেষ হয়েছিল। মিস্টার পান্ডে! টেক ইয়োর স্ট্যান্ড প্লীজ।

সি.বি.আই অফিসার মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী বললেন, প্লিজ রিমেম্বার, য়ু আর আন্ডার ওথ ওভার-নাইট!

ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট অভিবাদন করে বলেন, আই নো মি' লর্ড!

বাসু-সাহেবকে ইঙ্গিত করলেন বিচারক, প্লীজ প্রসীড।

এতক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হচ্ছিল গুরু-শিষ্যে। ব্যারিস্টার রে সাহেব বলেছিলেন, সেজন্য কাল আমি উঠে চলে যাইনি বাসু। আমার শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে চলে গিয়েছিলাম। হার-জিত নিয়েই জীবন! ইফ্ য়ু ক্যান টেক দ্য পাঞ্চ, কান্ট আই সোয়ালো ইট অ্যাজ ওয়েল?

জজ-সাহেব 'প্লীজ প্রসীড' বলার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যালাপ অসমাপ্ত রেখে বাসু উঠে দাঁড়ালেন। সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, মিস্টার পান্ডে, আপনি কাল আপনার সাক্ষ্যে বলেছেন যে, দুটি ভিন্ন লোকের ফিঙ্গার-প্রিন্ট কোন অবস্থাতেই হুবহু এক হতে পারে না। তাই না?

—তাই বলেছি।

—যেহেতু, 'এফ-পি-ওয়ান' আর বহরমপুর থানায় রক্ষিত ফিঙ্গার-প্রিন্ট দুটি হুবহু এক, তাই আপনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কাপাডিয়া আন্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার সুপ্রিয় দাশগুপ্ত এবং খোকন ওরফে লালু অভিন্ন ব্যক্তি? ইয়েস অর নো?

—ইয়েস!

—আপনার দু'বছর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ট্রেনিং এই সিদ্ধান্তে আপনাকে পৌঁছে দিয়েছে?

—হ্যাঁ তাই!

—কিন্তু ঐ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ইতিহাসে কি এমন নজির নেই, যে হায়েস্ট অথরিটি অন দ্য সাবজেক্ট বলেছেন, দুটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট হুবহু মিলে গেছে অথচ পরে প্রমাণিত হয়েছে যে দুটি বিভিন্ন লোকের ফিঙ্গার-প্রিন্ট?

—আমি এমন কেস একটিও জানি না।

—আপনি কি 'চেজ এ ক্রুকেড শ্যাডো' ফিল্মটা দেখেছেন?

—অবজেক্শান য়োর অনার! দ্যা কোয়েশ্চেন ইজ ইরেলিভ্যান্ট, ইমপার্টিন্যান্ট এবং বর্তমান মামলার সঙ্গে সম্পর্ক বিমুক্ত।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, অবজেকশান সাসটেন্ড! বাট্....একটু থেমে বললেন, বিষয়টা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। প্রতিবাদী কাউন্সেলকে আমি রিসেস্ পিরিয়ডে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি। আমি ঐ ফিল্মটা দেখিনি, কিন্তু—ওয়েল, য়ু মে প্রসীড....

বাসু-সাহেব একটা বাও করে বললেন, 'চেজ এ ক্রুকেড শ্যাডো' ফিল্মটা বর্তমান মামলায় অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু সহযোগী তাঁর ডাইরেক্ট এভিডেন্সে রামচন্দ্রপুরে আগরওয়াল হত্যার মামলার প্রসঙ্গ এনেছিলেন। সে মামলায় বর্তমান বিচারকই বিচার করেছিলেন, এবং আমার সহযোগী আইনজীবীই পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। আশা করি আপনাদের মনে আছে, সেখানেও দুটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষ হুবহু এক বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছিল সে দুটি ভিন্ন ব্যক্তির!

নিরঞ্জন মাইতি বলেন, সেটা ছিল অন্য ব্যাপার। তাতে ফিঙ্গার-প্রিন্ট সায়েন্সটা ভুল প্রমাণিত হয়নি!

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, আমি বাদীর সঙ্গে একমত। যাই হোক, আপনি জেরা চালিয়ে যান।

বাসু-সাহেব বলেন, মিস্টার পান্ডে, আজ যদি আমি প্রমাণ করি আসামী সুপ্রিয় দাশগুপ্ত ওরফে লালু নয়, তবে কি আপনি মেনে নেবেন ফিঙ্গার-প্রিন্ট সায়েন্সটা ভুল?

—এটা আপনার পক্ষে প্রমাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

—ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। সে, ইয়েস অর নো!

—ইয়েস!

বাসু হেসে বলেন, য়ু শুড বেটার হ্যাড সে 'নো'! তাই কিন্তু প্রমাণ করব আমি!

মাইতি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। তার আগেই বাসু বলেন, দ্যাটস্ অল মি' লর্ড! তারপর মহামান্য বিচারককে সম্বোধন করে বলেন, আদালত অনুমতি করলে আমি আমার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে পারি!

মাইতি একটা স্বগতোক্তি করেন, এর পরেও!

জাস্টিস্ ভাদুড়ী তাঁর দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করলেন; বাসুকে বলেন, ইয়েস, প্রসীড!

—আমার পরবর্তী সাক্ষী মিসেস সুবর্ণ দাশগুপ্তা।

—মিসেস সুবর্ণ দাশগুপ্তা হাজির?

সুবর্ণ সুজাতার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো সাক্ষীর মঞ্চে। অচঞ্চল দীপশিখার মত।

—আপনার নাম?

—মিসেস সুবর্ণ দাশগুপ্তা।

—স্বামীর নাম?

—মিস্টার সুপ্রিয় দাশগুপ্ত।

—আপনার স্বামী কী কাজ করেন?

—বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

—দু'বছর।

—হিন্দু-ম্যারেজ না রেজিস্ট্রি ম্যারেজ?

—রেজিস্ট্রি ম্যারেজ।

—আপনার স্বামী বর্তমানে কোথায় আছেন?

—আমি জানি না।

—অবজেক্‌শান য়োর অনার! জানেন না মানে কী?—লাফিয়ে ওঠেন মাইতি।

জাস্টিস ভাদুড়ী ভ্রুকুটি করেন। একবার সাক্ষী একবার বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখেন। বাসুকে কিছু বলতে যান, তারপর মনস্থির করে মাইতিকেই বলেন, অবজেকশান অন হোয়াট গ্রাউন্ডস্?

—ওঁর স্বামী জলজ্যান্ত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর উনি বলছেন 'জানি না'!

জাস্টিস ভাদুড়ী বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি কিছু বলবেন?

—আমি কী বলব? আমি তো শুনছি এখন। আমি সাক্ষীকে প্রশ্ন করেছি, তিনি জবাব দিয়েছেন। সহযোগী 'অবজেকশান' দিয়েছেন, তার কারণ দেখাচ্ছেন না। এখন কী বলতে পারি আমি?

—য়ু আর পারফেক্টলি রাইট টেকনিকালি—জজসাহেব মাইতির দিকে ফিরে বলেন, কী আপত্তি এ প্রশ্নোত্তরে তা তো বলবেন?

—এ তো ডাহা মিথ্যে কথা—ফুঁসে ওঠেন মাইতি!

—সো হোয়াট! সেটা জেরায় প্রমাণ করবেন। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য সাক্ষীর বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন; কিন্তু বর্তমান মামলায় বাধা দিচ্ছেন কোন অধিকারে?

মাইতি অসহায়ভাবে বসে পড়েন।

বাসুর পরবর্তী প্রশ্ন, এই কোর্ট রুমে আপনার স্বামী উপস্থিত আছেন?

সাক্ষী দর্শকমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন, আমি জানি না। দেখতে পাচ্ছি না।

মাইতি উঠে দাঁড়ান। আবার বসে পড়েন।

বাসু তাঁর হাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলেন, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঐ লোকটাকে ভালভাবে দেখুন...বলুন, ঐ লোকটাকে আপনি ইতিপূর্বে জীবনে কখনও দেখেছেন?

—না!

মুহূর্মুহু হাতুড়ির আঘাত সত্ত্বেও কোর্টরুমে নিস্তব্ধতা ফিরে আসতে পুরো এক মিনিট লাগল। জাস্টিস্ ভাদুড়ী এবার কিন্তু কাউকে ধমকালেন না।।

বাসুর পরবর্তী প্রশ্ন, কাঠগড়ার ঐ লোকটা আপনার বিয়ে করা স্বামী, কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার সুপ্রিয় দাশগুপ্ত, এম. এ. নয়?

—না!

মাইতি আর আত্মসম্বরণ করতে পারেন না। লাফিয়ে ওঠেন, দিস ইস্ প্রিপস্টারাস মি' লর্ড! এসব ওঁর অতি-নাটকীয় প্যাঁচ!

বাসু একধাপ এগিয়ে এসে উচ্চকণ্ঠে বলেন, মাননীয় আদালতের কাছে আমার একটি আর্জি আছে! যেহেতু এ পর্যন্ত বিচার আমার মক্কেল সুপ্রিয় দাসগুপ্তের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে তাই আমি এ মামলার আদ্যন্ত নাকচ করবার প্রার্থনা জানাচ্ছি!

বিচারকক্ষে পুনরায় গণ্ডগোলের সূত্রপাত হতেই জাস্টিস্ ভাদুড়ী একবার জোরে হাতুড়ির আঘাত করেন। স্তব্ধতা ফিরে আসে। বিচারক বলেন, যেহেতু এখনও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, আপনার মক্কেলের অনুপস্থিতিতে এ মামলার অধিবেশন হয়েছে তাই আপনার প্রার্থনা এখনই মঞ্জুর করা যাচ্ছে না! য়ু মে প্রসীড!

—দ্যাটস্ অল মি' লর্ড!—বাসু মাইতিকে বলেন, য়ু মে ক্রস-এক্সামিন হার।

আহত সিংহের মত লাফ দিয়ে ওঠেন মাইতি। নাটকীয়ভাবে সাক্ষীর সামনে এগিয়ে এসে বলেন, আপনি বললেন যে, ঐ লোকটা আপনার স্বামী নয়?

—তাই বলছি!

—তাহলে আপনার স্বামী কে?

—সুপ্রিয় দাশগুপ্ত!

—ঐ উনিই তো সুপ্রিয় দাশগুপ্ত!

—হতে পারে ওঁরও তাই নাম, কিন্তু উনি আমার স্বামী নন!

মাইতি অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন। বলেন, রাতারাতি কোথা থেকে আমদানি হলেন আপনি?

—অবজেকশান য়োর অনার! সহযোগীর প্রশ্নের ভাষায় আমার আপত্তি।

—অবজেকশান সাসটেইন্ড! আপনি সংযত ভাষায় প্রশ্ন করুন।

—আপনার কটা বিয়ে?

—অবজেকশান! সহযোগী আদালতের নির্দেশ মানছেন না। তাঁর ভাষা এখনও অশালীন!

জাস্টিস ভাদুড়ী মাইতিকে ধমক দেন, আপনি আপনার ভাষাকে সংযত করুন, না হলে ব্যাপারটা আমি আপনাদের বার-অ্যাসোসিয়েশানকে জানাতে বাধ্য হব!

মাইতি কিছু বলতে গেলেন। পারলেন না। মরিয়া হয়ে বললেন, আমি সময় চাইছি মি' লর্ড। এ মেয়েছেলেটা কে, সে খবরটা—

—অবজেকশান। 'এই ভদ্রমহিলাকে' বলুন!

মাইতি প্রায় তোৎলা হয়ে গেলেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, আপনারা দু-পক্ষ যদি রাজী থাকেন তাহলে আমি দশ মিনিটের জন্য কোর্ট স্থগিত রেখে আমার চেম্বারে আপনাদের দুজনের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে চাই।আফটার অল, আমাদের উদ্দেশ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা।

বাসু বলেন, আমি রাজী, কিন্তু তার আগে আমি একটা কাজ করতে চাই। আমি জানি, ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী এই আদালতে উপস্থিত আছেন। তাঁর জীবন সংশয়। তাঁকে সনাক্ত করে সর্বপ্রথম পুলিসের জিম্মায় দেওয়ার প্রয়োজন। আপনি কি ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দেবেন?

—ইয়েস! ডু অ্যাজ্ য়ু প্লীজ!

বাসু-সাহেব দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার সুপ্রিয় দাশগুপ্ত, ম্যানেজার, কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানি, যদি এ আদালতে উপস্থিত থাকেন তবে দয়া করে উঠে দাঁড়ান।

—দেখা গেল ভীড়ের মধ্যে একজন একহারা ফর্সা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরও বড় বড় জুলফি আছে। কিন্তু কোন মূর্খই তাঁকে আসামীর যমজ ভাই বলে ভুল করবে না—চেহারার সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও।

—আপনি এগিয়ে আসুন!

ধীর পদক্ষেপে ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন।

—আপনিই সুপ্রিয় দাশগুপ্ত—ম্যানেজার, কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানি?—প্রশ্ন করেন বাসু।

—হ্যাঁ!

—সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়ানো ঐ সুবর্ণ দাশগুপ্তা আপনার স্ত্রী?

লোকটা মুখ তুলে তাকালো। দেখলো চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মেয়েটি। সে কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বললে, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী!

মাইতি বললেন, কিন্তু এটা আমরা মেনে নিতে রাজী নই। এরা দুজনেই জাল হতে পারে! সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মেলোড্রামাটিক হচপচ হতে পারে।

জাস্টিস ভাদুড়ী বললেন, মিস্টার বাসু, আপনি কি কোন পথ দেখাতে পারেন যাতে প্রমাণ করা যায়—এঁরা দুজন সত্যি কথা বলছেন, অর্থাৎ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঐ লোকটা সুপ্রিয় দাশগুপ্ত নয়?

—কিছু সময় পেলে নিশ্চয় পারব, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই সেটা কেমন করে সম্ভব?

—ভুল বললে বাসু! এই মুহূর্তেই সেটা প্রমাণ করা সম্ভব।

সকলের দৃষ্টি গেল ডিফেন্স কাউন্সেলারদের চিহ্নিত কোণাটায়। উঠে দাঁড়িয়েছেন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. রে। তিনি একটি বাও করে বলেন, আদালত যদি আমাকে অনুমতি দেন—আমি পাঁচ মিনিটের ভিতর চূড়ান্তভাবে সমাধান করে দেব সমস্যাটা—

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, ইয়েস! প্লীজ ডু ইট!

—মিস্টার পান্ডে এখানে উপস্থিত। তিনি এই দু-জনের ফিঙ্গার-প্রিন্ট নিন। এখনই! তারপর ঐ নথিটা দিন। পিপলস এক্সিবিট নম্বর সেভেন। ওটা হচ্ছে সান্যাল অ্যাভিন্যুর একটা বাড়ির বিক্রয়-কোবালা। বিক্রেতা পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি হোল্ডার সুপ্রিয় দাশগুপ্ত। সাড়ে চার লাখ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করতে হলে সই ছাড়াও টিপছাপও দিতে হয়। মিস্টার পান্ডে ওটা দেখে পাঁচ মিনিটের ভিতর সনাক্তকরণ চূড়ান্তভাবে করে দিতে পারবেন।

আধঘণ্টার জন্য কোর্ট অ্যাডজার্ন করে জজ-সাহেব তাঁর খাশ কামরায় চলে গেলেন। সেখানে ডাক পড়ল বাসু, মাইতি এবং এ.কে.রে-র। ইতিমধ্যে পান্ডে-সাহেব তাঁর পরীক্ষাকার্য করে জানিয়েছেন, আসামী আর যেই হোক মোহনস্বরূপ কাপাডিয়ার ওকালতনামাধারী সুপ্রিয় দাশগুপ্ত নয়। দর্শকের আসন থেকে যে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই তাই।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, মিস্টার বাসু, আপনি যদি ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেন, তাহলে মামলাটার—অবশ্য মামলার নিষ্পত্তি তো হয়েই গেছে। আপনার মক্কেলের অনুপস্থিতিতে—

মাইতি বলেন, তা কেন! ওঁর মক্কেল তো ঐ আসামী! তার অপরাধ তো প্রমাণিত হয়েছে—

—না হয়নি।—বাধা দিয়ে বলেন এ. কে. রে—মামলায় তাকে অসংখ্যবার ম্যানেজার, কাপাডিয়া অ্যান্ড কাপাডিয়া কোম্পানি বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। সে তা নয়। সে পুনর্বিচার দাবী করতে পারে আইনত।

বাসু-সাহেব বলেন, সে সব কথা পরে। আপাততঃ এই নিন আমার দরখাস্ত। বর্তমান মামলার

আসামী খোকন ওরফে লালু আমার মক্কেল নয়। স্টেট-ভার্সেস সুপ্রিয় দাশগুপ্তের মামলা ডিস্‌মিস্ হয়েছে জানলেই আমার ছুটি!

জাস্টিস্ ভাদুড়ী বলেন, মামলা তো ডিস্‌মিস্ হয়েই গেছে। শুধু আমার অ্যানাউন্স করা বাকি। কিন্তু রহস্যটা যে কিছুই পরিষ্কার হল না বাসু-সাহেব।

বাসু হাত দুটি জোড় করে বলেন, আমার এক অনুগত ভক্ত আছে। সে গোয়েন্দা গল্প লেখে। কিছুদিনের মধ্যেই তার লেখা ছাপা বই বাজারে বেরুবে। আপনাকে না হয় এক কপি কমপ্লিমেন্টারি পাঠিয়ে দিতে বলব।

উঠে দাঁড়ান তিনি।

এ. কে. রে মাইতির দিকে ফিরে বললেন, আপনার নিমন্ত্রণে এসেছিলাম। আই এঞ্জয়েড ইট থরলি! আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

মাইতির মুখটা কালো হয়ে গেল। তবু কাষ্ঠ-হাসি হেসে শুধু বললেন, হেঁ হেঁ!

জাস্টিস্ ভাদুড়ী বললেন, অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম রে-সাহেব! শরীর ভাল তো?

—ভাল না থাকলে পর পর দুদিন অ্যাটেন্ড করি?

জাস্টিস্ ভাদুড়ী বলেন, বারওয়েল দ্য সেকেন্ড রিটায়ার করায় কলকাতার 'বার' কিন্তু কানা হয়ে গেছে রে-সাহেব।

রে বললেন, আই বেগ টু ডিফার। নূতন সূর্যের উদয় হয়েছে কলকাতার বারে—'পিয়ারী-ম্যাসন অফ দ্য ঈস্ট!' অর্থাৎ সাদা বাংলায় ঃ পূর্বাঞ্চলের 'মেরে পেয়ারী বাত্তুকার'।

দশ

কোর্ট-ফেরত সবাই এসে বসেছেন বাসু-সাহেবের বাড়ির সামনের লনে। বৈশাখী সন্ধ্যা, ঘরের চেয়ে বাইরেই আরামপ্রদ। তার উপর চাঁদনী রাত। গোল হয়ে বসেছেন বাসু, রানী, কৌশিক, সুজাতা, সুপ্রিয়, সুবর্ণ আর এ. কে. রে। বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এখনও বাড়ি যাননি। ব্যাপারটা সব জেনে না গেলে নাকি তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে।

সুজাতা বললে, এবার বলুন বাসু-মামু। কী করে কী হল?

কৌশিক বাধা দিয়ে বলল, আমি কিন্তু ইন্টারেস্টেড জানতে, আপনি কোন্ পর্যায়ে কতটা বুঝতে পেরেছিলেন, কোন্ কোন্ ক্লুয়ের সাহায্যে এবং কখন সবটা বুঝলেন।

এ. কে. রে বলেন, অর্থাৎ আমাদের কাছে এটা আড্ডা! তোমার কাছে ট্রেনিং ক্লাস।

রানী বললেন, তা তো হবেই। এ. কে. রে-র পতাকা তুলে নিয়েছিলেন পি. কে. বাসু—ভবিষ্যতে সেটাই তো বহন করবেন কে. মিত্র।

কৌশিক বললে, ভবিষ্যৎ পড়ে মরুক। আপাততঃ আমি হচ্ছি পেরি মেসনের সাকরেদ—পল ড্রেক। কিন্তু আর দেরী নয়। শুরু করুন আপনি।

বিশু খাবারের ট্রে নিয়ে এসে পরিবেশন শুরু করল।

বাসু বললেন, শুরু আমি করব না, সুপ্রিয় বলে যাও তোমার অভিজ্ঞতা—

—আমি সুবর্ণকে বলে এসেছিলাম, সাতদিনের জন্য কলকাতা যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি, তা ও জানত না। মিস্টার কাপাডিয়ার নির্দেশে আমি ব্যাপারটা ওর কাছেও গোপন করি। কলকাতায় এসে পার্ক হোটেলে উঠি। আমি আর জীবনবাবু। গুডফ্রাইডের আগের দিন এগারোই বাড়িটা বিক্রি হল। যদুপতি নগদ দু-লক্ষ টাকা আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিল, এগারোই সকালে। সেটা হোটেলের ভল্টে রেখে আমরা রেজিস্ট্রেশান অফিসে যাই।

—হোটেলে আপনারা কত নম্বর ঘরে উঠেছিলেন?

—39 নম্বরে। ডবল্ বেড রুম। একসঙ্গেই ছিলাম। যাই হোক, রেজিস্ট্রেশান হয়ে গেলে জীবনবাবু যদুপতিকে বললেন, স্যার আমাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে দেবেন না? যদুপতি ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে আমাকে বলল, আজ রাত্রে আপনাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করছি। মোকাম্বোতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। আমি রাজী হই। আমি আর যদুপতি রাত ন'টা পর্যন্ত মোকাম্বোতে ছিলাম। তারপর ফিরে আসি হোটেলে। রাত দশটায় জীবন ফিরে আসে। সারাদিনের ধকলে আর কলকাতার গরমে আমার ভীষণ মাথা ধরেছিল। বেয়ারাটাকে ডেকে আমি সারিডন আনতে দিচ্ছিলাম। জীবন বললে, আনাতে হবে না, তার কাছেই আছে। সে আমাকে একটা ট্যাবলেট দেয়। আমি খেয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। তারপরের কথা আর কিছু জানি না আমি। যখন জ্ঞান হয়, দেখি, আমি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কোন অজানা জায়গায় পড়ে আছি। মাঝে মাঝে একটি অচেনা স্ত্রীলোককে দেখেছি। জ্ঞান হলেই সে আমাকে একটা পানীয় খেতে দিত। প্রচণ্ড তেষ্টায় আমি সেটা চকচক্ করে খেয়ে ফেলতাম। এখন হিসাব করে দেখছি, এভাবে সাতদিন আমি ঘুমিয়েছি। তারপর গতকাল শেষ রাত্রে কৌশিকবাবু আমাকে উদ্ধার করেন আসানসোল থেকে। এ-ছাড়া আমি কিছুই জানি না।

বাসু-সাহেব ওর সূত্র তুলে নিয়ে বললেন, সমস্ত ব্যাপারটার মূল পরিকল্পনা হচ্ছে জীবন বিশ্বাসের। লোকটার সঙ্গে আন্ডার ওয়ার্ল্ড-এর দু-একজনের জানাশোনা ছিল। মাসকতক আগে থেকেই সে জানতে পারে যে, মোহনস্বরূপ কাপাডিয়া এভাবে বাড়িটা বিক্রি করবেন। তখন থেকেই সে সক্রিয় হয়। খোকন বা লালুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। খোকন মিস্ ডি-সিল্ভার মাধ্যমে এই পরিকল্পনাটা ছকে। ডি. সিল্ভার এক ভাই হাঁচি উন্মাদাশ্রমে ছিল। সে তাকে নয় তারিখে ওখান থেকে খালাস করে এনে পার্ক-হোটেলে তোলে এবং নয়-দশ তারিখে বারে বারে তাকে গাড়ি করে নিয়ে বার হয়। ওর ভাই ছিল জড়ভরত প্রকৃতির পাগল। তাই এতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। দশ তারিখে সে তাকে কলকাতার কোন প্রাইভেট উন্মাদাগারে ভর্তি করে দিয়ে একাই ফিরে আসে। হোটেলের সবাই জানত ভাইটি হোটেলেই আছে। এগারোই রাত্রে বড়বাজারে জৈনের গদিতে ডাকাতি করে খোকন এসে আশ্রয় নেয় ডি. সিল্ভার ঘরে। মধ্যরাত্রে সুপ্রিয় অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে ধরাধরি করে পাশের ঘরে আনা হয় এবং খোকন সুপ্রিয়র সীটে চলে যায়। বারো তারিখ সকালেই ডি. সিল্ভা একটা অ্যাম্বাসাডারে করে বর্ধমান চলে যায়। সঙ্গে যায় অজ্ঞান অবস্থায় আসল সুপ্রিয়, তার ভায়ের পরিচয়ে।

কৌশিক বলে, আমি ব্যাপারটা বুঝলাম না। সুপ্রিয়বাবু, আপনি কী জীবনবাবুকে বম্বে মেলে তিনখানা টিকিট কাটতে বলেননি।

—আদৌ না। আমার প্লেনে ফেরার কথা ছিল। টিকিটও কাটা ছিল।

—তাহলে?

বাসু-সাহেব বলেন, জীবন বিশ্বাসের পরিকল্পনাটা তুমি বুঝতে পারনি কৌশিক। তার প্ল্যান ছিল—বম্বে মেলে ওরা দু'জন, জীবন আর খোকন রওনা হবে। রেলওয়ে রেকর্ড-এ থাকবে—ক্যুপেতে ছিলেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস দাশগুপ্ত আর তার পাশের কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছিলেন জীবন বিশ্বাস। গাড়ি বর্ধমানে পৌঁছালে মিস্ ডি. সিল্ভা তার তথাকথিত অসুস্থ ভাই, অর্থাৎ সুপ্রিয় দাশগুপ্তকে নিয়ে বিনা টিকিটে কামরায় উঠবে। সেই আসল সুপ্রিয় দাশগুপ্তকে শুইয়ে দেওয়া হবে ক্যুপের লোয়ার বার্থে। তারপর খোকন আর ডি. সিল্ভা বর্ধমানেই নেমে যাবে দু-লাখ টাকা সমেত। রাত ভোর হলে জীবন এ কামরায় এসে চীৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। দেখা যাবে, সুপ্রিয় বিষ খেয়ে মারা গেছে এবং তাঁর দুটি স্যুটকেস নেই। জীবন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে নেই। সে তার ম্যানেজারের নির্দেশে তিনখানা টিকিট কেটেছে। ম্যানেজার সুপ্রিয় কোথা থেকে একটা অসচ্চরিত্রের মেয়েছেলে জুটিয়ে এনেছিল তা সে কেমন করে জানবে? তার সন্দেহ হয়েছিল কিনা?—হ্যাঁ হয়েছিল। তাই ঘটনার অনেক আগে সে ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার বাসু-সাহেবকে তার আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল। বিশ্বাস না হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

সুজাতা বলে, চমৎকার প্ল্যান!

কৌশিক বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও! তাহলে ঐ জৈন-সাহেবের রিভলভারটা ও কামরায় এল কেমন করে?

বাসু হেসে বলেন, সেটা জীবনের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। খোকনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঐ ডি. সিল্ভার সঙ্গে যৌথভাবে। ওরা দু-জনে হচ্ছে বর্ন-ক্রিমিনাল। দু-লাখ টাকা তিনভাগ করার চেয়ে তারা দু-জনে সেটাকে দু-ভাগ করতে চাইল। যাকে বলে ডবল্-ক্রস। ব্যবস্থা কবা হল—ট্রেন ছাড়ার আগে ওদের দলের একজন একটা লোডেড রিভলভার খোকনকে পৌঁছে দেবে। বুদ্ধদ্বার সি-ক্যুপেতে অতি অনায়াসে খোকন জীবনকে হত্যা করত। ট্রেন বর্ধমানে পৌঁছালে জীবনের মৃতদেহকেও ঐ ক্যুপেতে রেখে তারা সুযোগমত বর্ধমানে বা আসানসোলে নেমে যেত। পরদিন জোড়াখুন আবিষ্কৃত হত ঐ ক্যুপেতে। কেউ জানতে পারত না—কে খুন করে টাকটা নিয়ে ভেগেছে!

রানী বলেন, তাহলে জৈনকে কে খুন করেছিল?

—খুব সম্ভব খোকন নিজেই। সুকুমার বোস-এর এভিডেন্স থেকে তাই মনে হয়। আপনি কী বলেন? বাসু-সাহেব প্রশ্ন করেন এ. কে. রে-কে।

—আই বেগ টু ডিফার!—বললেন এ. কে. রে। একহারা চেহারা, ফর্সা রঙ আর বড় বড় জুলফি ছাড়া আর কোন যুক্তি নেই।

—কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তিও কিছু নেই।—বললেন বাসু-সাহেব।

—আছে। প্রকাশ্য একটা বিরুদ্ধ যুক্তি আছে। তাই যদি হত, তাহলে জৈনের রিভালভারটা এগারোই রাত্রে খোকনের কাছে থাকারই সম্ভাবনা। সে-ক্ষেত্রে ট্রেনে অন্য কেউ তাকে ঐ রিভলভারটা পৌঁছে দিতে আসত না। এগারোই তারিখ থেকে তার পকেটে থাকত একটা রিভলভার, যার নম্বর 759362।

সুজাতা অবাক হয়ে বললে, নম্বরটা মুখস্থ আছে এখনও!

—বাঃ! কোর্টে স্বকর্ণে শুনলাম যে!

কৌশিক বললে, সে তো আমরাও শুনেছি। ভুলে মেরে দিয়েছি।

এ. কে. রে বললেন, তাহলে কোনদিন 'পল-ড্রেক্ অব দ্য ঈস্ট' হতে পারবে না তুমি! কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও পরিষ্কার হয়নি। সুপ্রিয়বাবু—তুমি কি এগারোই সকালে লেট-ল্যামেন্টেড মিস্টার জৈনের বাড়িতে ফোন করেছিলে?

—না তো! ফোন করব কেন?

—ধর, ঐ হুন্ডির ব্যবস্থা পাকা করতে?

—সে কথা তো হয়েই ছিল তাঁর সঙ্গে। নেহাৎ তিনি রাজী না হলে আমি অন্য কারও দ্বারস্থ হতাম। কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার হিসাবে আমি কলকাতার অনেক ধনী ব্যবসায়ীকে চিনি। আর কাউকে না পেলে যদুপতির কাছ থেকে হুন্ডি নিতাম।

—যদুপতি রাজী না হলে—

—অ্যাট লিস্ট দু-লাখ টাকা স্যুটকেশে নিয়ে বোম্বাই মেলে যেতাম না। হয় কোন ব্যাঙ্ক ভল্টে রাখতাম—নেহাৎ না হয় প্লেনে নিয়ে যেতাম টাকাটা!

কৌশিক বলে, এবার আপনি বলুন স্যার, কেমন করে আন্দাজ করলেন ব্যাপারটা।

বাসু-সাহেব বুঝিয়ে বলেন, আমার প্রথম সন্দেহ জাগে জীবন ঠিক যে মুহূর্তে প্রথমবার আমার কক্ষে ঢোকে। কিন্তু সেটা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। সেটা একটা অনুভূতি। আমার সন্দেহ জাগে। জীবন যে সন্দেহজনক ব্যক্তি এ আশঙ্কা তোমাদের সকলেরই হয়েছিল। আমার খটকা লাগল মোহনস্বরূপ কাপাডিয়ার একটি টেলিগ্রামের একটি শব্দে। উনি লিখেছেন, 'হিজ ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি ইজ বিয়ন্ড কোশ্চেন' অর্থাৎ তার সততা আর কর্মদক্ষতা সন্দেহের অতীত। ঐ 'কর্মদক্ষতা' শব্দটায় খটকা লাগল আমার। মোহনস্বরূপ একজন কোটিপতি—তাঁর ম্যানেজারের 'কর্মদক্ষতার' বিষয়ে এতবড় সার্টিফিকেট তিনি কেন দিলেন? অমন দক্ষ ম্যানেজার বোম্বাই মেল-এ স্যুটকেসে করে

পাচার করা ছাড়া আর কোন রাস্তা খুঁজে পেল না! দু-লাখ টাকা! দ্বিতীয়ত এতবড় কোম্পানির ম্যানেজার খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ল অথচ বোম্বাই থেকে কোন সাড়া-শব্দ নেই কেন? মালিক না হয় বিদেশে—কিন্তু আর সবাই তো আছে—

—কিন্তু ওরা দু-জন তো গোপনে সম্পত্তিটা বেচতে এসেছিল। আর কেউ হয়ত জানে না—

—মানলাম। কিন্তু স্বাভাবিক হতো কী? এক্ষেত্রে জীবন নিজেই ট্রাঙ্ককল করে হেড অফিসে জানাতো, কোন একটা কাজে মালিকের নির্দেশে কলকাতা এসে ওরা ভীষণ বিপদে পড়েছে!

—তা ঠিক!

—তৃতীয়ত, খুনের মামলায় যে লোকটা ফাঁসী যেতে বসেছে সে তার উকিলের মাধ্যমে বাবা-দাদা-স্ত্রী-বন্ধু কাউকে খবরটা জানাবে না? সাহায্য চাইবে না? চতুর্থত, স্ত্রীর আগমন আশঙ্কায় সে অমন শিউরে উঠল কেন? আর সবচেয়ে বড় কন্ট্রাডিকশান হচ্ছে সুপ্রিয় দাশগুপ্তের চরিত্র-চিত্রণ! পান্ডে সাহেবের আঁকা ছবির সঙ্গে মোহনস্বরূপের আঁকা ছবিখানার আশমান-জমীন ফারাক! আমার মনে হল—দুটো লোক আলাদা। সেটা নিঃসন্দেহে হলাম যখন আলিপুরের হাজতে আসামী তার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করল। তার আগেই অবশ্য আমার সন্দেহ হয়েছিল—ডি. সিলভার হেপাজতেই আছে আসল সুপ্রিয়। আসামী যদি সুপ্রিয় না হয় তাহলে কখন সে সুপ্রিয়ের চরিত্রে অভিনয় শুরু করেছে? নিঃসন্দেহে এগারোই দুপুরের পরে। কারণ দলিলে নিশ্চয় আসল সুপ্রিয় সই করেছে? সেটা সন্দেহাতীতরূপে দেখে নেবে যদুপতি। অথচ যদুপতি বলছে রাত ন'টা পর্যন্ত সে আসল সুপ্রিয়কে দেখেছে। যদুপতির মিথ্যাভাষণের কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। সে আসল সুপ্রিয়কে নিশ্চিত চেনে, যেহেতু রেজিস্ট্রেশান অফিসে তাকে সনাক্ত হতে দেখেছে। তাহলে এগারোই রাত ন'টার পর এবং বারই বেলা দশটার আগে—

—কেন, বাবই বেলা দশটার আগে কেন?—প্রশ্ন করে সুজাতা।

—যেহেতু বারো তারিখ বেলা দশটায় কৌশিক পার্ক হোটেলে থেকে টেলিফোনে জানায় সে সুপ্রিয়কে দেখেছে, যে-সুপ্রিয়কে সে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দেখেছে। ফলে, ঐ রাত্রেই মানুষটার বদল হয়েছে। ঐ পার্ক হোটেল থেকেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, ঐ বারো তারিখেই বেলা নয়টার সময় ওদের পাশের ঘর থেকে মিস্ ডি. সিলভা তার পাগল ভাইকে নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে যায়। বাই রোড—দিল্লী রোড ধরে। বাকিটা দুইয়ে দুইয়ে চার....

ঠিক সেই সময়েই একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এসে থামল পোর্টিকোতে। নেমে এলেন একজন সুসজ্জিত যুবক। তাঁকে দেখে সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ায়, হ্যালো! আপনি?

ভদ্রলোক গরুড়পক্ষীর মত হাত দুটি জোড় করে বলেন, ক্ষমা মাংতে এসেছি! ঔর ছিপিয়ে থাকার জরুরৎ না আছে!

সুপ্রিয় বলে, আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন. . . .

বাধা দিয়ে কৌশিক বলে, প্রয়োজন হবে না। ঔর ভাষাতেই আমাদের মালুম হয়েছে!

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আমিও আপনাকে পহ্চানতে পেরেছি সুকৌশলীদাদা!

কৌশিক বলে, আপনার গাড়ির ডায়নামো ঠিক হয়ে গেছে?

—বিলকুল!

—আর সেই মাছের কাঁটাটা?

—না-পাত্তা!—তারপর হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে কৌশিকের সামনে মাথাটা নিচু করে যোগ করেন, মাথা পাতিয়ে দিলাম সুকৌশলীদাদা! অগর চাহেন তো এক ঝাপড় মারুন! লেকিন শালা-বাহানচোৎ করবেন না!

—বলেই পান-জর্দায় লাল আধ-হাত জিব বার করেন। দুটি হাত কানে ছুঁইয়ে যোগ করেন, সীয়ারাম! বিলকুল নজর হোয় নাই। লেডিসরা আছেন ইখানে! □

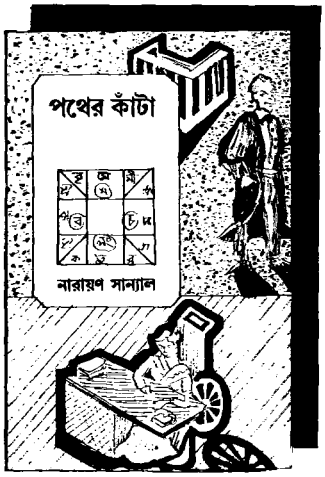

পথের কাঁটা

রচনাকাল :: 1975

প্রথম প্রকাশ :: জানুয়ারি 1976

প্রচ্ছদশিল্পী :: খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ :: শ্রী মুকুল চক্রবর্তী

ইন্টারকমটায় ভেসে এল মিসেস্ বাসুর কণ্ঠস্বর, তোমার সঙ্গে একজনা দেখা করতে চায়—একজন নয়, দুজন—মিস্ নীলিমা সেন আর মিস্টার জয়দীপ রায়। পাঠিয়ে দেব?

বাসু-সাহেব একটা আইনের বইয়ে ডুবে ছিলেন। সেটা বন্ধ করে বললেন, মক্কেল কেস্? মিস্ সেন, না মিস্টার রায়?

—এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত যৌথ। জিজ্ঞাসা করব?

—না থাক। পাঠিয়ে দাও। যুগলেই—

—অল্প পরে আগন্তুকদ্বয় প্রবেশ করল বাসু-সাহেবের চেম্বারে। বাসু পাইপটা দিয়ে ওদের সামনের চেয়ার দুটিকে নীরবে দেখিয়ে দিলেন।নমস্কার করে ওরা পাশাপাশি বসল।মেয়েটির বয়স্ত্রী শ্রেণীর কোঠায়—শ্যামলা রঙ, গড়নটি চমৎকার। চোখ দুটি বড় বড়—বেশ-বাস ছিমছাম। ছেলেটি দু-চার বছরের বড় হতে পারে। অত্যন্ত সুদর্শন এবং সুগঠিত শরীর। দীর্ঘকায়া, বলিষ্ঠ এবং চোখ-মুখে বুদ্ধিদীপ্ত একটা সপ্রতিভ ভাব। দেখলে মনে হয় সে দু-ঘা দিতে পারে, দু-ঘা নিতেও পারে।

মেয়েটিই প্রথম কথা বলল, আমার নাম—

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, দু-জনের নামই আমি জানি। প্রয়োজনটা বলুন।

প্রথম কথাতেই বাধা পেয়ে মেয়েটি যেন কিছু ক্ষুব্ধ হয়। তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি বল।

ছেলেটি নড়েচড়ে বসে। বলে, নীলিমার দাদু মিস্টার জগদানন্দ সেন একজনা ধনী ব্যবসায়ী। বয়স আশির কাছাকাছি—এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছেন। নীলিমাই তাঁর একমাত্র—বী কহলা, ওয়ারিশ। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটেছে...মানে নীলিমা মনে করছে....তার দাদু,

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব প্রশ্ন করেন, আপনি জগদানন্দবাবুর কে হন?

—আমি? না আমি কেউই হই না। আমি নীলিমার পাণিপ্রার্থী।

—আই সি। তার মানে সমস্যাটা বর্তমানে একমাত্র নীলিমা দেবীরই? কেমন?

—আইনত তা বলতে পারেন আপনি।

—সেক্ষেত্রে—কিছু মনে করবেন না—সমস্যাটা আমি শুধু ওঁর মুখ থেকেই শুনতে চাই।

—আই ডোন্ট মাইন্ড! বল নীলিমা।

মেয়েটি নড়ে-চড়ে বসে। সে কিছু বলবার আগেই বাসু-সাহেব বলেন, আই রিপিট—কিছু মনে করবেন না, সমস্যাটা আমি ওঁর মুখ থেকে জনান্তিকেই শুনতে চাই।

ছেলেটি অপ্রতিভ হল না একটুও। হেসে বললে, আই অল্‌সো রিপিট—আই ডোন্ট মাইন্ড। আমি বরং বাইরে গিয়ে বসি—

—না বাইরে নয়, ওখানে রোদ্দুর। আপনি আমার ল-লাইব্রেরিতে গিয়ে বসুন বরং। টেবিলে অনেক ম্যাগাজিন আছে—সময় কেটে যাবে।

বাসু-সাহেব ইলেকট্রিক বেলটা টিপলেন টেবিলের তলায় হাত চালিয়ে। এসে দাঁড়াল বিশু—ওঁর ছোকরা চাকর। তাকে নির্দেশ দিলেন ঐ ভদ্রলোককে ল-লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে বসাতে এবং ফ্যানটা খুলে দিতে।

জয়দীপের প্রস্থানের পরে বাসু-সাহেব মেয়েটার দিকে তাকালেন। তার মুখটা থমথম করছে। বাসু-সাহেব প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়স কত?

চোখ তুলে মেয়েটি তাকায়। একটু রূঢ় স্বরে বললে, জয়দীপকে এভাবে তাড়ানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। তার কাছে আমার গোপন করার কিছু থাকলে তাকে আমি এ-ভাবে সঙ্গে করে এখানে আনতাম না।

বাসু-সাহেব পাইপটা ধরালেন। বিচিত্র হেসে বললেন, তাই বুঝি? আমি ভেবেছিলাম, আমার প্রথম প্রশ্নের জবাবটাই হয়তো তুমি ওর কাছ থেকে গোপন করতে চাও! আমার প্রশ্নটার জবাব তুমি এখনও দাওনি। তোমার বয়স কত?

—চৌত্রিশ।

—কিছু হাতে রেখে বলছ না তো?

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি শুনেছিলাম আপনি বৃদ্ধভাষী; কিন্তু কোর্টে সওয়াল করতে করতে যে ওটা আপনার এমনই বদ-অভ্যাস হয়ে গেছে তা আমি আশঙ্কা করিনি। আচ্ছা চলি, নমস্কার!

বাসু পাইপটা দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, বস! অত রাগ করা ভাল নয়। তোমার মুখ-চোখ বলে দিচ্ছে তুমি একটা বিপদের মধ্যে পড়েছ। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। বস! অল রাইট! আই উইথড্র। তোমার বয়স বত্রিশ। মেনে নিলাম। এবার বল।

মেয়েটি বসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে, না বত্রিশ নয়, চৌত্রিশ। দু-বছর আপনাকেও হাতে রাখতে হবে না! আর আমার বয়সটা সঠিক কত তা জয়দীপ জানে!

—ভেরি গুড। এবার বল তোমার দাদুর কথা। তোমার সমস্যার কথা। বস। কী খাবে বল, চা না কফি?

মেয়েটি বসে। বলে, ধন্যবাদ। আপ্যায়ন করতে হবে না। আমি আপনার কাছে সৌজন্য সাক্ষাতে আসিনি, এসেছি ক্লায়েন্ট হিসাবে। সেটুকু মর্যাদা পেলেই আমি খুশি।

—রাগ পড়েনি তাহলে? আচ্ছা না হয় আমি ক্ষমাই চাইছি।

—ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। ঠিক আছে শুনুন—

নীলিমা সেন যা বলল তা সংক্ষেপে এই ঃ

জগদানন্দ সেনের সমস্ত সম্পত্তি স্বোপার্জিত। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পরীক্ষায় ফেল করে যখন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান তখন তাঁর বয়স আঠারো-উনিশ। সে বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। উনি পালিয়ে যান বর্মা মুলুকে। দীর্ঘ দশ-বারো বছর ছিলেন প্রবাসে। ব্যবসায় বেশ কিছু জমিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে

আসেন উনিশ'শ পঁচিশে। বর্মা থেকে সেগুন কাঠ আসত আর উনি কলকাতার বাজারে তা বেচতেন। রেঙ্গুনে ছিল ওঁর ব্রাঞ্চ অফিস। সেটা দেখাশোনা করতেন একজন বিশ্বস্ত ম্যানেজার—তিনি বর্মী, য়ু সিয়াঙ। তিনিই ওখান থেকে সেগুন কাঠ চেরাই করে জাহাজে করে পাঠাতেন। এভাবেই কেটে গেল আরও বছর পনের। তারপর জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার ঠিক আগে বর্মা-সেগুন আসা বন্ধ হল; কিন্তু ধুরন্ধর ব্যবসায়ী জগদানন্দ সময়েই সতর্ক হয়েছিলেন। তিনি ঐ সময়ে কাঠের ব্যবসা ছেড়ে ধরলেন লোহার ব্যবসা—হার্ডওয়ার মার্চেন্ট। যুদ্ধের ক'বছর শুধু পেরেক আর কাঁটাতার বেচে তিনি বেশ কয়েক লক্ষ টাকা কামিয়ে ফেলেন। বর্মায় থাকতেই একজন স্বজাতের বাঙালি মেয়েকে জগদানন্দ বিবাহ করেছিলেন। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল—পুত্র সন্তান, নীলিমার বাবা। তার পরেই ওঁর স্ত্রী মারা যান। জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার বছরখানেক আগে জগদানন্দ তাঁর একমাত্র পুত্রকে বর্মা মুলুকে পাঠিয়ে দেন। সেখানকার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেচে দেবার জন্য পুত্র সদানন্দকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দেন। সদানন্দ সমস্ত কিছু বিক্রয় করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে ফিরে আসে ভারতবর্ষে। কিন্তু সে গিয়েছিল একা, ফিরল যুগলে। ইতিমধ্যে সে রেঙ্গুনে একটি বর্মী মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে! জগদানন্দ পুত্রকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি। ত্যাজ্যপুত্রই করতে চেয়েছিলেন একমাত্র সন্তানকে। বছর দুই সদানন্দ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর মহেন্দ্রবাবুর প্রচেষ্টায় পিতাপুত্রে একটা মিলন হয়।

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, মহেন্দ্রবাবুটা কে?

—মহেন্দ্রনাথ বসু। দাদুর কলকাতা অফিসের ম্যানেজার। তিনি আমার বাবার বয়সী। তাঁকেও দাদু প্রায় ছেলের মতই মানুষ করেছিলেন। ঐ দু বছরের মধ্যে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমার জন্মের সময়েই আমার মা মারা যান। বাবার আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। মহেন্দ্রবাবুই একদিন আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন দাদুর কাছে। আমাকে দেখেই দাদুর রাগ জল হয়ে গেল।

—বুঝলাম। এখন তোমার সমস্যার কথাটা বল। এতক্ষণ তো পূর্বকথন শোনাচ্ছিলে।

—পূর্বকথন আরও কিছুটা শোনাতে হবে। না হলে বর্তমান সমস্যার পারম্পর্যটা আপনি ধরতে পারবেন না। শুনুন—

সদানন্দ মারা যান আরও বছর পাঁচেক পরে। নীলিমা তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। বাবার মৃত্যুর কথা অল্প অল্প মনে আছে তার—কিন্তু তার পরের কথা আরও স্পষ্টভাবে মনে আছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন জগদানন্দ। ব্যবসাপত্র নিজে কিছুই দেখতে পারেন না। নাতনিকে নিয়েই তাঁর দিন কাটে। এভাবেই কাটল আরও দু-বছর। তারপর কী-একটা কারণে জগদানন্দের সন্দেহ হল। একদিন তিনি খাতাপত্র দেখতে বসলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র যেন বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে ফেলেছে ব্যবসায় থেকে! হিসাব মেলাতে পারলেন না মহেন্দ্রবাবু। আইনতঃ কিছু করার ছিল না জগদানন্দের—কারণ পুত্রের মৃত্যুর পর শোকাহত জগদানন্দ তাঁর ম্যানেজারকে জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে রেখেছিলেন। মহেন্দ্র কৌশলী লোক—খাতাপত্রে সে লোকসানও দেখিয়ে গেছে আইন মোতাবেক, কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে, সেটা ওর কারসাজি। তহবিল তছরূপের মামলা আনলেন না জগদানন্দ। তৎক্ষণাৎ অপমান করে তাঁর বিশ্বস্ত ম্যানেজারকে বিদায় করে দিলেন। মহেন্দ্র প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়ে চলে যায়, আর ফেরেনি। এর পর গত পঁচিশ বছর তার কোন খবর ছিল না। হঠাৎ গত সপ্তাহে তার নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে। নীলিমা তাকে চিনতেই পারেনি—না চেনাই স্বাভাবিক। মহেন্দ্রবাবু এ পরিবার ছেড়ে যখন চলে যান তখন নীলিমার বয়স মাত্র আট নয় বছর। এমনকি জগদানন্দও এই ষাট বছরের বৃদ্ধের ভিতর তাঁর সেই যুবক ম্যানেজারকে খুঁজে পাননি। মহেন্দ্র যখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, বুড়ো কর্তা, আপনি আমাকে চিনতেই পারলেন না? কিন্তু আমি যাবার দিনে তো বলে গিয়েছিলাম আবার আমি ফিরে আসব! আমি মহেন্দ্র!

এর পরের ইতিহাস নীলিমা বিস্তারিত জানে না। এটুকু দেখেছে মহেন্দ্র সেই যে এসে ঢুকেছেন, আর বাড়ির বার হননি। আরও দেখেছে—ঐ ঘটনার পর থেকে দাদু যেন কী একটা আতঙ্কে একেবারে কাঁটা

হয়ে আছেন। ব্যাপারটা কী, তা সে জানে না—কিন্তু বুঝতে পারছে যে, বৃদ্ধ জগদানন্দ একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের তাড়নায় একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছেন। এইটাই নীলিমার সমস্যা।

—কী জাতীয় সাহায্য তুমি চাও আমার কাছে?

—দাদু হঠাৎ এমন বদলে গেছেন কেন সেই রহস্যটা উদ্ধার করতে চাই আপনার সাহায্যে।

বাসু বলেন, আমি গোয়েন্দা নই, আমি হচ্ছি ক্রিমিনাল উকিল। এক্ষেত্রে আমার সাহায্য তো তুমি আশা করতে পার না। তবে আন্দাজে বলতে পারি, ঐ মহেন্দ্র বোস তোমার দাদুকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে। তোমার দাদুর অতীত জীবনের কোনও ঘটনার কথা সে প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখাচ্ছে।

—তাহলে গত পঁচিশ বছর সে সেটা দেখায়নি কেন?

—আমার ধারণা, সেই গোপন ঘটনার কথা যে মহেন্দ্র জানে এটা জানা ছিল তোমার দাদুর—কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল মহেন্দ্র সেটা প্রমাণ করতে পারবে না। মহেন্দ্র নিশ্চয়ই অতি সম্প্রতি সেই গোপন ব্যাপারের কোন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। সেই নথিপত্র নিয়ে এসে হাজির হয়েছে তোমার দাদুর কাছে।

—আমারও তাই অনুমান; কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে? পঁচিশ বছর পরে সবকিছুই তো তামাদি হয়ে যায়।

—তা যায় না। ধর একটা মার্ডার কেস। পঁচিশ বছরে সে অপরাধ তামাদি হয়ে যায় না!

—আপনি কি বলতে চান আমার দাদু মানুষ খুন করেছিলেন?

—ডিড আই সে দ্যাট? তবে ঐ জাতীয় এমন কিছু তিনি করেছিলেন যে অপরাধ পঁচিশ বছরে তামাদি হয়ে যায় না। তোমাকে আগেই বলেছি, এক্ষেত্রে আমি তোমাকে খুব বেশি কিছু সাহায্য করতে পারব না—কিন্তু তোমার এক্ষেত্রে কী করণীয় তা সাজেস্ট করতে পারি। দাদুকে ঐ আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিতে তোমার কোন প্রাইভেট ডিটেক্টিভের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সে খুঁজে বার করবে গোপন রহস্যটা কী, কেমন করে মহেন্দ্র সেটা সংগ্রহ করেছে—এবং হয়তো সে তোমাকে পরামর্শও দিতে পারবে কেমন করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

—কলকাতায় এমন প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান আছে নাকি? আপনি সন্ধান দিতে পারেন?

—পারি। এই বাড়িরই অপর উইং-এ আছে 'সুকৌশলী'র অফিস। সেখানে কৌশিক মিত্র এবং সুজাতা মিত্র পার্টনারশিপ বিজনেসে এ জাতীয় কাজ করে। ওরা আমারই লোক। তুমি যদি চাও, তাহলে আমি যোগাযোগ করে দিতে পারি।

—প্লিজ স্যার—

বাসু-সাহেব ইন্টারকমের মাধ্যমে কৌশিককে সংবাদটা জানিয়ে দিলেন। মেয়েটি নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই বললেন, আর একটা কথা আছে। আমাকে যেসব কথা বললে তা ঐ জয়দীপ ছেলেটি জানে?

—জানে।

—তোমার দাদু জানেন তোমাদের দু-জনের সম্পর্ক?

—জানেন—তিনি রাজি হচ্ছেন না বলেই ব্যাপারটা পিছিয়ে যাচ্ছে।

—রাজি হচ্ছেন না? কেন?

বিচিত্র হাসল মেয়েটি। তারপর বললে, যে কারণে কানা-খোঁড়া না হওয়া সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি থুবড়ি হয়ে আছি!

—বুঝলাম না।

—যার সঙ্গেই আমার বিয়ের কথা হয়, দাদু ভেবে বসেন যে, সে আমাকে শুধু টাকার জন্য বিয়ে করতে চাইছে। আমার মনে হয়, দাদুর জীবদ্দশায় আমাদের বিয়েটা আদৌ হবে না। এটা ওঁর একটা, কী বলব? ফোবিয়া!

—অর্থাৎ তোমার দাদুর বিশ্বাস যে, জয়দীপও শুধুমাত্র টাকার লোভে তোমাকে বিবাহ করতে চাইছে?

—হ্যাঁ তাই।

—ও কী করে? কে আছে ওর পরিবারে?

—ও মোটামুটি একাই। বাবা-মা নেই। এক দাদা আছেন, এক বোনও আছে। দাদা পৃথক সংসার করেন, বোনও বিবাহিত। ও বিজনেস করে। মোটামুটি সচ্ছল। তবে আদর্শের বাতিক আছে। ঘুষ-ঘাষের মধ্যে যেতে চায় না। তাই ব্যবসায় উন্নতি করতে পারছে না।

—তোমার সঙ্গে কতদিনের আলাপ?

—তা বছরতিনেকের হবে।

—একটা কথা। জয়দীপ কি ঘরজামাই হয়ে তোমাদের বাড়িতে থাকতে রাজি হতে পারে? নীলিমা আবার বসে পড়ে। বলে, হঠাৎ এ কথা কেন?

—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে তোমার দাদু তোমার বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছেন না—তোমাকে হারাবার ভয়ে। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে বাড়িতে তিনি একেবারে একা হয়ে পড়বেন।

নীলিমা মাথা নাড়ল। বললে, না। তা নয়। ঐ ফোবিয়ার জন্যই। তাছাড়া আমাদের বাড়ি ফাঁকা নয়। আমার এক সম্পর্কে কাকা আছেন। তাঁর এক শ্যালিকা-পুত্রও ঐ বাড়িতে থাকে। বাড়ি আমাদের ফাঁকা নয়।

—আই সি!

ইতিমধ্যে ছোকরা চাকরটা জয়দীপকে লাইব্রেরি থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে। বাসু-সাহেব বললেন, আপনাকে একা বসিয়ে রেখেছি বলে দুঃখিত। এটা আমার প্রফেশনাল এথিক্স!

জয়দীপ নমস্কার করে বললে, আমার কোনই অসুবিধা হয়নি। লাইফ ম্যাগাজিনে একটা ভাল প্রবন্ধ পড়া গেল।

দুই

দিনতিনেক পরে কৌশিক এসে বাসু-সাহেবকে বলল, বরাতে নেই কো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কী? আপনি এমন একটি শাঁসালো মক্কেল পাঠালেন আমার কাছে, অথচ সেটা বুমেরাঙের মত আবার আপনার হাতেই ফিরে এল।

—কী হল আবার? কোন্ কেসটা?

—ঐ যে লোহার দালাল জগদানন্দের ব্ল্যাকমেলের কেসটা। নীলিমা দেবী দিন তিনেক আগে আমাকে এনগেজ করলেন। সবে জাঁকিয়ে তদন্ত শুরু করেছি, আজ এসে বলছেন ওটা স্থগিত রাখতে।

—কেন? সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে?

—তাই অনুমান করা যাচ্ছে। এবার ওঁরা এসেছেন আপনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে। জগদানন্দ একটি দলিল তৈরি করতে চান আপনার পরামর্শ মত। আন্দাজ করছি—ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে টাকায় খেসারত দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চান।

—এবারও কী ওরা যুগলে এসেছে? কোথায়?

—আমার অফিসে বসিয়ে রেখে এসেছি, দু'জনকেই।

—ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও—না, সঙ্গে করে নিয়ে এস।

একটু পরে কৌশিক ওদের দু-জনকে নিয়ে ঢুকল। জয়দীপ নমস্কার করে বলল, আপনার লাইব্রেরি ঘরটা খোলা আছে নিশ্চয়ই?

বাসু-সাহেব বললেন, এবার আর তার দরকার হবে না। সেবার কেসটা জানতাম না। তাই আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থে আপনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম; কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে জানিয়েছেন যে, আপনি তাঁর কাছের মানুষ! বসুন আপনিও।

নীলিমা চেয়ারে গুছিয়ে নিয়ে বসে। বলে, আজ কিন্তু আমি আপনার ক্লায়েন্ট নই। আমি ক্লায়েন্টের তরফে কথা বলতে এসেছি। আমি দূতমাত্র। ফলে আজ নিশ্চয়ই আপনার বাক্যবাণে বিদ্ধ হব না। দূত মাত্রেই অবধ্য!

বাসু হেসে বলেন, হ্যাঁ, দূত মাত্রেই অবধ্য! সেদিন অত করে অনুরোধ করলাম, তবু আজও রাগ পুষে বসে আছ। যাই হোক বল, কী খবর?

—আপনার নিমন্ত্রণ! আজ সন্ধ্যা সাতটা পাঁচের পর থেকে সাতটা পঁয়তাল্লিশ, কিম্বা আগামিকাল বেলা এগারোটা সতের গতে—

—এ হপ্তায় এ-দুটিই বিবাহের লগ্ন আছে বুঝি?

—বিবাহ! কার?

—তবে এগারোটা সতের গতে কিসের নিমন্ত্রণ?

বুঝিয়ে বলে নীলিমা। জগদানন্দ পঞ্জিকা মেনে চলেন। ঐ দুটি সময় হচ্ছে তাঁর ঠিকুজি-কুষ্ঠি অনুসারে শুভ লগ্ন। ঐ সময়েই তিনি একটি জরুরি দলিলে সই দিতে চান। তার পূর্বে পি.কে.বাসু বার. অ্যাট. ল. যদি অনুগ্রহ করে দলিলটা দেখে নেন, তবে জগদানন্দ কৃতকৃতার্থ থাকবেন। শুধু দলিলের যাথার্থ্য নয়, উকিল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যই নয়—ঐ সঙ্গে তিনি কিছু আইনঘটিত পরামর্শও নিতে চান। জগদানন্দ উনআশী বছরের বৃদ্ধ হলেও এখনও কিছু চলচ্ছক্তিহীন নন—তিনি নিজে আসতে পারেন। তবে বাসু-সাহেব তাঁর বাড়িতে গেলেই উনি খুশি হবেন।

সব শুনে বাসু-সাহেব বলেন, দলিলটা কিসের তা আন্দাজ করতে পারছ?

—না। তবে বাড়িতে আরও একজন অতিথি বেড়েছেন। উকিল বিশ্বম্ভর রায়। তিনি মহেন্দ্রবাবুরই অতিথি। ফলে আমাদেরও।

—এত উকিল থাকতে হঠাৎ আমাকে কেন? তোমরা 'সাজেস্ট' করেছিলে?

—না। দাদুর সলিসিটার ছিলেন ব্যারিস্টার এ. কে. রে-র অ্যাটর্নি ফার্ম। রে-সাহেব অবসর নিয়েছেন। উনিই নাকি আপনার নাম দাদুকে বলেছেন।

—ঠিক আছে। আমি আজই সন্ধ্যার পর যাব। কৌশিকও থাকবে আমার সঙ্গে। তোমাদের ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে যাও।

—তা দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তাঁকে জানাবেন না যে, আমরা ইতিপূর্বে আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আজই আপনাদের সঙ্গে আমাদের দু-জনের পরিচয়। পূর্বকথা আপনি কিছুই জানেন না।

—বুঝলাম। আচ্ছা তোমার দাদু বোধহয় হাঁচি-টিকটিকি পাঁজিপুঁথি মেনে চলেন?

—তা চলেন। এজন্য মাহিনা-করা একজন গ্রহাচার্যও আছেন তাঁর। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের জন্মপত্রিকায় বাঁধা!

—সন্ধ্যার পর বাসু-সাহেব নিজেই ড্রাইভ করে কৌশিককে নিয়ে এলেন। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা দ্বিতল বাড়ি। সাবেক ডিজাইন। দু-খানি ঘর বর্তমানে দখল করেছেন মহেন্দ্র-কাম-বিশ্বম্ভর পার্টি। দ্বিতলে দক্ষিণের বড় ঘরখানা কর্তামশায়ের। ঠিক তার বিপরীতে নীলিমার ঘর।

গাড়িটা পোর্চে এসে দাঁড়াতেই নেমে এল নীলিমা। বললে, আসুন। দাদু আপনাদের জন্য অপেক্ষা

করছেন। গাড়ি থেকে নামতেই কৌশিকের নজর হল দ্বিতলের একটি ঘরের বন্ধ-জানলার খড়খড়ি হঠাৎ উচু হয়ে উঠল। না দেখলেও তার ওপাশে দু-জোড়া কৌতূহলী চোখ যে তীব্র আগ্রহ নিয়ে ওদের লক্ষ্য করছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না কৌশিকের। মার্বেল পাথরে বাঁধানো চওড়া করিডর, প্রশস্ত সিঁড়ি। জানলা-দরজা, সিঁড়ির হাতল সবই পালিশ করা বর্মা সেগুনের। তা তো হবেই। বাড়িটি যে-আমলের তখন বুড়ো কর্তা ছিলেন বর্মা-টিকের রাজা।

জগদানন্দের দ্বিতলের ঘরটি প্রকাণ্ড। ইটালিয়ান-মার্বেলের সাদা-কালো চৌখুপিকাটা মেজে। ঘরের আসবাবপত্র মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগের। সবই পালিশ-করা বর্মা সেগুন। ঘরের একদিকে ডবল বেড খাট। এ পাশে শ্বেতপাথরের নিচু টেবিল ঘিরে সোফা-সেটি। ও পাশে আয়না-বসানো কাঠের আলমারি, বইয়ের র‍্যাক। এত আসবাবেও ঘরটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে—মাপে সেটা এতই বড়।

পর্দা সরিয়ে ওঁরা প্রবেশ করতেই যুক্তকরে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন গৃহস্বামী। দেখলে মনে হয় না তাঁর বয়স উনআশি। বরং ষাটের ঘরে এলে মনে হয়। মাথার চুল ধপধপে সাদা, গালে ঝাঁজও পড়েছে—কিন্তু একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন। ঘরের ভিতর চলাফেরা করছেন বিনা লাঠিতে। উর্ধ্বাঙ্গে একটি সামারকুল গেঞ্জি, পরনে কোঁচানো ধুতি। বাঁ-হাতে একাধিক কবচ ও মাদুলি। দু-হাতে সর্বসমেত গোটা-পাঁচেক আংটি। প্রবাল, পোখরাজ, নীলা—একটা বোধহয় হীরাও। অলঙ্করণের গূঢ় উদ্দেশ্য অবশ্য গ্রহশান্তির প্রয়োজনে।

আপ্যায়ন করে গৃহস্বামী ওঁদের বসালেন। তাঁর নির্দেশে নীলিমা একটি সৌখীন কাজ-করা কাঠের বাক্স এনে রাখল শ্বেতপাথরের টেবিলে। ডালাটা খুলে দেওয়ায় দেখা গেল তার ভিতর আছে চুরুট, সিগারেট, দেশলাই এবং ভাজা-মশলা—বিভিন্ন খোপে।

বাসু-সাহেব বললেন, ধন্যবাদ। আমি পাইপ খাই।

গৃহস্বামী বললেন, আপনার নাম আমার জানা ছিল। কাগজে কয়েকটি বিচিত্র ফৌজদারি মামলায় আপনার নাম দেখেছি! পরিচয় ছিল না। আমার আইনঘটিত পরামর্শ এককালে দিতেন ব্যারিস্টার এ. কে. রে। গত বিশ-বছরের ভিতর আর আইন-ঘটিত কোন পরামর্শ নেবার প্রয়োজনই হয়নি। রে-সাহেব আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ই হবেন। কিন্তু বুড়িয়েছেন আমার চেয়ে অনেক বেশী। তিনিই আপনার নাম করলেন, কিন্তু এঁকে তো—

—ও আমার সহকারী। নাম কৌশিক মিত্র। আমার কনফিডেন্সিয়াল কাজকর্ম ওই দেখাশোনা করে। আমার সামনে যা বলতে পারেন, তা ওর সামনেও বলতে পারবেন।

—না না, গোপন ব্যাপার তেমন কিছু নয়। একটা সাদামাটা দলিল। আচ্ছা নীলুদিদি—তুমি একটু জলখাবারের আয়োজন কর—আমি ততক্ষণ এঁকে বৈষয়িক ব্যাপারটা বোঝাই।

বাসু-সাহেব আপত্তি জানান, না না, জলখাবারের প্রয়োজন নেই—

গৃহস্বামী যুক্তকরে বলেন, প্রয়োজনটা আপনার নয়, আমার। অতিথি যদি মুখে কুটোটি না কাটেন গ্রহ কুপিত হন। গৃহস্থের অকল্যাণ হয়!

বাসু-সাহেব শ্রাগ করলেন। নীলিমা চলে গেল।

জগদানন্দ একটি চেয়ারে ঘনিয়ে এসে বসলেন। বললেন, ব্যাপারটা সামান্য। অনেক অনেকদিন আগে আমি আমার একজন ম্যানেজারকে কর্মচ্যুত করেছিলাম। তা, ধরুন পঁচিশ বছর আগে। চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কারণটা হচ্ছে এই যে, আমি মনে করেছিলাম তিনি তহবিল তছরূপ করেছেন। তাঁকে আমার জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া ছিল। আমার অজ্ঞাতে তিনি কিছু সম্পত্তি বেচে দেন এবং টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে ঠিক মত জমা দেন না। সেটা যখন আমি টের পেলাম তখন তাঁকে ডেকে তাঁর কৈফিয়ৎ তলব করলাম। উনি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পেশ করতে পারেননি। ফলে, তাঁকে বরখাস্ত করি। আজ পঁচিশ বছর পরে তিনি ফিরে এসে প্রমাণ দাখিল করছেন যে, তিনি আদৌ কোনও তহবিল তছরূপ করেননি। তাঁর কৈফিয়ৎ এখন আমি মিলিয়ে দেখেছি—বুঝেছি আমারই

অন্যায় হয়েছিল। এজন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করেছেন। আমি সেটা তাঁকে দিতে রাজি হয়েছি। এই ক্ষতিপূরণটা একটা লেখাপড়ার মাধ্যমে আমি করতে চাই—যাতে ঐ দাবি নিয়ে ম্যানেজার ভদ্রলোক আবার না পরে একদিন এসে হাজির হন। আপনাকে তার একটা ড্রাফট করে দিতে হবে। নিজে উপস্থিত থেকে এবং মধ্যস্থ হয়ে এই ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে হবে।

—বুঝলাম। এবার একটু বিস্তারিত করে বলুন।

জগদানন্দ যেটুকু বিস্তার করলেন তাতে প্রকাশ পেল—দাবিদারের নাম, বোঝা গেল তিনি এ বাড়িতেই বর্তমানে আছেন। একা নন, স-উকিল। এর বেশি কিছু ভাঙলেন না তিনি।

বাসু বললেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

—না, যাচ্ছে না। উনি যখন বরখাস্ত হন তখন ওঁর মাসিক বেতন ছিল চারশ' টাকা। বয়স ছিল চৌত্রিশ। উনি যদি ঐ রেজনেই পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত আমার কাছে চাকরি করতেন তবে তাঁর পাওনা হত সওয়া এগারো লাখ টাকা। অ্যানুইটির হিসাব করলে আজ পঁচিশ বছরে তাঁর হয়তো লাখ দুই টাকা দাঁড়াবে।

বাসু বললেন, তা হতে পারে। কিন্তু তিনি তো কাজ করেননি আপনার ম্যানেজার হিসাবে। আপনার ঐ ফর্মুলা অনুসারে হিসাব করলে দেখতে হবে চারশ' টাকার মাইনের চাকরি হারিয়ে বাস্তবে উনি কত রোজগার করেছিলেন। ধরুন যদি তিনি তখনই একটা তিনশ, টাকা মাইনের চাকরি ধরেন, তাহলে তাঁর মাসিক লোকসান হয়েছে একশ'। আপনার হিসাবমত তাঁর ক্ষতির নেট পরিমাণ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকায় নেমে আসে।

জগদানন্দ একটি চুরুট ধরিয়ে বললেন, টাকাটা যখন আমি দিতে রাজি তখন আর আপনার আপত্তি কিসের??

—আপত্তি এইজন্য যে, আমার মনে হচ্ছে আপনি সব কথা বলছেন না—বেশ কিছু গোপন করছেন।

এরমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জগদানন্দ বলেন, ধরা যাক, আপনার কথাই সত্য। তাতেই বা আপনার আপত্তি কী?? আপনি তো ক্ষতিপূরণের একটা দলিলের মুসাবিদা করে দেবেন শুধু।

বাসু-সাহেব বললেন, সে-ক্ষেত্রে আপনি রাম-শ্যাম-যদুকেই বা ডেকে পাঠালেন না কেন? এমন মামুলি দলিল তো যে-কোন উকিল তৈরী করে দিতে পারে আপনাকে। তার জন্য ব্যারিস্টার এ. কে. রে-র সাগরেদকে এগিয়ে আসতে হবে কেন?

জগদানন্দ চোখ বুজে মিনিটখানেক কী-যেন ভেবে নেন। তারপর বলেন, ডাক্তারের কাছে রোগ আর সলিসিটারের কাছে আইনের ফাঁক গোপন করতে নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি?? এখানে আমাকে কিছু গোপন করে যেতে হচ্ছে—আমি স্বীকার করছি—কিন্তু কী গোপন করছি তা আমি স্বীকার করতে পারি না। না, আপনার কাছেও নয়।

বাসু পাইপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে আপনি স্বীকার করলেন ঐ মহেন্দ্র এসেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে—এবং আপনি তার হাত থেকে রেহাই পেতে চান?

—ধরুন তাই।

—এ-ক্ষেত্রে আপনি স্বভাবতই চাইবেন ক্ষতিপূরণের দলিলটা এমনভাবে প্রস্তুত হ'ক যাতে ঐ লোকটা টাকা পাওয়ার পরেও যেন আপনাকে এসে শোষণ করতে না পারে। কেমন তো?

স্বাভাবিক অনুবিদ্ধান্ত।

—সে-ক্ষেত্রে আপনার গোপনীয় তথ্যটা কী, তা না জানলে আমি কেমন করে আপনাকে রক্ষা করব?

—মাপ করবেন—সেটা আমি বলব না, বলতে পারি না।

—ধরুন আপনি যৌবনে একটা খুন করেছিলেন—আজ পঁচিশ বছর পরে মহেন্দ্র এসেছে সেই খুনের একটা অকাট্য প্রমাণ নিয়ে। আপনি ক্ষতিপূরণ দিয়ে তো মার্ডার-চার্জ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।

জগদানন্দ হেসে বলেন, আপনার উদাহরণটা ভুল। যৌবনে আমি কোন খুন করিনি—তার অকাট্য প্রমাণ নিয়ে আসেওনি মহেন্দ্র। কিন্তু এটা তো নিশ্চিত—ক্ষতিপূরণটা দেবার সময় আমি ঐ অকাট্য প্রমাণটাও নিয়ে নেব—মানে যদি আপনার উদাহরণটাই সত্য হয়।

—কারেক্ট! কিন্তু তার একটা ফটোস্ট্যাট কপি ওর কাছে থেকে যেতে পারে!

ভ্রূকুঞ্চিত হয় জগদানন্দের। অনেকক্ষণ নীরবে ধূমপান করেন তিনি। তারপর মনস্থির করে বলেন, না! সে রিস্ক আমিই নেব। আপনাকে বলা যাবে না।

—এ-ক্ষেত্রে আমি আপনার কেসটা নিতে পারি না।

জগদানন্দ বিচিত্র হাসি হেসে বললেন, তাহলে এ আলোচনার এখানেই শেষ। আমি অন্য কোন উকিলের সন্ধানই করব। আপনার ভিজিটটা এনে দিই। আর আমার যুক্তকর নিবেদন—জলখাবারটা আপনাদের খেয়ে যেতে হবে।

জগদানন্দ উঠে গেলেন। আলমারি খুলে একটি চেকবই বার করে আনলেন। বাসু বলেন, দাঁড়ান। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি আগে। জবাব না দিতে চান দেবেন না, কিন্তু জবাবে যেটুকু বলবেন তা সত্য করেই বলবেন।

কৌতুক উপচে পড়ল জগদানন্দের দু-চোখে। বলল, সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে রহস্য উদ্ঘাটন! বেশ! করে দেখুন; কিন্তু সেটা পণ্ডশ্রম হবে মিস্টার বাসু! আমি ঘাঘু ব্যবসায়ী। এই করে চুল পাকিয়েছি। ও-ভাবে আমার পেটের কথা আপনি বার করতে পারবেন না।

বাসু-সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, আপনি বর্মা থেকে শেষ কবে ফিরে এসেছিলেন?

—ওরে বাবা! সে তো বহু-বহুদিন আগে। উনিশ'শ পঁচিশে। সদু—মানে নীলুর বাবা তখন দু-বছরের। তারপর আমি আর বর্মায় যাইনি।

—সদানন্দবাবুই বড় হয়ে বর্মার কাজ দেখাশোনা করতে যেতেন?

—না। বর্মার কাজ দেখাশোনা করতেন আমার সেখানকার ম্যানেজার য়ু সিয়াঙ। সদানন্দ একবারই মাত্র বর্মায় যায়, মানে তার সেই ছেলেবেলার কথা বাদ দিলে। ওর জন্ম ওখানেই।

—একবারই যান, মানে ঐ বিজনেস গুটিয়ে নিতে—সবকিছু বেচে দিয়ে আসতে?

—হ্যাঁ। জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার আগেই আমার আশঙ্কা হয় এমন একটা কিছু ঘটতে পারে। ঐ সময়ে লোহার ব্যবসায়ে আমার টাকারও প্রয়োজন ছিল প্রচুর। তাই সদুকে স্পেশাল পাওয়ার-অফ্ অ্যাটর্নি দিয়ে বর্মায় পাঠিয়ে দিই, মাসখানেক সে ওখানে ছিল। সব কিছু বিক্রি করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে সে ফিরে আসে।

—কত টাকায় বর্মার সম্পত্তি বিক্রি হয়?

—ঘর-বাড়ি, স্টক এবং গুড-উইল সমেত প্রায় সত্তর হাজার টাকায়।

—ব্যাঙ্ক-ড্রাফটের নাম্বারটা আমায় দিতে পারেন?

—কী হবে সে নম্বর দিয়ে?

বাসু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, এমন শর্ত তো ছিল না সেন-মশাই। আপনার কোন প্রতিপ্রশ্ন করার অধিকার নেই। হয় সত্য জবাব দেবেন, অথবা জবাব দিতে অস্বীকার করবেন।

জগদানন্দ হাসলেন। বললেন, ঠিক কথা। ব্যাঙ্ক-ড্রাফট-এর নম্বরটা আপনাকে দিতে পারি। এখনই চান?

—ইয়েস।

জগদানন্দ তাঁর কাঠের আলমারিটা খুললেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পুরাতন ইনকাম-ট্যাক্স ফাইল হাতড়ে নম্বরটা দাখিল করলেন। ব্যাঙ্ক অফ বর্মা ড্রাফ্ট্ দিচ্ছেন কলকাতার লয়েডস্ ব্যাঙ্কের উপর। টাকার অঙ্ক একাত্তর হাজার পাঁচশ বত্রিশ টাকা তিন আনা। তারিখ আঠারোই মে, 1940। বাসু-সাহেব নোটবুকে টুকে নিলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। আমি আপনার কাজটা করবার দায়িত্ব নিচ্ছি।

www.boiRboi.blogspot.com

ড্রাফট আমি করে দেব। এবার বরং মহেন্দ্রবাবু এবং বিশ্বম্ভরবাবুকে ডেকে পাঠান।

জগদানন্দ বললেন, গোপন তথ্যটা না জেনেই রাজী হলেন?

—ওটা তো কালকেই জানতে পারব। ব্যাঙ্ক খুললেই।

হো হো করে হেসে উঠলেন জগদানন্দ। বললেন, আপনার আশা যে, মহেন্দ্র আমাকে কী সূত্রে ব্ল্যাকমেল করছে তা আপনাকে জানিয়ে দেবে লয়েডস্ ব্যাঙ্ক?

বাসু কঠিন স্বরে বললেন, আগামি কাল এই সময় এসে সেটা অন্ততঃ আমি আপনাকে জানিয়ে যাব। এবার ডাকুন ওঁদের।

জগদানন্দ স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে দেখতে থাকেন বাসু-সাহেবকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, অসম্ভব বাসু-সাহেব। আই অ্যাকসেপ্ট য়োর চ্যালেঞ্জ! পঁচিশ বছর সময় লেগেছে মহেন্দ্রর—তাও সে আমার নাড়ি-নক্ষত্র জানত। আপনার পক্ষে এটা অসম্ভব!

বাসু-সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

অল্প পরেই এলেন মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভরবাবু।

মহেন্দ্রবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি। এক মাথা কাঁচা-পাকা কদম-ছাঁট চুল। ঝোলা গোঁফ, আর ঘন ভ্রূ। চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা ধূর্ত এবং সাবধানী। অপর পক্ষে বিশ্বম্ভরের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট—মোটাই বলা চলে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। কাপড়-জামায় দেহের যেটুকু ঢাকা পড়েনি সেখানে মেদের বাহুল্য নজরে পড়ে। জগদানন্দ ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহেন্দ্র হাত তুলে নমস্কার করল। বিশ্বম্ভর একটা কাগজে নিবদ্ধ দৃষ্টি থাকায় অজ্ঞাতে নমস্কার করার হাত এড়ালো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা আলোচনায় ডুবে গেলেন।

কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। মতদ্বৈধ দেখা দিল। বিশ্বম্ভর একটি ড্রাফট্ করে এনেছিলেন—সেটাই হল আলোচনার মূল সূত্র। বাসু-সাহেব বললেন, না, ঐ সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুকে বলতে হবে তিনি জগদানন্দের ওয়ারিশদেরও ভবিষ্যতে ঐ দাবি নিয়ে বিব্রত করতে পারবেন না।

বিশ্বম্ভর বললেন, মামলা হচ্ছে এমপ্লয়ার আর এমপ্লয়ির মধ্যে—এর ভিতর ওয়ারিশদের প্রসঙ্গ আসবে কী করে?

—সেটা আমাদের বিবেচ্য। ওঁকে দ্বিতীয়ত লিখে দিতে হবে—কোন অজুহাতেই তিনি জগদানন্দ অথবা তাঁর ওয়ারিশদের কাছে কোন দাবি নিয়ে কোনদিন উপস্থিত হবেন না।

বিশ্বম্ভর চটে উঠে বললে, এ যে অন্যায় দাবি করছেন মশাই! অতীতে আমার মক্কেলের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে এখন তারই ফয়শালা করছি আমরা। ভবিষ্যতে জগদানন্দবাবু যদি আমার মক্কেলের প্রতি নতুন কোন অন্যায় করেন, তবে তাঁকে মুখ বুঁজে সয়ে যেতে হবে?

বাসু-সাহেব বললেন, তৃতীয়তঃ ওঁকে আরও স্বীকার করতে হবে যে, ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে যদি পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, আমার মক্কেল জগদানন্দ বুঝতে পারেন আপনার মক্কেল মহেন্দ্রবাবু সত্যই তহবিল তছরুপ করেছিলেন তাহলে তদানীন্তন ব্যাঙ্ক-রেট সুদ সমেত ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা মহেন্দ্রবাবু প্রত্যর্পণের জন্য বাধ্য থাকবেন!

বিশ্বম্ভর উঠে দাঁড়ান চেয়ার ছেড়ে। বাসু-সাহেবকে ডিঙিয়ে জগদানন্দকে বলেন, আপনি যদি ফয়শালা করতে না চান সেটা সম্পূর্ণ পৃথক কথা। আমরা অন্য পন্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। ইনি যা দাবি করছেন তা অযৌক্তিক। অন্ততঃ গতকাল এসব ফ্যাকড়া আপনি তোলেননি।

জগদানন্দ বলেন, আচ্ছা আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি।

বাসু-সাহেবকে নিয়ে জগদানন্দ চলে গেলেন পাশের ঘরে। বললেন, এসব ফ্যাকড়া তুলছেন কেন?

—স্বাভাবিক কারণে। ধরুন যদি খেসারতের টাকাটি নিয়ে ও আবার আসে। আপনার যে গোপন ব্যাপারটা আছে সেটা প্রকাশ করে দেয়—প্রমাণ নাই করতে পারুক, স্ক্যান্ডেল ছড়াবার চেষ্টা করে তখন একটা 'শো-ডাউন' অনিবার্য হয়ে পড়বে। তখন মামলা করে ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা

আপনি দাবি করতে পারবেন। সে-টাকা আদায় হবে না, কিন্তু সেই ভয়ে ও স্ক্যান্ডালটাও ছড়াতে সাহস পাবে না।

জগদানন্দ ব্যাপারটা ভেবে দেখেন। একটু পরে বলেন, আপনার যুক্তি ঠিক; কিন্তু এসব শর্ত তো আমি আগে আরোপ করিনি, এখন ওরা শুনতে চাইবে কেন?

—এক কাজ করুন। ওদের কাছে একদিন সময় চেয়ে নিন। কাল এসে একটা ফয়শালা করা যাবে। কাল সন্ধ্যায়, এই একই সময়ে।

জগদানন্দ বিচিত্র হেসে বললেন, কেন বলুন তো? আপনি কি সত্যিই আশা রাখেন যে, কাল সন্ধ্যার মধ্যেই লয়েডস্ ব্যাঙ্ক থেকে জেনে আসবেন রহস্যের সন্ধান?

—তাই আশা করছি। মোট কথা একদিন সময় আপনি চেয়ে নিন শুধু।

তাই নেওয়া হল। বিশ্বম্ভর গজগজ করতে করতে উঠে গেল।

মহেন্দ্র কিন্তু যাবার সময় সবিনয় নমস্কার করে গেল তার প্রাক্তন মনিবকে এবং তাঁর সলিসিটারকে।

জলখাবার খেতে বসে শুরু হল খোশ গল্প। বাসু-সাহেব বলেন, সেন-মশাই, আপনার নাতনিটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ তেজি মেয়ে।

নীলিমা দাঁড়িয়েছিল সামনেই।জগদানন্দ তার পিঠে একটা স্নেহের চাপড় মেরে বলেন, হবেই তো! ওর জন্ম যে সিংহরাশিতে!

—তাই নাকি! সিংহরাশিতে জন্ম হলে বুঝি খুব তেজি হয়?

হা-হা করে হেসে ওঠেন জগদানন্দ। বলেন, না, জ্যোতিষচর্চা অত সহজ নয়; ওটা একটা রসিকতা করছিলাম। তবে নীলু-মা একটি ক্ষণজন্মা মেয়ে—যাকে বলে লগন-চাঁদা! ওর লগ্নে রবিও আছে কিনা! মুশ্‌কিল হয়েছে ওর নবমে শনি রয়েছেন—

তারপর হঠাৎ বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, আপনি জ্যোতিষ মানেন?

বাসু বলেন, গণিত জ্যোতিষ মানি, ফলিত জ্যোতিষ মানি না।

—আপনার কী রাশি?

—আমি নিজেই তা জানি না। ও সব রাশিচক্র তিথি-নক্ষত্র আমি বুঝিই না।

জলখাবার খেয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওঁরা নিচে নেমে এলেন। নীলিমা ওঁদের গাড়িতে তুলে দিতে এল। বাসু-সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করেন, নীলিমা, তোমার জন্মবারটা কী বলতো?

—জন্মবার দিয়ে কী হবে? সোমবার!

বাসু বলেন, এমনিই কৌতূহল হল জানতে! আচ্ছা চলি!

তিন

পরদিন সন্ধ্যায় বুড়ো-কর্তার নিভৃত-কক্ষে যখন আবার ওঁরা দু-জন মুখোমুখি বসলেন তখন জগদানন্দ বললেন, ব্যারিস্টার-সাহেব, আজ আপনার জন্যে আমি একটি 'সারপ্রাইজ' নিয়ে বসে আছি! সেটা দেখলে আপনি চমকে উঠবেন।

বাসু উৎসাহ দেখিয়ে বলেন, চমকিত হওয়া একটা দুর্লভ সৌভাগ্য! তাহলে আগে সেটাই দেখি। কাজের কথা পরে হবে।

ছোট ছেলের মত মাথা দুলিয়ে জগদানন্দ বলেন, ওটি হচ্ছে না। চমকিত হওয়া যখন দুর্লভ সৌভাগ্য তখন প্রতিশ্রুতিমত আপনি আগে আমাকে চমকিত করুন! কথা ছিল, আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাকে জানাবেন রহস্যটা কী! মানে আমার রহস্যটা।

বাসু-সাহেব বলেন, সে-সব কথা থাক!

—তাহলে তো হবে না ব্যারিস্টার সাহেব। সে-ক্ষেত্রে আগে হার স্বীকার করুন।

—করলাম!

খুশিয়াল হয়ে ওঠেন জগদানন্দ। বলেন, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক কোন খবর দিতে পারল না!

—লয়েডস্ ব্যাঙ্কে আমি আদৌ যাইনি।

—তাহলে আপনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছেন, মহেন্দ্র কী ব্যাপারে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে তা আপনি জানতে পারেননি?

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, একই কথা আমাকে দিয়ে বারে বারে কেন বলাচ্ছেন মিঃ সেন?

জগদানন্দ ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলেন, কিছু মনে করবেন না বাসু-সাহেব! এতে আপনার লজ্জিত হবার কিছু নেই। যে খবর বার করতে মহেন্দ্রের পঁচিশ বছর লাগল তা যে আপনি চব্বিশ ঘন্টায় জানতে পারবেন না তা আমিও জানতাম। তবে আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে। এই নিয়ে ইতিমধ্যে আমি বাজি ধরে বসে আছি কিনা। আপনার অসাফল্যে আমি একশ টাকা বাজি জিতলাম!

বাসু-সাহেব পাইপে অগ্নি সংযোগ করছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়ে বলেন, মানে? এ নিয়ে বাজি ধরেছেন? কার সঙ্গে? নাতনি?

—না! আপনার গুরু ব্যারিস্টার এ. কে. রে!

বাসু-সাহেবের হাতের দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বলেন, সেটা কী রকম?

—কাল আপনি চলে যাবার পরেই আমি রে-সাহেবকে টেলিফোন করেছিলাম। ওঁকে বললাম, আপনি বলেছেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমার একটা রহস্য উদ্ঘাটন করে দেবেন। শুনে রে-সাহেব বললেন—বাসু যদি কথা দিয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই করবে! তারপর যা হয়ে থাকে। দুই বুড়োয় কথা কাটাকাটি! শেষমেষ একশ' টাকার বাজি!

বাসু এবার দেশলাই থেকে দ্বিতীয় একটি কাঠি বার করে পাইপটা ধরালেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, সে-ক্ষেত্রে, সেন-মশাই, আমার উক্তি আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। গুরুর আর্থিক লোকসান আমি হতে দিতে পারি না। আপনার রহস্য আমি উদ্ঘাটন করেছি!

জগদানন্দ মিটিমিটি হাসছেন। বলেন, বটে! তবে সেটাই শোনান আগে।

বাসু ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। ঘরে ওঁরা তিনজনই মাত্র আছেন। জগদানন্দ, তিনি আর কৌশিক। তবু উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। বললেন, সেন-মশাই, কথাটা অপ্রিয়, তাই সব জেনেশুনেও আমি হার স্বীকার করছিলাম। বিশ্বাস করুন, আমি ব্যাপারটা জানি।

জগদানন্দ ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন। বলেন, ও ভাবে ফাঁকি দিতে পারবেন না!

বাসু যেন নিরুপায় হয়ে ঝুঁকে পড়েন। অস্ফুটে বলেন, আমি জানি—মহেন্দ্র এতদিনে প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছে যে, নীলিমা আপনার পৌত্রী নয়!

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন জগদানন্দ। কৌশিকও চমকে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে জগদানন্দ বলেন, আর একটু খুলে বলুন, কী বলতে চাইছেন।

—বলছি যে, আপনার পুত্র সদানন্দ সেন নীলিমার বাবা নয়—এ তথ্যটা মহেন্দ্র আবিষ্কার করেছে। হয়তো সে অনেকদিন ধরেই এটা জানত—সম্প্রতি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছে!

মাথাটা নিচু হয়ে গেল জগদানন্দের। অনেকক্ষণ নির্বাক বসে রইলেন তিনি। তারপর মুখ তুলে বললেন, আপনি কেমন করে জানলেন?

—সে প্রশ্ন অবান্তর! এখন দেখান আপনি কী দেখাতে চাইছিলেন যেন?

তবু উৎসাহ ফিরে পেলেন না জগদানন্দ। বললেন, আপনি জানাবেন না—কী সূত্রে এ তথ্যটা আবিষ্কার করেছেন?

—না! সে শর্ত তো ছিল না।

আরও মিনিটখানেক গুম মেরে বসে রইলেন জগদানন্দ। তারপর উঠে গেলেন এবং আলমারি থেকে একটি দলিল নিয়ে এসে নীরবে বাড়িয়ে ধরলেন বাসু-সাহেবের দিকে। কাগজটা খুলে বাসু-সাহেব দেখেন সেটি একটি উইল। অত্যন্ত পাকা মুন্সিয়ানার সঙ্গে জগদানন্দ স্বহস্তে একটি উইল লিখেছেন। তাতে তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির খতিয়ান আছে। ওঁর গুরুদেব পাবেন দশ হাজার, নীলিমার এক মামা দশ হাজার, আর একজন কে যেন পাবেন পাঁচ হাজার, এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু পাবে। নীলিমা পাবে নগদ পঁচিশ হাজার। জগদানন্দের বৈমাত্রেয় ভাই যোগানন্দ পাবেন পঞ্চাশ হাজার এবং ওঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বসত বাড়িটা নির্বাঢ় শর্তে উনি দিয়ে যাচ্ছেন মহেন্দ্রকে!

দীর্ঘ উইলটি পাঠ শেষ করে মুখ তুললেন বাসু-সাহেব। বলেন, পড়লাম।

—পড়লেন তা তো দেখতেই পেলাম। এবার আপনার অভিমত?

বাসু-সাহেব হেসে বললেন, আমার বিশ্বাস এত সহজে মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভরকে বোকা বানাতে পারবেন না! এ উইল পাল্টে যাতে আপনি আবার উইল করতে না পারেন সে ব্যবস্থা তারা করবে। প্রথমতঃ এটি রেজিষ্ট্রি করাবে; দ্বিতীয়তঃ আপনি যাতে তারপর আর দ্বিতীয় উইল না করতে পারেন, সে জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করবে।

—কী ব্যবস্থা?

—চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে নজরবন্দি করে রাখবে!

জগদানন্দ বলেন, আমি জানি। তাই এই ব্যবস্থাটিও করে রেখেছি। দ্বিতীয় উইল আমি আদৌ করব না।

উনি আর একটি কাগজ বের করে দেন—বসত বাড়িটি দান বিক্রয় করার অধিকার দিয়ে বাসু-সাহেবকে একটি স্পেশাল পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নি। বললেন, আপনি আমার আমমোক্তার-নামা নিয়ে আমার বসত বাড়িটি আমার তরফে নীলিমাকে দান করে দিন। কালই। তারপর পরশু আমি আমার উইলটা অপরিবর্তনীয় শেষ উইল হিসাবে রেজিষ্ট্রি করাব এবং একটি কপি মহেন্দ্রকে দেব। আমার বিশ্বাস ও মেনে নেবে। তিনটি কারণে—প্রথমতঃ ও জানে, এ বাড়ির দাম দু-আড়াই লাখ টাকা। দ্বিতীয়তঃ আমি আর কদিন? তৃতীয়তঃ আমার এই ডবল-ক্রসিংটা ও সন্দেহ করবে না—ভাববে, আমার জীবদ্দশায় যাতে সে পুনরায় ঝামেলা করতে না আসে তাই এই ব্যবস্থা আমি করেছি। আমার মৃত্যুর পরে ও যখন উইল মোতাবেক এ বাড়ি দখল নিতে আসবে তখন সে জানতে পারবে যে, উইল করার আগেই বাড়ির মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে!

বাসু-সাহেব বলেন, পরিকল্পনাটা ভাল। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না; কিন্তু তাহলে নাতনিকে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা দিচ্ছেন কেন? ওটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে একটু বাড়িয়ে দেওয়া ভাল নয়?

জগদানন্দ হেসে বলেন, সেটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। আমি দেখতে চাই এই উইল পড়ার পরেও ঐ ছোকরা—কী যেন নাম?—হ্যাঁ জয়দীপ, এ-বাড়িতে আর মাথা গলায় কি না! জয়দীপকে আমি উইলে সাক্ষী করব।

—এ বুদ্ধিটা ভাল করেছেন! এক ঢিলে দু-পাখি!

—বাড়িতে ফিরে এসে কৌশিক চেপে ধরল বাসু-সাহেবকে, এবার বলুন, কেমন করে জানলেন জগদানন্দের ঐ গোপন রহস্য?

ইজিচেয়ারে বসে পাইপ ধরাচ্ছিলেন বাসু-সাহেব। বলেন, বুঝলে না? পিওর অ্যান্ড সিম্পল ম্যাথমেটিক্স! অঙ্ক রে বাবা, অঙ্ক!

—অঙ্ক মানে? কিসের অঙ্ক?—বুখে ওঠে কৌশিক।

—অ্যাষ্ট্রনমির। গণিত জ্যোতিষ। শিবপুর বি. ই. কলেজে অ্যাষ্ট্রনমি পড়ানো হয়?

—হয় না; কিন্তু বি. এস্-সিতে আমার অঙ্কে অনার্স ছিল। ওটা বুঝি। ও-ভাবে আমাকে ব্লাফ দিতে পারবেন না। অ্যাস্ট্রনমির অঙ্কে কে কার বাপ তো কখনও বোঝা যায় না।

—যায় রে বাপু, যায়। শোন বুঝিয়ে দিচ্ছি। কথা প্রসঙ্গে জগদানন্দ নীলিমার জন্ম সম্বন্ধে কী কী বলছিলেন বল দিকিন!

—আমার ঠিক ঠিক মনে নেই, আপনিই বলুন।

—উনি বলেছিলেন, এক নম্বর—ওর জন্ম রাশি সিংহ, দু-নম্বর ও লগন্চাঁদা মেয়ে, তিন-নম্বর ওর জন্ম লগ্নে রবি, চার নম্বর ওর নবমে শনি। কেমন?

—তা হবে। তাতে কী হল? তাতে কখনও প্রমাণ হয় তার বাপ সদানন্দ নয়?

—হবে রে বাপু, হবে। অঙ্কটা আগে কষতে দাও। প্রথম কথা—'জন্মলগ্ন' কাকে বলে? জান? জন্মের সময় যে রাশি পূর্বগগনে উদয় হচ্ছে। তাই তো!

—হ্যাঁ, তাই।

—ওর লগ্নে রবি আছেন, অর্থাৎ জন্ম মুহূর্তে সূর্যও গুটি গুটি উঠছেন। অর্থাৎ ওর জন্ম সূর্যোদয় মুহূর্তে! কেমন?

—তাতে কী হল?

—তাতে প্রমাণ হল ওর জন্মমাস ভাদ্র!

—তা কেমন করে প্রমাণ হল?

—হল না? ওর জন্মরাশি হচ্ছে 'সিংহ'। জন্মরাশি কী? জন্ম মুহূর্তে চন্দ্র যে রাশিতে আছেন! অর্থাৎ চন্দ্র ছিলেন সিংহে। যেহেতু ও লগন্-চাঁদা এবং ওর লগ্নে আছেন রবি—ফলে জন্মমুহূর্ত চাঁদ ও সূর্য দুজনেই সিংহ রাশিতে নয়? এখন 'সিংহরাশিস্থে ভাস্করে' মানেই 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর!' ওর জন্মমাস ভাদ্র!

কৌশিক একটু ভেবে নিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বাসু বলেন, শুধু ভাদ্র মাসই নয়, ভাদ্রের অমাবস্যায়!

—কেন? অমাবস্যা কেন?

—যেহেতু সূর্য ও চন্দ্র একই রাশিতে! অ্যাস্ট্রনমি পেপারে কত নম্বর পেয়েছিলে?

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে কৌশিক বললে, ও ইয়েস!

—তাহলে এ পর্যন্ত জেনেছি যে, নীলিমা কোন একটি ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় সূর্যোদয়ের মুহূর্তে জন্মেছে। এগ্রিড? নাউ! আমাদের চার নম্বর হাইপথেসিস্ ছিল 'নবমে শনি'।

কৌশিক স্বীকার করে, ঐ ব্যাপারটা আমি বুঝিনি। 'নবমে শনি' মানে কি?

—বাসু বলেন, তোমার বুঝতে না পারাই স্বাভাবিক। ওটা অ্যাস্ট্রনমির এক্তিয়ারভুক্ত নয়, অ্যাস্ট্রলজির ব্যাপার। 'লগ্ন' থেকে নয়-ঘর গুণে যে রাশি পাওয়া যাবে সেখানে জন্ম সময়ে শনি ছিলেন এটাই বুঝতে হবে। যেহেতু ওর লগ্ন ছিল সিংহ তাই জন্মসময়ে দেখা যাচ্ছে শনি আছেন মেষ রাশিতে। ওর জন্ম-ছকটায় যেটুকু জানা গেল তার সাঙ্কেতিক চেহারা এই রকম—সিংহ রাশিতে আছেন রবি (র), চন্দ্র (চ) এবং লগ্ন (লং) আর মেষরাশিতে শনি (শ)। মজা হচ্ছে শনিগ্রহ এক এক রাশিতে থাকেন আড়াই বছর। মানে গোটা রাশিচক্র পাক মারতে তাঁর সময় লাগে আড়াই ইন্টু-বারো, ত্রিশ বছর! বর্তমান বছরে, এই 1975 সালে শনি আছেন মিথুনে। দেখছি, নীলিমার জন্ম সময়ে তিনি ছিলেন দু-রাশি পিছনে। তার অর্থ ওর জন্ম সময়টা আজ থেকে পাঁচ বছর, অথবা ত্রিশ-প্লাস-পাঁচ পঁয়ত্রিশ বছর, কিম্বা ত্রিশ-দুগুণে-ষাট-প্লাস-পাঁচ পঁয়ষট্টি বছর আগে—কেমন তো? যেহেতু নীলিমাকে পাঁচ বছরের খুকি অথবা পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ি বলে মনে হচ্ছে না তাই ওর বয়স পঁয়ত্রিশ! এগ্রিড? সিদ্ধান্তটা একটা বিকল্প পদ্ধতিতেও প্রমাণ করা যায়—নীলিমা প্রথম সাক্ষাতে বলেছিল তার বয়স চৌত্রিশ; অন্তত একটা বছর হাতে না রেখে কোন যৌবনোত্তীর্ণা অনূঢ়া নিজের বয়স বলে না। ফলে চৌত্রিশ প্লাস

এক পঁয়ত্রিশ! সংক্ষেপে নীলিমার জন্ম বৎসর 1940।

কৌশিক এতক্ষণে একটা মস্ত ফাঁক বার করেছে হিসাবে। বললে, তা কেন? শনি মেষরাশির প্রথমদিকে আছেন কিম্বা শেষ দিকে আছেন তা তো জানেন না। আপনি নিজেই বললেন এক রাশি পার হতে শনির আড়াই বছর লাগে। ফলে সালটা 1941 অথবা 1939 ও তো হতে পারে!

—কারেক্ট! ভেরি কারেক্ট! ভেরি ভেরি কারেক্ট। বরং তোমার বলা উচিত ছিল সে-হিসাবে 1938 থেকে 1942 যে-কোন সাল হতে পারে।

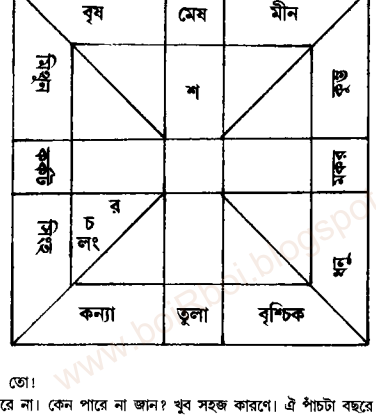

—পারেই তো!

—না, পারে না। কেন পারে না জান? খুব সহজ কারণে। ঐ পাঁচটা বছরে পাঁচ-পাঁচটা ভাদ্রের অমাবস্যা এসেছে। তার ভেতর শুধুমাত্র 1940-এর ভাদ্রের অমাবস্যা পড়েছে সোমবারে—যেটা নীলিমার স্বীকৃতি অনুসারে ওর জন্মবার! ফলে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ হল—নীলিমার জন্ম 1940 সালের ভাদ্র অমাবস্যায় সূর্যোদয়ের মুহূর্তে। বাংলা হিসাবে সেটা সতেরই ভাদ্র ১৩৪৭ ইংরাজি, দোশরা সেপ্টেম্বর 1940।

—বেশ তাও না হয় মেনে নিলাম; কিন্তু তা থেকে তার পিতৃপরিচয়—

—ধীরে রজনী, ধীরে! ব্যাঙ্ক অব বর্মার ড্রাফট্-এর তারিখ ছিল 18.5.1940। জগদানন্দের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সদানন্দ মাসখানেক বর্মায় ছিল। যদি ধরে নিই একেবারে প্রত্যাবর্তনের শেষ দিনে সে ড্রাফটটা নিয়েছে তাহলে সদানন্দের বর্মামুলুকে পদার্পণের তারিখটা হচ্ছে 14.4.1940। যদি ধরে নিই রেঙ্গুনে পদার্পণের দিনই নীলিমার মায়ের সঙ্গে সদানন্দের সাক্ষাৎ ঘটে থাকে তবে দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ সময়ে নীলিমার মায়ের গর্ভে ভ্রূণের বয়স অন্ততঃ পাঁচ মাস! Q.E.D.!

কৌশিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনাকে একটা প্রণাম করব বাসুমামা?

বাসু-সাহেব ইজিচেয়ারে হাতলে ঠ্যাঙ জোড়া তুলে দিয়ে বলেন, ভাগনে মামাকে প্রণাম করবে—এতে আবার তিথি নক্ষত্র দেখার কী আছে? কর!

চার

জগদানন্দের পরিকল্পনাটি খাসা। কিন্তু সেই-মোতাবেক কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ল। বাসু-সাহেব আমমোক্তার-বলে জগদানন্দের তরফে গোপনে তাঁর বসতবাড়িটি দানপত্র করে দিলেন তাঁর পৌত্রীকে—না, ভুল, বললাম! দলিলের কোথাও উল্লেখ নেই দানগ্রহীতা নীলিমা সেন জগদানন্দের পৌত্রী। বরং বলা হয়েছে, যে-হেতু সেন-পরিবারভুক্ত 'কুমারী নীলিমা দেবী' বৃদ্ধ বয়সে দাতা জগদানন্দের সেবা-শুশ্রূষা যত্ন আদি করেছেন তাই প্রতিদানে খুশিমনে সুস্থ বহাল তবিয়তে দাতা নির্ব্যূঢ়-স্বত্বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জগদানন্দ জয়দীপ এবং নীলিমাকে তাঁর নিভৃত কক্ষে ডেকে পাঠালেন। দানপত্রর কথা গোপন রেখে উইলখানি ওদের দুজনকে পড়তে দিলেন। দুজনে আদ্যন্ত তাঁর অপরিবর্তনযোগ্য শেষ উইলখানি পাঠ করলে জগদানন্দ প্রশ্ন করেন, তোমাদের মতামত নেবার জন্য এই উইল পড়তে দিইনি, বস্তুতঃ তোমাদের মতামতে এটা পরিবর্তনও করব না আমি; তবু আমি জানতে চাই এ বিষয়ে তোমাদের কিছু কী বলার আছে?

নীলিমা বৃদ্ধ নিঃশ্বাসে বসেছিল এতক্ষণ। এ প্রশ্নে মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু বললে, না!

জয়দীপ কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। বললে, আমার একটা কথা বলার ছিল। আপনি এভাবে নীলিমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছেন কেন?

—বঞ্চিত করছি! কে বলল? তাকে তো নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছি!

—এবং আপনার ভাইপোকে দিয়ে যাচ্ছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা, আর নিঃসন্তানীয় ঐ মহেন্দ্রবাবুকে দিয়ে যাচ্ছেন এই বাস্তুভিটা!

—হ্যাঁ, তাতে কী হল?

জয়দীপ স্থির হয়ে বসে রইল। জবাব জোগালো না তার কণ্ঠে। শেষে উঠে গেল সে।

পরদিন, শুক্রবার সকালে সে ফিরে এসে বললে, কাল আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। আপনি জানেন যে, আমি নীলিমাকে বিবাহ করতে চাই। আপনার আপত্তি ছিল। যে কারণে আপনি আপত্তি করেছিলেন আশা করি সেই কারণটা এখন আর নেই। যদি মনে করেন এখনও সেই কারণটি আছে তবে ঐ পঁচিশ হাজার টাকা থেকেও তাকে বঞ্চিত করে যান, আমি ওকে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাই।

জগদানন্দ রাগ করেননি। খুশি হয়েছিলেন। জবাবে বলেছিলেন, নীলুর বিবাহ আমার এই শেষ বয়সের শেষ উৎসব। এ বামেলা মিটে যাবার আগে সে বিষয়ে আমি চিন্তা করছি না। উইলটা হয়ে যাক, আপদ বিদায় হ'ক—তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।

—আপদ বিদায় হ'ক মানে? মহেন্দ্রবাবুকে তো আপনি খুশি মনে—

বাধা দিয়ে জগদানন্দ বলেছিলেন, ও কথা থাক!

বামেলা কিন্তু মিটল না। মহেন্দ্র এবং বিশ্বম্ভর এ প্রস্তাবে প্রথমটা রাজি হয়নি। শেষে অনেক কষ্টে জগদানন্দ রাজি করান। উইলে আরও উল্লেখ করা হল যে, এইটিই তাঁর শেষ উইল। যে কোনও কারণেই হ'ক এ উইল পরিবর্তন করে উনি যদি ভবিষ্যতে নূতন উইল প্রণয়ন করেন তবে তা আইনতঃ গ্রাহ্য হবে না।

এরপর মহেন্দ্র-বিশ্বম্ভর পার্টি রাজি হলেন। রাজি হলেন না বাসু-সাহেব। বাস্তুতঃ। তিনি প্রকাশ্যে দেখালেন এ অবস্থায় তিনি মোটেই খুশি নন। উইলে সাক্ষী হিসাবে তিনি সই দিতেও অস্বীকার

করলেন। হয়তো সেজন্যই মহেন্দ্র-বিশ্বম্ভর পার্টি আরও খুশি মনে এ ব্যবস্থা মেনে নিলেন। সাক্ষী হিসাবে সই দিলেন অ্যাডভোকেট বিশ্বম্ভরবাবু এবং জয়দীপ। শনি-রবি-সোম তিন দিনই ছুটি। স্থির হল, মঙ্গলবার ওটি রেজিস্ট্রি করানো হবে। আপাততঃ উইলের মূল কপিটি থাকল মহেন্দ্রের জিম্মায়।

ঐ শনিবারেই ঘটল একটি অদ্ভুত ঘটনা। জগদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে এলেন একজন অদ্ভুতদর্শন স্যুট পরা ভদ্রলোক! তাকে নীলিমা ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি, চেনে না। খর্বকায়, হৃষ্টপুষ্ট—বয়স সত্তর কাছাকাছি। নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুটি ছোট—ট্যাড়চা। যাকে বলে মঙ্গোলীয় ছাপ। গায়ের রঙ তামাটে। বৃদ্ধদ্বার কক্ষে তিনি জগদানন্দের সঙ্গে কী আলোচনা করলেন তা কেউ জানে না; কিন্তু নীলিমা লক্ষ্য করে দেখে তিনি চলে যাবার পর বিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্তে আগ্নেয়গিরির মত গুম্ মেরে বসে আছেন জগদানন্দ। সে প্রশ্ন করেছিল, ও ভদ্রলোক কে দাদু?

হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল। চাপা গর্জন করে উঠলেন জগদানন্দ, খুন করব! সব কটাকে খুন করব আমি! এরা ভেবেছে কী?

ক্রমশঃ বোঝা গেল ঐ অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোকটির নাম যু সিয়াঙ। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে তিনি ছিলেন জগদানন্দের বর্মা-অফিসের ম্যানেজার। নীলিমা আন্দাজে বুঝতে পারে—মহেন্দ্র হয়তো ঐর মাধ্যমেই গুপ্তরহস্য সম্প্রতি উদ্ধার করেছেন এবং ধূর্ত বর্মী ভদ্রলোক ব্যাপারটা আঁচ করে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ মহেন্দ্রবিদায় পর্ব চুকলেও মুক্তি পাচ্ছেন না জগদানন্দ। এবার তাঁকে যু সিয়াঙ-এর সম্মুখীন হতে হবে, জগদানন্দের নির্দেশে নীলিমা বাসু-সাহেবকে ফোন করল। ওর কাছ থেকে সব শুনে বাসু-সাহেব বললেন, এসব ব্যাপারে আমার চেয়ে কৌশিকই তোমাদের বেশি সাহায্য করতে পারবে। কাল সকালে সে যাবে তোমাদের বাড়িতে।

রবিবার কৌশিক সেই অনুসারে এসে উপস্থিত হল জগদানন্দের বাড়িতে। জগদানন্দ তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনি আশাকরি বুঝতে পেরেছেন আমার সমস্যাটা কী। এই যু সিয়াঙ লোকটাই মহেন্দ্রকে সরবরাহ করেছে যাবতীয় তথ্য। ঠিক কী কী তথ্য তা আমি জানি না—আন্দাজ করতে পারি। হয় তো যে জাহাজে সদানন্দ গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছিল সেই জাহাজের নাম, হয়তো চৌত্রিশ বছর আগেকার সেই প্যাসেঞ্জার লিস্ট-এর ফটো-স্ট্যাট কপি নিয়েছে ওরা। হয়তো যে হোটেলে সদানন্দ রেঙ্গুনে একমাস ছিল তার হোটেল রেজিস্টার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে—অথবা নীলুর মাকে যারা চিনত তাদের নাম-ধাম-বর্তমান ঠিকানা সব সংগ্রহ করেছে।

কৌশিক জানতে চায়, লোকটা কী চাইছে?

—টাকা! কোনও সঙ্কোচ করেনি যু সিয়াঙ—সে স্পষ্ট বলেছে মহেন্দ্রের সঙ্গে তার শর্ত হয়েছিল যে, সে যা আদায় করবে তার অর্ধেক তাকে দেবে। তার আশঙ্কা মহেন্দ্র তাকে ফাঁকি দেবে। তাই তার প্রস্তাব মহেন্দ্রকে আমি যা খেসারত হিসাবে দেব বলেছি তার অর্ধেক তাকে দিতে হবে।

—ও কোথায় থাকে?

—ও সোজা এসেছে রেঙ্গুন থেকে। আছে পার্ক হোটেলে, রুম নম্বর 38। বলেছে, আমি কী স্থির করলাম তা ওকে ঐ রুম নাম্বারে ফোন করে জানিয়ে দিতে।

—ওর সঙ্গে মহেন্দ্রের যোগাযোগ হয়েছে?

—আমি জানি না। আমি ওকে বলেছিলাম মহেন্দ্র এ বাড়িতেই থাকে। যদি সে দেখা করতে চায় তবে আমি তাকে ডেকে আনতে পারি। তাতে সে রাজি হয়নি। বলেছিল, মহেন্দ্রের সঙ্গে তার ফয়শালা যা করার কথা তা সে জনান্তিকেই করবে।

কৌশিক সব শুনে বলল, ঠিক আছে। যা ব্যবস্থা করার আমি করছি। বাসু সাহেবকেও সব জানাবো।

সেদিনই নীলিমা আর জয়দীপ এসে দেখা করল কৌশিকের সঙ্গে। জানতে চাইল—ব্যাপারটা কী?

কৌশিক বলে, নীলিমা দেবী যা আশঙ্কা করেছিলেন ঠিক তাই। অর্থাৎ মহেন্দ্র গোপন খবরটা সংগ্রহ করেছে ঐ বর্মী ভদ্রলোকের মাধ্যমে। উনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে, তথ্যটা ব্ল্যাকমেলিঙ-এর পক্ষে

প্রশস্ত। ফলে, নিজেই চলে এসেছেন রেঙ্গুন থেকে ভারতবর্ষে।

—কিন্তু গোপন তথ্যটা কী?—জানতে চায় জয়দীপ।

কৌশিক সজ্ঞান মিথ্যা ভাষণ করে, সেটা এখনও জানা যায়নি।

—এখন কী করতে চান?

—প্রথম ব্যবস্থা হচ্ছে সর্বক্ষণ ঐ য়ু সিয়াঙ ভদ্রলোককে নজরে নজরে রাখা। আমাদের জানতে হবে, ওর সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর বর্তমান সম্পর্কটা কী? মহেন্দ্রবাবুকেও নজরে নজরে রাখতে হবে।

—আপনি একা মানুষ—দুটো মানুষকে দু'জায়গায় নজরে রাখবেন কেমন করে?

—আমাকে লোক লাগাতে হবে। এ জাতীয় কাজ করার লোক আমার জানা আছে। দৈনিক চুক্তিতে তাদের এনগেজ করতে হবে।

জয়দীপ বলে, তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমি নিজেই ঐ পার্ক হোটেলে গিয়ে একটা ঘর নিই। য়ু সিয়াঙ আমাকে চেনে না। তাকে নজরবন্দি করি। সে কলকাতা শহরও চেনে না, ফলে তার সঙ্গে ভাব করে শহরটা দেখাই—হয়তো কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।

কৌশিক রাজি হল। এ ব্যবস্থাটা ভাল। জয়দীপ বেশ চালাক-চতুর, ওকে দিয়ে কাজ হবে। রবিবার বিকালেই জয়দীপ পার্ক হোটেলে একটা ঘর নিল। ঐ আটত্রিশ নম্বর ঘরের পরের পরের ঘরটা—চল্লিশ নম্বর কামরা।

বাসু-সাহেব বাড়ি ফিরে সব কথাও শুনলেন। বললেন, আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না কৌশিক। চল, একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা করে আসি।

কৌশিক বললে, সেটাই ভাল। বৃদ্ধ সকালবেলা আমাকে পেয়ে খুশি হননি। আপনার কথা বারে বারে জিজ্ঞাসা করছিলেন।

সত্যই বাসু-সাহেবের সাক্ষাৎ পেয়ে খুশি হয়ে উঠলেন জগদানন্দ। বললেন, এমনই একটা কিছু আশঙ্কা করেছিলাম আমি। আজ থেকে শনির দশা শুরু হল যে আমার।

বাসু বললেন, সেন-মশাই, আমি ওসব শনির দশা, বৃহস্পতির দশা বুঝি না। যা বুঝি তা হচ্ছে এই যে, আপনি বর্তমানে একটি প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই আমি ছুটে এসেছি। মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভর কি য়ু সিয়াঙের আগমন সংবাদটা জানে?

—বোধহয় না। যে সময় য়ু সিয়াঙ আসে তখন ওরা দুজনেই বাড়ি ছিল না।

—বুঝলাম। ওরা এখন বাড়ি আছে?

—আছে।

—তবে ওদের ডেকে পাঠান। নীলিমা আর জয়দীপকেও ডাকুন।

সবাই সমবেত হলে বাসু বললেন, আপনারা সকলেই জানেন, গত পরশু জগদানন্দবাবু একটি উইল করেছেন। তাতে কী আছে, আমি জানি না। কারণ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ঐ উইল করেন—কিন্তু আপনারা তা জানেন। উইলটি রেজিস্ট্রি করা হয়নি; কিন্তু তাতে জগদানন্দের স্বাক্ষর আছে—সেটি আইনমোতাবেক সিদ্ধ। আমার মতে, যতদিন না উইলটি রেজিস্ট্রি করা হচ্ছে ততদিন সেটা উইলের কোন বেনিফিশিয়ারির কাছে থাকা উচিত নয়।

—কেন বলুন তো?—জানতে চান বিশ্বম্ভর উকিল।

—সেটাই প্রথা। তা ছাড়াও কারণ আছে।

—সেই কারণটাই তো আমি জানতে চাইছি।

বাসু-সাহেব হঠাৎ ঘুরে বসেন মহেন্দ্রের দিকে। তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, মহেন্দ্রবাবু, আপনি য়ু সিয়াঙ বলে কাউকে চেনেন?

মহেন্দ্র এ প্রশ্নে হঠাৎ থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু সে জবাব দেবার আগেই বিশ্বম্ভর প্রতিপ্রশ্ন করে, সে প্রশ্নের সঙ্গে এ বিষয়ের পারম্পর্য কী?

বাসু ওর কথা কানে তোলেন না, মহেন্দ্রকেই প্রশ্ন করেন—আপনি সম্প্রতি রেঙ্গুনে গিয়ে ঐ য়ু সিয়াঙের সঙ্গে দেখা করেননি?

মহেন্দ্র আমতা আমতা করে। তাকে থামিয়ে দিয়ে বিশ্বম্ভর বলে, মিস্টার বাসু, আপনার যা কিছু প্রশ্ন আছে তা আমাকে করবেন। মক্কেলের তরফে আমিই তো হাজির আছি।

মহেন্দ্র ঢোক গিলে চুপ করে যায়। বাসু এবার বিশ্বম্ভরের দিকে ফিরে বলেন, বেশ আপনাকেই বলছি। আপনার মক্কেল যেমন পঁচিশ বছর পরে এসে খেসারত দাবি করছে, ঠিক সেইভাবে ঐ য়ু সিয়াঙও এসে দাবি করছে টাকা। তারও ঐ একই বক্তব্য! সেটা যে কী, তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন?

—না, পারছি না। সেটা কী?

—তার প্রতিও নাকি জগদানন্দবাবু অন্যায় করেছেন। সেও ঐ একই রকম প্রমাণ দাখিল করে খেসারত দাবি করেছে।

—হতে পারে। তার সঙ্গে আমার মক্কেলের সম্পর্কটা কী? সে তো অন্য একটা কেস?

—না, কেস একটাই। তা যাক। আপনি যেমন আপনার মক্কেলের স্বার্থ দেখছেন, আমিও তেমনি আমার মক্কেলের স্বার্থ দেখছি। তাই বলতে চাই, উইলটা অপনার মক্কেলের হেপাজতে থাকার সময়—এবং আমার মক্কেল য়ু সিয়াঙের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটার ফয়সালা করার আগে যদি আমার মক্কেলের কিছু ভালমন্দ হয়ে যায় তবে তার জন্য আপনার মক্কেল পুরোপুরি দায়ী থাকবেন! বুঝেছেন?

বিশ্বম্ভর চোখ থেকে চশমাটা খুলে তার কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, আজ্ঞে না, বুঝিনি। 'ভালমন্দ' বলতে কী মীন করেছেন?

—আই মীন অ্যান অ্যাটেম্পট টু মার্ডার! খুন! এবার বুঝলেন? এস কৌশিক!

উঠে পড়লেন বাসুসাহেব। ঘরের কেউই তখনও স্বাভাবিকতা ফিরে পায়নি।

পাঁচ

সোমবার সকাল আটটার সময় কৌশিককে ফোন করল জয়দীপ। ছেলেটা খুবই তুখোড়। গোয়েন্দাগিরির কাজটা সে ভালই করছে। তার খবর—গতকাল রাত নয়টার সময় মহেন্দ্র পার্ক হোটেলে এসেছিল। আটত্রিশ নম্বর ঘরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ষড়যন্ত্রকারীরা কী আলোচনা করেছে তা সে জানে না; কিন্তু রাত দশটা দশে মহেন্দ্র হোটেল ছেড়ে চলে যায়। য়ু সিয়াঙ তখন নিচের ডাইনিং রুমে গিয়ে নৈশ আহার সারে। আহারান্তে য়ু সিয়াঙ নিজের ঘরে ফিরে আসে, মালপত্র বেঁধে-ছেঁদে চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়!

কৌশিক টেলিফোনে বলেছিল, সে কী! ওকে এত বড় ক'লকাতা শহরে বেপাত্তা হতে দিলেন?

জয়দীপ বলল, আমি অত কাঁচা ছেলে নই। ও যদি ট্যাক্সি নিত তবে ওকে ফলো করতাম; কিন্তু লোকটা ট্যাক্সি ডাকেনি—হোটেলের গাড়িটাই ব্যবহার করেছিল। তাই সামান্য কিছু খরচ করে সহজে জানতে পেরে গেলাম ওকে কোথায় পৌঁছে দিয়ে এল গাড়িটা।

—কোথায় গেল ও?

—আমার থেকে বর্তমানে ফুট আষ্টেক দূরে য়ু সিয়াঙ রয়েছে।

—সে কী! কোথা থেকে ফোন করছেন আপনি?

—দমদম থেকে। ভি.আই.পি. হোটেলের একুশ নম্বর ঘর থেকে। য়ু সিয়াঙ আছে বাইশ নম্বরে। আমিও আজ সকালে পার্ক হোটেল থেকে চেক-আউট করে চলে এসেছি। এবার ঘটনাচক্রে ওর ঠিক

পাশের ঘরটাই পেয়েছি।

কৌশিক বলে, আমার মনে হয় মহেন্দ্র ওকে শাসিয়েছে কাল রাত্রে। বিদেশ বিভুই-এ যু সিয়াঙ বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেছে। ক'লকাতা শহরের খুব একটা সুনামও তো নেই বাইরের দুনিয়ায়। তাই রাতারাতি হোটেল বদলে একেবারে দমদমে গিয়ে উঠেছে। যাতে তেমন তেমন অবস্থা হলে সুট করে প্লেনে চেপে বসতে পারে।

জয়দীপ বলল, আমার কিন্তু মনে হয়, লোকটা সহজে পালাবে না। তাহলে এত খরচ করে বর্মা থেকে সে আদৌ আসত না।

—দেখা যাক।

বেলা বারোটা নাগাদ ফোন করল নীলিমা। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতেও শান্তি নেই। কাল বিকালে বাসু-সাহেব ঐ যে নাটকীয় ভঙ্গিতে 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার' কথাটা শুনিয়ে এলেন তারপর থেকেই জগদানন্দ কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। কাল রাত্রে ওঁর একেবারে ঘুম হয়নি। আজ সকালে আলমারি খুলে ওঁর একটা পুরোনো দিনের হাতিয়ার বার করেছেন। বর্মায় থাকতে সখ করে কিনেছিলেন। গজদন্তের মুঠওয়ালা একটা শৌখিন ছোরা। দেখতে শৌখিন, কাজে দড়—ব্লেডটা তীক্ষ্ণ, আট ইঞ্চি লম্বা। সেটা আর আলমারিতে তোলেননি—বালিশের নিচে রেখে দিয়েছেন। এ-ছাড়া আজ সকালে যোগানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর কী সব কথাবার্তা হয়েছে রুদ্ধদ্বার কক্ষে।

—যোগানন্দবাবুটা কে?—জানতে চেয়েছিল কৌশিক।

নীলিমা বুঝিয়ে দিয়েছিল, যোগানন্দ হচ্ছেন সম্পর্কে ওর ছোট কাকা অর্থাৎ জগদানন্দের ভাইপো—সেই যাঁকে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন উইলে। যোগানন্দ নির্বিরোধী মানুষ। বিপত্নীক—ছেলে-মেয়েও নেই। থাকার মধ্যে আছে যোগানন্দের এক শ্যালিকা-পুত্র—শ্যামল রায়। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। সেও অবিবাহিত। একটা সওদাগরি অফিসে চাকরি করে। ঐ বাড়িতেই থাকে। উপসংহারে নীলিমা বলল, দাদু আপনাকে একবার সন্ধ্যাবেলা দেখা করতে বলেছেন।

—কেন?

—কেন, তা বলেননি। তিনি মনে করেন, আমি নাবালিকা। এসব আলোচনায় আমার না থাকাই ভাল।

—কথাটা তো ঠিকই; কুমারী মেয়ে মাত্রেই বাঙালী পরিবারে নাবালিকা—

—তাই বুঝি? বয়সে কিন্তু আমি বোধহয় আপনার চেয়ে বড়!

—হতেই পারে না। কোন অবিবাহিত মেয়ে আমার চেয়ে বয়সে বড়, এটা আমি কখনই মেনে নিতে পারি না!

বিকাল পাঁচটা নাগাদ কৌশিক গিয়ে হাজিরা দিয়েছিল। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটায় ঢুকবার মুখে দেখা হয়ে গেল জয়দীপের সঙ্গে। কৌশিক বললে, এ কী! আপনি এখানে? দমদমের চিড়িয়া?

—ভয় নেই, চিড়িয়া আপনার ভাগেনি। শহর দেখতে বেরিয়েছেন।

জয়দীপ কাজের ছেলে। সে খবর রাখে যু সিয়াঙে আজ সকালে একটি টুরিস্ট বাসে সারাদিনের জন্য ক'লকাতা শহর দেখতে বেরিয়েছেন। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় টুরিস্ট বাসটা ফিরে আসবে এসপ্ল্যানেড ঈস্টে। জয়দীপ এখন সেখানেই যাচ্ছে। বাস থেকে নামামাত্র সে হারানো সুতোর খেই ফিরে পাবে এবং তারপর আবার আঠার মত সেঁটে থাকবে তার পিছনে।

কৌশিক বললে, নতুন কোনও খবর নেই?

—কিছু না। লোকটা একাই ছিল ঘরে। কোন ভিজিটার আসেনি, কোনও টেলিফোনও নয়। আমি ওর মুভমেন্ট সমস্ত লিখে যাচ্ছি আমার ডায়েরিতে।

জয়দীপ ঘড়ি দেখল। বললে, সময় হয়ে গেছে, আমি চলি।

কৌশিক বলে, চিড়িয়া দমদমে ফিরে গেলে ওখান থেকে আমাকে একটা ফোন করে জানাবেন।

—জানাব।

জয়দীপ চলে গেল। কৌশিককে নিয়ে নীলিমা দ্বিতলে উঠে এল। গৃহস্বামী বললেন, কালকে বাসু-সাহেব ঐ কথাটা বলার পর থেকেই আমার মনটা চঞ্চল হয়েছে। উনি ঠিকই বলেছেন,—ঐ মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভর না পারে এমন কাজ নেই। অথচ ওদের এখন তাড়াতেও পারছি না। মহেন্দ্র বলেছে, উইলটা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে ওরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এবং আমার জীবদ্দশায় আর বিরক্ত করতে আসবে না। জানি না, সে তার কথা রাখবে কি না; কিন্তু ঐ যু সিয়াঙ এসে পড়ায় অবস্থাটা আবার গুলিয়ে গেছে।

—যু সিয়াঙ-এর সঙ্গে আপনি কি পৃথকভাবে বোঝাপড়া করতে চান?

—এখনও মনস্থির করতে পারিনি। যোগানন্দ সেই পরামর্শই দিচ্ছিল।

—যোগানন্দবাবু! তিনি কি সব কথা জানেন?

—এখন তো দেখছি, জানে। অদ্ভুত ভাল ছেলেটা, জানলে—

জগদানন্দের কথা থেকে বোঝা গেল নির্বিরোধী মানুষ যোগানন্দ বহুদিন আগে থেকেই এ গোপন রহস্যের সন্ধান রাখেন। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এটা জানেন, দ্বিতীয় কারও সঙ্গে আলোচনা করেননি—এমনকি জগদানন্দের সঙ্গেও নয়। কী দরকার ওসব গ্লানিকর প্রসঙ্গ আলোচনা করার?—ভাবটা এই। তারপর মহেন্দ্রর আগমন, উইল প্রণয়ন সব কিছুরই খবর উনি রাখেন। একতলার ঘরটিতে বসে আপন মনে হুঁকো টানেন আর চতুর্দিকে নজর রাখেন। কাল বিকালে স্যুট-বুট পরা যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি যোগানন্দ। তবে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন লোকটা কে। আজ সকালে তিনি দ্বিতলে উঠে এসে জগদানন্দকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, কাকা কাল বিকেলে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই কি আপনার সেই রেঙ্গুনের ম্যানেজার যু সিয়াঙ?

জগদানন্দ চমকে উঠে বলেছিলেন, তুমি কেমন করে জানলে?

—আন্দাজ করছি। আমি একটা কথা বলতে এসেছি কাকা—

—বল। বস ঐ চেয়ারটায়।

যোগানন্দ বসেননি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, এবার নীলুর বিয়েটা আপনি দিয়ে দিন। শ্যামলের সঙ্গে নয়, ঐ জয়দীপ ছেলেটির সঙ্গেই। ওরা দুজনেই দুজনকে—

মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন যোগানন্দ। বৃদ্ধ বলেছিলেন, কিন্তু তুমি তো এতদিন তোমার শ্যালিকাপুত্র ঐ শ্যামলের সঙ্গেই নীলুর বিয়ে দিতে চাইতে। আজ হঠাৎ তোমার মত বদলালো কেন?

—শ্যামল ছেলেটা সত্যই ভালো। কিন্তু দিনকাল পালটে গেছে। এখন আর বাপ-মা-কাকা-জেঠাদের পছন্দ অনুসারে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে না। জয়দীপ আর নীলিমা যখন পরস্পরকে—

এবারও সঙ্কোচে থেমে গিয়েছিলেন উনি।

জগদানন্দ বলেন, ঠিক আছে। তোমার কথাটা মনে রাখব। আপাতত একটা ঝামেলায় পড়েছি, সেটা মিটুক।

—সে সম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমারও বয়স ষাটের কোঠায়। একা মানুষ, কতদিনই বা বাঁচব? আপনি কেন শুধু শুধু আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, কাকা?

জগদানন্দ অবাক হয়ে যান। কী বলবেন ভেবে পান না।

—তার চেয়ে ঐ পঞ্চাশ হাজারের ভিতর থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার দিয়ে যু সিয়াঙ-এর সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

জগদানন্দ চমকে উঠে বলেন, তার মানে? কী মেটাবো?

মাথা নিচু করে যোগানন্দ বলেন, কাকা, এ বাড়িতে আপনার ছেলের মতই মানুষ হয়েছি। আমি তো সবই জানি। আপনি আমাকে যা দিয়ে যাবেন, আমি মরে গেলে ঐ নীলুই আবার তা পাবে।অথচ আজ

যদি সব জানাজানি হয়ে যায় হয়তো জয়দীপ বেঁকে দাঁড়াবে। হয়তো নীলু মনের দুঃখে...না-কাকা, আপনি আর আপত্তি করবেন না—

সব কথা শুনে কৌশিক জানতে চাইল কেন তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। জগদানন্দ বললেন, যে, গতকাল বাসু-সাহেব যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তারপর থেকেই তিনি কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। গতকাল তাঁর তিলমাত্র ঘুম হয়নি। জগদানন্দ অনুরোধ করলেন, মহেন্দ্র যতদিন না বিদায় নিচ্ছে—মানে আর দু-তিন দিন হতে পারে—ততদিন কৌশিক বরং এ বাড়িতেই রাত্রিবাস করুক। কাল রেজিস্ট্রেশন হবে—তারপরেই মহেন্দ্র চলে যাবে। তখনই কৌশিকের ছুটি।

কৌশিক রাজি হল। বাড়িতে ফোন করে দিল। স্থির হল, কৌশিক থাকবে দ্বিতলে—জগদানন্দের ঘরের বিপরীতে উত্তর দিকের ঘরে। সে ঘরে এতদিন ছিলেন উকিল বিশ্বম্ভরবাবু, অগত্যা তাঁকে একতলায় নেমে যেতে হল। মহেন্দ্রবাবু তাঁর উকিলের কাছাকাছি থাকতে চান, তাই তিনিও দ্বিতল ছেড়ে একতলায় যোগানন্দের ঘরটি দখল করতে চাইলেন। যোগানন্দের তাতে আপত্তি নেই। ক'রাত্রের জন্য যোগানন্দ দ্বিতলের উত্তর-পশ্চিমের ঘরখানি দখল করলেন, ঠিক সিঁড়ির পাশেই। জগদানন্দ, নীলিমা অথবা শ্যামলের শয়নকক্ষের কোনও পরিবর্তন হল না।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে সবাই শুতে যাবে তখন টেলিফোনটা বেজে উঠল। নীলিমা ফোন ধরল। দমদম থেকে জয়দীপ ফোন করছে। সে সঙ্কেতে জানালো পাখি আবার খাঁচায় ফিরে এসেছে। তার ঘরের আলো এইমাত্র নিবল। পর মুহূর্তেই সে ফোন রেখে দিল।

শুতে যাবার আগে কৌশিক সারা বাড়িটা একবার টহল দিয়ে এল। যে যার ঘরে চলে গেছেন। একতলায় মহেন্দ্র এবং বিশ্বম্ভর শুয়ে পড়েছেন। ঘরের বাতি নেবানো। শ্যামল একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ছে। দোতলায় জগদানন্দের ঘরে আলো জ্বলছে। কৌশিক এসে দরজায় টোকা দিল। জগদানন্দ ভিতর থেকে 'ল্যাচ-কী' খুলে দিলেন; কৌশিককে দেখে বললেন, আবার কী হল?

—কিছু না। শুতে যাবার আগে দেখে যাচ্ছি। আপনি কি রাত্রে ভিতর থেকে ঘর বন্ধ করে রাখেন?

—এতদিন রাখতাম না। ইদানীং রাখছি।

কৌশিক লক্ষ্য করে দেখে জগদানন্দের খাটের পাশে রাখা একটি সাইড-টেবিল। তার উপর রাখা আছে ঢাকা দেওয়া এক গ্লাস জল, একটি টর্চ, সিগারেট দেশলাই, ছাইদান। খান-কয়েক বই, একটি টেবিল ল্যাম্প এবং একটি সুদর্শন খাপে ঢাকা হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা ছোরা। কৌশিক বলল, আজ আর বইটই পড়বেন না, কাল ঘুম হয়নি, শুয়ে পড়ুন।

শুভরাত্রি জানিয়ে সে বিদায় নিল। 'ক্লক' করে ল্যাচ-কী বন্ধ হবার শব্দ হল।

বারান্দায় দেখা হয়ে হল নীলিমার সঙ্গে। মেয়েটি জানতে চায় বেড-টি খাবার অভ্যাস আছে নাকি?

—পেলে খুশি হই। না পেলেও চলে যায়।

—কটা নাগাদ পেলে খুশি হন?

—কাউকে বিরক্ত না করে যদি হয়, তো ধরুন সকাল ছ'টায়।

—কেউ বিরক্ত হবে না, কারণ আমি ঐ সময় এক কাপ নিজেই বানিয়ে খাই।

ভোররাত্রে কৌশিকের ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। স্বতঃই নজর পড়ল ঘড়িটার দিকে। ভোর পৌনে পাঁচটা। সবে সকাল হচ্ছে। এত সকালে তো সে বেড-টি খেতে চায়নি। কৌশিক উঠে পড়ে। স্লিপারটা পায়ে গলায়। দরজাটা খুলে দিতেই দেখে আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে নীলিমা।

—কী ব্যাপার? এত ভোরে বেড-টি?

—আপনি একবার বাইরে আসুন তো—

ওর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের আভাস। কৌশিক তৎক্ষণাৎ বার হয়ে আসে। সামনে জগদানন্দের ঘরের দরজাটা খোলা। নীলিমা সে ঘরে প্রবেশ করে। পিছন পিছন কৌশিক। হাত বাড়িয়ে নীলিমা সুইচটা

দোতলা

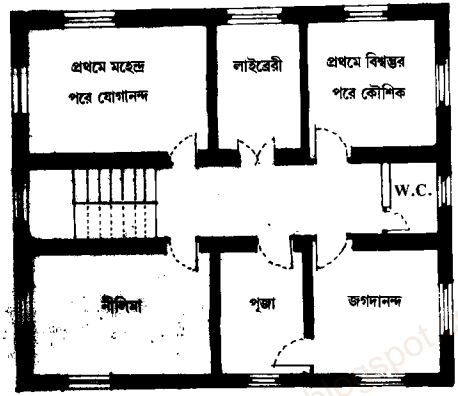

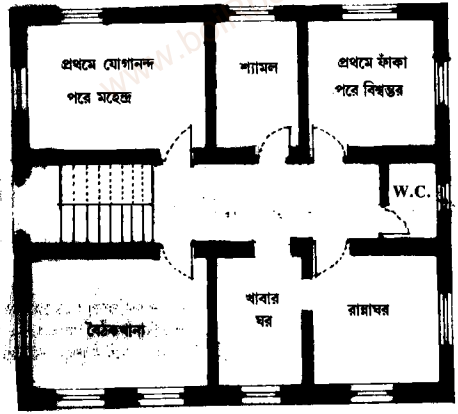

একতলা

www.boiRboi.blogspot.com

জ্বেলে দেয়। খাটের উপর জগদানন্দ নেই। বিছানাটার চাদর কোঁচকানো। নীলিমা একটা আঙুল নির্দেশ করে কী-যেন দেখায়। বলে, এর মানে কী?

ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কৌশিক। প্রশ্ন করে, আপনার দাদু কোথায়?

—দাদু পুজোর ঘরে—পুজো করছেন। কিন্তু এটা কী করে হল?

এক পা এগিয়ে নীলিমা দর্শনীয় বস্তুটার কাছে সরে আসে। এতক্ষণে নজর হয় কৌশিকের। টেবিলের উপর কাল রাত্রে যে কয়টি জিনিস দেখেছিল তার একটা নেই। চামড়ার খাপটা আছে, কিন্তু খাপ থেকে গজদন্তের মুঠটা বার হয়ে নেই; অর্থাৎ ছোরাটা অন্তর্হিত!

ভ্রূকুঞ্চিত করে কৌশিক একটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। দ্রুত ঘরের চারদিক দেখে নেয়। তারপর বলে, দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছেন?

—না। উনি খুব ভোরে ওঠেন। রোজ এই সময় পুজোয় বসেন। আজও তাই বসেছেন। কিন্তু ওঁর ঘরে ঢুকে হঠাৎ এটা নজরে পড়ল আমার। তাই আপনাকে ডেকে তুলেছি।

—হয় তো ঘর খালি রেখে পুজোর ঘরে যাবার সময় উনি ওটা তুলে রেখে গেছেন।

—সে-ক্ষেত্রে খাপ সমেত ওটা তুলে রাখাই স্বাভাবিক হত না কি?

যুক্তিপূর্ণ কথা। কৌশিক বললে, চলুন, প্রথমেই ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

—পুজোর সময় কেউ ওঁকে ডাকলে উনি বিরক্ত হন।

কৌশিক সে কথায় কর্ণপাত করে না। পুজোর ঘরে গিয়ে হাজির হল ওরা। বৃদ্ধ বিরক্ত হলেন যতটা তার চেয়েবিস্মিত হলেন বেশি। বললেন, তাই নাকি? খাপটা আছে অথচ ছোরাটা নেই? কই চলতো দেখি।

এ ঘরে আবার ফিরে এলেন ওঁরা। বৃদ্ধ বললেন, তাজ্জব কাণ্ড। আমি তো সকালে ওটাতে হাত দিইনি। সকালে ওদিকে নজরই পড়েনি আমার!

কৌশিক বললে, তা কেমন করে হয়? রাত্রে আপনি যখন ঘরটা বন্ধ করেন তখন আমি স্বচক্ষে দেখেছি—হ্যাঁ স্পষ্ট মনে আছে আমার—হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা ছোরাটা ওখানেই ছিল। রাত্রে ঘর তালাবন্ধ ছিল ভিতর থেকে! আপনি কখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন?

—ঘড়ি দেখিনি! আধঘণ্টা খানেক আগে।

নীলিমা বললে, দাদু যখন বার হয়েছেন তখন আমি জেগে। দোতলায় তারপর আর কেউ আসেনি। এলে আমার নজরে পড়ত।

চকিতে কৌশিকের মনে হল—জগদানন্দ খুন হতে পারেন এমন একটা আশঙ্কা গতকাল করেছিলেন বাসু-সাহেব; কিন্তু উপ্টোটাও তো হতে পারে? কাল রাত্রে জগদানন্দের বদলে যদি মহেন্দ্রবাবু খুন হয়ে থাকেন? কৌশিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল জগদানন্দের দিকে। তাঁর মুখ ভাবলেশহীন। কী ভাবছেন তিনি, বোঝার উপায় নেই। স্থির হয়ে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। কৌশিক নীলিমাকে বললে, বাড়ির আর সবাই ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আমি এখনই জানতে চাই সবাই সুস্থ আছে কিনা। আপনাদের কাছে ঐ ঘরগুলোর ডুপ্লিকেট চাবি আছে?

নীলিমাও বোধ করি আন্দাজ করেছে কৌশিক কী ইঙ্গিত করছে। তার মুখটা সাদা হয়ে যায়। অস্ফুটে বলে, আপনি কী আশঙ্কা করছেন—

তাকে কথাটা শেষ করতে দেয় না কৌশিক। বলে, সে সব আলোচনা পরে। প্রত্যেকেই ঘর ভিতর থেকে বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন। আমি জানতে চাই তাঁদের কাল রাত্রে কোনও বিপদ হয়েছে কিনা। আপনাদের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে? তাহলে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিঃশব্দে ঘরগুলো দেখে আসতে পারি।

মেয়েটি অনেকটা সামলেছে। তবু সে কাতরভাবে একবার তার দাদুর দিকে তাকায়। তারপর বলে, আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবির থোকা আছে। আসুন এঘরে।

মেয়েটির পিছন পিছন কৌশিক চলে এল তার শয়নকক্ষে। নীলিমা একটা টানা-ড্রয়ার খুলল। তারপর বিহ্বল হয়ে তাকালো কৌশিকের দিকে।

—কী হল?—কৌশিক ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করে।

নীলিমার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা। তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। কথা বার হল না।

—কী হয়েছে বলুন। অমন আমতা করছেন কেন?

—চাবির থোকাটা এখানেই থাকে। সেটা নেই! চুরি গেছে!

কৌশিক দাঁতে দাঁতে চেপে বলে, অর্থাৎ যে সেটা চুরি করেছে তার কাছে কালরাত্রে সব কটা ঘরই ছিল অবারিত দ্বার—খুনীর স্বর্গ!

নীলিমা জবাব দিল না। বসে পড়ল তার খাটে।

—এবং বাড়িসুদ্ধ লোককে না জাগিয়ে আমরা কিছু জানতে পারব না।

এবারও নীলিমা জবাব দিল না। দু-হাতে মুখটা ঢেকে সে নির্বাক বসে থাকে।

জগদানন্দ কখন নিঃশব্দে উঠে এসেছেন তা ওরা খেয়াল করেনি। এবার দরজার কাছ থেকে তিনি বলে ওঠেন, না। আমার কাছে একটা 'মাস্টার-কী' আছে, তা দিয়ে সবকটা ঘরের দরজা খোলা যায়। তুমি সবগুলো ঘর একবার দেখে এস।

হাত বাড়িয়ে একটি চাবি তিনি কৌশিককে দেন। এগিয়ে এসে নীরবে নাতনির মাথায় একটি হাত রাখেন। সে স্নেহস্পর্শে মনোবল ফিরে পায় মেয়েটি। বলে, চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। দাদু তুমি এখানেই অপেক্ষা কর।

তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। কৌশিক আর নীলিমা বার হল তদন্ত করতে। কৌশিক বললে, প্রথমেই মহেন্দ্রবাবুর ঘর। তিনিই—

হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরে নীলিমা। বলে, কী বলছেন! তার মানে, দাদু? ঐ আশি বছরের বৃদ্ধ—

কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে। চাপা আক্রোশে বলে, কেন? শুধু আশি বছরের বৃদ্ধই বা কেন? তাঁর জোয়ান নাতনিটি কি ছিলেন না এ বাড়িতে?

নীলিমার মুঠিটা আল্‌গা হয়ে যায়। আর কোনও কথা সে বলে না।

ওরা নেমে আসে একতলায়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমেই মহেন্দ্রের ঘরের দরজা। নিঃশব্দে কৌশিক মাস্টার কী-টা লাগিয়ে দেয় চাবির ফুটোয়। ক্লিক করে শব্দ হল। সন্তর্পণে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কৌশিক। দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রইল নীলিমা—একটা হাত মুখে চাপা দিয়ে—যেন একটা অনিবার্য আর্তনাদকে এখনই রুখতে হবে তাকে।

তড়াক করে খাটের উপর উঠে বসল মহেন্দ্র। বলল, এর মানে কী?

ধড়ে প্রাণ এল কৌশিকের। বলল, বেড-টি খাবেন? চা হচ্ছে!

মহেন্দ্র প্রথমেই তোশকের নিচে হাত চালিয়ে কি যেন দেখে নিল। তারপর বললে, ইয়ার্কি করার জায়গা পাননি? চা খাবার জন্যে ডাকতে চান তো দরজায় নক করেননি কেন? দরজা খুললেন কী করে?

কৌশিক বললে, খামকা চেঁচামেচি করবেন না। চা হয়ে গেছে, মুখে চোখে জল দিয়ে নিন।

বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, কুইক, বিশ্বম্ভরের উকিল কোন্ ঘরে শুয়েছিল?

নীলিমা আবার কৌশিকের হাতটা ধরে। অস্ফুটে বলে, বিশ্বম্ভরবাবু নয়, চলুন, বরং ছোটকাকুর ঘরটা দেখে আসি।

—ছোটকাকু?

—যোগানন্দ। উইল অনুযায়ী যাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার কথা।

খণ্ড-মুহূর্তের জন্য কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর বলে, ঠিক কথা! নেক্সট প্রবাবিলিটি

বোধহয়—যোগানন্দ!

সিঁড়ি বেয়ে ওরা উপরে উঠে আসে। ততক্ষণে ওদিককার ঘর খুলে বিশ্বম্ভর উকিলও বার হয়ে পড়েছেন করিডোরে। সম্ভবতঃ মহেন্দ্রের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে গিয়েছে তাঁর। মহেন্দ্রও দরজা খুলে উঁকি দিল।

কৌশিক আর নীলিমা উঠে এল দোতলায়। পিছন পিছন বিশ্বম্ভর আর মহেন্দ্র। তারা দুজনে নিম্নস্বরে কী যেন বলাবলি করছে। কৌশিক যোগানন্দের ঘরের দরজায় করাঘাত করল। কেউ সাড়া দিল না। সেই অবসরে বিশ্বম্ভর আর মহেন্দ্র এসে উপস্থিত হয়েছেন ঐ বৃদ্ধ দ্বারের সামনে। জগদানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের দ্বারপথে।

কৌশিক 'মাস্টার-কী' দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। চারজনেই হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করল ঘরে। পরমুহূর্তেই নীলিমার আর্ত-চীৎকারে চকিত হয়ে উঠল উষা মুহূর্তটি। কৌশিক ধমক দিয়ে ওঠে, চুপ করুন! কেউ কোন কিছু স্পর্শ করবেন না। বাইরে, বাইরে আসুন সবাই—

বিশ্বম্ভর দৃশ্যটা পিছন থেকে দেখতে পায়নি। বললে, কেন মশাই? আপনি হুকুম চালাবার কে?

কৌশিক বললে, আপনি একা এ ঘরে থাকতে চান থাকুন; কিন্তু পুলিস এসে পড়ার আগে আমি ঘরটা তালাবন্ধ রাখতে চাই। বাইরে আসুন মিস্ সেন।

নীলিমা আঁচলে মুখ ঢেকে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন জগদানন্দ। তাঁর পাঁজরসর্বস্ব বুকে তিনি টেনে নিলেন নাতনিকে। কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

মহেন্দ্রবাবু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ঘরের ভিতর। তাকে পিছন থেকে টেনে ধরল বিশ্বম্ভর। বললে, খবর্দার! কোন কিছু ছোঁবেন না। বাইরে বেরিয়ে আসুন। ওরা আমাদের জড়াতে চাইছে। এখনই পুলিসে খবর দেওয়া উচিত।

হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভর।

জগদানন্দ নাতনিকে বুকে জড়িয়ে দ্বার পথে দাঁড়িয়েছিলেন। এতক্ষণ তাঁর নজর পড়ল ঘরের ভিতর। খাটের উপর উবুড় হয়ে শুয়ে আছে তাঁর নির্বিরোধী ভাইপো—যোগানন্দ। তার পিঠের উপর উঁচু হয়ে জেগে আছে একটা শৌখিন ছোরার মুঠ—চমৎকার হাতির দাঁতের কাজ করা। রক্তে ভেসে গেছে খাট আর মেঝে।

পাশের ঘর থেকে তখন শোনা যাচ্ছে কৌশিকের কণ্ঠস্বর, ইস দ্যাট ডবল টু ডবল ওয়ান ডবল-থ্রি? লালবাজার?...পুট মি টু হোমিসাইড য়ুনিট প্লীজ? হ্যাঁ, খুন হয়েছে!

ছয়

মাত্র সাতদিনে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে মামলাটা ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেল এবং আসামীকে তিনি দায়রায় সোপর্দ করলেন। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে কেস উঠল দায়রা জজের আদালতে। এতটা তাড়াতাড়ি সচরাচর হয় না। এ ক্ষেত্রে সেটা করতে হয়েছে রাজনৈতিক চাপে। মামলায় একজন সাক্ষী আছেন যিনি বিদেশের নাগরিক। তিনি সমন পেয়েছেন। বার্মিজ কনসুলেট ভারত সরকারকে জানিয়েছেন যে, হয় অবিলম্বে জবানবন্দি নিয়ে তাঁদের নাগরিককে দেশে ফিরে যেতে দিতে হবে অথবা তাঁর ক'লকাতায় অবস্থানের ব্যয়ভার ও খেসারত ভারত সরকারকে বহন করতে হবে। ফলে এই তাড়াহুড়ো।

তদন্তকারী অফিসার মোটামুটি নিঃসন্দেহ হয়েছেন অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে। পুলিসের বক্তব্য

অনুযায়ী কেসটা এই—

আসামী জগদানন্দের ভাইপো যোগানন্দ কোন সূত্রে একটি পারিবারিক গোপন রহস্য জেনে ফেলেন। সেই রহস্যটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জগদানন্দকে শোষণ করছেন। জগদানন্দ ঐ উপার্জনহীন ভাইপোটিকে এতদিন খোরপোষ দিয়ে যাচ্ছিলেন বিনা প্রতিবাদে। সম্প্রতি যোগানন্দ চাপ সৃষ্টি করায় বৃদ্ধ একটি উইল করে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাবার লোভ দেখান। উইলটি লেখা হয় এবং সেটা পাওয়াও গেছে। রেজিস্টার্ড উইল নয়। তারপর ঘটনার পূর্বদিন রবিবার, যোগানন্দ এবং তাঁর কাকা জগদানন্দ দীর্ঘসময় রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করেন। এই সময় নাকি জগদানন্দ বলে উঠেছিলেন, এরা ভেবেছে কী? সব কটাকে খুন করব আমি! তারপর ঘটনার দিন সকালে জগদানন্দ তাঁর আলমারি খুলে একটি ছোরা বার করেন। ঘটনার রাত্রে যোগানন্দ ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে ঘরে শুয়েছিলেন—কিন্তু জগদানন্দের কাছে একটি 'মাস্টার-কী' ছিল, যা দিয়ে সব ঘর বাইরে থেকে খোলা যায়।

পুলিসের মতে মৃত্যুর সময় বারোটা থেকে সোয়া বারোটা। সময়টা নির্ধারণ করা হচ্ছে শ্যামলের জবানবন্দি থেকে। শ্যামল রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত জেগে বই পড়েছে। তারপর সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে; কিন্তু তার ঘুম আসেনি। ঠিক বারোটার সময় সে বাইরের বারান্দায় কার পদশব্দ শুনতে পায়। একতলার কোন বাসিন্দা বাথরুমে যাচ্ছে মনে করে সে আর খেয়াল করেনি। পরে অর্থাৎ মিনিটদশেক পরে তার মনে হল পদশব্দটা সিঁড়িতে হচ্ছে। এতে সে কৌতূহলী হয়ে পড়ে। কারণ, দোতলায় পৃথক বাথরুম আছে। সে প্রয়োজনে মধ্য রাত্রে কাউকে উপর থেকে নিচে অথবা নিচে থেকে উপরে উঠতে হয় না। তাই শ্যামল উঠে পড়ে। ঘরের আলো জ্বালে না; জানলা দিয়ে দেখতে চায়। চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া একজনকে সে সিঁড়ির মুখে দেখতে পায়। লোকটা তখন উপর থেকে নেমে আসছে। লোকটা মাঝারি উচ্চতার, তার মুখটা সে দেখেনি। শ্যামল সাহস করে দরজা খোলেনি। আবার শুয়ে পড়ার আগে ঘড়িটা দেখেছিল। রাত তখন সওয়া বারোটা।

অটোপ্সি-সার্জেনের মতেও মৃত্যুর সময় রাত সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা।

জগদানন্দের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে। অবশ্য ওঁর সামাজিক মর্যাদা এবং বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য আসামীপক্ষের ডিফেন্স কাউন্সেল পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল।

বাসু-সাহেব তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়েছেন যথারীতি। তাতে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি নূতন ক্লু, যার সন্ধান তাঁকে দিয়েছে জয়দীপ। বাসু-সাহেব ঐ সূত্রটি যাচাই করে দেখে বুঝেছেন খবরটা মিথ্যা নয়।

জয়দীপ ঘটনার দিন সকাল সাতটা নাগাদ দমদমের হেটেল থেকে ফোন করেছিল। তখন এ বাড়িতে ইন্সপেক্টার তদন্ত করছেন। টেলিফোন ধরেছিল কৌশিক। জয়দীপ বলেছিল, একটা জরুরি খবর আছে, শুনুন—

কৌশিক বলেছিল, যত জরুরি খবরই হোক আপনি এখনই চলে আসুন। এখানে একট বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে, কাল রাত্রে।

—কাল রাত্রে! কী ব্যাপার?

—আপনি চলে আসুন—লাইন কেটে দিয়েছিল কৌশিক।

জয়দীপ বেল্লা নটা নাগাদ এসে পৌঁছায়। তখন পুলিস চলে গেছে, কিন্তু বাসু-সাহেব এসেছেন। জয়দীপ বলে, আগের রাত্রে দমদম এলাকায় লোডশেডিং হয়েছিল। হোটেলে এয়ার কন্ডিশনার বা ফ্যান চলেনি। রাত ঠিক বারোটা চল্লিশ মিনিটে পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠায় জয়দীপের ঘুম ভেঙে যায়। বার তিনেক টেলিফোনটা বাজার পরেই শোনা যায় যু সিয়াঙের ভারি কণ্ঠস্বর।

—হ্যালো!

ইতিমধ্যে জয়দীপ টটটা জেলেছে। ডায়েরিটা খুলে তৈরী হয়ে নিয়েছে। স্তব্ধ রাত্রি, গরমের জন্য জানলা খোলা। য়ু সিয়াঙের প্রত্যেকটি কথা সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে ঠিক পাশের ঘর থেকে এবং তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলেছে। আদ্যোপান্ত কথা সে বলেছে ইংরেজিতে। তার আক্ষরিক অনুবাদ নিম্নোক্তরূপ:

"হ্যালো!...হ্যাঁ কথা বলছি...কে?...আমি চিনি না আপনাকে, কী চান?...এমন মাঝ রাত্রে বিরক্ত করছেন কেন?...হ্যাঁ চিনি, মহেন্দ্রবাবুকে চিনি। আপনি তাঁর কে?...কী? জোরে বলুন!...ও বুঝেছি, সলিসিটার! বলুন...আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। পথের কাঁটা দুর হয়েছে মানে কি?...টেলিফোনে যদি বলা না যায় তবে মাঝ রাতে বিরক্ত করছেন কেন?...আচ্ছা বেশ, আমি সকালে অপেক্ষা করব।...সকাল বারোটা পর্যন্ত। শুভরাত্রি।

বাসু তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েছিলেন। এখানকার সব কাজ ফেলে রেখে সোজা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দমদমের হোটেলে। ওঁর কার্ড দেখে য়ু সিয়াঙ বললে, কাল মাঝ রাত্রে আপনিই ফোন করেছিলেন?

বাসু হ্যাঁ-না এড়িয়ে বললেন, মাঝ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরতে হলে সকলেরই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

য়ু সিয়াঙ বলেন, থাক, কী বলতে চান বলুন? মহেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে আনলেন না কেন?

বাসু বললেন, মহেন্দ্রবাবুর আসা এখন সম্ভবপর নয়—কিন্তু কালকের সেই কথাটা মনে আছে নিশ্চয়। আপনাদের দুজনেরই পথের কাঁটা দুর হয়েছে।

—পথের কাঁটা! কী বলছেন আপনি। কে সে?

—যোগানন্দ সেন। যাকে জগদানন্দ তাঁর উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কাল রাত্রে তিনি খুন হয়েছেন!

'খুন' কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়াল য়ু সিয়াঙ। বলল, খুন হয়েছেন! বলেন কী! কে খুন করেছে?

বাসু হেসে বলেন, সেটা আর আমার মুখ দিয়ে নাই বা বলালেন।

য়ু সিয়াঙ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল বাসু-সাহেবের দিকে। তারপর বললে, লুক হিয়ার স্যার! ব্যাপারটা একটা মার্ডার কেস। আপনাকে আমি চিনি না। আপনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার কি না তাও আমি জানি না। আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন যে, আপনি সত্যিই—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, আমার ভিজিটিং কার্ড আপনি দেখেছেন, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও পরখ করে দেখতে পারেন।—পকেট থেকে বের করেন সেটা।

য়ু সিয়াঙ বলে, তাতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, আপনি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল; কিন্তু আপনি যে মহেন্দ্রবাবুর শত্রুপক্ষের ব্যারিস্টার নন তা আমি বুঝব কী করে?

বাসু-সাহেব বাড়িয়ে ধরেন একখানি কাগজ। একটু আগে জয়দীপ যা লিখে দিয়েছে। বলেন, কাল রাত্রি বারোটা চল্লিশ মিনিটে আপনি টেলিফোনে এই কটা কথাই বলেননি কি? মিলিয়ে দেখে নিন।

য়ু সিয়াঙ অত্যন্ত সাবধানী। কাগজটা পড়ে বললে, হ্যাঁ বলেছি। কিন্তু তাতেও প্রমাণ হয় না যে, আপনি মহেন্দ্রবাবুর উকিল। এটুকু প্রমাণ হয় যে, গতকাল রাত্রে আপনিই আমাকে ফোন করেছিলেন। আপনি প্রমাণ দিন আপনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার।

বাসু-সাহেব নীরবে উঠে দাঁড়ান। বলেন, আমি একবারও বলিনি যে, আমি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার। আচ্ছা নমস্কার!

—তার মানে?—হতচকিত য়ু সিয়াঙ অবাক হয়ে যায়।

কোর্টে মামলা ওঠার আগের দিন বাসু-সাহেব জনান্তিকে ডেকে পাঠালেন নীলিমা আর জয়দীপকে। বললেন, তোমরা দুজনে ব'স। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

জয়দীপ আর নীলিমা বসল পাশাপাশি।

—তোমরা জান যে, পুলিসের মতে যোগানন্দ একটা গোপন পারিবারিক রহস্য অবলম্বন করে ব্ল্যাকমেল করছিলেন জগদানন্দকে—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে ওঠে, কিন্তু সেটা তো একেবারে মিথ্যা।

—যোগানন্দবাবুর ব্ল্যাকমেল করাটা মিথ্যা; কিন্তু পারিবারিক রহস্যটার অস্তিত্ব মিথ্যা নয়। বস্তুতঃ সেই রহস্য নিয়ে মহেন্দ্র এবং য়ু সিয়াঙ ওঁকে ব্ল্যাকমেলিং করছিল। কেন, তোমরা জান না?

নীলিমা বললে, জানি। কিন্তু রহস্যটা কী, তা জানি না। আপনি জেনেছেন?

—জেনেছি। সে কথা কোর্টে অনিবার্যভবে উঠবে। তাই আগেভাগেই তা তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাইছি।

—বলুন?—নীলিমা উৎকর্ণ।

বাসু একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, বলছি; কিন্তু তার আগে মনটা প্রস্তুত কর নীলিমা। খবরটা তোমার পক্ষে শকিং! একটা প্রচণ্ড আঘাত তুমি পাবে—উপায় নেই—এ আঘাত সইবার মত মনের জোর তোমার আছে—আমি বিশ্বাস করি।

মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, বলুন আপনি। আমি প্রস্তুত! দাদু কাউকে খুন করেছিলেন?

—না, খুন নয়। তাছাড়া অপরাধটা তিনি করেননি।

—তিনি করেননি? তবে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে কী করে ওরা?

—ঐ যে বললাম। পারিবারিক কলঙ্ক! ধর তোমার বাবার নামে, অথবা মায়ের নামে কোন কথা। যেটা গোপন রাখতে চান জগদানন্দ।

ভ্রূ-দুটি কুঁচকে ওঠে নীলিমার। বলে, প্লীজ, যা বলবার এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলুন আপনি।

—তোমার বাবার সঙ্গে তোমার মায়ের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তার আগেই তুমি এসে আশ্রয় নিয়েছিলে তোমার মায়ের দেহে।

মেয়েটি একেবারে পাথর হয়ে যায়।

জয়দীপ চীৎকার করে ওঠে, আমি বিশ্বাস করি না! বাজে কথা।

নীলিমার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। অস্ফুটস্বরে বলে, তবে কে আমার বাবা?

—আমি জানি না নীলিমা। আমরা কেউই জানি না! তোমার দাদুও নয়!

হঠাৎ উঠে পড়ে মেয়েটি। দ্রুত পায়ে ঢুকে যায় বাথরুমে। সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। জয়দীপ স্তব্ধ বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়। বাসু বলেন, ইয়ং ম্যান! এজন্য যদি নীলিমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে চাও তাহলে এই তোমার সুযোগ। নিঃশব্দে চলে যাও। এতবড় আঘাতটা যখন সয়েছে, তখন তোমার দেওয়া আঘাতটাও ও সইতে পারবে।

জয়দীপ বসে পড়ল চেয়ারে। দৃঢ়স্বরে বললে, মিস্টার বাসু, আপনাকে জানাবার সময় হয়েছে—আমরা বিবাহিত! নীলিমা আমার স্ত্রী।

এবার চমকে ওঠার পালা বাসু-সাহেবের। বলেন, মানে! কবে থেকে?

—দাদু যেদিন উইল করলেন তার পর দিন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আমার পরিচিত। বিনা নোটিসে রাতারাতি বিয়ে দিতে তিনি আপত্তি করেননি!

বাসু-সাহেব তাঁর হাতটা বাড়িয়ে জয়দীপের বলিষ্ঠ হাতখানা টেনে নেন। বলেন, মাই কন্‌গ্র্যাচুলেসন্স!

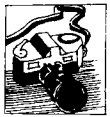

সাত

—আদালত যদি অনুমতি করেন তাহলে বাদীপক্ষ একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে এই মামলার উদ্বোধন করতে চান। বাদীপক্ষ আশা রাখেন যে, তাঁরা প্রমাণ করবেন এই মামলার আসামী বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী জগদানন্দ সেন একটি পারিবারিক রহস্য উদ্ঘাটনের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাইপো ব্ল্যাকমেলার যোগানন্দকে স্বহস্তে হত্যা করেন। আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব যে, এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল রাত বারোটা থেকে সওয়া বারোটার মধ্যে। যখন নিহত যোগানন্দ জগদানন্দের আশ্রয়েই নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। আসামীর বয়স এবং মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে এক্ষেত্রে লঘু দণ্ডদান করার প্রশ্ন ওঠে না, যেহেতু হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এ হত্যাকাণ্ড করা হয়নি—বরং মৃত যোগানন্দকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোভ দেখিয়ে নিশ্চিন্ত করে, তাকে ঘটনার রাত্রে একতলার বদলে দ্বিতলে নিয়ে এসে যেভাবে আসামী সুপরিকল্পিতভাবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেন, তাতে তাঁকে চরমতম দণ্ড দিয়ে মাননীয় বিচারক এ আদালতের মর্যাদা রক্ষা করবেন বাদীপক্ষ এমনই আশা রাখেন।

সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতি আসন গ্রহণ করলেন। আদালতে জনসমাগম বেশ হয়েছে। আসামীর কাঠগড়ায় একটি চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ জগদানন্দ। আসামীর বার্ধক্যের কথা বিবেচনা করে বিচারক এটুকু সৌজন্য দেখিয়েছেন। আসামীর মূর্তি ভাবলেশহীন। তিনি কী ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে না।

বিচারক সদানন্দ ভাদুড়ী এবার প্রতিবাদীদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা কি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান?

সচরাচর বাসু-সাহেব প্রারম্ভিক ভাষণ দেওয়ার বিপক্ষে। আজ কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আদালত যখন অনুমতি করছেন তখন প্রতিবাদীর তরফে একটি মাত্র কথাই আমরা বলব: আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব—এ হত্যার সঙ্গে আসামীর কোনও সম্পর্ক নেই। কে আসামীর স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করেছে তা জানবার জন্য তিনি আমাদের চেয়েও উৎসুক। আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব—মৃত যোগানন্দ ব্ল্যাকমেলিং করেননি কোনদিনই এবং তাঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না আসামীর তরফে। থ্যাঙ্ক মি লর্ড। বাদীপক্ষ এবার তাঁদের সাক্ষীদের ডাকতে পারেন।

বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী অটোপ্সি-সার্জেন। তিনি মৃত্যুর কারণ ও সময় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যোগানন্দের মৃত্যু হয়েছে রাত সাড়ে এগারোটার পরে এবং সাড়ে বারোটার আগে। জগদানন্দের নামাঙ্কিত ছোরাটিকে তিনি সনাক্ত করলেন।

বাসু-সাহেব তাঁকে আদৌ ক্রস্-এগজামিন করলেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষী ইনভেস্টিগেশান অফিসার ইন্সপেক্টার মণীশ বর্মণ। সে তার সাক্ষ্যে ঘটনার দিন সকালে এসে যা যা দেখেছে তার বর্ণনা দিল। প্রতিটি লোকের প্রাথমিক জবানবন্দি যা লিখে নিয়েছে তা পড়ে শোনালো। মহেন্দ্রবাবু, বিশ্বম্ভরবাবু, শ্যামল এবং নীলিমার প্রাথমিক এজাহার। কৌশিকের নাম উল্লেখ করল না। তারপর দমদমে ভি. আই. পি. হোটেলের বাসিন্দা য়ু সিয়াঙ-এর জবানবন্দি যা নিয়েছে তাও পড়ে শোনালো। মাইতি ঐ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে মিঃ যু সিয়াঙ কি স্বীকার করেছিলেন যে, ঘটনার দিন সকাল দশটার সময় বর্তমান মামলায় বাদীপক্ষের কাউন্সেল মিঃ পি. কে. বাসু দেখা করেন?

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান: অবজেকশন য়োর অনার! বর্তমান মামলার সঙ্গে এ প্রশ্ন সম্পর্ক-বিমুক্ত।

মাইতি একটি বাও করে বলেন, মি লর্ড, এ প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা আমার পরবর্তী প্রশ্নেই উদ্ঘাটিত হবে—আই অ্যাশিয়োর য়ু!

—অবজেকশান ওভারুলড!

মণীশ বর্মন বলেন, হ্যাঁ, স্বীকার করেছিলেন।

—মিস্টার য়ু সিয়াঙ কি বলেছিলেন যে, ব্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু ছদ্ম পরিচয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—

আবার উঠে দাঁড়ান বাসু: অবজেকশন মিঃ লর্ড! বর্তমান সাক্ষীর পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব হেয়ার-সে। আসামীর অনুপস্থিতিতে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর সঙ্গে মিস্টার য়ু সিয়াঙ-এর কী কথোপকথন হয় বর্তমান সাক্ষীর কাছ থেকে তার থার্ডহ্যান্ড রিপোর্ট এ মামলায় গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়।

—অবজেকশান সাস্টেইনড্!

মাইতি হেসে বলেন, ঠিক আছে। এ ক্ষেত্রে মামলার পারম্পর্য রক্ষার্থে আমি সাময়িকভাবে বর্তমান সাক্ষীকে অপসারণ করে মিস্টার য়ু সিয়াঙকে সাক্ষ্য দিতে ডাকতে চাই।

বাসু বলেন, আমাদের আপত্তি নেই। সে-ক্ষেত্রে বর্তমান সাক্ষীকে ক্রস্ করবার অধিকারও আমরা মজুত রাখলাম।

আদালতের অনুমতি পেয়ে মিস্টার য়ু সিয়াঙ সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। মাইতি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করলেন—য়ু সিয়াঙ জগদানন্দের রেঙ্গুনস্থ অফিসের ম্যানেজার হিসাবে 1920 থেকে 1940 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকরি করেছেন। এখন তিনি রেঙ্গুনে থাকেন। দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছেন। 1940 খ্রীষ্টাব্দের আঠারই মে তারিখে তাঁর চাকরি শেষ হয়। ঐ দিন জগদানন্দের পুত্র তাঁর রেঙ্গুনস্থ যাবতীয় সম্পত্তি প্রায় একাত্তর হাজার টাকায় বিক্রয় করে দেন। এই প্রসঙ্গে মাইতি জানতে চান, সদানন্দ সেন তারপর কবে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন।

—20.5.40 তারিখে, মাবুতি জাহাজ যোগে।

—ঐ সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও কি প্রত্যাবর্তন করেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি জানেন, সদানন্দ কোন্ তারিখে বিবাহিত হন?

—হ্যাঁ জানি। বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। 13.5.40 তারিখে।

—সদানন্দ কত তারিখে রেঙ্গুনে পদার্পণ করেন?

—10.4.40 তারিখে। আমি জাহাজ-ঘাটায় এসেছিলাম তাঁকে রিসিভ করতে।

—এর আগে সাবালক হবার পর ঐ সদানন্দ সেন কি কখনও বর্মায় এসেছিলেন?

বাসু-সাহেব আপত্তি তোলেন, অবজেকশান! এ প্রশ্নের জবাব সাক্ষী দিতে পারেন না। প্রশ্নটি অবৈধ!

জজসাহেব বুলিং দেবার আগেই মাইতি বলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। মিস্টার সিয়াঙ, এটা কি স্বাভাবিক যে, আপনার নিয়োগকর্তার একমাত্র পুত্র রেঙ্গুনে যাবেন আর আপনি জানতে পারবেন না?

—না, স্বাভাবিক নয়। সদানন্দ ইতিপূর্বে রেঙ্গুনে এলে আমার তা জানার কথা।

—আপনার জ্ঞাতসারে সদানন্দ সেন যৌবনে পদার্পণের পরে ঐ 10.4.40 তারিখের আগে বর্মায় আসেননি?

—না, আমার জ্ঞাতসারে নয়।

—আপনি তাঁর স্ত্রীকে কতদিন ধরে চিনতেন?

—তার বালিকা বয়স থেকে।

—সে-কি বিবাহের পূর্বে ভারতবর্ষে এসেছিল?

বাসু-সাহেব আসন ত্যাগ করার উপক্রম করতেই মাইতি বলেন, অল রাইট, অল রাইট! আই উইথড্র। আচ্ছা মিস্টার য়ু সিয়াঙ, বলুন তো, সদানন্দের স্ত্রী যদি কুমারী বয়সে বর্মা ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আসত তা কি আপনার অজানা থাকতে পারত?

—অসম্ভব। কারণ বালিকা বয়স থেকে ও আমাদের বাড়িতেই অন্য ফ্ল্যাটে থাকত।

—তার মানে, আপনার জ্ঞাতসারে সদানন্দ সেনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ 10.4.40-এর আগে কিছুতেই হতে পারে না?

—হ্যাঁ তাই!

—আচ্ছা মিস্টার সিয়াঙ, এবার বলুন তো-ঘটনার দিন, আই মীন যোগানন্দ সেনের হত্যার দিন, মঙ্গলবার সকাল প্রায় দশটার সময় এ মামলার প্রতিবাদী ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

—করেছিলেন।

—তিনি কি নিজেকে মহেন্দ্র বাবুর সলিসিটার হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলেন, না! কিন্তু তিনি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে আমি মনে করি—তিনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার।

—কী ভাবে তিনি সেই পরিবেশ সৃষ্টি করেন?

—উনি তার পূর্ব রাত্রে রাত ঠিক বারোটা চল্লিশ মিনিটে একটি টেলিফোন করে আমাকে বলেন যে, আমাদের পথের কাঁটা দূর হয়েছে!

আদালতে একটা গুঞ্জন ওঠে। বিচারক তাঁর হাতুড়িটা পিটলেন। স্তব্ধতা ফিরে এল আদালতে। —ঠিক কী কী কথাবার্তা হয়েছিল—মানে যতটা আপনার মনে আছে, বলে যান।

সাক্ষী টেলিফোনে কথোপকথনের একটি বিবৃতি দিলেন এবং বললেন কী ভাবে পরদিন ব্যারিস্টার-সাহেবের পরিচয়পত্র পাওয়া মাত্র তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তিনিই মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার!

তার মানে আপনি বলতে চান—ঐ দিন রাত বারোটা চল্লিশে প্রতিবাদী ব্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু জানতেন যে, জগদানন্দ বাবুর বাড়িতে একটা খুন হয়েছে?

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে তাকালেন। তিনি কিন্তু কোন আপত্তি জানালেন না। সাক্ষী চিন্তা করে জবাবে বলল, তা আমি জানি না। তিনি 'পথের কাঁটা' বলতে কী মীন করেছিলেন, তাও আমি জানি না। তবে রাত বারোটা চল্লিশে ঐ রহস্যময় টেলিফোন-কলে আমি খুব বিস্মিত বোধ করি!

—আপনি কী বোধ করেন, তা আমি শুনতে চাইছি না। আমি জানতে চাইছি—টেলিফোনে ঐ মধ্যরাত্রে আপনাদের যে কথোপকথন হয় তার একটি অনুলিপি কি তিনি আপনাকে পরদিন বেলা দশটায় দেখান?

—হ্যাঁ দেখান।

—য়ু মে ক্রস-এগজামিন—আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসু-সাহেবের প্রথম প্রশ্ন, মিস্টার সিয়াঙ, আপনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন কি এ মামলায় সাক্ষী দেবার জন্য?

সিয়াঙ একটু থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, নিশ্চয় নয়। আমি ভারতবর্ষে এসেছি দেশ দেখতে—আমার পাসপোর্টেও তাই লেখা আছে।

—কলকাতায় পদার্পণের দিনেই আপনি আপনার প্রাক্তন নিয়োগ-কর্তা জগদানন্দের সঙ্গে দেখা করেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ তাই।

—আচ্ছা মিস্টার সিয়াঙ, আপনি যখন দেশ দেখতেই এসেছেন তখন কলকাতা শহরটা না দেখে সর্বপ্রথমেই আপনি কেন জগদানন্দ সেনের সঙ্গে দেখা করেন?

—তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে। হাজার হোক, তিনি আমার মনিব ছিলেন।

—ঠিক কথা। আচ্ছা এবার বলুন তো—মহেন্দ্রবাবুকে আপনি প্রথম কোথায় দেখেন এবং কবে?

—রেঙ্গুনে দেখি। মাসতিনেক আগে।

—ঠিক কত তারিখে?

—তারিখ আমার মনে নেই।

—উনি যেদিন ফিরে আসেন সেদিন আপনি মহেন্দ্রবাবুকে সী অফ করতে রেঙ্গুন এয়ারপোর্টে এসেছিলেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ।

—সেটা কত তারিখ?

—তা আমার ঠিক মনে নেই।

—এবার বলুন তো মিস্টার সিয়াঙ—তিন মাস আগে ঠিক কত তারিখে আপনার সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ হয়, ঠিক কোন তারিখে তিনি ফিরে আসেন তা আপনার মনে নেই—অথচ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার তারিখগুলো আপনার কেমন করে নিখুঁতভাবে মনে আছে?

মাইতি আপত্তি জানান! এ প্রশ্নের উত্তর সাক্ষী কেমন করে জানবেন?

বিচারক মৃদু হেসে বললেন, অবজেকশান সাসটেইন্ড!

বাসুও হেসে বললেন, প্রশ্নটা তাহলে অন্যভাবে পেশ করি। আপনি আগেই বলেছেন—এ মামলায় সাক্ষী দিতে হবে তা আপনি জানতেন না, দেশ দেখতে এসেছেন। সে ক্ষেত্রে আমার সহযোগীর প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি কেমন করে দিলেন? স্মৃতির উপর নির্ভর করে?

সাক্ষী একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, না, আমার ডায়েরী দেখে তারিখগুলো ঝালিয়ে নিয়েছিলাম আজ সকালে।

—সে দ্যাট! কিন্তু দেশ দেখতে আসার সময় ডায়েরিতে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কতকগুলো ঘটনা আপনি কেন টুকে নিয়ে এলেন?

সাক্ষীকে নিরুত্তর দেখে মাইতি লাফিয়ে ওঠেন, অবজেকশান য়োর অনার। দ্য কোশ্চেন ইস ইরেলিভ্যান্ট, ইম্পার্টিন্যান্ট অ্যান্ড অ্যাবসার্ড।

ভাদুড়ী বললেন, অবজেকশান ওভাররুলড। আনসার দ্যাট কোশ্চেন!

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে সাক্ষী বললেন, আই ডোন্ট নো!

—আই নো!—গর্জন করে উঠলেন বাসু। আপনি এসেছিলেন জগদানন্দকে ব্ল্যাকমেল করতে। মহেন্দ্রবাবু আপনাকে ঐ সব প্রশ্ন করেছিলেন, তা থেকে আপনি বুঝতে পারেন এই খবরগুলি দিয়ে জগদানন্দকে ব্ল্যাকমেল করা যায়। তাই কলকাতা পৌঁছেই আপনি ছুটেছিলেন তাঁর বাড়ি। অ্যাডমিট ইট!

সাক্ষী কাঁপতে কাঁপতে শুধু বললে, নো, নো!

বাসু এবার আক্রমণের পদ্ধতি বদলে অন্যদিক থেকে শুরু করেন, ঘটনার দিন, আই মীন যোগানন্দকে মৃত অবস্থায় যেদিন সকালে দেখা যায়, সেদিন বেলা দশটার সময় ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু যখন আপনার সঙ্গে দেখা করেন তখন আপনি তাঁকে প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন—মহেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে আনলেন না কেন! ইয়েস অর নো?

—ইয়েস!

—তার মানে যোগানন্দ খুন হবার পরে মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে তাঁর সলিসিটারের পক্ষে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা আপনার কাছে প্রত্যাশিত ঘটনা!

—না তা নয়, মানে—

আপনি আপনার সাক্ষ্যে এখনই বলেছেন যে, পূর্বরাত্রে টেলিফোনে 'পথের কাঁটা' কথাটা শুনে তার

অর্থ আপনি বুঝতে পারেননি, নয়?

হ্যাঁ তাই।

—এ ক্ষেত্রে পরদিন যখন ব্যারিস্টার বাসু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন আপনি কি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন 'পথের কাঁটা' বলতে পূর্বরাত্রে তিনি কী মীন করেছিলেন?

—না, করিনি।

—করেননি, কারণ 'পথের কাঁটা' ব্যাপারটা কী, তা আপনি জানতেন, তাই নয়?

না না, তা নয়। আমার খেয়াল হয়নি।

—দ্যাটস অল, মিলর্ড—আসন গ্রহণ করেন বাসু।

মাইতি উঠে দাঁড়ান। একটি বাও করে বলেন, আমার সহযোগীর জেরা যখন শেষ হয়েছে তখন আমি আদালতকে একটি প্রার্থনা জানাব। বর্তমান সাক্ষীর যে সাক্ষ্য এইমাত্র আদালতে লিপিবদ্ধ হল তার একটি অনুলিপি আমাকে দেওয়ার হুকুম হ'ক। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিবাদী ব্যারিস্টার রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটেই জানতেন যোগানন্দ খুন হয়েছেন; কিন্তু তিনি সে খবরটা পুলিশে দেননি। এ নিয়ে আমি বার অ্যাসোসিয়েশানে মুভ করতে চাই।

বিচারক একটু চিন্তা করে প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করেন, এ সম্বন্ধে আপনার কোনও বক্তব্য আছে?

—নো মিলর্ড। আদালত বাদীর এ প্রার্থনা মঞ্জুর করলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

তবু বুলিং দিলেন না জাস্টিস ভাদুড়ী। একটু ইতস্ততঃ করে বাসু-সাহেবকে পুনরায় বললেন, আই উইশ টু আস্ক য়ু এ পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক কোশ্চেন কাউন্সেল! আপনি কি ঘটনার দিন রাত্রি বারোটা চল্লিশে জানতেন যে, একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে?

—নো, মিলর্ড!

—আপনি কী ঐ সময় কোন ফোন করেছিলেন?

—নো, মিলর্ড। আমি ঐ সময় অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম।

মাইতি উঠে দাঁড়ান। কিছু একটা কথা বলতে যান। তারপর বসে পড়েন।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, মিস্টার পি. পি. আপনি অনুলিপি পাবেন। প্লীজ প্রসীড।

পরবর্তী সাক্ষী যোগানন্দের শ্যালিকাপুত্র শ্যামল। সে তার সাক্ষ্যে জানালো, কী ভাবে রাত বারোটা থেকে সওয়া বারোটার মধ্যে সে একটা ছায়ামূর্তি দেখেছিল।

মাইতি প্রশ্ন করেন, আপনার একথা কেন মনে হল না যে, কেউ হয়তো বাথরুমে যাচ্ছে?

—না। কারণ দোতলাতে এবং একতলাতে পৃথক বাথরুম আছে। সে প্রয়োজনে বাথরুমে যেতে কাউকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয় ন।

—আই সী। আচ্ছা শ্যামলবাবু, এ কথা কি সত্য যে, আপনার মেসোমশাই যোগানন্দবাবু আপনার সঙ্গে এক সময় নীলিমা দেবীর বিবাহের প্রস্তাব তুলেছিলেন?

—হ্যাঁ, সত্য কথা।

—তারপর সে বিবাহ-প্রস্তাব কেন ভেঙে যায়?

—আমি জানি না।

—আপনার আপত্তি ছিল?

—না।

—নীলিমা দেবীর আপত্তি ছিল?

—আমি জানি না।

আমার সওয়াল এখানেই শেষ—সহযোগী জেরা করতে পারেন।

বাসুসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, শ্যামলবাবু, আপনি এইমাত্র বললেন, আপনাদের বাড়িতে রাত্রে বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজনে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয় না, তাই না?

—হ্যাঁ, তাই বলেছি।

—আচ্ছা এবার বলুন তো—দ্বিতলবাসী কোন বাসিন্দা যদি দ্বিতলবাসী কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে খুন করতে চান তবে কি সেই প্রয়োজনে তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়?

—অবজেকশান য়োর অনার! আর্গুমেন্টেটিভ!

বাসু বাও করে বলেন, মিলর্ড, সহযোগী ডাইরেক্ট এভিডেন্সে প্রমাণ করেছেন—দ্বিতলে নিদ্রিত কোনও গৃহবাসী বাথরুমে যাবার প্রয়োজনে সিঁড়ির ব্যবহার করেন না, জেরায় আমি প্রমাণ করতে চাই, দ্বিতলে নিদ্রিত কোনও গৃহবাসী দ্বিতলে নিদ্রিত অপর কোন ব্যক্তিকে খুন করতে চাইলে তাঁকে সিঁড়ির ব্যবহার করতে হয় না। এতে আপত্তির কী আছে? হংস যদি ডুবে ডুবে গুগ্‌লি খেতে পারে, তবে হংসীও তা পারে! What's sauce for the gander should be sauce for the goose!

বিচারক মৃদু হেসে বলেন, অবজেকশান ওভাররুলড।

শ্যামল বললে, না, দ্বিতলবাসী কেউ যদি রাত্রে দ্বিতলবাসী অপর কারও ঘরে ঢুকে খুন করতে চান তাহলে তাঁকে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে না।

—যেহেতু আসামী এবং যোগানন্দ দুজনেই সে রাত্রে দোতলায় শুয়েছিলেন, ফলে সিঁড়িতে আপনি যাকে দেখেছেন সে খুনী হলে অন্তত আসামী নয়?

—হ্যাঁ তাই।

পরবর্তী সাক্ষী মহেন্দ্র বোস। লোকটা মাইতির সওয়ালের জবাব দিতে গিয়ে অদ্ভুত এক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসল। স্বীকার করল, সে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে জগদানন্দের ম্যানেজার ছিল, তারপর তার চাকরি যায়। এরপর সে দীর্ঘদিন অন্যত্র ছিল। মাসছয়েক আগে তার সঙ্গে ঘটনাচক্রে যোগানন্দের সাক্ষাৎ হয়। যোগানন্দ নাকি বলেন, তিনি তাঁর শ্যালিকা-পুত্রের সঙ্গে নীলিমার বিবাহ দেবার চেষ্টা করছেন। তাতে মহেন্দ্র বলে, যোগানন্দবাবু আপনি কি জানেন, ঐ মেয়েটির জন্ম সম্বন্ধে একটা রহস্য আছে? যোগানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি মহেন্দ্রকে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে বলেন। তাঁর নির্দেশে মহেন্দ্র রেঙ্গুনে যায়। নীলিমার জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ য়ু সিয়াঙ-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করে ফিরে আসে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সওয়াল শেষ করে মাইতি বাসু-সাহেবকে বলেন, আপনি এবার জেরা করতে পারেন।

বাসু-সাহেব বলেন, মহেন্দ্রবাবু, আপনার জবানবন্দি অনুযায়ী ছয় মাস আগেও যোগানন্দ নীলিমার জন্ম-রহস্য বিষয়ে কিছু জানতেন না, কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আশৈশব জগদানন্দ যে যোগানন্দকে আশ্রয় দিয়েছেন, ভরণ-পোষণ করছেন তার কারণ এ নয় যে, যোগানন্দ একটি গোপন তথ্য জানেন, তাই নয়?

—আমি স্যার, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

পারছেন না বুঝি? আচ্ছা বুঝিয়ে বলি। জগদানন্দ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যোগানন্দকে এতদিন যে ভরণ-পোষণ করেছেন তার কারণটা কী?

—আমি জানি না।

—অন্ততঃ সে কারণটা এই নয় যে, তিনি যোগানন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে,—মানে আমি ছয় মাস আগের কথা বলছি—যোগানন্দ নীলিমার জন্ম-রহস্য বিষয়ে কোনও স্ক্যান্ডেল ছড়াতে পারত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! তা তো বটেই। কারণ যোগানন্দ এতদিন কিছু জানতেন না।

—তার মানে ছয়-মাস আগে পর্যন্ত যোগানন্দের আর্থিক অবস্থা ছিল হীন। শুধুমাত্র খাওয়া-পরার চিন্তা ছিল না। তাঁর নিজস্ব কোন রোজগার ছিল না। ব্ল্যাকমেলিং থেকেও আয় ছিল না। হয়তো জগদানন্দ কিছু হাত-খরচ দিতেন। তাই নয়?

—তাই হবে বোধহয়, আমি তা কেমন করে জানব?

—বাস্তবে যাই হোক, আপনার ধারণাটা তাই ছিল। ঠিক নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ধারণায় তাই ছিল বটে।

—এবার বলুন তো মহেন্দ্রবাবু, প্লেনে করে রেঙ্গুনে গিয়ে তথ্যটা সংগ্রহ করে আনতে আপনার কত খরচ হয়েছে? আই মীন—রাফ হিসাব। চার-পাঁচ হাজার টাকা?

—অত নয় স্যার। হাজার তিনেক হবে।

—খরচটা কে করল? শ্যালিকা-পুত্রের বিবাহ-ব্যবস্থার তাগিদে নিঃস্ব যোগানন্দ, না আপনি?

একটা ঢোঁক গিলে সাক্ষী বললে, আজ্ঞে যোগানন্দবাবু নন, আমিই।

—তাই বুঝি! তা নিঃসম্পর্কীয় যোগানন্দের শ্যালিকাপুত্রের বিবাহ হচ্ছে না দেখে আপনি উতলা হয়ে অত টাকা গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে বসলেন কেন?

সাক্ষী রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললে, যোগানন্দবাবু আমাকে বলছিলেন যে, বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি আমাকে ভালমত ঘটক-বিদায় দেবেন। জগদানন্দের অগাধ সম্পত্তি সবই তো পেত ঐ শ্যালিকাপুত্র।

বাসু একগাল হেসে বলেন, এটা বেফাঁস কথা হয়ে গেল মহেন্দ্রবাবু! গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে যখন আপনি রেঙ্গুন যাচ্ছেন তখন তো আপনি নিশ্চিত জানতেন যে, বিয়েটা হবে না! নীলিমার জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে যোগানন্দের সন্দেহ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আপনার তো কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বস্তুতঃ আপনি তো বিয়েটা যাতে ভেঙে যায়—সেই তথ্যই সংগ্রহ করতে গেলেন। তাই নয়?

—আমি স্যার আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না!

—পারছেন না তার কারণ আপনি ন্যাকা সাজছেন। আদ্যন্ত মিথ্যা কথা বলছেন!

—কী মিথ্যা বলেছি?

—যোগানন্দের অনুরোধে আপনি গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে বার্মা যাননি। গিয়েছিলেন ব্ল্যাকমেলিং-এর রসদ সংগ্রহ করতে। ফিরে এসেই জগদানন্দকে শোষণ করতে শুরু করেছিলেন, স্বীকার করুন?

—না স্যার! আমি...আমি কেন ব্ল্যাকমেলিং করতে যাব?

বাসু হেসে বলেন, আমি জেরা করব, আপনি উত্তর দেবেন, এটাই আদালতের রীতি। আপনি কেন ব্ল্যাকমেলিং করতে যাবেন সে কৈফিয়ৎ আমার দেবার নয়। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন, তহবিল তছরূপ করেছিলেন বলে আপনার ম্যানেজারী খতম হয়েছিল একদিন?

—আজ্ঞে না!

—আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে জগদানন্দ যেদিন আপনাকে বাড়ির বার করে দেন সেদিন আপনি তাঁকে শাসিয়ে যাননি যে, এর প্রতিশোধ আপনি নেবেন?

—না স্যার, এসব কী বলছেন আপনি?

—ও! তবে আপনার চাকরি গেল কেন?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলে, সদানন্দ মারা যাবার পর উনি ব্যবসা গুটিয়ে আনেন। তাই ম্যানেজারের আর কোন দরকার ছিল না।

—তাই বুঝি! নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা! আচ্ছা, এবার বলুন তো মহেন্দ্রবাবু—তাহলে জগদানন্দ তাঁর শেষ উইলে আপনাকে কেন তাঁর বসত বাড়িটি দিয়ে যেতে চাইলেন?

মাইতি আপত্তি জানান। এ প্রশ্নের জবাব নাকি সাক্ষীর দেবার কথা নয়।

—অবজেকশন সাসটেইন্ড!

ঠিক আছে। আমার জেরা এখানেই শেষ।

বাদী পক্ষের শেষ সাক্ষী জয়দীপ রায়। নাম ধাম পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাইতি তাঁকে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন করলেন—আপনি কি নীলিমা দেবীকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে কখনও জগদানন্দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন?

—হয়েছিলাম।

—আপনি কি নীলিমা দেবীর জন্ম তারিখটা জানেন?

—হ্যাঁ জানি। দোশরা সেপ্টেম্বর, 1940।

—কেমন করে জানলেন?

—আমি ওর জন্ম-পত্রিকা দেখেছি।

—দ্যাটস্ অল মিলর্ড

বাসু কিন্তু দীর্ঘ জেরা করলেন জয়দীপকে। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, আপনি কি ঘটনার আগের রবিবার সন্ধ্যায় পার্ক হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরটা নিজ নামে ভাড়া নেন?

—হ্যাঁ, নিই।

—আপনার কলকাতায় থাকার জায়গা আছে। তা সত্ত্বেও কেন হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন?

—ঐ হোটেলে আটত্রিশ নম্বর ঘরে উঠেছিলেন মিস্টার য়ু সিয়াঙ। তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখবার উদ্দেশ্যে।

—ঐ রবিবার রাত্রি নটা থেকে দশটা পর্যন্ত মিস্টার য়ু সিয়াঙ একজন দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে বুদ্ধদ্বার কক্ষে কথা বলেছিলেন কিনা তা কি আপনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানেন?

—জানি। আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম, মিস্টার মহেন্দ্র বোস এবং তাঁর উকিল ওঁর সঙ্গে ঐ সময় বুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করতে থাকেন।

—তারপর কী হয় বলে যান—

জয়দীপ তার জবানবন্দিতে বলে যায় পরবর্তী ঘটনা। রাত দশটায় য়ু সিয়াঙ-এর হোটেল ত্যাগ। পরদিন সোমবার সকাল সাতটায় সেও পার্ক হোটেল থেকে চেক আউট করে চলে যায়। গিয়ে ওঠে দমদমের ভি. আই. পি. হোটেলে। রাত বারোটা চল্লিশে সে কিভাবে টেলিফোন-মেসেজটা লিখে নেয় এবং সকাল হলে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এসে বাসু-সাহেবকে কাগজখানা দেয় সব বিশদভাবে জানায়।

বাসু-সাহেবের জেরা শেষ হবার আগেই আদালত বন্ধ হল।

বিচারক ঘোষণা করলেন—পরদিন যথারীতি বেলা দশটায় আদালত বসবে।

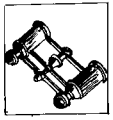

আট

কোর্ট থেকে ফিরে ওঁরা এসে বসলেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে। একতলার বৈঠকখানায়। বাসু-সাহেব, কৌশিক, জয়দীপ আর শ্যামল। মহেন্দ্র এবং বিশ্বম্ভর বর্তমানে এ বাড়িতে থাকেন না। তাঁরা হোটেলে উঠেছেন। জগদানন্দ দ্বিতলে নিজের ঘরে উঠে গেলেন। এসব আলোচনায় তিনি আজকাল আর থাকেন না।

কৌশিক বললে, আপনার জেরায় আজ বেশ বোঝা গেছে যে, মহেন্দ্র-সিয়াঙ কোম্পানিই ব্ল্যাকমেলিং করছিল, যোগানন্দ নয়। ফলে জগদানন্দের পক্ষে খুন করার কোনও মোটিভ বাদী-পক্ষ দেখাতে পারবে না।

বাসু বলেন, তা তো হল; কিন্তু তাহলে খুনটা করল কে? কেন?

কৌশিক বলে, তা নিয়ে আপনার কেন মাথা-ব্যথা? আসামী খুন করেনি এটুকু প্রমাণ করারই তো দায়িত্ব আপনার!

—আই ডোন্ট এগ্রি। সত্যকে উদ্ঘাটিত করার দায়িত্ব আমার!

নীলিমা একটি স্বগতোক্তি করে, আশ্চর্য, সেই ডুপ্লিকেট চাবির গোছাটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না!

জয়দীপ বললে, না পাওয়াই স্বাভাবিক। সেটা দিয়েই খুনী ঐ দরজাটা খুলেছে। এতক্ষণে সেটা কলকাতার কোন রাস্তায় স্যুয়ারেজে চলে গেছে! সেটা যথাস্থানে রেখে যাবার ঝুঁকি খুনীটা নেবে কেন?

শ্যামল বললে, বাসু-সাহেব, আপনি জেরায় আর একটু অগ্রসর হলেন না কেন? দ্বিতলবাসীর বদলে খুনী যদি একতলার বাসিন্দা হয় তাহলে দ্বিতলবাসীকে খুন করতে হলে তাকে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়—এ কথাটিও তো আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে পারতেন।

—পারতাম, বাট দ্যাটস্ অবভিয়াস্। জাস্টিস ভাদুড়ী জানেন,—দুইয়ে দুইয়ে চার হয়।

কৌশিক বললে, মহেন্দ্র যে বিশ্বম্ভরবাবুকে দিয়ে খেসারত বাবদ একটা ড্রাফ্ট তৈরি করেছিল সে প্রসঙ্গ তো তুললেন না?

—কী লাভ হত কৌশিক? ওরা সেটা অস্বীকার করে যেত। মহেন্দ্র তো স্বীকারই করছে না যে, তাকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এই অজুহাতে সে এ বাড়িতে এসেছে!

—আপনি বিশ্বম্ভরকে কাঠগড়ায় তুলবেন না? সে রাত বারোটা চল্লিশে ফোন করেছিল কি না—

বাসু-সাহেব কী যেন চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। বলেন, তোমরা কথা বল, আমি, আমি এখনই আসছি।

উনি উঠে এলেন দ্বিতলে। জগদানন্দের ঘরে ঢুকে দেখেন বৃদ্ধ চুপ করে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। বাসু-সাহেবকে দেখে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকান। বাসু বসে পড়েন পাশের চেয়ারটায়। বলেন, বলুন তো—আপনি যে আমার মাধ্যমে এ বসতবাড়িটি আপনার নাতনিকে দানপত্র করে দিয়েছেন, এ খবরটা কে কে জানে?

—আপনি, আমি, কৌশিকবাবু আর যোগানন্দ জানত।

—আর কেউ?

—হ্যাঁ, নীলিমাও জানে!

—নীলিমা কেমন করে জানল?

জগদানন্দ বলতে থাকেন। বুধবার দানপত্রটা রেজেস্ট্রি হয়। পরদিন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি নীলিমা আর জয়দীপকে দানপত্রের কথা গোপন করে উইলটা দেখান। তারপর জয়দীপ চলে যায়। জগদানন্দ নীলিমার ঘরে এসে দেখেন, মেয়েটা টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছে। জগদানন্দ মর্মাহত হন। নীলিমা ওকে দেখে বলে, তুমি ছোটকাকুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছ এতে আমি খুশি। তুমি বসতবাড়িটা আমাকে দিচ্ছ না তাতেও আমার দুঃখ নেই দাদু। কিন্তু তুমি ঐ মহেন্দ্রবাবুকে কেন দিচ্ছ বাড়িটা? কোন সৎ কাজে এটা দান করে যাও না দাদু? তোমার নামে অনাথ-আশ্রম হ'ক, হাসপাতাল হ'ক! তুমি যখন থাকবে না তখন তো আর ঐ মহেন্দ্র তোমাকে আর ব্ল্যাকমেল করতে আসবে না?

জগদানন্দ আর স্থির থাকতে পারেননি। রঙের টেক্কাটা নীলিমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বুঝিয়ে বলেছিলেন, মহেন্দ্র কোনদিনই উইলের প্রবেট নিয়ে এ বাড়ি দখল করতে পারবে না—কারণ এ বাড়ির মালিক জগদানন্দ নন, নীলিমা।

বাসু উঠে দাঁড়ান। বলেন, কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! এতবড় খবরটা এতদিন বলেননি?

—খবরটা কী এতই গুরুত্বপূর্ণ?

—আলবৎ! এ থেকেই যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যোগানন্দকে কে খুন করেছিল?

—জগদানন্দ স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

বাসু-সাহেবের গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি কোথায় যেন চলে গেলেন!

কৌশিক বৈঠকখানা থেকে উঁকি মেরে দেখে বললে, এ কী? উনি এমন কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন যে? আমি যে ঐ গাড়িতেই ফিরতাম?

জয়দীপ হেসে বললে, এ থেকে প্রমাণ হয় বাসু-সাহেব একজন জিনিয়াস্! জিনিয়াসদেরই অমন মগজের দু'চারটে স্ক্রু আলগা থাকে।

নয়

জগদানন্দের বাড়ি থেকে ফিরে এসে বাসু-সাহেব শুনলেন তাঁর জন্য একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী নাকি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে! আদালতে এমনিতেই নানারকম ধকল গেছে, সেখান থেকে গিয়েছিলেন জগদানন্দের বাড়িতে, তারপর ক্লান্ত দেহে এতক্ষণে ফিরে এসেছেন নিজের ডেরায়। সন্ধ্যাবেলাটা তিনি কিছুক্ষণ একা থাকেন, কিছুটা স্ত্রীর সান্নিধ্যে গল্পগুজবে কাটান। এ সময় আগন্তুকের ঝামেলা বরদাস্ত হয় না তাঁর। প্রশ্ন করেন, কে লোকটা? কী চায়?

মিসেস্ বাসু বলেন, নাম বলতে আপত্তি আছে তাঁর। ধুতি পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। বলেছেন—ব্যাপারটা গোপন।

বাসু-সাহেব জুতার ফিতা খুলতে খুলতে বলেন, ব্যারিস্টারের কাছে সাঁঝের অন্ধকারে যে দেখা করতে আসে তার ব্যাপারটা গোপনই হয়ে থাকে রানু, সেটা কোন সংবাদ নয়। কিন্তু কী করে এসেছে লোকটা? খুন? না তহবিল তছরুপ?

রানী দেবী হেসে বলেন, তোমার কি ধারণা সে-কথা আমার কাছে স্বীকার করার পরেও ভদ্রলোকের গোপনীয়তা বজায় থাকতো?

—ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও। আমি বাইরের ঘরে বসছি।

একটু পরে ওঁর চেম্বারে যে ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন তিনি মোটেই অপরিচিত ব্যক্তি নয়, যদিও তাঁর সাজে-পোষাকে একটু অভিনবত্ব আছে। ধড়া-চূড়া খুলে রেখে নিতান্ত বাঙালী বাবুটি সেজে এসেছেন।

—কী ব্যাপার মণীশবাবু? হঠাৎ এভাবে ছদ্মবেশে শত্রুশিবিরে? বসুন।

মণীশ বর্মণ ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারে বসে বললে, আপনার একটা অভিযোগও কিন্তু টিকছে না বাসু-সাহেব। প্রথমত এটা আমার ছদ্মবেশ নয়, নিতান্তই আমার নামরূপের উপযোগী বাঙালি পোশাক—দ্বিতীয়ত আমি শত্রুপক্ষের লোকও নই। বরং বলব—পাছে আপনি আমার মধ্যে শত্রুপক্ষের আভাস পাঁন তাই পুলিসের সাজ-পোশাক খুলে রেখে এসেছি। সংক্ষেপে আপনার সামনে যে বসে আছে সে ইন্সপেক্টার মণীশ বর্মণ নয়, মণীশবাবু!

—ভূমিকাটা ভালই হয়েছে—এবার বিষয়বস্তুতে আসা যাক? কী ব্যাপার?

মণীশ কিন্তু সরাসরি বক্তব্যে আসাতে পারল না। কোথায় যেন তার বাধছে। একটু ইতস্তত করল, নড়ে-চড়ে বসল। শেষে গলাটা সাফা করে শুরু করল: ভূমিকাটা আমার শেষ হয়নি বাসু-সাহেব। মুখবন্ধ হিসাবে আরও কয়েকটা কথা বলে নিই। না হলে আমি ঠিক সহজ হতে পারছি না।

—বলুন?

—প্রথমে কিছুটা নিজের কথা বলি। আমার চাকরি আট বছরের। কলেজে পড়াশুনায় ভাল ছাত্র

ছিলাম। পুলিসের চাকরিতে উন্নতি হয়েছে বেশ তাড়াতাড়ি। কিন্তু চাকরি জীবনে একটা অভিশাপ থাকে—জানেন নিশ্চয়ই—আমি সেই অভিশাপের খোরাক হয়েছি। যে কেসটায় এখন আপনি আর আমি বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছি—আমি জগদানন্দবাবুর কেসটার কথা বলছি—সে কেসে আমি ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি। সব কথাই স্বীকার করব—আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, যোগানন্দ-হত্যা মামলায় জগদানন্দকে আসামী করাটা ভুল হচ্ছে। আমি আমার রিপোর্টে প্রথম থেকেই বলে যাচ্ছি যে, যোগানন্দকে জগদানন্দ খুন করেননি, করতে পারেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রামার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। উপরওয়ালার নির্দেশ অনুসারে আমাকে কেস সাজাতে হল। আমি মনে মনে জানতাম যে, আপনি জগদানন্দকে নিরপরাধী বলে নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবেন। আজকে আদালতে আপনি মামলাটাকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তাতে আমার ধারণা যে সত্য সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মজা হচ্ছে এই যে, আমার উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষ সব বুঝেও তাঁর গোঁ ছাড়ছেন না।

মণীশ বর্মণ হঠাৎ নীরব হল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলেন ও আর কিছু বলছে না তখন বাধ্য হয়ে বাসু-সাহেব বলেন, বুঝলাম। এখন আপনি কী চাইছেন ঠিক করে বলুন তো? আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? ইচ্ছে করে কেসে হারব?

মণীশ ম্লান হেসে বলে, পুলিসের চাকরীতে এই হচ্ছে বিড়ম্বনা মিস্টার বাসু। আমি কেসটা হারলে আমার চাকরিতে একটা দাগ পড়বে।সরকারী ফাইলে শুধু লেখা থাকবে কেসটা আমি ইনভেস্টিগেট করেছিলাম, আমিই পরিচালনা করেছিলাম এবং এমনভাবে কেসটা সাজিয়েছিলাম, যাতে অভিযুক্তের শাস্তি হয়নি।

বাসু-সাহেব একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, কিন্তু আমি তার কী করতে পারি?

—সেই কথাই বলছি স্যার! আমার মনে হল, জগদানন্দ বেকসুর ছাড়া পেয়ে যান তো যান, কিন্তু প্রকৃত অপরাধীকে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে এ অবস্থা থেকেও আমি ভরাডুবিকে ঠেকাতে পারব। আপনার কীর্তি-কাহিনী সবই আমার জানা। আপনার প্রতিটি কেস্-হিস্ট্রি খুঁটিয়ে পড়েছি আমি। তাই ভাবলাম, আপনি কিছুতেই জগদানন্দকে মুক্ত করে আপনার কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে করবেন না। যোগানন্দকে কে হত্যা করেছে সে রহস্যটা ভেদ না করা পর্যন্ত আপনার রাতে ঘুম হবে না। ঠিক নয়?

বাসু-সাহেব একটা চুরুট ধরালেন।

—তাই আমি আদালত থেকে বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে সোজা আপনার কাছেই চলে এসেছি!

—হুম্। কিন্তু আপনার উপরওয়ালা কি এ তথ্যটা জানেন?

—না। জানেন না। কোনদিন জানতেও পারবেন না। আমি চাই আপনাকে সাহায্য করতে, বরং বলা উচিত আপনার সাহায্যে রহস্যটা ভেদ করতে। আপনি কি রহস্যটার কিনারা করতে পেরেছেন?

—না। তবে কয়েকটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগছে।

—আমার মনে হয় আরও কয়েকটি ক্লু পেলে হয়তো আপনার পক্ষে রহস্যটা ভেদ করা সহজ হবে। সুতরাং সর্বপ্রথমে আমরা আমাদের সংগৃহীত 'ক্লু'গুলো বিনিময় করি। আপনি কী বলেন?

বাসু-সাহেব বলেন, আমার আপত্তি নেই, তবে আমাদের সন্ধির শর্তগুলো তার আগে স্থির হওয়া প্রয়োজন। আপনি ঠিক কী চান, তাই আগে বলুন?

—আমার তরফে একটি মাত্র শর্ত। জগদানন্দকে মুক্ত করেই আপনি থামবেন না, প্রকৃত খুনীকে চিহ্নিত করে দেবেন এবং কী সূত্রে তাকে চিহ্নিত করলেন তা শুধু আমাকেই জানাবেন!

—আমি রাজি! শুধু ওটুকুই নয়, প্রকৃত অপরাধীকে যাতে আপনিই গ্রেপ্তার করেন সে ব্যবস্থাও

আমি করে দেব—যদি আদৌ তাকে ধরতে পারি।

—থ্যাঙ্ক য়ু স্যার!

এর পর দীর্ঘ সময় ওঁরা নিজ-নিজ তথ্যের আদানপ্রদান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কৌশিকও বাসায় ফিরে এসেছিল। তাকেও ডেকে পাঠালেন বাসু-সাহেব। তিনজনে গভীর আলোচনায় ডুবে গেলেন। বাসু-সাহেব বলেন, মণীশবাবু, আপনি প্রথমে বলুন হত্যাকারী হিসাবে কাকে আপনার সন্দেহ হয় এবং কেন?

মণীশ বললে, আমার বিশ্বাস যোগানন্দকে যে হত্যা করেছে তাকে আপনারা চেনেনই না।

কৌশিক ঠাট্টা করে বলে, যা বাব্বা! গোয়েন্দা কাহিনীতে তো এমন হওয়ার কথা নয় মণীশবাবু,—আসল অপরাধীকে ধরতে না পারলেও তার পরিচয় আমাদের পাওয়া উচিত ছিল।

মণীশ বললে, প্রথম কথা এটা গোয়েন্দা গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা। দ্বিতীয় কথা—আমি বলতে চাই যোগানন্দকে যে হত্যা করেছে তাকে না চিনলেও যার নির্দেশে সে হত্যা করেছে তাকে আপনারা চেনেন।

বাসু বলেন, আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

—আমার ধারণা—এটা পাকা হাতের কাজ। অ্যামেচার নয়, প্রফেশনাল খুনীর কাজ। এ কথা মনে করছি যে 'ক্লু'-টার সাহায্যে সেটা আগে জানাই। সে খবর আপনাদের অজানা। আমি জানি, য়ু সিয়াঙকে আপনারা সন্দেহজনক ব্যক্তি মনে করে নজরবন্দি করেছেন। কিন্তু যার মাধ্যমে করেছেন সেই জয়দীপ ছোকরা হচ্ছে অ্যামেচার। তাই 'ক্লু'-টার সন্ধান সে পায়নি। য়ু সিয়াঙ সম্বন্ধে আমিও খবরাখবর নিয়েছি। আমার সংবাদসূত্র বলছে—য়ু সিয়াঙ ক'লকাতায় এসে সর্বপ্রথমেই জগদানন্দের দ্বারস্থ হয়নি, সে ক'লকাতার 'আন্ডার-গ্রাউন্ড' জগতের সঙ্গেই প্রথম যোগাযোগ করে টেলিফোনে। দ্বিতীয়ত জয়দীপের ধারণা য়ু সিয়াঙ রবিবার সারাদিন একটা টুরিস্ট বাসে শহর দেখে বেরিয়েছে। খবরটা ভুল। লোকটা অত্যন্ত শেয়ানা। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল তাকে কেউ হোটেলে নজরবন্দি করে রেখেছে। তাই রবিবার সকালে সে টুরিস্ট বাসে রওনা হলেও এসপ্ল্যানেডে নেমে যায়। গুণ্ডাদের গোপন আড্ডায় যায় এবং বিকাল তিনটে নাগাদ টুরিস্ট বাসের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আবার অন্যত্র বাসে চেপে বসে। জয়দীপের ধারণা রবিবার সমস্ত দুপুর সে ঐ টুরিস্ট বাসেই ছিল। তা সে ছিল না। তৃতীয়ত, রবিবার রাত সাড়ে নয়টায় সেই 'আন্ডার-গ্রাউন্ড' জগতের একজন কুখ্যাত গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক পার্ক হোটেলে আসে। যে সময় ঐ হোটেলে মহেন্দ্র এবং তাঁর উকিল য়ু সিয়াঙের সঙ্গে দেখা করে প্রায় সেই সময়ই! সে যে ঠিক কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তা জানি না—তবে আমার অনুমান লোকটা মহেন্দ্র-বিশ্বম্ভর পার্টির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, এসেছিল য়ু সিয়াঙের কাছেই।

—লোকটার নাম কী?—জানতে চান বাসু-সাহেব।

মণীশ বর্মন বলে, পিতৃদত্ত নামটা ঠিক কী তা জানি না, পুলিসের খাতায় তার নাম খোকা গুণ্ডা। বার দুই তাকে খুনের মামলায় জড়ানো হয়েছিল; দু বারই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে ডাকাতির কেসে বছর পাঁচেক একবার মেয়াদও খেটেছে। লোকটা রীতিমতো দাগী। ভবানীপুর থানায় তাকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় হাজিরা দিতে হয়।

কৌশিক বলে, ধরা যাক আপনার অনুমান সত্য। এ খুনটা কোন অ্যামেচারের হাতে হয়নি, খোকা গুণ্ডাই আসল অপরাধী। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে মধ্যরাত্রিতে সে কী করে বৃদ্ধদ্বার ঘরের ভিতর ঢুকল?

—বৃদ্ধদ্বার বলতে দুটো দরজা। সদর দরজা আর যোগানন্দের শয়নকক্ষের দরজা। দুটো দরজার কোনটাই ভিতর থেকে ছিটকিনি বা খিল দিয়ে বন্ধ ছিল না—গা-তালা লাগানো ছিল। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, সবকটা দরজার ডুপ্লিকেট চাবির থোকাটাই ঘটনার পূর্বে চুরি গিয়েছিল।

কৌশিক বললে, তা গিয়েছিল; কিন্তু সে-ক্ষেত্রে য়ু সিয়াঙকে সন্দেহ করাটা কি স্বাভাবিক?

বহিরাগত যু সিয়াঙ কেমন করে নীলিমা দেবীর দেরাজ থেকে ডুপ্লিকেট চাবির গোছাটা চুরি করবে? মহেন্দ্রবাবু সেটা করতে পারে হয়তো—যে-হেতু সে ঐ বাড়িতে ছিল; কিন্তু আপনিই তো বলছেন খোকা গুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল যু সিয়াঙ,মহেন্দ্র নয়। আর তার চেয়েও বড় কথা—মোটিভ। মহেন্দ্র অথবা যু সিয়াঙ কী কারণে যোগানন্দকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগাবে তাই বলুন?

মণীশ বলে, এ বিষয়ে আমার থিয়োরি এই যে, যোগানন্দকে হত্যা করার ইচ্ছা যু সিয়াঙ-এর আদৌ ছিল না। সে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়েছিল মহেন্দ্রকে খুন করতে। ভেবে দেখুন—ঐ খাটে মহেন্দ্রবাবুই রাত্রে শোওয়ার কথা। যু সিয়াঙ কেমন করে জানবে ওরা ঘর বদলাবে?

কৌশিক অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কিন্তু কে কোন ঘরে রাত্রে শোয় সেটা যু সিয়াঙ জানবে কেমন করে? সে তো মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য একবার ঐ বাড়িতে গিয়েছিল। জগদানন্দের সঙ্গে কথা বলে চলে আসে। তার পক্ষে কি জানা সম্ভব মহেন্দ্র কোন ঘরে রাত্রে শোয়?

মণীশ সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাসু-সাহেবকে বলে, আপনি কী বলেন?

বাসু-সাহেব এতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে যাচ্ছিলেন। নড়ে-চড়ে বসে বলেন, আমি বলি কি ঘরে বসে এসব তত্ত্ব-আলোচনা না করে, চল আমরা একটু সরেজমিনে তদন্ত করে আসি।

—সরেজমিনে তদন্ত! সে আবার কোথায়?

বাসু বলেন, প্রথম কথা, মণীশবাবু, তুমি এখান থেকে ভবানীপুর থানায় একটা ফোন করে জেনে নাও সেই খোকাবাবু আজ তাঁর হাজিরা দিয়ে গেছেন কিনা। যদি না দিয়ে গিয়ে থাকেন তবে তিনি এলে যেন তাঁকে আটকে রাখা হয়। আমরা রাত নটা নাগাদ ভবানীপুর থানায় যাব। দেখ, তাকে পাওয়া যায় কিনা।

মণীশ মনে মনে খুশী হল। সে লক্ষ্য করেছে ইতিমধ্যে বাসু-সাহেব 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমেছেন। অর্থাৎ মণীশ বর্মন তাঁর স্নেহের পাত্রে উন্নীত হয়েছে। সোৎসাহে সে বাসু-সাহেবের টেলিফোনটা টেনে নিয়ে ভবানীপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করল। ভাগ্য ভাল—খোকা গুণ্ডা এখনও তার হাজিরা দিতে আসেনি। মণীশ থানায় জানিয়ে রাখল, সে এলে তাকে যেন আটকে রাখা হয়। বাসু বলেন, প্রয়োজনবোধে খোকাবাবুকে যেন আমার অ্যাকাউন্টে চা-পান-সিগ্রেট জোগান দেওয়া হয় এটাও বলে রাখ।

মণীশ হাসতে হাসতে বলে, তার প্রয়োজন হবে না। আপনি বিখ্যাত ক্রিমিনাল সাইডের ব্যারিস্টার। অপরাধ-জগতের সবাই আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা সৌভাগ্য বলে মনে করে। কিন্তু রাত নটা বাজতে তো এখনও অনেক দেরি। এতক্ষণ কী করব আমরা?

বাসু গাত্রোত্থান করেন, ঐ যে বললাম—একটু সরেজমিনে তদন্ত করব। চল পার্ক হোটেলটা ঘুরে আসি। আটত্রিশ নম্বর কামরাটা একবার স্বচক্ষে দেখে রাখা ভালো।

মণীশ উঠে দাঁড়ায়। বলে, যেতে চান চলুন, কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—যু সিয়াঙ ঐ ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিল রবিবার রাত দশটায়।সেখানে অ্যাশ্‌ট্রেতে কোনও চুরুটের ছাই অথবা ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে কিছুই পাবেন না! ইতিমধ্যে হয়তো একাধিক বোর্ডার ঐ ঘরে বাস করে গেছে।

বাসু-সাহেব আবার চটি-জোড়া খুলে জুতো পায়ে দিতে দিতে বলেন, তা কি আগে-ভাগে কেউ বলতে পারে? কবি বলেছেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন!' কী কৌশিক, যাবে না কি?

কৌশিক দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয় নয়! এতদিন পরে সেই ঘরটা সার্চ করতে যাবার মত বাসনা আমার আদৌ নেই!

বাসু বললেন, ঠিক আছে। পরে কিন্তু তুমিই পস্তাবে। চল হে মণীশবাবু।

দশ

ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত হওয়া সত্ত্বেও পার্ক-হোটেলের ম্যানেজার মণীশ বর্মনকে চিনতে পারল। ইতিপূর্বেই সে একবার ধড়া-চূড়া পরে তদন্ত করে গেছে। বললে, বলুন স্যার, কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?

মণীশ বাসু-সাহেবের পরিচয় দিয়ে বললে, ইনি একবার ঐ আটত্রিশ নম্বর ঘরটা দেখতে চান।

—তাহলে প্রথমেই জানতে হয় ঘরটা অকুপায়েড কিনা ।

ম্যানেজার রিসেপশান কাউন্টারে ফোন করে জেনে নিয়ে বললে, ভাগ্য ভাল। ঘরটা এখন ফাঁকা। একটু আগেই খালি হয়েছে। আমিও আপনাদের সঙ্গে আসব?

বাসু বলেন, কোনও প্রয়োজন নেই। একজন রুম অ্যাটেনডেন্টকে শুধু আমাদের সঙ্গে দিন।

হোটেল বয়ের সঙ্গে ওঁরা লিফ্‌ট-এ করে তিনতলায় উঠে এলেন। ত্রিতলের একক-শয্যাবিশিষ্ট আটত্রিশ নম্বর ঘরটা করিডোরের শেষ প্রান্তে। হোটেল-বয় ঘরের তালা খুলে দিল। বাসু-সাহেব ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কী দেখলেন তা তিনিই জানেন। অতি সংক্ষেপে পরিদর্শন শেষ করে এসে বললেন, চল এবার নিচে রিসেপ্‌শান কাউন্টারে যাই।

নিচের রিসেপ্‌শান কাউন্টারে আবার দেখা হয়ে গেল ম্যানেজার ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি বলেন, কী হল ব্যারিস্টার-সাহেব, পেলেন কিছু?

বাসু-সাহেব, তা কিছু কিছু পেলাম বইকি। এবার আমি দেখতে চাই আপনাদের হোটেল রেজিস্টারখানা। যদি কোন আপত্তি না থাকে।

ম্যানেজার বলেন, আপত্তি? বলেন কী? মিস্টার বর্মণ যখন চাইছেন তখন সব রকম সাহায্যই করব আমরা। আসুন।

ম্যানেজার পরিচয় করিয়ে দিলেন, এ হচ্ছে মিস্ এডনা পার্কার। আমি যদি না থাকি তাহলে এর কাছে যা জানতে চান জেনে নিতে পারেন।

মিস্ এডনা পার্কার রিসেপ্‌শান-কাউন্টারে ডিউটি দিচ্ছিল। বছর বাইশ-তেইশ বয়স। দেখতে যতটা সুন্দর তার চেয়ে বেশি দেখাচ্ছে উগ্র সাজের চটকে। নীল চোখ, সোনালী চুল। সবিনয়ে বললে, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর যু সারস?

বাসু-সাহেব ওর কাছ থেকে হোটেলের রেজিস্টারখানা চেয়ে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। এ কয়দিনে কয়েক পাতা এগিয়ে এসেছে খাতাটা। পাতা উল্টে খুঁজে বের করলেন উনি। হ্যাঁ, এই তো যু সিয়াঙের হস্তাক্ষর। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা দশ-এ সে হোটেলে চেক্-ইন করে। আটত্রিশ নম্বর ঘর। স্থায়ী ঠিকানার ঘরে বর্মার একটি বাড়ির নম্বর। 'প্রফেশন'-এর ঘরে লিখেছে বিজনেসম্যান, ব্যবসায়ী। বর্মার নাগরিক। পাস্‌পোর্ট নম্বরের উল্লেখও করতে হয়েছে। রবিবার রাত দশটা পনের মিনিটে সে হোটেলের গাড়ি নিয়েই হোটেল ত্যাগ করে যায়। বাসু-সাহেব ডায়েরিতে সব কিছু টুকে নিলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন, পরের পৃষ্ঠাতেই আছে জয়দীপের স্বাক্ষর—সে রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ হোটেলের খাতায় সই করেছিল। অর্থাৎ কৌশিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে সোজা চলে এসেছিল এই হোটেলে। জয়দীপের এন্ট্রিটাও খুঁটিয়ে দেখলেন বাসু-সাহেব। কত নম্বর ঘরে সে উঠেছিল, কবে, কটার সময় সে হোটেল ছেড়ে দেয়।

খাতাটা বাসু-সাহেব বাড়িয়ে ধরেন ম্যানেজারের দিকে। বলেন, এই রেজিস্টারখানা মামলায় প্রয়োজন হতে পারে। আপনি বরং এটা আপনার নিজস্ব সিন্দুকে তুলে একটা নতুন খাতা এখন, এই মুহূর্ত থেকেই চালু করুন। এতে যু সিয়াঙের সই আছে, নিজ স্বীকৃতি-মত তার স্থায়ী ঠিকানা, পাস্‌পোর্ট নাম্বার ইত্যাদিও আছে।

ম্যানেজার বললেন, খাতাটা এখনই কাউন্টার থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভবপর নয়, যে সব বোর্ডার এসেছেন, এখনও হোটেলে আছেন তাঁদের নামগুলি নূতন খাতায় কপি করে নিতে হবে প্রথমে।

বাসু বলেন, বেশ, এখনই কপি করতে দিন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে খাতার কোন ফিগার যাতে কেউ ট্যাম্পার না করে সে জন্য আমি আপনাকে কয়েকটি এন্ট্রিতে গোল চিহ্ন দিয়ে সই দিতে অনুরোধ করব।

ম্যানেজার বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। আপনি যে যে ফিগারগুলো গোলচিহ্ন দিয়ে দেবেন, আমি তার পাশে পাশে সই দিয়ে দিচ্ছি।

বাসু-সাহেব খাতাখানি টেনে নিলেন। তিন-চারটি এন্ট্রিতে গোল চিহ্ন দিয়ে ফেরত দিলেন। ম্যানেজার তার পাশে পাশে সই দিলেন।

মণীশ কৌতূহল সম্বরণ করতে পারে না। বলে, মাপ করবেন মিস্টার বাসু, আমি কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। এ খাতায় গোঁজামিল দিতে চাইবে কে? কেন? যু সিয়াঙ তো এখানে মিথ্যা কিছু লেখেনি। তার চেক্-ইন টাইম, চেক-আউট টাইম, রুম নম্বর, স্থায়ী ঠিকানা, পাস্‌পোর্ট নম্বর সবই তো জেনুইন?

বাসু সংক্ষেপে বলেন, সাবধানের মার নেই। বাই দ্য ওয়ে, মণীশবাবু, যু সিয়াঙ কলকাতায় এসে খোকা গুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করছিল এটা তুমি কোন সূত্রে জানলে? এ ব্যাপারটাও বুঝে নেওয়ার দরকার—কারণ যু সিয়াঙ নিজেই বলেছে যে, সে এই প্রথম কলকাতায় আসছে। সে-ক্ষেত্রে তার পক্ষে অমন একটি কুখ্যাত গুণ্ডার সন্ধান পাওয়া বিস্ময়কর নয়?

মণীশ বললে, আপনার শেষ প্রশ্নটার জবাব জানি না, কিন্তু প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতে পারি। পার্ক হোটেল কর্তৃপক্ষ খুব সাবধানী। হোটেল থেকে কোনও বোর্ডার বাইরে কোন ফোন করলে তা অপারেটারের মাধ্যমে যায়। কোন ঘরেই অটোমেটিক ফোন নেই। এঁদের অপারেটারের কাছে নাম্বার চাইতে হয়। অপারেটার যোগাযোগ করে দেয়। বোর্ডারকে টেলিফোনের জন্য আলাদা চার্জ দিতে হয়। তাই অপারেটার খাতায় লিখে রাখে কোন বোর্ডার কটার সময় কত নম্বরে ফোন করছে। সেই সূত্র থেকেই—

মণীশ সাদা বাঙলায় কথা বলছিল এতক্ষণ। এবারে ঘুরে মিস্ এডনা পার্কারকে ইংরাজিতে বললে, আপনাদের সেই টেলিফোনের খাতাটা দেখি?

খাতাটা থাকে পাশের টেলিফোন অপারেটারের কাছে। মিস্ পার্কার খাতাখানা নিয়ে এল। মণীশ তার পাতা উল্টে দেখালো শনিবার রাত্রে আটত্রিশ নম্বর ঘর থেকে যু সিয়াঙ একটি টেলিফোন করেছিল। সে নম্বরটি চিহ্নিত। অর্থাৎ যে নম্বরে খোকা গুণ্ডার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বাসু-সাহেব বললেন, এটাও একটা জবর এভিডেন্স। এ খাতাখানাও সেফ্ কাস্টডিতে সরিয়ে রাখা ভাল।

খাতাখানা উনি খুঁটিয়ে দেখলেন। আর যে-সব নম্বরে ফোন করা হয়েছে সেই নম্বরগুলিও উনি ডায়েরিতে টুকে নিলেন। কয়েকটি স্থানে কালি দিয়ে গোলচিহ্ন দিলেন। ম্যানেজার-সাহেবকে আবার সই দিতে হল।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ ওঁরা বেরিয়ে গেলেন ভবানীপুর থানার দিকে।

ভবানীপুর থানায় তীর্থের কাকের মত বসে আছে খোকাবাবু।

ছিপছিপে গড়ন। হৃষ্টপুষ্ট মোটেই নয়। কে বলবে লোকটা গুণ্ডা! সাজ-পোশাকে রীতিমত ভদ্রসন্তান। সূচ্যগ্র একটি নূর আছে, মাথায় বড় বড় চুল পিছনে ফেরানো। মুখে বসন্তের দাগ। নেহাৎ

গোবেচারি ধরন।

বাসু-সাহেবকে নিয়ে মণীশ ঘরে ঢুকতেই লোকটা তড়াক করে উঠে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিনীত নমস্কার করে বললে, আবার কী কসুর হল স্যার আমার? এরা আমাকে ঘরে যেতে দিচ্ছে না!

বাসু-সাহেব আসন গ্রহণ করে বললেন, অপরাধ এবার তুমি করনি খোকাবাবু, কিন্তু অপরাধ কেউ না কেউ এখনও তো করছে। তাদেরই একজনকে ধরবার জন্য তোমার সাহায্য চাইছি। যা জিজ্ঞেস করব সত্য জবাব দেবে। মিথ্যা বললে তুমিই ফাঁসবে কিন্তু!

—বলুন স্যার? মিছে কথা আমি কখনও বলি না—মা-ওলাইচণ্ডীর কসম!—খোকা গুণ্ডা এখনও গরুড় পক্ষী।

—'যু সিয়াঙ' নামে একজন বর্মী ভদ্রলোককে চেন?

—না স্যার! অমন নাম বাপের জন্মে শুনিনি!

—এত তারিখ, শনিবার রাত্রি নটার সময় তুমি পার্ক হোটেলে গিয়েছিলে?

খোকা দু-দোখ বুজে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললে, আজ্ঞে না। সেই শনিবার আমি রানাঘাটে গেস্‌লাম স্যার। থানার বড়বাবুর কাছে ছুটি নিয়ে গেস্‌লাম। শনিবার হাজিরা দিইনি। পেত্যয় না হয়, বড়বাবুকে শুধোন।

বাসু-সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেন, তা থেকে কী প্রমাণ হয়? তুমি শনিবারে থানায় হাজিরা দাওনি মানে কি তুমি কলকাতায় ছিলে না?

—ছুটিতে ছিলাম স্যার। রানাঘাটে! মা-ওলাইচণ্ডীর দিব্যি!

—শনিবার রাত্রে কেউ তোমাকে রানাঘাটে দেখেছে প্রমাণ করতে পারবে?

—পারব স্যার! আমার শালার ছাপরায় ছিলাম। সে শালা সাক্ষী দেবে।

—শালার নাম কি ধর্মপুত্তুর?

—আজ্ঞে না, স্যার। যুধিষ্ঠির!

বাসু-সাহেব হেসে ফেলেন। তারপর বলেন, ঠিক আছে। যাঁহা ধর্মপুত্র তাঁহা যুধিষ্ঠির। তার সাক্ষ্যকে কে অস্বীকার করবে? এবার বলত খোকাবাবু, তার পরের সোমবার রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

—রাত কটায় স্যার?

—এই ধর রাত বারোটা নাগাদ?

—নিয্যস্ সত্যি কথা বলব স্যার? অপরাধ নেবেন না তো?

—না, বল না। মা ওলাইচণ্ডীর নামে নাহয় একটা সত্যি কথাই বললে!

—কথাটা পাঁচকান হলে আমার ঝঞ্ঝাট হবে কিন্তু!

—খুব গোপন ব্যাপার নাকি? তা হোক, বলেই ফেল!

—সৌরভীর ঘরে ছিলাম, স্যার।

—সৌরভী! কোথায় তার ঘর?

—হ্যাড়কাটা গলি! দেখবেন স্যার, কথাটা আমার বউয়ের কানে না ওঠে। মাগি ভীষণ খাণ্ডার! কিছুতেই শালি বিশ্বাস করে না—আমি ও পাড়ায় যাই-ই না!

পরদিন কোর্টে যাবার পথে বাসু-সাহেবের গাড়ি এসে থামল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটার সামনে। বেলা পৌনে নটা। আদালতে যাবার জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। বাসু গটগট করে উঠে গেলেন দ্বিতলে। জগদানন্দের ঘরে ঢুকে দেখলেন বৃদ্ধ ঠিক কালকের মতই স্থির হয়ে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। যেন সারা রাত তিনি ওখানে ওভাবেই বসে আছেন। বাসু জানেন, সেটা সত্য নয়—তবু এটাও জানেন ঐভাবে বসে থাকাটাই এখন তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, সেনমশাই, দোষটা আমার নয়, আপনার! আপনি ভাইটাল ক্লুটা আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন বলেই এতদিন কষ্ট পেলেন!

ভ্রূ কুঞ্চন করে জগদানন্দ বলেন, ভাইটাল ক্লু বলতে? ঐ দানপত্র করার খবরটা নীলুকে জানানো?

—এক্জ্যাক্টলি! আপনার ক্লু পেয়ে আমি বাকি তদন্তটা করেছি। সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আজ আপনাকে বেকসুর খালাশ করিয়ে আনব। শুধু তাই নয়, যে আপনার ভাইপোকে হত্যা করেছে আজ তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি! আদালতে পুলিস প্রস্তুত থাকবে।

জগদানন্দের ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। কিছু বলতে পারলেন না তিনি।

—আপনি তৈরী হয়ে নিন! ভয় কী? আজই তো এ যন্ত্রণার শেষ!

ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি টোকা দিলেন নীলিমার ঘরের দরজায়। সে সাজ-পোশাক পালটাচ্ছিল। দরজা খুলে দিয়ে বললে, এ সময়ে আপনি? হঠাৎ?

বাসু বিনা সঙ্কোচে ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের টুলটা টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, নীলিমা, ব'স ঐখানে। তোমাকে একটা কথা বলার আছে।

—মেয়েটি বসল। তার শুধু এক চোখে কাজল। সে সঙ্কোচ করল না তাই বলে।

—তোমাকে দুটো কথা বলব। একটা আনন্দের সংবাদ, একটা দুঃখের। কোন্‌টা আগে শুনতে চাও?

—আনন্দের সংবাদটা।

—আজ আদালতে তোমার দাদু বেকসুর খালাস হ'য়ে যাবেন। প্রকৃত অপরাধী কে তা জানা গেছে।

নীলিমা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—বলেন কী! কে সে?

মাথা নাড়লেন বাসু, নট নাউ! এবার দুঃসংবাদটা জানাই? আজ তোমার একটা বিরাট লোকসানের দিন।

নীলিমা বললে, বুঝেছি! কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই! এ বাড়ির অধিকার যদি না পাই, দাদুর সম্পত্তির কণামাত্র না পাই, তাহলেও আমি দুঃখ করব না। দাদু যে মাথা সোজা করে আজ বাড়ি ফিরে আসবেন এ আনন্দই আমাকে সব দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করবে!

বাসু ওর খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বললেন, ভগবান তোমাকে সেই মনোবলই দিন!

এগারো

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় আদালত বসল।

অসমাপ্ত সাক্ষ্য দিতে উঠে দাঁড়াল জয়দীপ। কোর্ট-পেশ্‌কার মনে করিয়ে দিল—গতকাল হলপ নেওয়া আছে বলে আজ তাকে হলপ নিতে হচ্ছে না, কিন্তু সে আজ যা বলবে তা হলপ্ নিয়ে বলা জবানবন্দিই। সাক্ষী বলল, সে জানে!

বাসু প্রশ্ন করেন, কাল আপনি আপনার জবানবন্দিতে বলেছিলেন যে, সোমবার সকালে আপনি পার্ক হোটেল থেকে চেক আউট করে বেরিয়ে যান। ঠিক কটায় চেক-আউট করেন?

জয়দীপ বললে, ঠিক সময়টা আমার মনে নেই। সোমবার সকালের দিকে। সাতটা থেকে নটা।

—থ্যাঙ্কু! আচ্ছা জয়দীপবাবু এবার বলুন, আপনি কি বিবাহিত?

জয়দীপের মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। মাথা নিচু করে বলে, হ্যাঁ।

—আপনার স্ত্রীর নাম কী?

মাইতি আপত্তি করেননি। সাক্ষী নিজেই বলে ওঠে, সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক!

—সেটা আদালত বুঝবেন, আপনার স্ত্রীর নাম কী?

জয়দীপ বিচারককে সরাসরি প্রশ্ন করে, আমি কি ও প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য?

—অফ কোর্স! য়ু আর!

জয়দীপ মাথা নিচু করে বললে, নীলিমা সেন!

আদালতে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। সকলের দৃষ্টি গেল আসামীর দিকে।

—'নীলিমা সেন' অর্থে আসামীর নাতনি?

—হ্যাঁ, তাই।

—কবে ও কিভাবে আপনাদের বিবাহ হয়েছে?

দাঁতে দাঁত চেপে জয়দীপ বললে, ঘটনার আগের শনিবার।

—ঘটনার আগে এবং ঐ শনিবারেরও আগে আপনার হবু স্ত্রী কি আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, ইতিপূর্বেই জগদানন্দ একট দানপত্র যোগে আপনার হবু স্ত্রীকে বসতবাড়িটি দিয়ে দিয়েছেন? ও বাড়ির মালিক আপনার হবু স্ত্রী। হ্যাঁ, না না?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলল, হ্যাঁ।

—অর্থাৎ ঘটনার দিন আপনি জানতেন যে, উইল মোতাবেক মহেন্দ্রবাবু কোনদিনই ঐ বাড়ির দখল পাবে না। ইয়েস?

—ইয়েস!

—আপনি একথাও জানতেন যে, উইল মোতাবেক মহেন্দ্রবাবু ছাড়া অন্যান্য বেনিফিশিয়ারি তাদের ভাগ পাবে, অর্থাৎ যোগানন্দ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন?

—না জানার কী আছে?

—আপনি আরও জানতেন যে, উইলটা যদি খোয়া যায় তাহলে আপনার স্ত্রী স্বাভাবিক ওয়ারিশ হিসাবে ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন?

মাইতি আপত্তি জানান—এ সব প্রশ্ন নাকি অপ্রাসঙ্গিক। বিচারক সেটা মেনে নিতে রাজি হলেন না। ফলে সাক্ষীকে স্বীকার করতে হল, সে সেটা জানত!

—এবার বলুন জয়দীপবাবু, সোমবার আপনি যখন বিকাল পাঁচটায় ঐ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখনও আপনি জানতেন না যে, কৌশিকবাবু সে রাত্রে ওখানে থাকবেন—যেহেতু জগদানন্দবাবু আপনার প্রস্থানের পরে কৌশিকবাবুকে ঐ প্রস্তাব দেন? ইয়েস?

—হ্যাঁ, তাই।

—তার মানে দাঁড়াচ্ছে—সোমবার বিকালে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় আপনার জানা ছিল না যে, কৌশিকের রাত্রিবাসের প্রয়োজনে মহেন্দ্রবাবু এবং যোগানন্দ ঘর বদলাবে?

সাক্ষী চটে উঠে বলে, আপনি কী বলতে চান? আমি খুন করেছি?

বাসু শান্তভাবে বলেন, আমি বলতে চাই না মিস্টার রায়, আমি শুনতে চাই। আমার প্রশ্নের জবাব শুনতে চাই। বলুন, বলুন?

—না আমি জানতাম না, সে রাত্রে কে কোথায় শুচ্ছেন!

উঁহু হুঁ! ওটা তো আমার প্রশ্নের জবাব নয়! আপনি 'জানতেন না' নয়, আপনি 'জানতেন' যে, যে-খাটে যোগানন্দ নিহত হয়েছেন ঐ খাটে মহেন্দ্রবাবুর শয়ন করার কথা! সোজা হিসাবটা স্বীকার করছেন না কেন?

—বেশ তাই না হয় হল। তাই জানতাম আমি।

—এবং জানতেন যে, মহেন্দ্রবাবুর বালিশের নিচে রাখা আছে ঐ উইলটা, যেটা খোয়া গেলে আপনার হবু-স্ত্রী, আই বেগ য়োর পার্ডন,...ততক্ষণে তিনি আপনার স্ত্রী—ওটা সোমবারের ঘটনা, হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন। স্বামী হিসাবে যাতে আপনারও অধিকার বর্তাবে!

মাইতি উঠে দাঁড়াল, অবজেকশান য়োর অনার। এ সব কী অবান্তর প্রশ্ন! বিচার হচ্ছে কার? আসামীর না সাক্ষীর?

বিচারক দূরস্বরে বলেন, অবজেকশান ওভাররুলড। আনসার দ্যাট!

—না আমি জানতাম না—উইলটা কোথায় রাখা আছে। আমার তা জানার কথা নয়।

—জয়দীপবাবু এবার স্বীকার করুন, সেদিন রাত প্রায় বারোটার সময় আপনি ঐ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে—

চিৎকার করে ওঠে সাক্ষী, ডুপ্লিকেট চাবি আমি পাব কোথায়?

—পাবেন আপনার স্ত্রীর শয়নকক্ষের ড্রয়ারে। যে-ঘরে একমাত্র আপনারই প্রবেশ-অধিকার ছিল—বাট প্লীজ ডোন্ট ইন্টারাপ্ট—স্বীকার করুন, রাত বারোটায় ঐ বাড়িতে ফিরে আসেন। ইয়েস অর নো?

—নো! অ্যান এফাটিক নো। রাত বারোটায় আমি ওখান থেকে অনেক অনেক দূরে। পনের মাইল! দমদমের ভি. আই.পি. হোটেলের বাইশ নম্বর ঘরে। রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটে যেখানে মিস্টার য়ু-সিয়াঙ টেলিফোন ধরেছিলেন তার ঠিক পাশের ঘরে!

—দ্যাটস য়োর অ্যালেবাই! আপনার বজ্রবাঁধুনি রক্ষাকবচ! ঘটনার মুহূর্তে আপনি ছিলেন দমদমে। তাই নয়?

সাক্ষী জবাব দেয় না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে প্রশ্নকর্তার দিকে।

বাসু-সাহেব বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, মিঃ লর্ড! ঘটনার পারম্পর্য রাখতে বর্তমান সাক্ষীকে সাময়িকভাবে অপসারণ করে আমি অপর একটি সাক্ষীর সাক্ষ্য নিতে চাই।

মাইতির তাতে আপত্তি নেই। বিচারক বললেন, নো অবজেকশান।

নবীন সাক্ষীর নাম ঘোষণা করল নকীব। সাক্ষ্য দিতে এলেন, এডনা পার্কার। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। পার্ক হোটেলের রিসেপশান কাউন্টারে কাজ করেন। বাসু-সাহেব তাঁর নাম ধাম পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি গত মাসের পার্ক হোটেলের রেজিস্টারটা সঙ্গে করে এনেছেন?

—এনেছি।

—ওটা দেখে আপনি আদালতকে জানাবেন কি যে, গত অমুক তারিখ, রবিবার ঠিক ক'টার সময় জয়দীপ রায় স্বনামে আপনাদের হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরটা বুক করেন?

সাক্ষী রেজিস্টার দেখে বললেন, সন্ধ্যা সাতটায়।

—কবে ক'টার সময় তিনি ঐঘরটি ছেড়ে দেন?

—মঙ্গলবার সকাল সাতটায়।

—জাস্ট এ মিনিট! ঠিক করে দেখে বলুন, সোমবার সকাল সাতটা নয় তো?

—না! 'মঙ্গলবার' সকাল সাতটায়।

—ঐ তারিখ এবং সময়টা কি লালকালি দিয়ে গোল্লা দেওয়া আছে? এবং তার পাশে কি একটি সই দেওয়া আছে? থাকলে কার সই?

—গোল্লা দেওয়া আছে, সই দেওয়াও আছে। সইটা আমাদের ম্যানেজারের।

—কেন তিনি ওটা সই দিয়েছেন তা আপনি জানেন কি?

—জানি। ম্যানেজার সাহেব আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনি তাঁকে ঐ রকম অনুরোধ করেছিলেন। হোটেল-রেজিস্টার যাতে ট্যাম্পার না হয় তাই তিনি সাবধান হয়েছিলেন। আমাকে তিনি ঐ রেজিস্টারটা সেফ-কাস্টডিতে রেখে একটি নতুন রেজিস্টার খুলতে বলেন। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে আমাকে সমন করা হবে—ঐ তারিখ এবং সময় কোন একটি খুনের মামলার গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স!

—এবার আপনি ঐ গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্সটি আদালতে দাখিল করুন।

এডনা পার্কার সেটা জমা দেবার পর বাসু তাকে পুনরায় প্রশ্ন করেন, বোর্ডারদের টেলিফোন কলের বিল তৈরি করবার জন্য যে রেজিস্টার রাখা হয় আপনি কি সেটাও এনেছেন?

—এনেছি।

—ওটা দেখে বলুন তো সোমবার, না ইংরাজি মতে মঙ্গলবার রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটে ঐ চল্লিশ নম্বর ঘর থেকে দমদম ভি. আই. পি. হোটেলে কি একটা টেলিফোন করা হয়েছিল?

সাক্ষী কী জবাব দিলেন তা শোনা গেল না। ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তেই কোর্টের প্রবেশ-পথে কী একটা হাঙ্গামা বেধে গেল। ঐ দিকে একটা হৈ-চৈ ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। বিচারক বারম্বার হাতুড়ির শব্দ করলেন, তবু গণ্ডগোল থামল না। একজন কোর্ট-পেয়াদা ছুটে এসে বিচারকের কানে কানে কী একটা কথা নিবেদন করল। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন জাস্টিস ভাদুড়ী; বললেন, কোর্ট অ্যাডজর্নড ফর হাফ অ্যান আওয়ার!

এতক্ষণে ব্যাপারটা জানা গেল। আদালত থেকে কে একজন সাক্ষী ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। পুলিস প্রস্তুতই ছিল। আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা পার হতেই লোকটাকে পুলিস-ইন্সপেক্টার মণীশ বর্মণ জাপটে ধরে। কিছুটা ধস্তাধস্তি। পরে লোকটা গ্রেপ্তার হয়।

বারো

—শেষ পর্যন্ত জয়দীপ? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—বললে কৌশিক!

শ্যামল বললে, আমিও না। জয়দীপ দাদুর ছোরা দিয়ে মেসোকে খুন করবে এ যেন ভাবাই যায় না।

বাসু-সাহেব বলেন, তোমাদের কোথায় ভুল হচ্ছিল জান? খুন করার পূর্বমুহূর্তে জয়দীপ জানত—সে মহেন্দ্রকেই খুন করছে, যোগানন্দকে নয়। ওরা যে ঘর বদলেছে সে কথা সবাই জানত—জানত না তিনজন—য়ু সিয়াঙ, আমি আর জয়দীপ। দ্বিতীয় কথা, জয়দীপের খুন করার আসল উদ্দেশ্য শুধু মহেন্দ্রকে হত্যা করা নয়, মহেন্দ্রের বালিশের নিচে যে উইলটা আছে সেটা হস্তগত করা এবং ঐ সঙ্গে জগদানন্দকে ফাঁসীতে ঝোলানো। একটা কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে—যোগানন্দের বদলে মহেন্দ্র খুন হলে—ঐ ছোরায় খুন হলে—জগদানন্দ জামিন পেতেন না। বর্তমান মামলায় জগদানন্দের খুন করার কোন মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায়নি। জোড়াতালি দিয়ে পুলিস যে কেসটা সাজিয়েছে সেটা ধোপে টিকল না, টেকার কথাও নয়—কিন্তু যোগানন্দের বদলে মহেন্দ্র খুন হলে জগদানন্দকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হত।

কৌশিক প্রশ্ন করে, তাহলে জয়দীপ পার্ক হোটেল থেকে এসে খুন করার পর রাত বারোটা চল্লিশে দমদমে ফোন করল কেন?

—ধাপে ধাপে ভেবে দেখ। প্রথমত জয়দীপের প্রথম পরিকল্পনাটা কী ছিল? মহেন্দ্র নিহত হবে জগদানন্দের ছোরায়। মহেন্দ্রের বিছানার তলা থেকে উইলটা চুরি যাবে এবং জগদানন্দ ফাঁসিতে ঝুলবেন। উইল না থাকায় সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার স্ত্রী—অর্থাৎ সে নিজে। কিন্তু খুন করেই সে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। হয়তো টর্চের আলোয় সে দেখেছিল খুন হয়ে গেল যোগানন্দ। তখন আর কিছু করার নেই। মহেন্দ্র কোন ঘরে শুয়েছে তা সে জানে না। ফলে দ্বিতীয় খুন করবার মত সাহস তার তখন নেই। সে পালিয়ে গেল পার্ক হোটেলে। পার্ক হোটেলের ঘরটা সে ছাড়েনি, যদিও দমদমের হোটেলেও স্বনামে একটা ঘর নিয়েছিল।

খুব সম্ভব একটা অ্যাটাচি কেস নিয়ে এসেছিল, তার ভিতর রক্তাক্ত গায়ের চাদরটা সে লুকিয়ে নিয়ে যায়। সর্বাঙ্গ চাদরমুড়ি থাকায় তার গায়ে বা জামা-কাপড়ে রক্ত লাগেনি। পার্ক হোটেলে পৌঁছে তার মনে হল, জগদানন্দের পক্ষে যোগানন্দকে হত্যা করার কোনও হেতু খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখনও যোগানন্দের পক্ষে ব্ল্যাকমেলিং করার আয়াঢ়ে পরিকল্পনাটা পুলিস করেনি। ও স্থির করল, ওকে দুটো জিনিস তখনই করতে হবে। প্রথমত নিজের জন্য একটা মোক্ষম অ্যালেবাই তৈরী করা। দ্বিতীয়ত সন্দেহটা মহেন্দ্র-বিশ্বম্ভর পার্টির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। তারই ফলশ্রুতি ঐ টেলিফোন।পার্ক হোটেল থেকে সে দমদমে ফোন করে যু সিয়াঙের জবাবগুলো লিখে রাখে! আমাদের বলে, সে দমদমে হোটেলে পাশের ঘর থেকে ঐ জবাবগুলো শুনে শুনে লিখেছে।

কৌশিক বললে, তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আপনি ওকে কেমন করে সন্দেহ করলেন?

—ঐ টেলিফোন কলটা থেকেই। কে ওটা করতে পারে?

—কেন, বিশ্বম্ভরবাবু? মহেন্দ্র? যদি ওঁরাই এটা করে থাকেন।

ভুল বলছ কৌশিক। তা কী সম্ভব? প্রথম কথা, ওরাই যদি খুন করে থাকে তবে সেটা ওরা মধ্যরাত্রে কেন জানাতে যাবে যু সিয়াঙকে? কাজের কথা তো কিছু ছিল না—একমাত্র সকালবেলা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছাড়া? তার জন্য ঐ মাঝরাতে ওরা ঐ ভাষায় টেলিফোনে কথা বলবে? ঐ 'পথের কাঁটা' দূর করার কথা? দ্বিতীয়ত রাত বারোটায় খুন করে, তার চল্লিশ মিনিট পরে কোথা থেকে ওরা ফোন করল? বাড়ির ফোন নিশ্চয়ই ব্যবহার করবে না। ফোনটা আছে বৈঠকখানায়—তার সামনেই শ্যামল শুয়ে আছে। বলতে পার, ওদের কাছে সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তাতেই বা কী? অত রাত্রে পাবলিক টেলিফোন বুথ পাবে কোথায়? কোনও পেট্রোল স্টেশন বা ওষুধের দোকান থেকে অমন ভাষায় ফোন কি ওরা করতে পারে?

—ঠিক কথা। এভাবে আমরা ভাবিনি।

—ফলে ফোন করার উদ্দেশ্য আর কিছু। আমার স্বতঃই মনে হল জয়দীপ ঐভাবে প্রমাণ রাখতে চেয়েছে যে, সে রাত বারোটা চল্লিশে দমদমের হোটেলে ছিল। জয়দীপ বুদ্ধিটা করেছিল ভালই—কিন্তু সে একটিমাত্র ভুল করে ধরা পড়ে গেল।

—কী ভুল?

—আমাকে সে চিনতে পারেনি! সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে, পার্ক হোটেলে গিয়ে আমি রেজিস্টার দেখে আসব।

নীলিমা বলে, কিন্তু আপনি আমাদের বিয়ের কথাটা কেমন করে জানলেন? আমি তো বলিনি।

—না, তুমি বলনি। বলেছিল জয়দীপই। সেটাও তার একটা চালে ভুল হয়েছিল।

বাসু-সাহেব চলে আসবার আগে নীলিমা তাঁকে জনান্তিকে পাকড়াও করল। বলে, একটা কথা ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনি বলেছিলেন—আদালতে আমি প্রচণ্ড একটা লোকসানের মধ্যে পড়ব। ওটা আপনারও ভুল হয়েছিল। প্রেমে আমি এমন কিছু অন্ধ হয়ে যাইনি যে, খুনী জেনেও জয়দীপকে আমি ক্ষমা করব।

বাসু বললেন, সেই বিষয়েই আমার সন্দেহ ছিল নীলিমা। যতই আধুনিকা হও, তোমার রক্তে যে ভারতীয় নারীর ট্র্যাডিশন।

—ওটাও আপনার ভুল হয়েছে ব্যারিস্টার-সাহেব। দস্যু-রত্নাকরের সহধর্মিণীও ভারতীয় নারী। জয়দীপ যদি উত্তেজনার বসে খুন করে বসত তাহলে আমি...কিন্তু সে তা করেছিল ঠাণ্ডা মাথায়। সুপরিকল্পিত ভাবে। সে আমার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য ছিল কি?

বাসু বললেন, থ্যাংকস্ নীলিমা। বাই দ্য ওয়ে, তুমি 'শেষের কবিতা' পড়েছ?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—শেষের কবিতার শেষ কবিতার মোদ্দা কথাটা কী বলত?

—'পরশুরামে'র মতে—'উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতিক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে।'

—ঠিক কথা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—অতঃপর তোমাদের জীবন 'শ্যামলে শ্যামল' এবং 'নীলিমায় নীল' হয়ে উঠুক! □

www.boiRboi.blogspot.com

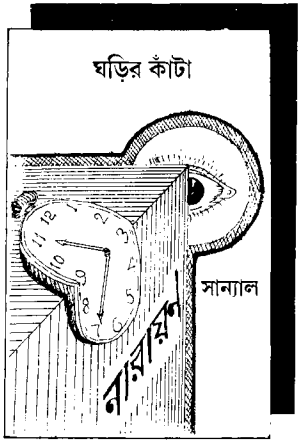

ঘড়ির কাঁটা
রচনাকাল: 1976
প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি 1977
প্রচ্ছদশিল্পী: প্রণবেশ মাইতি
উৎসর্গ: শ্রী সুরেশ প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী

—ঘড়ির কাঁটা? তার মানে?—কৌশিক কৌতূহলী।

—'ঘড়ির কাঁটা' বোঝ না? সময়! টাইম ফ্যাক্টর। মহাকালের খণ্ডিত রূপ, যাকে আইনস্টাইন বলেছেন ফোর্থ ডাইমেনশন—ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্যাপারটাকে আরও গুলিয়ে তোলেন বাসু-সাহেব।

কৌশিক বললে, তা তো বুঝলাম, কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় আপনি এ রহস্যের 'ক্লু' কী করে পেলেন?

—ঘড়ির কাঁটা থেকেই আমি সব 'ক্লু' পেয়েছি কৌশিক। তোমরা ঘটনাগুলো বিচার করেছ, বিশ্লেষণ করেছ, কিন্তু গোটা ঘটনাকে তোমরা দেখেছ ত্রি-মাত্রিক রহস্য হিসাবে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-খাড়াই! ব্যাস্! এই জগৎ-প্রপঞ্চে যে আর একটি ফোর্থ-ডাইমেনশন আছে—টাইম, মহাকাল—তাঁকেই উপেক্ষা করেছ। অর্থাৎ তোমাদের চিন্তাসূত্র ছিল—'এটা কেন হল? ওটা কেন হল, রাম কেন এ-কথা বলল, শ্যাম কেন ও-রকম আচরণ করল'! আমি প্রশ্নগুলি অন্য দৃষ্টিতে দেখেছি : রাম এ-কথা 'কখন' বলল? শ্যাম ও রকম আচরণ 'কখন' করল!—ঐ ঘড়ির কাঁটাটার দিকে বরাবর নজর ছিল বলেই সমস্যাটা আমার কাছে ছিল চতুর্মাত্রিক। 'টেনসার ক্যালকুলাস' ভিন্ন এ সমস্যার সমাধান হয় না! তোমরা সলিড জিয়োমেট্রিতে—

বাধা দিয়ে কৌশিক বলে, বুঝেছি, আর সরল করে বোঝাতে হবে না। আপনি শুধু বলুন—ঘড়ির কাঁটা থেকে আপনি কেমন করে বুঝতে পারলেন—হত্যাকাণ্ডটা কে করেছে, কেন করেছে?

ঘনিয়ে এসে বসে কৌশিক, সুজাতা আর রানী দেবী।

জানিনা, এঁদের সকলের পরিচয় আবার নতুন করে দিতে হবে কিনা।

কৌশিক, সুজাতা আর রানী দেবী ঘনিয়ে এসে বসায় বাসু-সাহেব চুরুটটা ধরিয়ে জমিয়ে শুরু করলেন, বেশ বলছি, এখন সব কথা তোমাদের বুঝিয়ে বলতে আর কোন আপত্তি নেই। কেস যখন জেতা গেছে তখন মন্ত্রগুপ্তি নিষ্প্রয়োজন। শোন—

...কিন্তু না!

এ অনুচ্ছেদটি কাহিনীর একেবারে শেষ পাতায় লেখার কথা ছিল আমার। সর্বপ্রথমেই ওটা লিখতে বসা আমার ভুল হয়েছে—মানে ভ্রান্তিটা টাইম-ফ্যাকটরে, টেনসর ক্যালকুলাসের অঙ্ক! যাকে বলে: ঘড়ির কাঁটায়। আগের কথা আগে বলি, না হলে বাকি পৃষ্ঠাগুলো আপনারা আর উল্টেই দেখবেন না।

টেলিফোনটা বেজে ওঠায় আচমকা ঘুম ভেঙে গেল রবির। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বিছানায়। প্রথমেই নজর পড়ল টেবিল ক্লকটার দিকে। সকাল পাঁচটা পনের। টেলিফোনটা থাকে মাঝের ঘরে—খাবার ঘরে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে রবি। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে নিজের ফোন নম্বরটা ঘোষণা করে।

—রবি বলছিস? আমি প্রকাশ।

—কী ব্যাপার? এই কাক-ডাকা ভোরে? কোথা থেকে বলছিস?

ডিউটি রুম থেকেই। শোন, একটা বিশ্রি ব্যাপার হয়েছে। কমল একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছে। এইমাত্র এমার্জেন্সিতে নিয়ে এল। তুই যেমন আছিস চলে আয়।

—কমল? আমাদের কমলেশ? বলিস কী?

—হ্যাঁ। অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিল, হঠাৎ—

—মারাত্মক আঘাত? বাঁচবে তো?

—বলা যায় না রে। আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখিনি এখনও। এইমাত্র, মানে পাঁচ মিনিট হ'ল এসেছে। অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। এমার্জেন্সিতে নিয়ে গেল। এখনই দেখব আমি। হেড ইঞ্জুরি...ইন্টার্নাল হেমারেজ হচ্ছে...

—ঠিক আছে, আমি এখনই যাচ্ছি। সুদীপকে একটা ফোন করব?

—না, তুই আগে এখানে চলে আয়। দরকার হয়, এখান থেকেই ফোন করিস।

—তুই মীনার ফোন নম্বর জানিস? তাকে একটা খবর—

—মীনা! মীনা কে? ও বুঝেছি। সে সব পরে হবে, তুই চলেআয়...ইয়েস কামিং! ওরা আমাকে ডাকছে এমার্জেন্সি থেকে। তুই চলে আয় এখনি, যেমন আছিস্।

লাইন কেটে দিল প্রকাশ।

টেলিফোন রিসিভারে নামিয়ে রেখে রবি কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মতো। কমল! কমলেশ মিত্র! ওদের বেপরোয়া বড়লোক বন্ধু। সংবাদপত্রের নিউজ এডিটার। মাঝে মাঝে তাকে নাইট ডিউটি করতে হয়। সারারাত ডিউটি করে ভোর বেলা বেচারি বাড়ি ফিরছিল, আর...

—কার কী হয়েছে গো? মারাত্মক আঘাত বললে না?

রবি ঘুরে দাঁড়ায়। দেখে অঞ্জলিও বার হয়ে এসেছে ঘর থেকে। ওর কপালের টিপটা ধেবড়ে গেছে! গায়ে ব্লাউজ নেই—রাত্রে সে খালি গায়েই শুয়েছিল। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। রবি বলে, প্রকাশ ফোন করছিল মেডিকেল কলেজ থেকে। এই মাত্র মেডিকেল কলেজ এমার্জেন্সি-রুমে কমলেশকে নিয়ে এসেছে। মারাত্মক একটা মোটর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে তার। মাথাটা থেঁৎলে গেছে, না বাঁচারই সম্ভাবনা।

সাত সকালে এই নৃশংস ঘটনার কথায় মর্মাহত হয় অঞ্জলি। কমলেশ মিত্রকে সে চেনে, ভাল করেই চেনে। লোকটার চোখে-মুখে কথা, আর তার কথায় কোন 'আড়' নেই। বিয়ের পরেই রবি কিছু বন্ধু-বান্ধবকে একটা ঘরোয়া নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই তখনই কমলেশের সঙ্গে অঞ্জলির প্রথম পরিচয়। লোকটা উচ্ছ্বসিত ভাবে নববধূর রূপের প্রশংসা করেছিল। মনে আছে অঞ্জলির—সে রাত্রে সে রবিকে বলেও ছিল: তোমার বন্ধু একটা অসভ্য!

রবি হাসতে হাসতে বলেছিল, কমলের কথায় কিছু মনে কর না। ও একটা পাগল!

অঞ্জলি দেখল, ইতিমধ্যে রবি জামাটা গায়ে চড়িয়েছে। বললে, চায়ের জলটা চাপিয়ে দিই, একেবারে বাসি মুখে—

—পেটে গরম চা পড়লেই এখন বাথরুমে যেতে হবে।

—তা ও-সব হাঙ্গামা মিটিয়েই যাও না বাপু। কতক্ষণ থাকতে হবে হাসপাতালে কে জানে?

রবি রাজী হয় না। বলে, মোটর-বাইকে যেতে আমার মিনিট পাঁচেক লাগবে। এত সকালে রাস্তা একেবারে ফাঁকা। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ঘুরে আসব।

সূর্য সেন স্ট্রীট থেকে মেডিকেল কলেজ মোটর বাইকের আরোহীর কাছে পাঁচ মিনিটের পথ। রবি বসুর কাছে বোধ হয় আড়াই থেকে তিন মিনিট। এমনিতেই সে বেপরোয়া, তায় সে পুলিসের ইন্সপেকটার—ট্রাফিস-রুলস্ মানার বালাই নেই!

অঞ্জলি রাগ দেখিয়ে বলে, এক বন্ধু তো মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে ঢুকেছেন, তুমি আর ঐ বাহাদুরীটা নাই বা দেখালে।

মনটা উদ্বিগ্ন না থাকলে রবি হয়তো হাসত, একটু আদর করত অথবা জবাবে জব্বর কিছু শুনিয়ে দিত; কিন্তু তার মন ছিল অন্য রাজ্যে—মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। যেখানে ইন্টারনাল হেমারেজ হচ্ছে ওর এক বন্ধুর মাথার ভিতর। বন্ধু? হ্যাঁ, বন্ধু বইকি! যদিও কমলেশ মিত্রকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে আজকাল ওর মন চায় না। তবু এতদিনের অভ্যাসটাও ছাড়তে পারেনি। কমলেশ, প্রকাশ, সুদীপ আর রবি সেই যাকে বলে হাফপ্যান্ট যুগের বন্ধু। চারজনে একই ক্লাসে পড়ত—গোলদীঘির ধারে ঐ হিন্দু স্কুলে। একই সঙ্গে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে। প্রকাশ ফার্স্ট ডিভিশনে, ও আর সুদীপ সেকেন্ড আর কমলেশ কোনক্রমে টিকিয়ে টিকিয়ে। তারপর কিছুটা ছাড়াছাড়ি হয়েছিল অবশ্য—প্রকাশ গেল মেডিকেল পড়তে, সুদীপ কমার্স। রবি নিল পুলিসের চাকরি আর কমলেশ হল ফ্রি-লান্সার। কমলেশ মিত্র বাপের এক ছেলে এবং বাবা রীতিমতো বড়লোক। স্কুলজীবনে পুঁটিরাম মোদকের দোকানে, কিম্বা গোলদীঘির পিছনে সরবতের দোকানে বন্ধুদের আড্ডায় বিল মেটানোর দায় বরাবর কমলেশই নিত—সেদিক থেকে ছেলেটা ছিল দিল-দরিয়া। প্রকাশ কলেজে এবং রবি পুলিসের ট্রেনিঙে ঢোকার পরেও কফি হাউসে কমশেলই বরাবর বিল মেটাতো। স্কুলে থাকতেই সে বিগড়ে যায়। প্রথমে সিগ্রেট, পরে গাঁজা, শেষে মদ। কলেজের খাতায় নাম লিখিয়েছিল, কিন্তু ক্লাস করার চেয়ে ক্লাস কাটার দিকেই ঝোঁকটা ছিল বেশি। বছর কয়েক টানা-হেঁচড়া করে ঢাকি শুদ্ধ মা সরস্বতীকে বিসর্জন দিয়ে আসে গঙ্গায়। ঢোকে সিনেমা লাইনে। তখন থেকেই বাপের সঙ্গে মনান্তর। দু'একবার ছোটখাটো সাইড রোল পেয়েছিল। কিন্তু পাত্তা পেল না। কিছুদিন 'মানিক'দার গল্প শোনালো, কিছুদিন 'ঋত্বিক'দার। নেক্সট বইয়ের সে নাকি হিরো হচ্ছে! নাকে ঝামা ঘষে দেবে এবার উত্তম অথবা সৌমিত্রের। কিন্তু কোথায় কী? কিছু দিনের মধ্যেই ছেড়ে দিল সিনেমা লাইন। বাপের সুপারিশে ঢুকল সংবাদপত্র অফিসে। রবি অবাক হয়ে বলেছিল—তুই সংবাদপত্রের অফিসে কী চাকরি করবি রে? এক পাতা বাঙলা লিখতে হলে তুই যে বাইশটা বানান ভুল করিস! কমলেশ বলেছিল, ও-সব ম্যানেজ হয়ে যাবে! তা গেছে। এখন সে বেশ মোটা মাইনে পায়। ওর বাবা গত হয়েছেন। ফলে এখন তাকে শুধু সচ্ছল নয়, ধনীই বলা চলত। তা বলা চলে কিনা রবি ঠিক জানে না—কারণ এই তিন-চার বছরে কমলেশ যে-হারে টাকা উড়িয়েছে তাতে কুবেরের পক্ষেও দেউলিয়া হওয়া উচিত। কমলেশ থাকে একটা ফ্ল্যাটে—চাকর সম্বল। পৈত্রিক বসত-বাড়িতে ওর মাথা গলানোর উপায় নেই। সেটা ওর বাবা দিয়ে গেছেন কমলেশের স্ত্রী অনুপমাকে। অনুপমার সঙ্গে কমলেশের বনিবনাও নেই। সেপারেশন চলছে। রবি কানাঘুষা শুনেছিল, ডিভোর্সের মামলাও নাকি দায়ের করা হয়েছে। সেটা আদালতে ঝুলছে। কমলেশের নতুন বান্ধবী নাকি মীনাক্ষী—ঐ সিনেমা জগতেই আলাপ। সে বেচারিও নাকি বৃপালী পর্দায় ঢুকতে পারেনি, এখন সোনালী স্বপ্ন দেখছে। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের এটাই নাকি মূল কারণ।

তা হোক। সেটা কমলেশের ব্যক্তিগত ব্যাপার। রবি কমলেশকে শ্রদ্ধা করে না, ভালও বাসে না, কিন্তু তবু সহপাঠী তো বটে। ছেলেটার মধ্যে একটা অদ্ভুত উন্মাদনা আছে। মাঝে মাঝে এসে হাজিরা দেয় রবির ফ্ল্যাটে। সেদিন তার উচ্চকণ্ঠের দরাজ হাসিতে সচকিত হয়ে ওঠে রবির প্রতিবেশীরা। অঞ্জলিও সেদিন চঞ্চল হয়ে ওঠে ওর বেপরোয়া মদ্যপ বন্ধুর ভয়ে। অনুপমার ব্যাপারে একদিন ঝগড়া করে রবি ওকে মারতে পর্যন্ত উঠেছিল। তা হোক—তবু লোকটা বেঘোরে মারা যাবে!

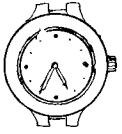

অবশেষে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নৈঃশব্দকে বিদীর্ণ করে রবি বসুর মোটর বাইক এসে থামল এমার্জেন্সি বিভাগের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে রবি এগিয়ে গেল এমার্জেন্সি-রুমে। ঘরে প্রকাশ নেই। ডিউটিতে ছিল আর একজন ছোকরা ডাক্তার। রবি এগিয়ে এসে বললে, ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্ত আছেন?

—আছেন। এইমাত্র একটি এমার্জেন্সি কেস এসেছে। তাকে অ্যাটেন্ড করছেন।

—মোটর অ্যাকসিডেন্ট কেস?

—হ্যাঁ। বাঁ পায়ের 'ফিমার বোন'-এ কম্পাউন্ড ফ্যাকচার হয়েছে।

—বাঁ পা? মাথায় নয়?

—মাথাতেও হয়ে থাকতে পারে, আমি দেখিনি লক্ষ্য করে। এই তো মিনিটপাঁচেক আগে এল কেসটা। ভিতরে নিয়ে গেল—

রবি চমকে ওঠে। তা কী করে হয়। পাঁচ-মিনিট আগে কেসটা এসেছে মানে? কুড়ি মিনিট আগেই তো সে টেলিফোনে খবরটা জানতে পেরেছিল। হঠাৎ ওর মনে হল, ছেলেটি বোধহয় অন্য একটা কেসের কথা বলছে। অর্থাৎ কমলেশের পরে যে কেসটা এসেছে এমার্জেন্সিতে। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, আমার নাম রবি বসু, প্রকাশ সেনগুপ্ত আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। সে আমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে, আমাদের দুজনেরই কমন-ফ্রেন্ড কমলেশ মিত্র একটা মোটর অ্যাকসিডেন্ট-এ আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছে। সে অবিলম্বে আমাকে চলে আসতে বলেছিল। বলেছিল, কমলেশের মাথায় আঘাত লেগেছিল, পায়ে নয়। অথচ—

ছেলেটি একটা রেজিস্টারের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, আয়াম সরি। আমি ভেবেছিলাম আপনি অমল বাবুর কথা বলছেন।—কমলেশ মিত্র? দাঁড়ান দেখছি—

খাতা উল্টে-পাল্টে দেখে ছেলেটি ফতোয়া জারি করল। না, কমলেশ মিত্র নামে কোন পেশেন্ট আসেনি আজ সকালে। মোটর অ্যাকসিডেন্ট কেস্ একটাই এসেছে। এই অমল সোমের।

রবি চমকে ওঠে, কী নাম বললেন? অমল সোম? সেও আমার আর এক বন্ধুর নাম। আই মীন, আমাদের দুজনেরই বন্ধু—

—তাহলে ডক্টর সেনগুপ্ত আপনাকে টেলিফোনে 'অমল' বলেছেন আর আপনি 'কমল' শুনেছেন।

রবি মাথা নেড়ে বলল, তাও তো সম্ভব নয়। ও যে স্পষ্ট বললে হেড-ইঞ্জুরি, মাথার ভিতর ইন্টার্নাল হেমারেজ হচ্ছে—পায়ের কথা সে আদৌ বলেনি।

—তা হলে হয়তো হেড-ইঞ্জুরিও হয়েছে। আমি ঠিক জানি না। এই মাত্র এল তো—

—এই মাত্র মানে? ঠিক কটায়?

আবার খাতা দেখে ছেলেটি বললে, আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী পাঁচটা সাতাশে।

—স্ট্রেঞ্জ! প্রকাশ আমাকে ফোন করেছিল ঠিক পাঁচটা পনেরোয়!

—আপনার ঘড়ি বোধহয় স্লো হয়ে গেছে।

রবি তার হাতঘড়িটা বাড়িয়ে ধরে। দেখা গেল, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের দেওয়াল-ঘড়ির সঙ্গে সেটা কাঁটায়-কাঁটায় সময় দিচ্ছে।

ছেলেটি কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বললে, কী-জানি মশাই। ডক্টর সেনগুপ্ত একটু পরেই আসবেন। তখন আপনার এ হ্রেঁয়ালীর ফয়শালা হবে! সিগ্রেট চলবে?

একটি সিগ্রেট বার করে দেয়। নিজেও ধরায়। বলে, আমার নাম মৈনুল হক চৌধুরী। ডক্টর সেনগুপ্ত আমার এক বছরের সিনিয়ার।

রবি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বললে, কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে?

হঠাৎ ডক্টর হক-চৌধুরী বলে, আমার মাথায় একট আইডিয়া এসেছে। আজ কত তারিখ?

—পয়লা। কেন?

—এবং মাসটা এপ্রিল, তাই নয়? দুইয়ে-দুইয়ে চার!

রবি বিরক্ত হয়ে বলে, অসম্ভব! ডঃ সেনগুপ্ত একজন রেস্‌পন্সিবল্ অফিসার—চ্যাঙড়া নয়। মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে এমন 'প্র্যাক্‌টিকাল জোক' সে নিশ্চয় করবে না। আর তাছাড়া কমল না হলেও অমল তো সত্যিই আহত হয়েছে—

—কিন্তু সে যে হাসপাতালে এসেছে পাঁচটা সাতাশে। তার বারো মিনিট আগে কি ডক্টর সেনগুপ্ত টেলিপ্যাথিতে খবর পেলেন যে, অমন একটা কেস আসছে?

রবির আবার সব কিছু গুলিয়ে যায়।

আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডঃ সেনগুপ্ত বার হয়ে এল। রবিকে দেখেই বললে, এসেছিস্? অমলের পা-টা বোধহয় বাঁচানো যাবে না। অ্যাম্পুট করতে হবে। অর্থোপেডিক সার্জেন দেখছেন! ওর বাড়ির লোকরা এখনও কিছু জানে না। তুই খবর দিবি?

—দিচ্ছি—তাহলে হেড-ইঞ্জুরি নয়?

—না, না—মাথায় কিছু হয়নি। শুধু বাঁ পা-টা—

—কিন্তু তুই যে তখন টেলিফোনে বললি—মাথার ভিতর ইন্টার্নাল হেমারেজ—

প্রকাশ অসহিষ্ণুর মত বলে ওঠে, সে-সব পরে হবে রবি। আগে অমলের বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার। ওদের ফোন নেই—বাড়ি তো তুই চিনিস—

রবি উঠে দাঁড়ায়। বলে, খবর আমি এখুনি দিচ্ছি প্রকাশ, কিন্তু আমার প্রশ্নটা তুই এড়িয়ে যাচ্ছিস। আমার প্রশ্নের জবাবটা আগে দে। তুই কেন বললি, 'কমল' আহত হয়েছে!

—কমল? আমি বলেছি?

—হ্যাঁ, বলেছিস। বলেছিস 'কমল যখন অফিস থেকে ফিরছিল'—,তুই জানিস না অমল সোম এ.জি.ডবলু.বি-তে চাকরি করে? তার ছুটি হয় বিকাল সাড়ে পাঁচটায়?

—প্লীজ রবি। ঐ সব ছেঁদো কথা নিয়ে কি এখন সময় নষ্ট করা উচিত?

টেবিলে একটা চাপড় মেরে রবি উচ্চকণ্ঠে বলে, আলবাৎ উচিত! আগে কৈফিয়ৎ দে?

একজন নার্স থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এমার্জেন্সি-রুমের দোরগোড়ায়।

প্রকাশ আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে বললে, লুক হিয়ার রবি! এটা হাসপাতাল! চেঁচামেচি করিস না—

—আলবাৎ করব! বল্—কেন মিথ্যা কথা বলেছিলি?

ডক্টর হক চৌধুরীও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলে, মিস্টার বোস, আপনি খামকা উত্তেজিত হচ্ছেন—

রবি এক ধমকে তাকে থামিয়ে দেয়, আপনি থামুন তো মশাই। আই ওয়াণ্ট টু নো হোয়াই দিস্ লায়ার...

—রবি!—এবার প্রকাশও গলা চড়ায়। বলে, পুলিসে চাকরি করিস বলেই ভদ্রতা জ্ঞান থাকবে না এমন কোন কথা নেই। তুই যদি ভদ্রভাবে কথা বলতে না পারিস তোকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলতে বাধ্য হব আমি। এটা হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড। তোর থানা নয়—

এমার্জেন্সির খোলা দরজার সামনে ততক্ষণে রীতিমত একটা জটলা।

রবি বললে, ভদ্রলোকের সঙ্গেই ভদ্র ব্যবহার করতে হয় প্রকাশ। তোর মত ছোটলোক মিথ্যেবাদীর সঙ্গে আবার ভদ্রতা কি রে!

—আই সে—লীভ দিস্ রুম! ইম্মিডেটলি!

—ঠিক আছে! আমিও দেখে নেব!—হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায় রবি বোস।

ডক্টর মৈনুল হক-চৌধুরীও বেরিয়ে আসে পিছন পিছন। কাছে এসে বলে, আপনার রাগ করবার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু মিস্টার বোস—হাজার হোক এটা হাসপাতাল। আর ভুলে যাবেন না, উনি এক্ষুণি একটা মরণাপন্ন রুগীকে অ্যাটেন্ড করে এলেন, যে লোকটা...যে লোকটা আপনাদের দুজনেরই বন্ধু।

—আয়াম সরি, ডক্টর চৌধুরী। আপনার সঙ্গে আমি অহেতুক রূঢ় ব্যবহার করেছি। আমি...আমি সত্যই দুঃখিত।

—ঠিক আছে। সেটা কিছু নয়। তাহলে ঐ পেশেন্ট-এর বাড়িতে খবরটা আপনিই পৌঁছে দিচ্ছেন তো?

—নিশ্চয়! কমল-অমল দুজনেই আমার বন্ধু! কিন্তু প্রকাশকে আমি দেখে নেব!

ভটভটিয়া গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল পটুয়াটুলির দিকে। কমলেশ মিত্র নয়, অমল সোমের বাড়ির দিকে।

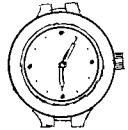

কলিং-বেলটা বেজে উঠতেই অঞ্জলি বললে, ও মুন্নির মা, সদরটা খুলে দাও তো। বাবু ফিরে এলেন বোধহয়।

মুন্নির মা ঠিকে ঝি। সকালবেলা এসে বাসন-মাজতে বসেছিল কলতলায়। গৃহকর্ত্রীর নির্দেশে সে হাত ধুয়ে সদর দরজা খুলে দিতে গেল। তখনই মনে হল অঞ্জলির—কিন্তু কই, মোটরবাইকের শব্দ তো হয়নি! রবি বোস যখন বাড়ি ফেরে তখন সারা পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়। চুপি চুপি তার আসার উপায় নেই! তাহলে কেএল? মাসের প্রথম দিন—এ সময়ে অনেকেই আসতে পারে: খবরের কাগজওয়ালা, মিল্ক সাপ্লাই কোম্পানির লোকটা, কিম্বা—

মুন্নির মা ফিরে এসে বললে, একজন ভদ্দরলোক। বাবুর বন্ধু বোধহয়।

—বন্ধু? বন্ধু কেমন করে জানলে? দেখতে কেমন?

মুন্নির মাকে জবাব দিতে হল না। তার আগেই দরাজ-গলায় কে যেন বলে ওঠে, দেখতে কন্দর্পকান্তি নয়! তবু বন্ধুই!

রীতিমত আঁৎকে ওঠে অঞ্জলি। খোলা দরজা পেয়ে লোকটা অনায়াসে এগিয়ে এসেছে! অঞ্জলি ঘর দোর সাফ করছিল, তখনও গায়ে ব্লাউসটাও চড়ায়নি। কোনক্রমে গায়ে আঁচলটা জড়িয়ে বললে, আপনি বাইরের ঘরে বসুন। আসছি!

কমলেশ বিনা বাক্যব্যয়ে গিয়ে বসল বৈঠকখানায়। অঞ্জলি আয়নায় মুখটা একবার দেখে নেয়। আঁচল দিয়ে ঘষে কপালের টিপটা তুলে ফেলে, ব্লাউজটা গায়ে দেয়। কাপড়টা আর পালটায় না, টেনেটুনে ঠিক করে নেয়।তারপর আঁচলে মুখটা মুছতে মুছতে বাইরের ঘরে এসে ফ্যানটা খুলে দিয়ে বলে, কী ব্যাপার? আপনি বহাল তবিয়তে আছেন, অথচ আজ সাত-সকালে প্রকাশবাবু টেলিফোনে—

কথাটা তার শেষ হয় না। হঠাৎ নজরে পড়ে কমলেশ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। সে মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অকারণেই ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে অঞ্জলি। ও থামতেই কমলেশ বললে, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু আপনাকে।

রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়ে অঞ্জলি। সে তো জানে, প্রসাধনের বাষ্পমাত্র নেই তার সারা অঙ্গে। নিতান্ত ঘরোয়া সাজ—বস্তুত নেহাৎ বাধ্য না হলে এ অবস্থায় সে বাইরের লোকের সামনে বের হত না।

তাহলে এ ব্যঙ্গোক্তির অর্থ? কমলেশ যে মদ্যপ এ খবর অঞ্জলির না-জানা নয়; কিন্তু এই সাত সকালে সে নিশ্চয় এক পাঁট মদ গিলে আসেনি। তাহলে?

কমলেশ একই সুরে বলতে থাকে, প্লীজ ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। আই মীন, এ লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে তো আর লক্ষ্মীর ঠাঁই হল না—তাই এমন ঘরোয়া আটপৌরে বেশে আপনাদের দেখতে ভা-রি ভাল লাগে আমার।

যথেষ্ট দূরত্ব রেখে অঞ্জলি একটি সোফায় বসে পড়ে। চোখে চোখ রাখতে পারে না। তবু বলে, তা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থাকবার দরকারই বা কী? অনুদিকে—

—থাক ও কথা!—কমলেশ ওকে থামিয়ে দেয়। বলে, রোবে হারামজাদাটা কি বেরিয়ে গেছে?

একটু ক্ষুণ্ণ হল অঞ্জলি। নির্জন ঘরে বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপে তার স্বামীর উল্লেখে যে বিশেষণগুলি শিষ্টাচার-সম্মত, কমলেশ তার সীমা ছাড়িয়েছে। এক মুহূর্ত আগে ঐ লোকটার মুগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে এ-ভাষাটা অত্যন্ত বেমানান। কিন্তু ঐ রকমই মানুষ কমলেশ। কোন পরিবেশে কী জাতীয় কথা বলতে হয় তা সে জানে না।

অঞ্জলি জবাবে বলে, হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—প্রকাশের একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক! কোনও মানে হয়? ভোর পাঁচটার সময় হাসপাতাল থেকে আমার অফিসে ফোন করেছে। বললে, রোবে হারামজাদাটাকে—

কী জানি কেন আর থাকতে পারল না অঞ্জলি! বাধা দিয়ে ওঠে—না!

—না? কী না?

—প্রকাশবাবু নিশ্চয়ই ঐ বিশেষণটি ব্যবহার করেননি!

খেয়াল হয় কমলেশের। ম্লান হাসে। স্বীকার করে অপরাধ—ঠিকই বলেছেন, অঞ্জলি দেবী! প্রকাশ ও-ভাষায় কথা বলেনি। এ অশালীন ভাষাটা আমার, নিতান্তই আমার। কী করব বলুন, আমি সেই আদিম, বর্বর, জংলীই রয়ে গেলাম...

—যাক্ যা বলছিলেন তাই বলুন।

সুর কেটে গেছে। তবু পুরানো কথার খেই ধরে শেষ করে, প্রকাশ টেলিফোনে বললে, রোবেটাকে 'এপ্রিল ফুল' করা যাক। ওকে টেলিফোন করে বলি, তুই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলি, অ্যাকসিডেন্ট করে আমার এমার্জেন্সিতে এসেছিস। আমি বারণ করেছিলাম, প্রকাশটা শুনলে না। তাই অফিস থেকে সোজা চলে এসেছি আপনাদের বাসায়।

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললে, এতটা বয়স হল, তবু 'এপ্রিল ফুল' করার মত ছেলেমানুষী ঘুচল না আপনাদের?

কমলেশ একটা চুরুট ধরালো। বললে, এতটা বয়স হল মানে? কী এমন বয়স হয়েছে আমাদের? পঁয়ত্রিশ? ছত্রিশ? ছেলেমানুষী করার বয়স কি নিতান্তই পেরিয়ে গেছে বলতে চান অঞ্জলি দেবী?

অঞ্জলি জবাব দিতে সাহস পেল না। বাড়িতে ওরা দুজন ছাড়া মুন্নির মা অবশ্য আছে। কিন্তু 'আদিম-বর্বর-জংলী' মানুষটা এ নির্জন ঘরে ছেলেমানুষীর প্রমাণ দিতে হয়তো সেটা ভ্রুক্ষেপ করবে না। তাই কথা ঘোরানোর উদ্দেশ্যে বললে, চা খাবেন?

—অফ কোর্স। তবে খালি পেটে নয়। যা হোক কিছু বানান!

ফরমায়েস করে সে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে থাকে। খাওয়ার সঙ্গে জুতোর ফিতে খোলার কী সম্পর্ক অঞ্জলি বুঝে উঠতে পারে না। পরমুহূর্তেই রহস্যটা পরিষ্কার করে দেয় কমলেশ, চা বানাতে আপনার পনের-বিশ মিনিট সময় লাগবে নিশ্চয়। আমি বরং ততক্ষণ একটু লম্বা হই। সারারাত ঠায় চেয়ারে বসে বসে মাজা ধরে গেছে!

লম্বা হওয়ার মত আয়োজন বৈঠকখানায় নেই। শয়নকক্ষে কমলেশকে আহ্বান করা চলে না। অঞ্জলি কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকে। জুতো খুলে কমলেশ উঠে দাঁড়ায়। টাইটা খুলে ফেলে, কোটটাও।

ধুপধাপ ফেলে দেয় সোফায়। বলে, মিনিট পনের রোবের খাটে শুয়ে নিলে নিশ্চয় আপনি আপত্তি করবেন না, কী বলেন?

কাষ্ঠ-হাসি হাসল অঞ্জলি। হাঁ-না বলতে পারল না।

—চা তৈরী হয়ে গেলে এখান থেকেই হাঁক পাড়বেন। চা নিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে না। আমি নিজেকেও অতটা বিশ্বাস করি না!

অঞ্জলি কাঁটা হয়ে বসে দাঁড়িয়ে থাকে। জুতো-মোজা পড়ে থাকল; কোট-টাইগুলোও। কমলেশ বিনা অনুমতিতে খাবার ঘরটা পার হয়ে সোজা ঢুকে পড়ল ওদের বেডরুমে। ওখান থেকেই বললে, নেহাৎ যদি ঘুমিয়ে পড়ি একটু ঘুমোতেই দেবেন—রোবে ফিরে এলে এক সঙ্গে চা খাব—হয়তো ঠ্যাঙানিও!

খাবার ঘর থেকেই দেখতে পেল অঞ্জলি—কমলেশ ফ্যানটা খুলে দিল। একটানে শার্টটা খুলে ফেলল, ঘামে ভেজা গেঞ্জিটাও। রোমশ একটা চওড়া বুক! রবির বুকে কিন্তু লোম নেই! দরজাটা ভেজিয়ে দিল কমলেশ! খুট করে আওয়াজও হল—ছিটকিনি দিল নাকি? কেন? চকিতে মনে পড়ল অঞ্জলির—আলমারিতে চাবি দেওয়া নেই। অবশ্য ভিতরের লকারটা চাবি দেওয়া। ওর গহনাপত্র, টাকা-কড়ি সবই ভিতরের লকারে। ওদের দাম্পত্যজীবনের কিছু গোপন ইতিহাসও আছে সেখানে। কিন্তু কমলেশ নিশ্চয় বন্ধ ঘরের সুযোগে আলমারি খুলে হাতড়াতে বসবে না। তবে ভিতর থেকে সে ছিটকিনি দিল কেন?

অঞ্জলি বৈঠকখানায় এসে ওর পরিত্যক্ত কোট আর টাইটা সংগ্রহ করল। ডাইনিং-রুম-এর আলনায় হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখল। চায়ের জলটা বসাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে হওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোটের পকেটে কমলেশের মানিব্যাগ ফেলে যাওয়া ঠিক নয়। একটু ইতস্তত করে অঞ্জলি ঐ কোটের ভিতর পকেটে হাত চালিয়ে দেয়। যা ভেবেছে। ভারি একটা ওয়ালেট। সেটা নিয়ে ও রান্নাঘরে ফিরে আসে। হীটারে চায়ের জলটা বসিয়ে দেয়। মানিব্যাগটা কোথায় রাখবে? প্রশস্ত স্থান হচ্ছে শোওয়ার ঘরের আলমারি। সেখানে রাখা যাবে না। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ না থাকলেও সে সাহস সঞ্চয় করে ঐ ঘরে ঢুকতে পারত না। কমলেশই তো বলেছে, সে আদিম, বর্বর, জংলী! তাছাড়া সাবধানবাণী তো সে নিজেই শুনিয়ে গেছে। কথাটা এখনও বাজছে কানে: আমি নিজেকেও অতটা বিশ্বাস করি না।

অঞ্জলির মনে পড়ল—একটু আগেই সে ভেবেছে—আলমারির পাল্লাটা কমলেশ স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধে খুলে দেখবে না। সে নিজে কিন্তু সে আইন মানল না। স্ত্রীলোক বলেই বোধ করি। কমলেশের মনিব্যাগটা সে খুলে দেখল। তাতে একশ টাকার নোট আছে পাঁচখানা, এ-ছাড়া পাঁচ-দশ টাকারও কিছু। আর আছে কিছু ভিসিটিং কার্ড। এবং একটি ফটোগ্রাফ। একটি মেয়ের। অঞ্জলিরই বয়সী। কিন্তু সাজ পোশাক মোটেই আটপৌরে নয়। মুখখানা রীতিমত এনামেল করা। ভুরু কামিয়ে এঁকেছে। ভুরু কামানো চেহারা দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যায় অঞ্জলির—কী রূপই খোলে! বুঝতে অসুবিধা হয় না—ক্ষৌরীকৃত-ভ্রূ সুন্দরীটি মীনাক্ষী মজুমদার। সেই যে মেয়েটা কমলেশের গৃহলক্ষ্মীকে গৃহ-ছাড়া করেছে।

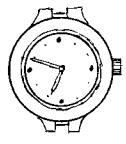

রবি যখন তার বাহনের গর্জনে পাড়া সচকিত করে বাড়ি ফিরে এল ততক্ষণে কলকাতা শহর রীতিমতো সরগরম। মুন্নির মা হরিণঘাটা ডিপো থেকে দুধ এনে দিয়েছে। খবরের কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেছে। অঞ্জলির উনানে তখন ডাল সিদ্ধ হয়ে গেছে, সাঁতলানোর আয়োজন হচ্ছে। দ্বার-পথ থেকেই রবির বলে ওঠে, বাজারের থলি আর টাকা দাও।

বাজারের জন্য রবিকে রোজ হাত পাততে হয় গৃহলক্ষ্মীর কাছে— কারণ মাসকাবারী টাকা অঞ্জলির কাছেই থাকে। মাস কাবার হয়ে গেছে, তবুও। অঞ্জলি এগিয়ে এসে বলে, বাজার থাক। শোন, ইতিমধ্যে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। তোমার বন্ধু এসেছিলেন—

—বন্ধু! কে বন্ধু? কখন?

—যাকে দেখতে তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে—কমলেশবাবু। তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই। আমার এমন ভয় করছিল, জান—

—ভয়? কেন? ভয় করার কী আছে?

—ভয় করবে না? লোকটা বললে 'ঘুম পাচ্ছে'! বলেই সোজা ঢুকে পড়ল আমাদের শোবার ঘরে। তারপর ধড়াশ করে শুয়ে পড়ল তোমার বিছানায়।

—বল কী! কমলেশ এসেছিল? কেন?

—তোমাকে প্রকাশবাবু এপ্রিল ফুল করায় সে নাকি মর্মাহত!

—তাই সে অমনি আমার ঘরে এসে আমার খাটে ধড়াশ করে শুয়ে পড়ল? বাঃ! তুমি ঢুকতে দিলে কেন?

—বা রে! আমি কী করব?

এর বেশি কী-বা বলতে পারে অঞ্জলি? এমনিতেই সে কিছুটা গোপন করেছে। মিথ্যা কথা বলেছে। কমলেশ রবির বিছানাতেও আদৌ শোয়নি। শুয়েছিল অঞ্জলির বিছানাতেই। পাশাপাশি সিঙ্গল-বেড খাট; ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে ভুলটা বুঝতে পেরেছিল কমলেশ। যাবার সময় সে-কথা সে স্বীকার করে গেছে। চা খাবার খেয়ে, জামা-জুতো পরে রওনা দেবার জন্য যখন সে তৈরী তখন অঞ্জলি বলেছিল, আপনার মানিব্যাগটা—

—মানিব্যাগ? কেন? আমার পকেটে নেই—ইনসাইড-পকেট হাতড়াতে থাকে।

—ওখানে নেই! আমি সরিয়ে রেখেছিলাম, নিন—ব্লাউসের ভিতর থেকে মানিব্যাগটা বার করে বাড়িয়ে ধরেছিল অঞ্জলি।

কমলেশ বিচিত্র হেসে বলেছিল, আমি চলে যাচ্ছি, আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আপনি নিশ্চয় নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছেন, কিন্তু আমার মানিব্যাগটা তাতে রাগ করেছে অঞ্জলি দেবী।

অঞ্জলি বুঝে উঠতে পারে না ধাঁধাটা। বললে, তার মানে?

—মানিব্যাগটা আমাকে বলছে—তুমি যদি ঐ নরম বালিশে মাথা রেখে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে, তাহলে আমিও শুয়ে থাকতাম নরমতর বালিশে!

অঞ্জলি রীতিমতো রাঙিয়ে উঠেছিল। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে এ জাতীয় রসিকতা করা চলে কি না জানা নেই বেচারির। কমলেশ-মীনাক্ষীর মতো সে পার্টিতে যায় না—এ জাতীয় কম্‌প্লিমেন্টস্ ওদের সমাজে স্বাভাবিক কিনা,তাও জানা নেই। জবাব জোগায় না তার মুখে। কমলেশ নিজে থেকেই বলেছিল, যাক ও কথা! অসভ্য জংলী মানুষটার কথায় কান দেবেন না; কিন্তু যাবার আগে আর একটা কথা আমার না বললেই নয়। আপনার কাছে আর একটি কারণে অপরাধী হয়ে আছি। ক্ষমা চেয়ে নিই—

কথা না বাড়ালেই চলত, তবু এমন ভাবে কথাটা শেষ হল যে, এর পর অঞ্জলিকে প্রশ্ন করতেই হল—কী আবার অপরাধ?

—রবির বিছানায় শোবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি ভুল করে শুয়েছিলাম আপনার বিছানায়।

কৌতূহল দমন করতে পারেননি অঞ্জলি। বলে, কী করে বুঝলেন?

মানিব্যাগটা আঘ্রাণ করে কমলেশ বলেছিল, এই মানিব্যাগটাই আমাকে বলে দিচ্ছে। পুলিসের দারোগা নিশ্চয়ই ক্যাম্থারাইডিন মাখে না?

এ সব কথা অঞ্জলি খোলাখুলি বলেনি তার স্বামীকে। বলা যায় না। অর্থাৎ না বলাই মঙ্গল। যেমন কাঠ-গোঁয়াড় মানুষ—কে জানে কীভাবে নেবে কথাটা। তাই কমলেশ যে ভুল ক'রে—ভুল করেই তো.... শুধু জানালো মোটামুটি ঘটনাগুলো। কমলেশ এসেছিল, জামা জুতো খুলে—হ্যাঁ, রবির বিছানায় শুয়েছিল। মুন্নির-মা ডেকে দেওয়ায় উঠে এসে চা-টোস্ট-অমলেট খায় এবং ঠিক সাড়ে ছয়টায় চলে যায়।

—এরপর আমি বাড়িতে না থাকলে ওকে ঘরে ঢুকতে দিও না।মাতালটা কখন কী করে বসে ঠিক কি? দাও, বাজারের থলিটা দাও—

অঞ্জলি বাজারের থলিটা আনতে যায়।

ইতিমধ্যে রবি অমলের বাড়িতে দুঃসংবাদটা দিয়ে এসেছে। মুখ হাত ধুতে ধুতে সেই গল্পটা শোনাচ্ছিল অঞ্জলিকে। অঞ্জলি ততক্ষণে ডাল সাঁৎলিয়ে আবার চায়ের জল বসিয়েছে। খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে রবি শোবার ঘরে ঢুকে যায়। অঞ্জলি রান্নাঘর থেকেই বলে ওঠে—কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় এখনও ঢোকেনি বাপু। অমলবাবু হাসপাতালে এসে পৌঁছানোর আগেই কেমন করে প্রকাশবাবু তোমাকে ফোন করলেন—'কমল'-'অমল' যাই বলে থাকুন না কেন?

রবি জবাব দিল না। সে হঠাৎ বেরিয়ে এল শোবার ঘর থেকে। হঠাৎ যেন কোন জরুরী কথা মনে পড়ে গেছে তার। বার কতক টেলিফোনে কী নম্বর ডায়াল করল। কথাবার্তা কী হল কানে যায়নি অঞ্জলির। হঠৎ তার লক্ষ্য হল, রবি আবার জামা জুতো পরছে।

—নাও বাজারের থলি। মাছ যদি না পাও ভালো মতো।

—বাজার থাক। যা হোক ভাতে-ভাত রান্না করে রেখ। আমি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চাই—

—কি হবে তলিয়ে দেখে? শোন—শুনে যাও!

কে কার কথা শোনে। মোটর-বাইকটা ঠেলতে ঠেলতে রবি আবার পথে নামে। রেডিওতে তখন বাঙলা খবর চলছে।

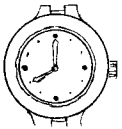

ডক্টর সেনগুপ্ত নাইট ডিউটি সেরে যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন ওদের বাড়িতে অফিস-কলেজ যাত্রীরা সবাই সচকিত। প্রকাশদের বাড়িটা বড়। একান্নবর্তী পরিবার। ওরা তিন ভাই; ও-ই ছোট। এখনও বিয়ে করেনি। বাকি দুই দাদাও এ বাড়িতে আছেন সস্ত্রীক। ছোট বোন সতী এবার ইকনমিক্সে এম.এ. দেবে। বাড়িতে পদার্পণমাত্র সতী ঘোষণা করে—সুদীপদা ফোন করেছিল, বলেছে তুই এসেই যেন ফোন করিস। খুব জরুরী ব্যাপার।

যত জরুরীই হোক, প্রকাশ সর্বপ্রথমে বাথরুমে ঢুকল। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে ফোন করল সুদীপকে: কী রে? বাড়ি ফিরেই তোকে ফোন করতে বলেছিলি নাকি?

—হ্যাঁ, মানে...কোনও দারুণ, অসাধারণ রকমের দারুণ কোন খবর আছে তোর?

—যা ব্বাবা! তার মানে?

—সকালে কাগজ দেখেছিস?

—কাগজ? খবরের কাগজ? দেখেছি! কেন? কী আছে তাতে?

—ছাই দেখেছিস! ঠিক আছে! কাগজ দেখতে হবে না, আমারই দেখা আছে। শোন, কিছুদিন আগে আমরা তিন-চারজন—আই মীন, তুই, আমি কমলেশ, রোবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট লটারির টিকিট কিনেছিলাম একসঙ্গে—মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, মনে আছে। কেন?

—এখনও বুঝলি না? আমার টিকিটের নম্বর হচ্ছে C/506907! কী কাঠ বরাৎ দেখ মাইরি! ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছে ঐ 'সি' গ্রুপেই, আর নম্বরটা হচ্ছে, C/506909! আমরা ক'জন পর পর, মানে কন্‌জিকিউটিভ টিকিট হোল্ডার তো? তাই তোকে ফোন করে...হ্যালো...হ্যালো...হ্যালো!

সুদীপ বুঝতে পারেনি। ভেবেছে যান্ত্রিক গোলযোগে লাইনটা কেটে গেল বুঝি। আসলে তা নয়। উত্তেজনায় প্রকাশ টেলিফোনটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখেছে। তার হাতটা কাঁপছে! চলকে পড়ল কিছুটা চা। চায়ের কাপটা সে কোনক্রমে নামিয়ে রাখল। ফার্স্ট প্রাইজ যেন কত ছিল। সওয়া লাখ? ঐ অঙ্কটা কি সেই 'প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট কার' সমেত ?

সতী উঠে এসেছে ততক্ষণে—কী হল রে ছোড়দা? মাথাটা টলে উঠল?

—না! মাথা ঠিক আছে। শোন, তুই একটা কাজ করবি সতী? আমার টেবিলের ঐ বাঁ-দিকের দেরাজটা খোল—একটা টফির বাক্স আছে। নিয়ে আয় তো।

বিস্মিত সতী তৎক্ষণাৎ বাক্সটা নিয়ে আসে।

—ওটা খোল। একটা লটারির টিকিট আছে। পেয়েছিস?...হ্যাঁ, ঐ তো! দে তো ওটা...না থাক। দিতে হবে না। ওর নম্বরটা পড়ে শোনা শুধু!

সতীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে। সে কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না। আদেশমাত্র পড়ে শোনাতে থাকে: C/5...0...6...9...

চাপা গর্জন করে ওঠে প্রকাশ, জানি! জানি! লাস্ট ডিজিটটা বল—য়ুনিটের ঘরে যেটা আছে! শোন সতী! ঠিক মতো যদি বলতে পারিস—আমি বাদশা! তোকে...তোকে একটা স্টিরিও সেট রেডিওগ্রাম, কিম্বা টি-ভি—

—কী বকছিস পাগলের মত? কী হয়েছে বল তো?

প্রকাশ শান্ত হয়ে ওঠে। বলে, ঠিক আছে। আমি তৈরী...তুই আর কী করবি? যা ভাগ্যে আছে তাই হবে, বল নাম্বারটা...

—C/506908।

—এইট? ঠিক দেখছিস? এইট!

—এই দেখ না। টিকিটটা মেলে ধরে সতী।

প্রকাশ এলিয়ে পড়ে সোফায়। বলে, সতীরে। হাতের মুঠো থেকে ফস্‌কে গেল। ইস! ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছে আমার ঠিক পরের নাম্বারটা! 506909! সওয়া লক্ষ টাকা! কোন মানে হয়?

ফস্‌কে যখন গেছে তখন আর হা-হুতাশ করে কী হবে! তবু সতীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। ইস্! এখনই কী কাণ্ডটা ঘটতে যাচ্ছিল!

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে প্রকাশ। টেলিফোনটা নিয়ে ডায়াল করতে থাকে। কিন্তু টেলিফোনের ধরনই ঐ। অকাজে খোশগল্প করতে চাও তো একবারে লাইন পাবে, আর জরুরী প্রয়োজন থাকলে দুটো ডিজিট ডায়াল করতেই এনগেজড টোন!

সতী বলে, তুই তাড়াহুড়া করছিস। আমাকে দে ফোনটা। কত নম্বর?

প্রকাশ যন্ত্রটা হস্তান্তরিত করে। বলে, সুদীপ, আমি আর কমলেশ পর পর টিকিট পেয়েছিলাম। তিনটে কন্‌জিকিউটিভ নাম্বার হবেই। সুদীপের হচ্ছে 907, আমার 908। এখন লাস্ট চান্স কমলেশের। ফিফটি পার্সেন্ট চান্স। তার টিকিট নম্বর হয় 906 অথবা 909।

—কমলেশদার নম্বরটা কত তাই বল!

—আমিও তাই জানতে চাই। 906 না 909!

—হেত্তেরি! ওর টেলিফোন নাম্বারটা কত?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য টেলিফোনে যোগাযোগ হল; কিন্তু এতবড় সংবাদটা জানা গেল না। কমলেশ বাড়ি নেই। অফিস থেকে আদৌ ফেরেনি। কিন্তু অফিস থেকেই টেলিফোনে ভৃত্যকে নির্দেশ দিয়েছে, সে সপ্তাহখানেক বাড়ি ফিরবে না। কোথায় গেছে তা-ও জানে না কমলেশের গৃহভৃত্য।

রীতিমতো অবাক হল প্রকাশ। এর মানেটা কী? আজ ভোর পাঁচটায় সে প্রকাশকে এমার্জেন্সি রুমে ফোন করেছিল। কই, তখনও তো সে বলেনি, যে এক সপ্তাহের জন্য বাইরে যাচ্ছে।বরং বলেছিল, রবি হাসপাতালে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও এসে পড়বে। তা সে আসেনি। কমলেশের অফিসে ফোন করেও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। জানা গেল সে সাতদিনের ছুটিতে আছে।

কাল রাত্রে নাইট ডিউটি গেছে। এমন দিনে ও সকাল সকাল খেয়ে একটা টানা ঘুম দেয়। আজ কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। মেজবৌদি এসে বললেন, আর হা-হুতাশ করে কী হবে ভাই? বরাতে নেই

কো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কী? খেয়ে দেয়ে একটা ঘুম দাও।

তা ঠিক! কমলেশ প্রাইজটা পাক আর না পাক, সে যে পায়নি এটা তো প্রতিষ্ঠিত সত্য। স্নানাহার করে নিদ্রার ক্রোড়েই আশ্রয় নিল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না; হঠাৎ বাজল টেলিফোন। মেজবৌদি ছিলেন যন্ত্রটার কাছে। ওকে বললেন, তোমাকে খুঁজছে। মহিলা-কণ্ঠ। নাম জানাতে চায় না, মানে তোমাকে ছাড়া—

প্রকাশ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাকায় মেজবৌদির দিকে। অণিমা নিশ্চয় নয়। অণিমা তাকে বাড়িতে ফোন করে না কখনও। টেলিফোনটার কথা-মুখে বললে, প্রকাশ সেনগুপ্ত বলছি—

—ডক্টর সেনগুপ্ত, আমার নাম মীনাক্ষী মজুমদার। নামটা কখনও শুনেছেন?

—শুনেছি। যদি ভুল না করি তবে কমলেশের কাছে।

—হ্যাঁ, আমি সেই মীনাক্ষী! আপনাকে একটা খবর দেবার আছে। দারুণ খবর। দারুণ...দারুণ খবর...

প্রকাশের আনন্দিত হবার কথা; কিন্তু তার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। টিকিটটা একঘর আগু-পিছু হলে আজ মীনাক্ষীর বদলে সতী অথবা অণিমা তাদের বান্ধবীদের ঠিক এইভাবে ফোন করত। হয়ত কমলেশ সংবাদটা জানালে ওর এই প্রতিক্রিয়া হত না। মীনাক্ষীকে সে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় খবরটা বলতে দিল না। বরং উল্টে ডাহা মিছে কথা বললে, আমাকে জানাতে হবে না। কমলেশ নিজেই আমাকে জানিয়েছিল!

—কী খবর বলুন তো?

—বললাম তো, আমি জানি। কমলেশের টিকিটের নম্বরটা 506909! সবার আগে সে আমাকেই টেলিফোন করে জানায়।

—সবার আগে? কটার সময়?

—সকাল পাঁচটা দশ! কমলেশ কোথায়?

—এক মিনিট লাইনটা ধরুন তো। বলছি।

কথার কথা নয়,পুরো একটি মিনিটই লাগল। প্রকাশ বুঝতে পারে, মীনাক্ষীর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কমলেশ। মীনাক্ষী তাই যাচাই করে নিচ্ছে। মনে মনে হাসে প্রকাশ। এইবারে বেধে যাবে দুজনে। প্রাণের বান্ধবীর আগে কমলেশ কেন প্রকাশকে খবরটা দিয়েছে?

মিনিটখানেক পরে মীনাক্ষী বললে, আপনার বন্ধু কোথায় তা আমি জানি না। আমি দূতমাত্র। তার নির্দেশমত আজ বিকাল সাড়ে তিনটায় আপনাকে হোটেল হিন্দুস্থানে আসতে বলছি।

—সাড়ে তিনটেয়? এখন কটা?

—পৌনে দুটো! যদি কোন কারণে দেরি হয়ে যায়, সোজা ওর ঘরে চলে যাবেন। ওর রুম নাম্বার অবশ্য জানি না, সেটা কাউন্টারে জেনে নেবেন। ও আজ-কালের মধ্যে হোটেল হিন্দুস্থানে একটা পার্টি থ্রো করতে চায়। সেই বিষয়েই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবে। আই মীন, কাকে কাকে বলা যায়—

—আপনিও থাকবেন নিশ্চয় আলোচনায়?

—নিশ্চয়। আমিও রওনা হচ্ছি। ট্রাই টু বি পাঙ্কচুয়াল'

—আপনার ও নির্দেশটা বাহুল্য। আমি ডাক্তার। ঘড়ির কাঁটা মেনে চলি।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াতে যাবে মেজবৌদি বললেন, ভাগ্যবতীটি কে?

—ভাগ্যবতী মানে?—ফুঁসে ওঠে প্রকাশ।

মেজবৌদি মুখ টিপে বলেন, আমার শাঁসালো ব্যাচিলার দেবরটি যাঁর আহ্বানমাত্র গায়ে পাঞ্জাবি চড়ান, ঘড়ির কাঁটা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি ভাগ্যবতী নন?

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলে, ও হচ্ছে মীনাক্ষী মজুমদার। যার জন্য কমলেশের স্ত্রী ডিভোর্সের মামলা এনেছে।

সতী বলে, তাহলে কমলেশদার ভাগ্যটাই খুলেছে! উঃ! ঈশ্বরের কী সূক্ষ্ম বিচার! তেলটা ঢালার আগে ঠিক দেখে নিয়েছেন কোন মাথাটা সবচেয়ে তৈলাক্ত!

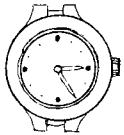

হোটেল হিন্দুস্থানের পার্কিন প্লেসে গাড়িটা রেখে প্রকাশ প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে এল। বাতানুকূল করা লাউঞ্জটা পার হয়ে রিসেপশান কাউন্টারে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েটিকে ইংরাজিতে প্রশ্ন করল, মিস্টার কমলেশ মিত্রর রুম নম্বরটা কত?

মেয়েটি রেজিস্টার দেখে বললে: 528।

—মিস্টার মিত্র কি ঘরে আছেন?

মেয়েটি তার পিছনে নম্বর দেওয়া পায়রা-খোপ বাক্সের দিকে তাকিয়ে বললে, খুব সম্ভবতঃ আছেন। চাবি দেখছি না। আচ্ছা, দাঁড়ান, ফোন করে দেখি...

টেলিফোন বেজেই গেল। কেউ সাড়া দিল না।

প্রকাশ একটু ইতস্তত করে বললে, আমার নাম ডক্টর পি. সেনগুপ্ত। মিস্টার মিত্র আমাকে পাঞ্চুয়ালি সাড়ে তিনটেয় আসতে বলেছিলেন। কোনও মেসেজ কি উনি রেখে গেছেন?

মেয়েটি যন্ত্রচালিতের মত 528 নম্বর খোপটা হাতড়ে বললে, ডঃ পি সেনগুপ্ত? হ্যাঁ, আপনার নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন দেখছি।

বড় আর মোটা একটা সীলমোহর করা খাম। বেশ অবাক হয় প্রকাশ। এ আবার কী? মেয়েটির সামনে সে কিন্তু কোনও কৌতূহল দেখায় না। খামটা নিয়ে লাউঞ্জের একেবারে ও-প্রান্তে চলে যায়। তারপর সাবধানে খুলে ফেলে। আশ্চর্য! তার ভিতর পুরানো খবরের কাগজ ঠাসা। কাগজগুলো আড়াআড়িভাবে কাটা—অর্থাৎ ছাপা কাগজের কোনও বক্তব্য নেই। প্রকাশের মনে হল,এগুলির ভিতর কী যেন একটা কঠিন পদার্থ আছে। ঠিক তাই। কাগজের গহ্বর থেকে শেষ-মেশ বেরিয়ে এল একটা চাবি। এই হোটেলেরই নামাঙ্কিত। তাতে নম্বর লেখা আছে: 528!

—কী কাণ্ড! কমলেশের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি! সব কিছুতেই রহস্যঘন আস্তরণ! প্রকাশকে ভোরবেলা জানাতে পারল না যে, সে এক সপ্তাহ অজ্ঞাতবাসে থাকছে; লটারিতে পেল টাকা, খবরটা দিল ওর বান্ধবী! ওর ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলতে চায়, তার জন্য এই পেল্লায় খামে সীলমোহর করেছে!

লিফট বেয়ে পাঁচতলায় উঠে যায়। ঘর তালাবন্ধ; কিন্তু বাইরে একটা বোর্ড ঝুলছে DO NOT DISTURB। এর মানে কী? মানে যাই হোক, প্রকাশ তালা খুলে নির্জন ঘরে ঢুকল। দরজাটা খুলেই রাখে। এখনই কমলেশ অথবা মীনাক্ষী এসে পড়বে। মিনিটপাঁচেক বসেই থাকল। তারপর ধরালো সিগ্রেট।কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে?

বাসু-সাহেব ইন্টারকমের সুইচটা টিপে দিয়ে বললেন—বল?

রিসেপশান কাউন্টার থেকে মিসেস রানী বাসু বলেন, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন, ডক্টর পি. সেনগুপ্ত। পাঠিয়ে দেব।

ব্যারিস্টার-সাহেব প্রতিপ্রশ্ন করেন, কী কেস জিজ্ঞাসা করেছিলে?

—করেছিলাম। বলছেন অত্যন্ত গোপন এবং জরুরী। শুধু তোমাকেই বলতে পারেন।

—আহ্! গোপন আর জরুরী না হলে আমার কাছে মরতে আসবে কেন? দ্যাটস নট দা পয়েন্ট...ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও।

চারটে বত্রিশ মিনিটে বাসু-সাহেবের চেম্বারের দরজাটা খুলে গেল। আগন্তুক লক্ষ্য করে

দেখে—ব্যারিস্টার-সাহেব শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। বেচারি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—ওদিকে ফিরে বাসু-সাহেব ওকেই লক্ষ্য করছেন—ওপাশে অন্ধকারে টাঙানো একটি আয়নায়। বাসু-সাহেবের ধারণা: ঐ প্রবেশ মুহূর্তটিই তাঁর ক্লায়েন্টের পক্ষে দুর্বলতম মুহূর্ত। যদি সে কোন মিথ্যার নির্মোকে আবৃত হয়ে এসে থাকে তাহলে তার অ্যাটর্নির চোখে চোখ রাখার ঠিক আগের মুহূর্তটিতেই সে সবচেয়ে অসহায়; তাঁর ভাষায়: ভালনারেবল্! বাসু-সাহেবের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই তাঁদের দৃটি সংবাদ জানিয়ে রাখি। প্রথম কথা—আসামী নির্দোষ বলে যদি উনি নিজে নিঃসন্দেহ হন তবেই তার কেস হাতে নেন। যাদের নির্দোষ বলে বিশ্বাস করতে পারেন না তাদের বলেন: হয় দোষ কবুল করে সাজা নিন, অথবা অন্য কোনও উকিলের দ্বারস্থ হন। এ ব্যাপারটা এতই জানাজানি হয়ে গেছে যে, কলকাতা আদালতের প্রায় প্রত্যেকটি বিচারক জানেন—বাসু-সাহেবের মক্কেল দোষী হ'ক আর নির্দোষ হ'ক, বাসু-সাহেবের বিশ্বাস মতে সে নির্দোষ।

দ্বিতীয় সংবাদ—আজ পর্যন্ত বাসু-সাহেবের কোনও মক্কেল—মানে খুনের দায়ে অভিযুক্ত মক্কেল, কখনও 'কনভিকশন' পায়নি। এ বিষয়ে তাঁর বিশ বছরের আনব্রোকেন রেকর্ড!

সামনের চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করে বাসু-সাহেব বলেন, ইয়েস! স্টার্ট টকিং!

—আমার নাম ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্ত। একটা অত্যন্ত জরুরী এবং গোপন...

ধমকে ওঠেন বাসু-সাহেব, দেখুন মশাই, সময়ের দাম আপনারও আছে আমারও আছে। ফালতু কথা বলছেন কেন? আপনার নাম-ঠিকানা তো ভিজিটিং কার্ডেই আছে, আর জরুরী এবং গোপন ব্যাপার না থাকলে এমন হন্তদন্ত হয়ে ক্রিমিনাল লইয়ারের কাছে ছুটে আসবেন কেন? কাজের কথা যেটুকু আছে বলুন। নাউ স্টার্ট টকিং এগেন।

প্রকাশ একটু থতমত খেয়ে যায়। ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু যে একজন বিচিত্র মানুষ এটুকু জানা ছিল তার। এর আগে কখনও দেখেনি। বিপদে পড়ে কিন্তু সবার আগে তাঁর কথাই মনে হয়েছে।ছুটে এসেছে তাঁর চেম্বারে। বললে, আমার সন্দেহ হচ্ছে কেউ আমাকে ফাঁদে ফেলতে চায়। একটা মিথ্যা অপরাধের চার্জে, মানে...

—কী জাতীয় অপরাধ?

—ঠিক জানি না। খুনের মামলাও হতে পারে—

—আই সী! এবার বিস্তারিতভাবে বলুন। শুরু হতে শুরু করুন।

প্রকাশ সব কথাই খুলে বলে। কমলেশের প্রাইজ প্যাওয়ার কথা, কী ভাবে খবরটা পায়, কী ভাবে হোটেলে গিয়ে বোকা হয় ইত্যাদি। কমলেশ, সুদীপ, মীনাক্ষীর পরিচয় দেয়।

—বুঝলাম। কিন্তু এতে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভয়াবহ তো কিছু বলেননি এখনও?

—না। তার পরের ঘটনাটুকু শুনুন—

হোটেলের ঐ ফাঁকা ঘরে প্রকাশ নাকি মিনিট পনের ছিল। তারপর বিরক্ত হয়ে সে উঠে পড়ে। ঘরটা তালাবন্ধ করে করিডরে বেরিয়ে আসে। কেউ তাকে ঘর থেকে বার হতে দেখেনি। লিফট দিয়ে নয়, এবার সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে। তারপর হোটেল ছেড়ে গাড়ির কাছে আসে। গাড়ি সে লক করে যায়নি। হোটেলের পার্কিং-জোনে দারোয়ানের নাকের ডগায় ছিল বলে ও-কথা তার মনেও পড়েনি। গাড়িতে ড্রাইভারের সীটে বসতে গিয়ে ওর মনে হল—সীটের নিচে শক্ত কী একটা জিনিস রয়েছে। গদিটা উঁচু করতেই বার হল জিনিসটা। প্রকাশ পকেট থেকে বার করে বাসু-সাহেবকে দেখালো বস্তুটা। একটা পয়েন্ট টু-টু বোরের রিভলভার!

বললে, আমার প্রচণ্ড ভয় হল তখন। সন্তর্পণে চেম্বারটা খুলে দেখলাম, ছয়টা খোপের মধ্যে পাঁচটায় তাজা গুলি ভরা আছে; এবং ট্রিগারের সামনে একটা ডিসচার্জড বুলেট! গন্ধ শুঁকে দেখলাম, ব্যারেলে বারুদের তাজা গন্ধ! অর্থাৎ কিছু পূর্বেই ঐ পিস্তলটা ছোঁড়া হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে বিশ্রী লাগল। স্পষ্ট বুঝলাম—কেউ আমাকে ফাঁসাতে চাইছে। আমি বাড়ি গেলাম না। আপনার

ঠিকানা জানা ছিল। সোজা চলে এসেছি তাই। এখন বলুন, আমার কী কর্তব্য? পুলিসে যাওয়া?

—বলছি। তার আগে বলুন, হোটেলের সেই 528 নম্বর চাবিটা কী করলেন?

প্রকাশ তার পকেট থেকে একটি চাবি বার করে বাসু-সাহেবের গ্লাস্টপ টেবিলে রাখল। বাসু বললেন, ওটা কাউন্টারে জমা দিয়ে এলেন না কেন?

—কেমন করে দেব? আমার নাম কমলেশ মিত্র নয়। রিসেপশনিস্ট যদি সন্দেহ করত? তাছাড়া, আমি চাইনি সে আমাকে বারে বারে দেখে চিনে রাখুক।

—ঠিক বুঝলাম না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি কিছু একটা গোপন করছেন।

—নো স্যার! আমি আদ্যন্ত সত্যি কথা বলছি।

—আই সী! দেখুন ডক্টর সেনগুপ্ত, আমার কতকগুলো 'হুইম' আছে, মানে বাতিক। আমি শুধু সেই কেসগুলোই হাতে নিই যেখানে বুঝি আমার মক্কেল নির্দোষ এবং সে আমাকে আদ্যন্ত সত্যি কথা বলছে। এ-ক্ষেত্রে আমার ধারণা আপনি আদ্যন্ত সত্যিকথা বলেননি—নো! নট দ্য হোল ট্রুথ!—জাস্ট এ মিনিট! বাধা দেবেন না। আমাকে শেষ করতে দিন! তবু আমি শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে আপনার কেসটা নিচ্ছি। কারণ কেসটা আমার কাছে অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং লাগছে।

—থ্যাঙ্ক স্যার!—পকেট থেকে চেকবুক বার করে প্রকাশ বললে, আপনাকে কত টাকার 'রিটেইনার' দেব?

—অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক-এ এক টাকা।

—এক টাকা! মানে?

—হ্যাঁ, এক টাকা! শর্তসাপেক্ষে। ঐ এক টাকার চেকটা নিচ্ছি আপনাকে মক্কেল বলে আইনতঃ স্বীকৃতি দিতে। শর্তটা হচ্ছে এই—প্রাথমিক তদন্তে যদি বুঝি, আপনি নির্দোষ এবং আমাকে নির্ভেজাল সত্য কথা বলেছেন, তাহলেই আমি কেসটা চালাব। না হলে ঐ এক টাকা ফেরত দিয়ে আমি হাত ধুয়ে ফেলব। রাজি?

প্রকাশ তাতেই রাজি।

বাসু বললেন, রিভলভারটা আর একবার দেখি। না, না, ওটা আপনার হাতেই থাক। খুলে আলোর সামনে ধরুন। দ্যাটস্ ইট।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্পর্শ বাঁচিয়ে উনি মারণাস্ত্রটা পরীক্ষা করলেন, গন্ধ শুঁকলেন। তারপর বললেন, থ্যাঙ্কু। এবার ওটা পকেটে রেখে দিন। আর ঐ টেলিফোনটা তুলে পর পর তিনটে ফোন করুন। একটা আপনার বাড়িতে—বলুন, বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে রাত্রে আপনি ফিরবেন না। দ্বিতীয়টা আপনার কর্মস্থলে—জানিয়ে দিন, জরুরী দরকারে কাল আপনি যেতে পারছেন না। তৃতীয়টা সদর স্ট্রীটের লীটন হোটেলে, দেখুন সিঙ্গল-সীটেড একটা ঘর পান কি-না। পেলে স্ব-নামে ঘরটা বুক করুন।

নির্দেশমত প্রকাশ টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাসু-সাহেব ঘর থেকে 'সুকৌশলী'র কৌশিক মিত্রকে ডেকে পাঠালেন।

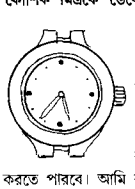

লীটন হোটেলে প্রকাশকে নামিয়ে দিয়ে বাসু-সাহেব যখন কৌশিককে নিয়ে হোটেল হিন্দুস্থানে এসে পৌঁছালেন তখন বিকাল পাঁচটা সাঁইত্রিশ। কৌশিককে তালিম দেওয়া শেষ হয়েছিল। সে বললে, এরকম মিথ্যা পরিচয় দেওয়া বেআইনি হবে না-কি?

কী মুশকিল! মিথ্যা পরিচয় দেবে? ঠিক যেভাবে বললাম সেভাবে কথোপকথন চালাবে মেয়েটিকে কোন মিথ্যা কথা না বলেও তুমি কার্যোদ্ধার করতে পারবে। আমি বুঝে নিতে চাই, ঐ রিসেপশনিস্ট মেয়েটির মনে আছে কিনা— সেনগুপ্তের আকৃতি, ভবিষ্যতে সে প্রকাশকে সনাক্ত করতে পারবে কি-না। প্রকাশ যদি কাঠগড়ায় দাঁড়ায় ঐ মেয়েটিই হবে প্রসিকিউশনের প্রধান সাক্ষী—তাকে গুলিয়ে দেবার এই হচ্ছে সুযোগ।

—তাহলে আপনিই গিয়ে বলুন না কেন?

—কী আপদ! প্রকাশ আর তুমি একই এজ-গ্রুপের; একই রকম লম্বা। সেই জন্যেই তোমাকে পাঞ্জাবি পরিয়ে এনেছি! আমি যে একেবারে ভিন জাতের।

অগত্যা দুজনে গুটি গুটি এগিয়ে যান রিসেপশান কাউন্টারের কাছে। বসু ফুট-তিনেক দূরে দেওয়ালে প্রলম্বিত একটি চিত্রকর্মের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি এবং উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করেন। কৌশিক এগিয়ে এসে মেয়েটিকে বললে, মিস্টার কমলেশ মিত্রের 528 নং খোপটা কাইন্ডলি একটু দেখবেন? ডক্টর পি. সেনগুপ্তের নামে তিনি কি কোন মেসেজ রেখে গেছেন?

যন্ত্রচালিতের মত মেয়েটি চিহ্নিত খোপটা হাতড়ে বলে, না।

—মিস্টার কে. মিত্র কি ঘরে আছেন?

মেয়েটি কী-যেন ভাবছিল। টেলিফোনের রিসিভারের দিকে অভ্যাসবশে হাতটাও বাড়িয়েছিল। হঠাৎ থমকে থেমে পড়ে। বলে, ইয়ে, ডক্টর সেনগুপ্ত, ঘণ্টাদুয়েক আগে আপনি কি একটা মোটা খাম নিয়ে যাননি?

কৌশিক প্রশ্নটার সরাসরি জবাব দিল না। বললে, আমি নূতন কোনও চিঠির কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যে ফিরে এসে সে কি নূতন কোনও মেসেজ রেখে গেছে?

মেয়েটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওকে খুঁটিয়ে দেখছিল। ভ্রূ কুঁচকে বললে, মাপ করবেন, ঘণ্টাদু'য়েক আগে আপনি নিজেই এসেছিলেন চিঠিখানা নিতে?

বাতানুকূল-পরিবেশেও কৌশিক ভিতরে ভিতরে ঘেমে ওঠে। তবুও হেসে বলে, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?

কেউই কারও প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। প্রতি-প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে তীর্যক জবাব। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক মেয়েটি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বললে, কিছু মনে করবেন না, আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে,আপনি ডক্টর সেনগুপ্ত? মানে, এর আগে আপনার হাতেই সেই খামটা আমি দিয়েছি?

কৌশিক বলে, গাড়িতে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। এনে দেখাতে পারি। আমার নাম, ফটো, সই, লাইসেন্স নাম্বার। দেখবেন?

মেয়েটি ইতস্তত করে। হয়তো লোকটা ওদের বোর্ডার-এর বিশিষ্ট বন্ধু। এতবড় চ্যালেঞ্জ করা রাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না তো?

ওর নীরবতার সুযোগ নিয়ে কৌশিক পকেট থেকে একটা চাবি বার করে টেবিলের উপর রাখে। হেসে বলে, এ-ভাবে খামকা অপমানিত হতে হবে জানলে আমি আসতুমই না! এনি ওয়ে, এই চাবিটা রাখুন। মিস্টার মিত্র ফিরে এলে বলবেন, তার বন্ধুকে সে যে ডুপ্লিকেট চাবিটা দিয়েছিল...

—আয়াম সো সরি, ডঃ সেনগুপ্ত। প্লীজ এক্সকিউজ মি! আমারই ভুল। আমি অকপটে ক্ষমা চাইছি! ছি-ছি-ছি! কী অন্যায়!

চাবিটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে কৌশিক বললে, ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি। আফটার অল, আপনি যা কিছু করছেন আপনাদের বোর্ডার-এর স্বার্থেই করছেন।

—অসংখ্য ধন্যবাদ! আপনি আমাকে নিশ্চিত করলেন ডক্টর সেনগুপ্ত।

কৌশিক ফিরে এল বাসু-সাহেবের কাছে। বললে, তাহলে চলুন, ঘরে গিয়ে বসি। মেয়েটি এতক্ষণে বাসু-সাহেবকে দেখল। তিনি মিষ্টি করে হাসলেন।

লিফ্‌ট ধরে দুজনে উঠে এলেন চারতলায়। নির্জন করিডোরে পদার্পণ করে কৌশিক জানতে চায়, আমি মেয়েটিকে কোন মিথ্যা কথা বলেছি?

ঊর্ধ্বমুখ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বাসু-সাহেব চিবুকে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না এবং এইভাবে সত্য বলিতে বলিতে মিথ্যার সাতমহলা প্রাসাদ বানাইব!

528 নম্বর ঘরে ঢুকলেন দুজনে। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন প্রথমেই। কৌশিকের কানে কানে বললেন, কোন কিছু স্পর্শ কর না। ফিঙ্গার-প্রিন্ট না পড়ে।—তারপর গঙ্গাস্নানান্তে নিষ্ঠাবান বিধবা যেভাবে বকের মতো পা ফেলে স্পর্শ বাঁচিয়ে বাড়ি ফেরেন সেই ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন তিনি। ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ তাতে বাস করেনি। অ্যাশট্রেতে একটি মাত্র সিগ্রেটের দগ্ধাবশেষ। বাসু বলেন, ঐ দেখ প্রমাণ! প্রকাশ সেনগুপ্তের ফিঙ্গার-প্রিন্ট রয়েছে অ্যাশট্রেতে!

কৌশিক পকেট থেকে রুমাল বার করে বলে, মুছে দেব?

বাসু ঝাঁপিয়ে পড়েন, সার্টেনলি নট! আমরা তদন্ত করতে এসেছি,কোনও এভিডেন্স ট্যাম্পার করতে নয়।

—কিন্তু প্রকাশবাবু তো আপনার মক্কেল। তাকে বাঁচানোই তো—

তাকে মাঝখানে থামিয়ে দেন বাসু-সাহেব বলেন, প্রকাশ আমার শর্তসাপেক্ষে মক্কেল।

সাবধানে হাতে রুমাল জড়িয়ে উনি বাথরুমের দরজাটা খুলে ফেলেন।

কৌশিক অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ওঠে!

স্নানাগারে উবুড় হয়ে পড়ে আছে একজন। রক্তের একটা ধারা ক্ষীণ রেখায় বয়ে গেছে জলনিকাশী নর্দমাটার দিকে। বাসু নিচু হয়ে ওকে পরীক্ষা করলেন। তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, ডেড অ্যাজ এ ডোডো!

—এখনই পুলিসে খবর দেওয়া উচিত—কৌশিক টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়।

—অফ কোর্স! তবে এ ঘর থেকে নয়। এস, নিচে যাই।

ঘরটা আবার তালাবন্ধ করে ওঁরা নিচে নেমে এলেন। লাউঞ্জের একান্তে একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ ছিল। বাসু-সাহেব সেখান থেকে ফোন করলেন থানায়। ও-প্রান্ত থেকে সাড়া দিলেন ইন্সপেক্টর সতীশচন্দ্র বর্মন। বাসু-সাহেবকে তিনি ভালমতই চেনেন। বলেন, বলুন স্যার। কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি?

বাসু বলেন, আমাকে নয়, সেবাটা করতে হবে জনগণকে। আপাতত আপনি দয়া করে হোটেল হিন্দুস্থানে চলে আসুন। সেখানে 528 নম্বর ঘরে এইমাত্র একটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমার অনুমান কেসটা খুনের।

—কে মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করেছে?

—আমি।

—আপনি ঐঘরে কেন গিয়েছিলেন?

—প্রফেশনাল প্রয়োজনে, আমার মক্কেলের স্বার্থে।

—কে আপনার মক্কেল?

বাসু বললেন, মনে হচ্ছে, আপনি টেলিফোনেই আমার গোটা জবানবন্দিটা শুনতে চান। আমার আপত্তি নেই। তবে ইতিমধ্যে লাসটা পাচার হয়ে গেলে আমাকে দায়ী করবেন না। দয়া করে আপনার ডায়েরিতে লিখে নিন, আমি পাঁচটা বাহান্ন মিনিটে খবরটা আপনাকে জানিয়েছি! এবার আমার বিস্তারিত জবানবন্দিটা লিখে নিন। কাগজ-কলম বার করেছেন?

বর্মন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, লুক হিয়ার মিস্টার বাসু! এটা আদালত নয়। আপনাকে প্যাঁচ কষতে হবে না। আমি এখনি আসছি। আপনি হোটেল ছেড়ে যাবেন না। ঘরটা খোলা আছে?

—না। তালাবন্ধ আছে। চাবি আমার কাছে। আমি অপেক্ষা করছি।

পুলিস ভ্যান এসে পৌঁছালো ছয়টা বেজে বারো মিনিটে। বর্মণ এগিয়ে এসে বললে, চাবিটা দিন।

বাসু বিনা বাক্যব্যয়ে চাবিটা হস্তান্তরিত করলেন। বর্মণ তার দুজন সহকারী সমেত উঠে গেল ওপরে। যাবার সময় বলে গেল বাসু যেন স্থানত্যাগ না করেন।

মিনিট পাঁচেক পরে ক্যামেরা বগলে এক ভদ্রলোক এসে কাউন্টারে প্রশ্ন করলেন, লাশ কোথায় পাব?

মেয়েটি আঁতকে ওঠে। প্রশ্নটার কোনও অর্থ গ্রহণ হয় না। ভদ্রলোক পান চিবোতে চিবোতে নির্বিকারভাবে ভাষান্তরে বলেন, আই মীন, খুন হয়েছে কত নম্বর ঘরে?

মেয়েটির চোখ দুটি যেন অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বলে, মানে! খুন কেন হতে যাবে?

নির্বিকার পুলিস ফটোগ্রাফার দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে দাঁতের ফাঁক থেকে একটি সুপুরির কুচি বার করে স্পিটুনে থুথু ফেললেন। একগাল হেসে বললেন, খুন কেন হয়েছে তা কি এখনই বলা যায়? আগে লাশ দেখি।

বাসু এগিয়ে এসে বললেন, 528 নম্বরে। ইন্সপেক্টর বর্মণ সেখানেই আছেন। আপনি পুলিস ফটোগ্রাফার তো? সোজা চলে যান উপরে। ফিফথ ফ্লোর।

মেয়েটি আমতা আমতা করে বললেন, কী বলছেন আপনারা? কে খুন হয়েছে?

বাসু বললেন, পরিচয় এখনও জানা যায়নি। একজন ভদ্রলোক। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। ঐ ঘরে বাথরুমে মরে পড়ে আছে।

—আপনি...আপনি তা কেমন করে জানলেন?

—স্বচক্ষে দেখেছি বলে। থানায় জানিয়েছি। আপনার সামনে দিয়েই তো ইন্সপেক্টর আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে গেল। দেখেননি?

মেয়েটি এক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপরেই টেলিফোনটা তুলে নিল। খুব সম্ভবত ম্যানেজারকে খবরটা জানাতে।

আধ ঘন্টা পরে বর্মন নেমে এল নিচে। বাসু-সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, নাউ স্টার্ট টকিং। আপনি কেন এসেছিলেন এ হোটেলে।

—এ প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। আমার মক্কেলের স্বার্থে।

—কে আপনার মক্কেল?

—সরি। নামটা জানাতে পারছি না।

—লুক-হিয়ার ব্যারিস্টার-সাহেব। কেসটা খুনের। এভাবে আপনি হত্যাকারীকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না।

—আপনি কী-করে জানলেন, আমার মক্কেলই হত্যাকারী?

—আপনি কী করে জানলেন যে, সে হত্যাকারী নয়?

—যে-হেতু সে বলেছে যে, সে হত্যা করেনি।

—আপনি কি বলতে চান আপনার মক্কেল যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা?

—একজ্যাক্টলি! তবে কথাটা আমি বলছি না, বলছে আমাদের সংবিধান! সে যে তাই নয়, সেটা প্রমাণ করার দায় আপনার।

—কিন্তু লোকটার নাম না জানলে—

—আমি দুঃখিত। তবে আমি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কাল সকাল দশটার সময় আমি আমার মক্কেলকে নিয়ে আপনার অফিসে আসব। আমার মক্কেল জবানবন্দি দেবে।

—কাল সকাল দশটায়! তার মানে সারারাত আপনি তাকে তালিম দেবেন?

বাসু একগাল হেসে বলেন, তাই কি পারি? আজ সারারাত যে আমি আপনার নজরবন্দি।

বাসু উঠে দাঁড়ান। বলেন, আশা করি আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই?

—আছে! বসুন, বসুন—ইন্সপেক্টর ভেবে পায় না কোন দিক থেকে আক্রমণ করবে। ঠিক তখনই কাউন্টার ছেড়ে উঠে আসে মেয়েটি। বলে, এক্সকিউজ মি, ইন্সপেক্টর! আমি জানি কে ওঁর মক্কেল। ঐ ভদ্রলোক—ওঁর নামও জানি। ডক্টর পি. সেনগুপ্ত।

বর্মন মেয়েটিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, আপনি কি নেশা করেছেন? ওঁর নাম কৌশিক মিত্র। উনি মিস্টার বাসুর সাকরেদ।

মেয়েটি বলে, কিন্তু উনি এখানে এসে নিজেকে ডক্টর পি. সেনগুপ্ত বলে পরিচয় দেন। উনি দু'বার এসেছিলেন। একবার সাড়ে তিনটা নাগাদ, একবার সাড়ে পাঁচটায়। প্রথমবার একটা মোটা খাম আমার হাত থেকে নিয়ে যান ডক্টর সেনগুপ্তের পরিচয়ে। আমার বিশ্বাস সেই খামের ভিতরেই ঐ ঘরের চাবিটা ছিল।

বর্মন উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটিকে ছেড়ে কৌশিকের মুখোমুখি হয়ে বলে, উনি যা বলেছেন তা সত্য?

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, উনি ভুল বলছেন। কৌশিক একবারও বলেনি যে, সে ডক্টর সেনগুপ্ত। সে আমার সামনেই ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—ডক্টর সেনগুপ্তের নামে কোন চিঠি আছে কি না।

মেয়েটি রুখে ওঠে, তখন আমি বলিনি—উনি নিজের 'আইডেন্টিটি' প্রমাণ করতে পারেন কি না?

—কারেক্ট! কিন্তু ঐ ভদ্রলোক যখন তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাতে চাইলেন, আপনি তখন রাজী হননি!

—হ্যাঁ। কারণ উনি তখনই ঐ ঘরের চাবিটা বার করে যে দেখালেন আমাকে।

—কারেক্ট! কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়? ওঁর নাম ডক্টর সেনগুপ্ত?

বর্মন ওঁর সওয়াল-জবাবে বাধা দিয়ে কৌশিককে প্রশ্ন করে, আপনি আজ বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ এ হোটেলে আর একবার এসেছিলেন?

—না।

মেয়েটি গর্জে ওঠে, না? আপনি আমার কাছ থেকে একটা খাম নেননি?

বাসু-সাহেব কৌশিককে বলেন, ভদ্রমহিলার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় তোমার নয়!

বর্মন উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনারা দু'জন অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি।

সে এগিয়ে গেল টেলিফোনটার দিকে। কৌশিক নিম্নস্বরে সাদা বাঙলায় প্রশ্ন করে, মেয়েটির প্রশ্নের জবাব দিতে বারণ করলেন, কিন্তু বর্মন যদি জানতে চায়?

—আদ্যন্ত সত্যভাষণ করবে। সাতমহলা বাড়ি বানাবার চেষ্টা না করে!

—যদি আপনার মক্কেলের নাম জানতে চায়?

—বলবে। সে আমার মক্কেল। তোমার নয়। তুমি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। সব সময়েই পুলিসকে সাহায্য করতে হবে তোমাকে।

ওদের বাঙলা-কথোপকথনের অর্থ গ্রহণ হচ্ছিল না মেমসাহেবের। সে আবার ফুঁসে ওঠে, আপনি অস্বীকার করতে পারেন—বিকাল ঠিক সাড়ে তিনটায় এসে আপনি ডক্টর সেনগুপ্তের পরিচয়ে আমার হাত থেকে একটা খাম নেননি?

কৌশিক জবাব দেবার আগেই বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, আপনি আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে বলতে পারেন—ওর হতেই খামটা দিয়েছিলেন আপনি?

—আলবৎ পারি।

—কিন্তু একটু আগে আপনি অতটা 'শিওর' ছিলেন না!

—কে বলল ছিলাম না?

—আপনার আচরণ। না হলে ওঁকে আত্মপরিচয় দিতে বললেন কেন?

—আমি জানতে চেয়েছিলাম উনিই ডাঃ সেনগুপ্ত কিনা।

—তার মানে আপনি 'শিওর' ছিলেন না।

মেয়েটি দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, লুক হিয়ার স্যার, এটা আদালত নয়, এবং আপনিও কিছু ব্যারিস্টার নন! এভাবে আমাকে ক্রস করতে পারেন না আপনি।

—আর ইউ শিওর নাউ?

আবার সেই 'শিওর'। মেয়েটি একেবারে ক্ষেপে ওঠে: হোয়াট ডু ইউ মীন?

—আপনাকে ক্রস করার অধিকার আমার নেই?

—না নেই। ইউ শ্যাল নেভার ব্রাউ-বিট মি দ্যাট ওয়ে!

—আই উইল, মাডাম! আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—কাঠগড়ায় তুলে 'ক্রস-এক্সামিনেশন' বস্তুটার অর্থ কী, তা আমি আপনাকে অস্থিতে-অস্থিতে সমঝিয়ে দেব! তবে মানুষজনকে মনে রাখার ক্ষমতা আপনার যে-রকম তাতে হয় তো আপনি আমাকে তখন চিনতে পারবেন না। আমার কার্ডটা তাই রাখুন।

নামাঙ্কিত একটি কার্ড টেবিলে রাখলেন বাসু-সাহেব। মেয়েটি স্তম্ভিত। অস্ফুটে শুধু বললে, পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল, মানে ঐ যাকে খবরের কাগজে একবার বলেছিল 'পেরি মেসন অফ দ্য ইস্ট'?

বাসু-সাহেবকে জবাব দিতে হল না। তার আগেই ফিরে এল বর্মন। বাসু-সাহেবকে বললে, আপনি যেতে পারেন কিন্তু মিস্টার কৌশিক মিত্রের জবানবন্দি আমি এখনই নেব। ওঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

বাসু বলেন, ঠিক আছে। আমিও অপেক্ষা করছি। আমার যাবার তাড়া নেই।

বর্মন বললে, আপনার না থাকে, আমার আছে। আপনাকে তাড়াবার। মিস্টার কৌশিক মিত্র আপনার মক্কেল নন, জবানবন্দি আমি জনাস্তিকেই নেব।

বাসু প্রাগ করেন। উঠে পড়ে বলেন, তাহলে কাল সকালেই দেখা হচ্ছে। গুড নাইট টু এভরিবডি।

হোটেল থেকে বার হবার মুখেই একটা কথা কানে গেল বাসু-সাহেবের। ঘুরে দেখলেন, তিন-চারজন দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশ-পথের বাইরে। একজন লাউঞ্জ থেকে বার হয়ে এসে ওদের উদ্দেশ্য করে বললে, কমলেশ না পাত্তা। লাউঞ্জে নেই। এখন কী করবে বল? কাউন্টারে গিয়ে খোঁজ করব?

বাসু এগিয়ে এলেন দলটির দিকে। বললেন, আপনারা কমলেশ মিত্রের নিমন্ত্রণে এখানে এসেছিলেন?

একটি যুবক বললে, হ্যাঁ, আপনিও কি তার নিমন্ত্রণে এসেছিলেন?

—না। আমার নাম পি. কে. বাসু। আমি ব্যারিস্টার। আপনারা কেউ আমার নাম জানেন?

যুবকটি বলে, বিলক্ষণ। আপনি তো স্বনামধন্য ব্যক্তি। আমরা সবাই আপনাকে চিনি। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি নবীন চ্যাটার্জী, বিজনেসম্যান; ইনি মিস্ মীনাক্ষী মজুমদার, আর আমার নাম সুদীপ লাহিড়ী।

বাসু বলেন, ইতিমধ্যে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে হোটেলের ভিতর। পুলিসী তদন্ত হচ্ছে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আপনারা আসুন—আমরা বরং সামনের ঐ রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি।

দলটিকে এক কোণায় বসিয়ে এসপ্রেসো কফির অর্ডার দিয়ে বাসু বললেন, আমি এসেছিলাম একটা তদন্তে, যাতে আপনাদের বন্ধু কমলেশ মিত্রও ইনভল্‌ভড্ হতে পারে! মিস্ মজুমদার, আপনি কখন জানতে পারেন, কমলেশ প্রাইজটা পেয়েছে?

—সকাল প্রায় সাড়ে নটায়। কমলেশ ফোনে জানিয়েছিল।

—কোথা থেকে ফোন করছে তা সে বলেছিল?

—হ্যাঁ, এই হোটেল থেকেই।

—আপনাকে সে কখন আসতে বলেছিল?

—সন্ধ্যা ছয়টায়। বলেছিল, আরও দু-চারজন বন্ধুকে সে নিমন্ত্রণ করছে। রাত্রে সে আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিল।

—এই চারজনকেই?

—তাই তো দেখছি এখন।

—আমি শুনেছি, ডাঃ প্রকাশ সেনগুপ্ত আর রবীন বোস ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদের নিমন্ত্রণ ছিল না?

—কী জানি! থাকলে ওঁরাও হয়তো এখনই এসে পড়বেন।

—আপনি কমলেশের তরফে এদের দু'জনের কাউকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?

—কমলেশের তরফে! নিশ্চয় নয়। কমলেশ আমার বন্ধু, যেমন ঐরাও তার বন্ধু। কমলেশের তরফে আমি কাউকে নিমন্ত্রণ করতে যাব কোন অধিকারে? কেন বলুন তো?

বাসু-সাহেব এবার সুদীপকে বলেন, আপনাকে সে কখন নিমন্ত্রণ করে?

সুদীপ সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে, ব্যারিস্টার সাহেব, এবার আপনি আমাদের একটা প্রশ্নের জবাব দিন। হোটেলে কী ঘটেছে? আর কমলেশের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

বাসু-সাহেব চুরুটের ল্যাজ কাটতে কাটতে বললেন, কমলেশ যে ঘরটা ভাড়া নিয়েছিল তার নম্বর 528। আজ বিকাল পাঁচটা নাগাদ সেই ঘরের বাথরুমে একটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ। কমলেশ কোথায় তা কেউ জানে না, অফকোর্স যদি মৃতদেহটা তারই না হয়।

মনে হল, ভুকুম্পনে টেবিলটা নড়ে উঠল। আধ মিনিট সবাই নির্বাক। তারপর নবীনবাবু বললেন, এ-ক্ষেত্রে সবার আগে গিয়ে মৃতদেহটা আমাদের সনাক্ত করা উচিত। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই—কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুলিসের জেরার সম্মুখীন হতে হবে আপনাদের। জবাবে কে কী বলবেন তা স্থির করে রেখেছেন তো?

সুদীপ বললে, জবাবে আবার কী বলব? যা সত্য কথা তাই বলব। মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার অনেক পরে আমরা এসেছি,—

বাসু বলেন, সেইটাই হবে পুলিসের প্রথম প্রশ্ন। আপনারা সকলেই কি এ হোটেলে আজ এখনই প্রথম এলেন?

নবীন তৎক্ষণাৎ বললে, নিশ্চয়ই!

সুদীপ কোনও জবাব দিল না।

মীনাক্ষী আর সুদীপ পরস্পরের দিকে তাকায়।

বাসু বলেন, ঠিক আছে। এবার আপনারা হোটেলে যান। মৃতদেহ সনাক্ত করুন। সম্ভবতঃ আপনাদের বন্ধুই মারা গেছে। অটোপ্সি-সার্জেন মৃত্যুর কী সময় নির্ধারণ করেন সেটা দেখুন।

মৃতদেহ সনাক্ত করে ওরা তিনজন যখন বেরিয়ে এল তখন কলকাতার রাস্তায় আলো জ্বলেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নবীন বললে, এমন একটা বিশ্রি ব্যাপার ঘটে যাবে তা কি আজ সকালেও ভেবেছিলাম? কমলেশটা...

মীনাক্ষী বাধা দিয়ে বললে, ও সব কথা ভেবে লাভ নেই নবীনবাবু। যাক, আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দিন।

সুদীপ বললে, বাড়ি ফিরবে? তার চেয়ে চল না—

নবীনকে খুব অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। সে বাধা দিয়ে বলে, আমাকে তাহলে বাদ দাও ভাই। আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি বাড়ি যাব।

নবীন বাস ধরে রওনা হয়ে যাবার পর মীনাক্ষী বললে, কোথায় যাবার কথা বলছিলে তখন?

—কোন ফাঁকা জায়গায়। চল, ভিক্টোরিয়ার সামনের ময়দানে গিয়ে বসি।

পায়ে পায়ে দু'জনে সরে এল ময়দানের দিকে। এ-সময়ে ও জায়গাটা মোটেই নির্জন নয়। তবু ওরই মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে দু'জনে বসল।

সুদীপই নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বলল: মীনু, তুমি কি আশঙ্কা করছ এই ব্যাপারটা নিয়ে পুলিস আমাদের ঝামেলায় ফেলতে পারে?

—তোমাকে না ফেললেও আমাকে ফেলতে পারে। মার্ডার চার্জ অবশ্য আমার উপর আসবার কোনও কারণ নেই, কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে অনেক সাপই বেরিয়ে পড়তে পারে। তুমি তো জান—কমলের সঙ্গে আগামীকালই আমার দার্জিলিঙ যাবার কথা ছিল।

—তা ছিল। তাতে কী? সে কথা বলছি না; আমি বলছি, হত্যা মামলায় কি তোমাকে বা আমাকে জড়ানোর কোন সম্ভাবনা আছে?

মীনাক্ষী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখে নিয়ে বললে, এ কথা বলছ কেন?

—বাসু-সাহেবের কথা থেকে মনে হল, মৃত্যুর সময় বেলা দুটোর পর এবং বিকাল চারটার আগে। ঐ সময়টুকুর জন্যে তোমার কি কোনও অকাট্য 'অ্যালিবাই' আছে?

আরও গম্ভীর হয়ে যায় মীনাক্ষী। সরাসরি জবাব না দিয়ে বলে, কেন? তোমার নেই?

—বিকাল পৌনে চারটে পর্যন্ত আছে। তারপর নেই। তোমার?

—কী আমার?

—বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, তার অকাট্য প্রমাণ দিতে পারবে?

মীনাক্ষী অনেকক্ষণ কী ভাবল; তারপর বললে, কিছু মনে পড়ছে না। এত নার্ভাস লাগছে!

—মনে করতে হবে মিনু, মনে করা দরকার! নেহাৎ যদি মনে না পড়ে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি...

—তুমি কীভাবে?

—তুমি ঠিক তিনটে সাতচল্লিশ মিনিটে হোটেল হিন্দুস্থানের লাউঞ্জে ছিলে!

মুখটা সাদা হয়ে গেল মীনাক্ষীর। আমতা আমতা করে বললে, মানে! তুমি কী বলতে চাইছ?

—আমি বলতে চাইছি যে, তুমি যে বেলা পৌনে-চারটে নাগাদ এ হোটেলে এসেছিলে তার অকাট্য প্রমাণ আছে। সেটা অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তোমাকে একজন দেখে ফেলেছিল। যে তোমাকে চেনে!

দু-হাতে মুখ ঢেকে মীনাক্ষী অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে বললে, সুদীপ! তুমি কেন এসেছিলে বলত?

—আমি! আমি কোথায় এসেছিলাম? কখন?

—ঠিক তিনটে সাতচল্লিশ মিনিটে হোটেল হিন্দুস্থানের লাউঞ্জে?

এবার জবাব দিতে সুদীপই ইতস্তত করছিল।

মীনাক্ষী বললে, তুমিই আমাকে দেখতে পেয়েছিলে; না হলে এখনই এভাবে ও-কথা বলতে পারতে না।—তাই না?

—হ্যাঁ, তাই।

—আমার মনে হয়—আমরা দুজনেই পরস্পরের কাছে সত্য ঘটনা খুলে বললে ভাল হয়। আমার নিজের কথা আগে বলি—হ্যাঁ, আমি এসেছিলাম। কমলেশই আমাকে আসতে বলেছিল। সাড়ে-তিনটে নাগাদ। একটা বিশেষ কারণে। কারণটা কী, তা এ-ক্ষেত্রে অবান্তর—আসল কথা হচ্ছে এই যে, আমি এসেছিলাম—তুমি যখন আমাকে দেখতে পেয়েছ তখনই। ঐ পৌনে চারটে নাগাদ। কমলেশ আমাকে আসতে বলেছিল, অথচ সে নিজে ঘরে ছিল না। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল আমার। এখন মনে হচ্ছে ওর রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতরেই ও পড়ে ছিল, বাথরুমের মেজেতে!

—রিসেপশন কাউন্টারে কোনও কথাবার্তা বলেছিলে?

—হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না—কী 'স্ট্যান্ড' নেব!

—পুলিস যদি জানতে চায়, তবে আদ্যন্ত সত্য কথা বলাই ভাল। তুমি এসেছিলে, নক করেছিলে, কাউন্টারে কথা বলেছিলে, ফিরে গিয়েছিলে—

—আর তুমি?

—আমিও অস্বীকার করব না। কারণ একই সময়ে আমি ঐ হোটেলে এসেছিলাম এক বন্ধুর গাড়িতে। সে আমাকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়। কমলেশকেও সে চেনে। ফলে আমি যে এখানে এসেছিলাম এটা চেপে যাওয়া ঠিক হবে না।

—তুমি কখন কোথায় আমাকে দেখতে পেয়েছিলে?

—তুমি তখন রিসেপশন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিলে। তুমি আমার দিকে পিছনে ফিরে ছিলে। তুমি আমাকে দেখতে পাওনি, আমি পেয়েছিলাম।

—তাহলে তুমি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বললে না কেন?

—সত্যি কথা বলব?

—সত্যকথা বলতে তো আমরা দুজনেই প্রতিশ্রুত, সুদীপ।

—আমি কমলেশের ঘরের সামনে গিয়ে দেখি, বাইরে একটা 'ট্যাগ' ঝুলছে 'Do not disturb' (বিরক্ত করবেন না)। আমি অনাহূত এসেছিলাম, সন্ধ্যায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল—কিন্তু তার আগেই আমি এসেছিলাম ওকে একান্তে পেতে। আমি ওর কাছে কিছু টাকা ধার চাইতাম। কিন্তু ওর ঘরের সামনে 'বিরক্ত করবেন না' বিজ্ঞপ্তিটা দেখে ফিরে আসি। কাউন্টারে তোমাকে দেখেই বুঝতে পারলাম, কেন ঐ বোর্ডটা টাঙানো আছে। অর্থাৎ কমলেশ তোমার প্রতীক্ষাতেই আছে।

—আই সী! এতক্ষণে বুঝলাম।

—আমি কিন্তু এখনও সবটা বুঝতে পারিনি মীনু।

—কী বুঝতে পারনি?

—আবার জিজ্ঞাসা করি; সত্য কথা বলব?

—বার বার ভনিতা করছ কেন?

—বিকাল তিনটে সাতচল্লিশে তোমাকে যখন দেখি, তখন তোমার পরিধানে ছিল একটা লাল রঙের মুর্শিদাবাদী। অথচ সন্ধ্যা ছয়টায় যখন আবার এলে, অর্থাৎ এখন তোমার পরিধানে একটা নীল রঙের জর্জেট! কেন মীনাক্ষী? এত দ্রুত তোমাকে শাড়ি পাল্টাতে হ'ল কেন?

মীনাক্ষী প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। তারপর সামলে নিয়ে বলে,হোয়াট ডু য়্যু মীন? আমার সেই শাড়িটায় কোন রক্তের দাগ লেগেছিল বলতে চাও?

—আমি কিছুই বলতে চাই না মীনাক্ষী। আমি শুধু তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, এ মামলায় ঐ প্রশ্নটাও তো উঠে পড়তে পারে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কী জবাব দেবে তা ভেবে রাখা উচিত নয় কি?

মীনাক্ষী একটুক্ষণ চুপ করে কী ভেবে নেয়। তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, আমাকে কেন সন্দেহ করছ সুদীপ? কমলেশকে আমি...তুমি তো সবই জান! আমার কী মোটিভ্ থাকতে পারে?

—না মীনু। তুমি ভুল করছ। তোমাকে আমি আদৌ সন্দেহ করছি না। তোমার কোনও 'মোটিভ্' খুঁজে পাচ্ছি না বলে নয়, তার কারণ কে কমলেশকে খুন করে এসেছে তা আমি জানি। শুধু তোমাকেই নয়, তাকেও ঠিক একই সময়ে হোটেল হিন্দুস্থানে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। বোধকরি মার্ডার ওয়েপন সমেত!

মীনাক্ষী উৎসাহে ওর হাতটা চেপে ধরে। বলে, কে? কাকে? কাকে দেখেছ তুমি?

—সে-কথা এখন আমি বলব না। প্রয়োজন হলে পুলিসকেই বলব। তাই তোমাকে আড়ালে ডেকে এনেছিলাম। তোমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম যে, তুমি যে একই সময়ে হোটেল হিন্দুস্থানে এসেছিলে এই সত্যটা পুলিসের কাছে গোপন কর না। আমার 'ডিপজিশানে' তোমার কথাও থাকবে। তোমাকে আমি দেখেছি তা আমি বলব। আমি চাই না সেটা তুমি অস্বীকার করে বিপদগ্রস্ত হও! আর কেউ না জানলেও তুমি তো জান মীনু—আমি তোমাকে...

মুহূর্তমধ্যে রূপান্তর ঘটে মীনাক্ষী মজুমদারের। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে তার। বলে, জানি! তাহলে এস না সুদীপ, আমরা দুজনে দুজনের অ্যালিবাই হই। পুলিসকে বলি, আমরা দুজনে একই সঙ্গে...

—না! আদালতে দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারব না! তাছাড়া আমি এসেছিলাম অন্য এক বন্ধুর গাড়িতে। কোথা থেকে কী বিপর্যয় হয়ে যাবে! ঠিক যা যা ঘটেছে তাই বলব আমরা।তুমি আর আমি।

—বেশ তুমি যা চাইছ তাই হবে।

—আমি কি শুধু এইটুকুই চাইছি মীনু?

এক মুহূর্ত বিলম্ব হল মীনাক্ষীর। তারপর বললে, আজকে আমায় মাপ কর সুদীপ। আজ নয়। কমলেশের মৃতদেহটা আমাকে এখনও 'হন্ট' করছে!

—আই নো! আজই জবাব দিতে বলছি না। চল, এবার ওঠা যাক। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—প্লীজ সুদীপ! আমাকে একটু একা থাকতে দাও। একটা ট্যাক্সি ধরে দাও শুধু।

সুদীপ শ্রাগ করল। উঠল ট্যাক্সির খোঁজে। আবার মনে হল ওর—তার সিদ্ধান্ত কি ভুল? যে লোকটাকে লিফ্‌টে নামতে নামতে এক লহমার জন্য দেখতে পেয়েছিল সেই কি হত্যা করেছিল কমলেশকে? সেই কি টাঙিয়ে দিয়ে এসেছিল ঐ বোর্ডটা ঃ 'বিরক্ত করবেন না!' তাহলে মীনাক্ষী মজুমদার মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে লাল রঙের শাড়িটা পাল্টে এল কেন? প্রথমবার লালরঙের শাড়িই বা বেছে নিয়েছিল কেন? তাতে রক্তের দাগ সহজে নজর পরে না বলেই?

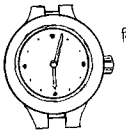

লীটন হোটেলে ফিরে বাসু-সাহেব প্রথম সাক্ষাতেই প্রকাশকে বললেন, এই নিন ধরুন। উইশ্ য়ু বেস্ট অব্ লাক! আমি হাত ধুয়ে ফেলেছি।

বাসু-সাহেবের প্রসারিত হাতে একটি এক-টাকার অঙ্ক লেখা চেক্।

প্রকাশ অবাক হয়ে বলে, মানে? আপনি আমার কেসটা নেবেন না?

—না। আমার বিবেক বাধা দিচ্ছে।

—তার মানে আপনি বিশ্বাস করছেন, কমলেশকে আমিই খুন করেছি?

বাসু-সাহেব হেসে বললেন, দেড়সেকেন্ড আগেও কিছুটা সন্দেহ ছিল। এখন নেই। কারণ আপনার জানার কথা নয়, কমলেশ খুন হয়ে মরে পড়ে আছে ওর ঘরে। বস্তুত আপনার জবানবন্দি অনুসারে ডিসচার্জড্ বুলেটের সঙ্গে কমলেশের কোন সম্পর্ক নেই।

মাথাটা নিচু হয়ে গেল প্রকাশের। বললে, আপনি আর একটু বসবেন? তাহলে আপনাকে সব কথা খুলে বলি।

বাসু-সাহেব বসেন। বলেন, আপনার প্রথম স্টেটমেন্ট শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি 'হোল-ট্রুথ' বলছেন না। আসল কথাটা বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। কেন জানেন?

—না। কেন?

—আপনার জবানবন্দি অনুসারে আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হতে পারেন গাড়ির সীটের নিচে রিভলভারটা আবিষ্কারের পরমুহূর্ত থেকে। তার পূর্বেই কিন্তু আপনি বলেছেন—ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আপনি কাউকে লক্ষ্য করেননি! সেটা কেন লক্ষ্য করবেন আপনি? বলেছেন, লিফ্‌টে না নেমে আপনি সিঁড়ি দিয়ে নেমেছেন। আর সব চেয়ে বড় কথা, খোলা মনে চাবিটা কাউন্টারে জমা দিয়ে আপনার গাড়ির কাছে যাবার কথা, সুতরাং খুন নিজে করুন বা না করুন, এ-কথা সূর্যোদয়ের মত স্পষ্ট যে, ঘর ছাড়ার আগে আপনি জানতেন—বাথরুমে কমলেশ মরে পড়ে আছে।

প্রকাশ অসহায়ের মত বলে ওঠে, বিশ্বাস করুন। খুন আমি করিনি। তবে আপনার ও-কথা সত্য। বাথরুমের দরজা খুলে আমি দেখেছিলাম।

—বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর রুমাল দিয়ে হাতলটা মুছে দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

—না তো! কেন?

বাসু ওর চোখের দিকে পুরো এক মিনিট একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর চেকটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে বললেন, আই উইথড্র! না! আপনি খুন করেননি! বলুন। সব কিছু আবার বিস্তারিত বলে যান। টাইম-ফ্যাকটারটা ঠিক রেখে। আজকের সকাল থেকে শুরু করুন। ঘুম থেকে ওঠা দিয়ে শুরু করে—

—আমি কাল রাত্রে আদৌ ঘুমাইনি। বলি শুনুন—

সারা দিনের অভিজ্ঞতা বিস্তারিত বলে গেল সে। বাসু মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছিলেন।

—প্রথমে বলুন, রবি বসুকে কেন মিথ্যা কথা বলে ডেকে পাঠালেন?

—কমলেশের প্ররোচনায়। সেই পৌনে-পাঁচটার সময় আমাকে পত্রিকা অফিস থেকে ফোন করে এই পরিকল্পনার কথা বলে। আমি আপত্তিও করেছিলাম। ও শোনেনি। বলেছিল, পত্রিকা অফিস থেকে সে সোজা মেডিকেল কলেজ আসবে। রবির আগেই। রবির ঠেলা সেই সামলাবে। তাই এপ্রিল ফুল করতে রবিকে ফোন করি—

—তাহলে তখনও আপনি জানতেন না যে, তার পনের মিনিটের ভিতরেই অমল সোম আহত হয়ে হাসপাতালে আসবে?

—তা কেমন করে জানব? ওটা নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা। কমল আর অমল নাম দুটো শুনতে এক রকম। তাই ওরা ভেবেছিল—

—বুঝলাম। মীনাক্ষী মজুমদারের কণ্ঠস্বর আপনি চেনেন?

—না। তার সঙ্গে কখনও কথা হয়নি আমার। চোখেও দেখিনি কখনও।

—তার মানে আজ পৌনে-দুটো নাগাদ যে মেয়েটি আপনাকে ফোন করে, সে যে মীনাক্ষী মজুমদার এ কথা হলপ নিয়ে আপনি বলতে পারেন না?

—নিশ্চয় নয়! কেন? সে কী অস্বীকার করেছে?

বাসু-সাহেব ওর কাছ থেকে কমলেশের বাসার ঠিকানা, তার পৈতৃক বাড়ির পাত্তা, সুদীপ ও রবির টেলিফোন নাম্বার নোটবুকে টুকে নিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, পারতপক্ষে হোটেল ছেড়ে বার হবেন না। আমি অনেক কষ্টে পুলিসের নজর এড়িয়ে এসেছি। কাউকে এখান থেকে ফোন করবেন না। পুলিস আপনাকে খুঁজছে। কাল আপনাকে সকাল সাড়ে নটার সময় তুলে নিয়ে যাব। থানায়। সেখানে সমস্ত ঘটনা আদ্যন্ত সত্য বলবেন। কিছু গোপন করবেন না। বুঝেছেন?

—রিভলভারের কথাটাও?

—নিশ্চয়! রিভলভারটা নিয়ে যাবেন। জমা দিতে হবে।

—ওঁরা যদি জানতে চান, মৃতদেহ আবিষ্কার করা মাত্র কেন পুলিসে জানাইনি?

—বলবেন, আপনার সন্দেহ হয়েছিল—কেউ অপরাধটা আপনার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। তাই তৎক্ষণাৎ আপনি আমার কাছে চলে আসেন। আমাকে সব কথা খুলে বলেন। আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম—পুলিসে আমিই খবর দেব। ফলো?

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কৌশিক ফিরল না, তখন বাধ্য হয়ে ওঁরা নৈশ আহারে বসলেন। বাসু-সাহেব, মিসেস বাসু, আর কৌশিকের স্ত্রী সুজাতা। ওঁদের আহারপর্ব যখন মধ্যপথে তখন খানা-কামরায় কৌশিকের নাটকীয় প্রবেশ। মিসেস বাসু বললেন, কী ব্যাপার? এত রাত? টিকটিকিরাও তো খায়। না কী?

কৌশিক এক গাল হেসে বলে, এখন যত ইচ্ছে ধমক দিতে পারেন। আমি আজ দিগ্বিজয় করে ফিরেছি। রীতিমত 'গুরু-মারা-চেলা!'

বাসু বললেন, ওরে ব্বাবা! কেন? কী সংবাদ নিয়ে এলে? শুনি?

কৌশিক একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। বলে, বলুন তো কমলেশ কেন খুন হল? মোটিভটা কী?

বাসু বলেন, কমলেশই যে খুন হয়েছে এটাই তো আমার অজানা। কেন হয়েছে তা কোথা থেকে জানব?

—হ্যাঁ, মৃতদেহটা কমলেশ মিত্রেরই। ওর দুজন বন্ধু ও একজন বান্ধবী এসেছিল আপনি হোটেল ছেড়ে যাবার পরেই। তারাই সনাক্ত করে গেল। পুলিস আমার জবানবন্দি নিয়ে ছেড়ে দেবার পরেই আমি ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করি। সুদীপ লাহিড়ী, নবীন চ্যাটার্জী আর মীনাক্ষী মজুমদার। আমি আরও জেনে এসেছি, মীনাক্ষী দেবী আর সুদীপবাবু দুজনেই ঐ হোটেলে এসেছিলেন তিনটে থেকে চারটের ভেতর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মৃত্যুর সময়টা কী? মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচটা বাহান্ন মিনিটে—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, মৃতদের আবিষ্কৃত হয়েছে সাড়ে তিনটে থেকে পৌনে চারটের মধ্যে। যা হোক, তারপর?

কৌশিক বলে, এ কথা কে বললে?

—আপাতত আমি বলছি, কিন্তু সে তো চেলার হাতে মৃত গুরুর সংগৃহীত সংবাদ। চেলামহাশয়ের গোটা রিপোর্টটা আগে শুনি।

কৌশিক এ কথায় দমে যায়। বলে, যাই হোক, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। মৃত্যু যদি তিনটে থেকে চারটের মধ্যে ঘটে থাকে তাহলে মীনাক্ষী এবং সুদীপ একটু ঝামেলায় পড়বেন। সেটা আমার আসল খবর নয়, আসল খবর হচ্ছে—

কৌশিকের মতে যেটা আসল খবর সেটা সে সংগ্রহ করেছিল সুদীপ লাহিড়ীর কাছ থেকে। সুদীপ জানত, কমলেশ আর মীনাক্ষী দোশরা সকালের ফ্লাইটে দার্জিলিঙ বেড়াতে যাচ্ছিল। কমলেশ সেজন্যই ছুটি নিয়েছিল। একত্রিশে মার্চ গেছে রবিবার,তার আগের দিন কমলেশ তাই ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার টাকা নগদে তুলেছে। সুদীপ তা জানে। কমলেশ বলেছিল, সোমবার সে ঐ নগদ টাকা ট্রাভলার্স চেক করিয়ে নেবে। কৌশিক খোঁজ নিয়ে জেনেছে, টাকাটা হোটেলের ভল্টে কমলেশ রাখেনি এবং মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে সে টাকাটা পাওয়া যায়নি কোথাও। ফলে ঐ দশ হাজার টাকাটাই হচ্ছে খুন হওয়ার হেতু। লটারির সওয়া লক্ষ টাকা সম্ভবত কমলেশ হাতে পায়নি। অবশ্য কৌশিক সে বিষয়ে খোঁজ নিয়েও দেখেনি।

বাসু-সাহেব পুনরায় বাধা দিয়ে বলেন, তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল লটারির প্রাইজ মানি অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক-এ দেওয়া হয়। খবরের কাগজে ফলাফল ঘোষণার পর সে টাকা হাতে পেতে মাসখানেক সময়ও লেগে যেতে পারে। কারণ চেকটা দেন এ.জি.ডবলিউ.বি—ডিরেক্টরেট অফ লটারিজ-এর নির্দেশ পেলে। ফলে ও তদন্ত তোমাকে করতে হবে না।

মিসেস বাসু বললেন, কৌশিকের সাফল্যে মনে হচ্ছে তুমি চটে যাচ্ছ?

বাসু বলেন, শাস্ত্র বলে, পুত্র এবং শিষ্যের হাতে পরাজয়ই কাম্য।

কৌশিক হতাশ হয়ে বলে, সুজাতা, আমার খাবারটা আনো।

বাসু বলেন, আর নবীন চ্যাটার্জী? তার বিষয়ে কোন সন্ধান পাওনি?

—পেয়েছি! সে আদৌ হোটেলে আসেনি। মানে, তার কথা অনুযায়ী।

—নবীন কি জানত, কমলেশ ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার টাকা তুলেছে?

—সে কেমন করে জানবে? না। সে জানত না।

—ফর ইয়োর ইনফরমেশন—নবীন জানত। তুমি কি এ খবরটা পেয়েছ যে, নবীন হচ্ছে কমলেশের শালা?

—নবীন চাটুজ্জে? কমলেশ মিত্রের শ্যালক!

বাসু-সাহেব তখন বলতে থাকেন—তাঁর তদন্তের ফলাফল। লীটন হোটেল থেকে তিনি গিয়েছিলেন কমলেশের ফ্ল্যাটে। কমলেশের ভৃত্য শিবু অত্যন্ত চালাক-চতুর। তার কাছ থেকে সন্ধান পাওয়া গেল—শনিবার বিকালেই নবীন তার ভগ্নিপতির বাসায় এসেছিল। কমলেশকে সে বলেছিল, অত টাকা এ-ভাবে বাড়িতে নগদে রেখেছ কেন? ভল্টে রাখলেই পারতে। জবাবে কমলেশ বলেছিল—সিংহের গুহায় ঢুকে কেউ তার বাচ্চা চুরি করে না নবীন। পকেট থেকে পিস্তল বার করে সে দেখিয়েছিল। শিবু তখন বারান্দায় ছিল। সবটুকু সে স্বচক্ষে দেখেছে।

বাসুসাহেব শেষমেশ বলেন, কে, কেন খুন করেছে তা জানি না। তবে খুনী যে দশ হাজার টাকা হাতাতে পারেনি, এটুকু জানি।

কৌশিক রুখে ওঠে—কেমন করে জানলেন?

—কারণ মৃত্যুর পূর্বেই টাকাটা হোটেল থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। আমি জানি!

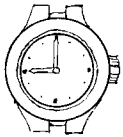

পরদিন। দোশরা এপ্রিল। বেলা ঠিক নয়টার সময় বাসু-সাহেবের গাড়িটা এসে দাঁড়াল লীটন হোটেলের সামনে। প্রকাশ তৈরীই ছিল! বলে, চলুন যাই।

—না। আগে তোমার ঘরে গিয়ে বসবে চল। কথা আছে।

ঘরে বসে বাসু প্রশ্ন করেন, তুমি কি জানতে, গত শনিবার কমলেশ দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে হোটেলে নিয়ে এসেছিল?

—না। এই মাত্র শুনলাম।

—রিভলভারটা নিয়েছ? ওটা একবার খুলে ধরত।

প্রকাশ আদেশ পালন করা মাত্র বাসু তার নম্বরটা নোটবুকে টুকে নিলেন। রুবি কোম্পানির পয়েন্ট টু-টু বোরের রিভলভার। নম্বর 732753* হঠাৎ চমকে ওঠেন বাসু। বলেন, এ কী! কাল দেখেছিলাম, ডিসচার্জড বুলেটটা ব্যারেলের ঠিক সামনে আছে। আজ এক ঘর সরে গেল কেমন করে?

প্রকাশ বলল, আমি বোধহয় অসাবধানে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এক ঘর সরিয়েছি।

—খুব অন্যায় করেছ। ওটাতে হাত দেওয়া উচিত হয়নি তোমার।

তারপর হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেল ওঁর। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন কয়েকটি মুহূর্ত। প্রকাশ একটু ঘাবড়ে যায়। বলে কী দেখছেন?

—কাল রাত্রে রিভলভারের নম্বরটা আমি টুকে রাখিনি। ডক্টর সেনগুপ্ত, এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি যে, রাতারাতি গোটা রিভলভারটাই পাল্টে গেছে।

—কী বলছেন! ওটা তো বরাবর আমার হেপাজতেই আছে!

—তা আছে। কিন্তু তুমি নিজেই ওটা করনি তো? মানে, জাস্ট অসাবধানে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে....

প্রকাশ বলে, আপনি কী বলছেন মাথামুণ্ডু—

চাপা গর্জন করে উঠেন বাসু, লুক হিয়ার ডক্টর। সাদা বাঙলায় বলছি—এভাবে আমাকে এড়িয়ে মার্ডার-ওয়েপনটা বদলে ফেলনি তো?

প্রকাশ শুধু বললে, ঈশ্বরের দিব্যি।

থানার সামনে গাড়িটা দাঁড়াতেই এগিয়ে এলেন বিকাশবাবু—প্রকাশের দাদা। তার পিছনে সতী। প্রকাশ বললে, এ কী! তোমরা কোথা থেকে এলে?

সতী প্রকাশের হাতটা টেনে নিয়ে ভেঙে পড়ে, ছোড়দা! এ তুই কী করলি?

বিকাশবাবু জোর করে তাকে টেনে সরিয়ে নেন।

বিকাশবাবুর কাছ থেকে জানা গেল, গতকাল রাত নয়টার সময় থানা থেকে প্রকাশের খোঁজে লোক

এসেছিল। রবি বসুও এসেছিল। রবির কাছ থেকেই ওরা জানতে পারেন প্রকাশ গা-ঢাকা দিয়েছে; কিন্তু সকাল দশটায় সে থানায় আসবে এজাহার দিতে। সতী রবিকে চেনে। রবি আগেও ওদের বাড়িতে এসেছে অনেকবার।

প্রকাশ বাসু-সাহেবের সঙ্গে তার দাদার পরিচয় করিয়ে দিল। বাসু বললেন, আমাদের সময় হয়ে গেছে। আমাদের মাপ করতে হবে। এস প্রকাশ।

থানার বড়বাবু সতীশ বর্মন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। রবি বসুও উপস্থিত। বর্মন প্রথমেই বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এমন একটা ব্যাপারে আপনি প্রধান সাক্ষীকে এভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বাসু বলেন, সাক্ষীকে লুকিয়ে রাখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আমার মক্কেল। প্রথম সুযোগেই আমি তাকে আপনার সামনে হাজির করেছি। সকাল দশটার আগে আপনাদের দপ্তর খোলে না।

—থানা যে রাতে ঘুমায় না এ খবরটা আপনাকে জানাতে হচ্ছে, এটাই আশ্চর্য।

—কিন্তু আমি যে রাতে ঘুমোই। আমার মক্কেলও।

—কিন্তু আপনার মক্কেল সারা রাত বাড়ি ফেরেনি কেন?

—সারা রাত বাড়ি না ফেরা পিনাল কোডের কত নম্বর ধারা মোতাবেক অপরাধ না জানলে কেমন করে মক্কেলকে ডিফেন্ড করব? তিনি কাল রাত্রে লীটন হোটেলে ছিলেন; স্ব-নামে। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। লুকিয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

—ঠিক আছে। এবার উনি ওঁর জবানবন্দি দিন। তবে প্রথমেই বলে রাখছি—তিনি যা বলবেন তা টেপরেকর্ড করে রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনবোধে তাঁর জবানবন্দি তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হতে পারে।

অতঃপর প্রকাশ তার দীর্ঘ জবানবন্দি দিল। গাড়িতে রিভলভার প্রাপ্তির প্রসঙ্গ আসতেই বর্মন বললেন—কই? সেই রিভলভারটা দেখি?

প্রকাশ সেটা হস্তান্তরিত করে দিতেই বর্মন তার চেম্বার খুলে দেখলেন। বাসু-সাহেবের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আশ্চর্য! সারারাত এই মার্ডার-ওয়েপনটা লুকিয়ে রেখেছেন?

—মার্ডার-ওয়েপন! আপনি বলতে চান—ঐ পিস্তলেই খুন হয়েছে!

বর্মন ব্যঙ্গোক্তি করে, এটা একটা দশ বছরের খোকাও বুঝতে পারে!

—নাকি? অথচ আমি তার হেতুটা বুঝছি না। কী করে বুঝলেন?

বর্মন জবাব দিলেন না বরং রবি বোসকে বললেন, ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট জীতেন বসাককে ডেকে দিতে। অনতিবিলম্বেই ইন্সপেক্টর বসাককে ডেকে নিয়ে এল রবি। থানার বড়বাবু তাকে বললেন, বসাক, এই রিভলভারেই কাল হিন্দুস্থান পার্কে খুনটা হয়েছে। তুমি অটোপ্সি-সার্জেনের কাছ থেকে বুলেটটা পেয়েছ; এবার এটাতে একটা টেস্ট-বুলেট ছুঁড়ে কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপে....ওয়েল, য়ু নো ইয়োর জব! কালকের মধ্যেই আমি লিখিত রিপোর্ট চাই।

বসাক চেম্বারটা খুলে দেখছিল। বললে, আমি একটা কথা বলব স্যার?

—নো। নট নাউ! আমি জবানবন্দিটা শেষ করতে চাই। যাও।

বসাক কিন্তু গেল না। বসল পাশের চেয়ারে। প্রকাশ বলে, গাড়িতে রিভলভারটা আবিষ্কার করেই আমি বুঝতে পারি, কেউ আমাকে একটা বিশ্রী কেস-এ জড়াতে চাইছে। তাই আমি তৎক্ষণাৎ চলে যাই ব্যারিস্টার পি.কে.বাসুর কাছে।

—তারপর?

বাসু বলেন, তারপর আর কিছু নেই মিস্টার বর্মন। জবানবন্দির এখানেই যবনিকা। এর পর আমার মক্কেল যা কিছু করেছে তার জিম্মাদারী আমার। সে বিষয়ে তাকে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আমি নিষেধ করছি।

—তা তো করছেন, কিন্তু যে অস্ত্রে খুন হল সেটা কেন উনি সারারাত লুকিয়ে রাখলেন—তা তো উনি বলবেন, না, হয় এটুকুও বলুন যে, সেটাও আপনার নির্দেশে!

—কী আশ্চর্য! কেসটা যে বুলেটের আঘাতে খুন তাও তো আমাদের জানাননি আপনি। ডাক্তার যখন পরীক্ষা করলেন তখন আপনি আমাদের ঘরে ঢুকতে দিলেন না। লোকটা মরে পড়ে আছে এটুকুই আমার মক্কেল আর আমি জানতাম। আত্মহত্যা হতে পারে, থ্রম্বোসিস হতে পারে, ছোরার আঘাতে খুন হতে পারে—

—এবং ঐ পিস্তলের গুলিতেও হতে পারে—

বসাক আবার বললে, আমি একটা কথা বলব স্যার?

ধমকে ওঠেন বড়বাবু, নো। প্লীজ ডোন্ট ডিস্টার্ব মি, এর আগেও বলেছি মামকা আমাকে ইন্টারাপ্ট করবে না—তোমাকে ডেকেছিলাম রিভলভারটা দিতে। সেটা পেয়েছ, এবার যাও। কাল রিপোর্ট দিও। লিখিত রিপোর্ট।

বসাক নিজেকে অপমানিত বোধ করে উঠে দাঁড়ায়। টেবিলের উপর পিস্তলটা রেখে দিয়ে গটগট করে চলে যায়। বর্মন পিছন থেকে গর্জে ওঠেন, ওটা ফেলে যাচ্ছ কেন?

বসাক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওখানে থেকেই বলল, ওটার দরকার হবে না। আপনি লিখিত রিপোর্ট চেয়েছেন। তাই পাবেন। কাল নয়, আজই। দশ মিনিটের মধ্যে।

—মানে?

—এটা পয়েন্ট টু-টু বোরের রিভলভার। অটোপ্সি-সার্জেন যে বুলেটটি আমাকে দিয়েছেন সেটা পয়েন্ট থ্রি-এইট বোরের। ফলে ল্যাবরেটারিতে এটাকে না নিয়ে গিয়েও আমি লিখিত রিপোর্ট দিতে পারব—এটা সেই মার্ডার-ওয়েপন নয়!

বসাক ঘুরে দেখল না তার ভাষণের প্রতিক্রিয়া। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বর্মন চট করে ঘুরে বাসুকে বললেন, এর মানে কী?

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, ভারি শক্ত প্রশ্ন! তাই তো! এর মানেটা কী হতে পারে?

প্রকাশকে নিয়ে বাসু-সাহেব থানা থেকে বেরিয়ে আসতেই প্রকাশ বলল, যাক বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার! ভাগ্যে ওটা টু-টু বোরের!

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু আমার যে কম্প দিয়ে জ্বর এল ডক্টর! আমি যে কিছুতেই বর্মনের সেই অসহায় প্রশ্নটা ভুলতে পারছি না—এর মানে কী?

—মানে নিয়ে কি আমরা ধুয়ে খাব? এটা যখন মার্ডার-ওয়েপন নয়, তখন ওরা আমাকে ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পাবে না।

—তা তো পাবে না, কিন্তু মার্ডার-ওয়েপন ছাড়া কেউ খামকা তোমার গাড়িতে একটা পিস্তলই বা রেখে যাবে কেন? যাতে আছে একটা ডিসচার্জড বুলেট, যার ব্যারেলে বারুদের গন্ধ! ওটারই দাম তো হাজার তিন-চার।

প্রকাশ হেসে বলে, সে চিন্তা আমার নয়, ব্যারিস্টার-সাহেব। পুলিসের!

—এবং আমার!

প্রকাশ বাড়িতে ফিরে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল সকলের। বড়বৌদি ছুটলেন কালীঘাটে। মানত সারতে। মেজবৌদি বললেন, কোথায় লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছিলে ঠাকুরপো—একেবারে থানায় নিয়ে তুলল। সতী ওকে জনান্তিকে কানে কানে বললে, রাতারাতি আর একটা যন্তর কোথা থেকে পয়দা করলি রে ছোড়দা? মস্তান-পার্টির সঙ্গে তোর খাতির আছে নাকি?

প্রকাশ বলে, বাজে কথা একদম বলবি না। দেওয়ালেরও কান আছে, জানিস।

কিন্তু এ আনন্দ বারো ঘন্টাও স্থায়ী হল না। ঐ দিন রাত দশটায় সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে থানা থেকে লোক এল। তছনছ হয়ে গেল সব কিছু। রাত একটা নাগাদ ওদের বাড়ির পিছনে আঁস্তাকুড়ের আবর্জনার ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হল একটি রিভলভার। এটি পয়েন্ট থ্রি-এইট বোরের। পুলিস বাড়ি

ছেড়ে গেল রাত দুটোয়। রিভলভারটা নিয়ে গেল। এবং ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্তকেও গ্রেপ্তার করে।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। জজের আদালতে যেদিন বিচার শুরু হল সেদিন কোর্টে লোক হয়েছে যথেষ্ট। ইতিমধ্যে পুলিস প্রাথমিক তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট কেসটা দায়রায় সোপর্দ করেছেন। আজ জাস্টিস্ সদানন্দ ভাদুড়ীর কোর্টে মামলাটা শুরু হল। বাদীপক্ষে আছেন নিরঞ্জন মাইতি। স্বনামধন্য পাবলিক প্রসিকিউটার। বিবাদীপক্ষে ব্যারিস্টার বাসু। বাদী ও প্রতিবাদী প্রস্তুত কি না জেনে নিয়ে বিচারক বললেন, মিস্টার পি.পি. আপনি কি একটা প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান?

—চাই মি-লর্ড! কেসটা জটিল—প্রত্যক্ষদর্শী কেউ নেই, কিন্তু সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সে আমরা কী কী প্রমাণ করতে চাই, তার চুম্বকসার প্রথমেই শুনিয়ে দিলে মামলার গতিপথ অনেকটা সরল হয়ে যাবে। বাদীপক্ষ আশা রাখেন, তাঁরা প্রমাণ করবেন আসামী ঐ ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্ত মাত্র দশ হাজার টাকার লোভে অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর সহপাঠী বন্ধুকে হত্যা করেন। মাত্র দশ হাজার টাকা বলছি এজন্য যে, ঐ অর্থ ডক্টর সেনগুপ্তের ছয় মাসের উপার্জনের অপেক্ষা কম। তাঁর বন্ধু—মৃত কমলেশ মিত্র যে একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন এমন দাবী আমরা করছি না। তাঁর চরিত্রে অনেক দোষ ছিল—কিন্তু সেজন্য তাঁর প্রাণধারণের মৌলিক অধিকার নিশ্চয় নাকচ হয়ে যায় না।

আমরা প্রমাণ করব, মৃত কমলেশ মিত্র গত তিরিশে মার্চ, শনিবার, ইউ-বি-আই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার টাকা নগদ তোলেন। পয়লা এপ্রিল তাঁর দার্জিলিঙ যাবার কথা ছিল, তিনি প্লেনের টিকিটও কেটেছিলেন। শনিবার বারোটা থেকে ঐ টাকা তাঁর বাড়িতে লোহার আলমারিতে নগদে রাখা ছিল। কমলেশবাবু ছিলেন কৌতুকপ্রিয় লঘু চরিত্রের মানুষ। একত্রিশে, রবিবার, তাঁর নাইট-ডিউটি ছিল। পয়লা এপ্রিল ভোর পাঁচটা নাগাদ তিনি আসামীকে অনুরোধ করেন রবি বসুকে ফোন করে জানাতে যে, তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। বলাবাহুল্য এটা নিছক কৌতুক—রবি বসুকে এপ্রিল ফুল করা। আমরা আশা রাখি প্রমাণ করব যে, সকাল সওয়া পাঁচটা নাগাদ কমলেশ অফিস থেকে বের হন এবং ছয়টা পাঁচ মিনিটে রবি বসুর বাড়িতে আসেন। সেখানে পৌঁছে কমলেশ দেখতে পান, ভুল খবর পেয়ে রবি বসু তার পূর্বেই মেডিকেল কলেজে রওনা হয়ে গেছে। মিসেস বসু স্বামীর অনুপস্থিতিতে যখন স্বামীর বন্ধুকে আপ্যায়ন করার আয়োজন করেন তখন রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত কমলেশ রবিবাবুর শয়নকক্ষে চলে যান এবং শুয়ে পড়েন।

আমরা আশা রাখি, সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সে প্রতিষ্ঠা করব—নির্জন কক্ষে কমলেশ দেখতে পান, ঘরে লোহার আলমারিটা বন্ধ করা নেই। কমলেশবাবু—আগেই বলেছি—অত্যন্ত লঘুচরিত্রের খেয়ালী মানুষ। নিছক কৌতূহলে তিনি আলমারির পাল্লা খুলে দেখতে পান, ভিতরে ইন্সপেক্টর রবি বসুর সার্ভিস রিভলভারটা রয়েছে। কৌতুকপ্রিয় কমলেশ তৎক্ষণাৎ সেটি পকেটে ভরে ফেলেন। চুরির উদ্দেশ্যে নয়, বন্ধুকে নাকাল করার অভিলাষে। রবিবাবুর রিভলভারটি ছিল থ্রি-এইট বোরের স্যাঙ্কবী কোম্পানীর। তার নম্বর 397526। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—কমলেশের একটি নিজস্ব রিভলভার ছিল। সেটি রুবি কোম্পানির টু-টু বোরের।

কমলেশ সাড়ে ছয়টার সময় রবি বসুর সূর্য সেন স্ট্রীটের বাসা থেকে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন। তাঁর গৃহভৃত্যের সাক্ষ্যে আমরা প্রমাণ করব, প্রাতঃরাশের সময় তিনি খবরের কাগজে দেখেন যে, তিনি এবার লটারীতে সওয়া লক্ষ টাকার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দার্জিলিঙ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে একটি পার্টি দেবার বাসনা জাগে তাঁর। গৃহে স্থানাভাব—তাই তিনি হোটেল হিন্দুস্থানে একটি সুইট ভাড়া নেন। বন্ধু-বান্ধবীদের টেলিফোন করে সন্ধ্যা ছটার সময় তাঁর সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে বলেন। শুধু তাঁর নিকটতম বন্ধু ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্তকে বিকাল তিনটায় ঐ হোটেলে দেখা করতে বলেন।

মামলা চলাকালীন আমরা দেখাব যে, কমলেশবাবু বেলা পৌনে এগারোটায় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট

লটারীর দপ্তরে ফোন করেন এবং তাঁরা ওঁকে বেলা সাড়ে তিনটায় আসতে বলেন। সেই অনুসারে তিনটা নাগাদ তিনি যখন হোটেল ত্যাগ করে যাচ্ছেন তখন তাঁর মনে পড়ে যে, বন্ধু ডক্টর সেনগুপ্তকে তিনি সাড়ে তিনটায় আসতে বলেছেন। তিনি অনায়াসে কাউন্টারে চাবিটি রেখে নির্দেশ দিয়ে যেতে পারতেন যে, বন্ধু এলে যেন তাঁকে চাবিটি দিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়। কিন্তু কৌতুকপ্রিয় কমলেশ সে পথে যাননি। তিনি কী বিচিত্র ব্যবস্থা করেছিলেন তা মামলা চলাকালীন আমরা দেখাব। আমরা প্রমাণ করব, আসামী প্রকাশবাবু কীভাবে কাউন্টার-ক্লার্কের হাত থেকে চাবি নিয়ে বন্ধুর অনুপস্থিতিতে ঐ ঘরে ঢোকেন। একটা সিগ্রেট খেতে যতটুকু সময় লাগে অন্তত সেই সময়টুকু তিনি ঐ নির্জন ঘরে ছিলেন। তারপর চুরির উদ্দেশ্যেই হোক অথবা খেয়ালবশেই হোক তিনি ঘরের আলমারির পাল্লাটা খোলেন এবং দেখতে পান, সেখানে থাক দেওয়া নোট ও একটি রিভলভার রয়েছে।

আলমারির ভিতরে নোটগুলি ছিল একশ টাকায়—দশ কেতা নোট—দশ হাজার টাকার! রিভলভারটি রবি বসুর। আসামী তৎক্ষণাৎ টাকাটি পকেটজাত করে রিভলভার হাতে অপেক্ষা করেন। কিছু পরে কমলেশ তাঁর ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে দরজা খুলে ঘরে ঢোকা মাত্র প্রকাশ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তখন কমলেশের পকেটে ছিল তাঁর নিজস্ব রিভলভার; কিন্তু তিনি সেটি বার করার সুযোগ পান না। আসামী মৃতদেহকে বাথরুমে টেনে নিয়ে যান। তিনি যে বাথরুমের দরজা খুলেছিলেন—ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্টের সাক্ষ্যে তা আমরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করব।

প্রস্থানের সময় আসামী লিফট দিয়ে নামেন না, যাতে লিফটম্যান তাঁকে পরে সনাক্ত না করতে পারে। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন তখন সাক্ষী সুদীপ লাহিড়ী লিফট বেয়ে উপরে উঠছিলেন। দ্বিতলের ল্যান্ডিঙে সুদীপ তাকে দেখতে পান। আসামীর সঙ্গে কোনও ব্যাগ ছিল না। তার দুই পকেটে তখন দশ হাজার টাকা এবং দুটি রিভলভার। সুদীপবাবু আসামীর হিপ-পকেট থেকে একটি রিভলভারের মাথা উঁচু হয়ে আছে দেখতে পান।

আমরা প্রমাণ করব, গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আসামী ঐ রাত্রে বাড়ি ফেরেন না। হোটেলে রাত্রিবাস করেন এবং মধ্যরাত্রে নিজের বাড়িতে আসেন। মার্ডার-ওয়েপন, অর্থাৎ রবি বসুর পয়েন্ট থ্রি-এইট বোরের রিভলভারটি নিজ বাড়ির বাগানে লুকিয়ে রেখে হোটেলে ফিরে যান।

মাননীয় আদালতকে আমার শেষ বক্তব্য—বাদীপক্ষের প্রতিবেদনে কোনও লুকোছাপা নেই। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ কেসটি প্রথমেই পেশ করলাম। এ জাতীয় মামলায় বাদীপক্ষ এমনভাবে তাদের আক্রমণ পদ্ধতি খোলাখুলি পেশ করেন না; আমরা সে-পথে যেতে চাই না। আমরা বলতে চাই, আসামীর অপরাধ সূর্যোদয়ের মত স্পষ্ট—সে অপরাধ অপ্রমাণ করার পূর্ণ সুযোগ আমার সহযোগী প্রতবাদীপক্ষকে দিতে চাই। তাই এই দীর্ঘ প্রারম্ভিক ভাষণ। আমাদের শেষ বক্তব্য—মাননীয় আদালত এ জাতীয় অপরাধে আসামীর চরমতম দণ্ডবিধান করে আদালতের মর্যাদা রক্ষা করুন।

কপালের ঘাম মুছে মাইতি আসন গ্রহন করেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, এবারে আপনি প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে পারেন।

—থ্যাঙ্ক মি-লর্ড। আমাদের কোন প্রারম্ভিক ভাষণ নেই। বাদীপক্ষ তাঁদের সাক্ষীদের ডাকতে পারেন।

প্রথম সাক্ষী অটোপ্সি-সার্জেন ডক্টর শ্রীশ ধর। মাইতির প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, তাঁর মতে মৃত্যুর সময় এ বৎসর পয়লা এপ্রিল বৈকাল তিনটা থেকে চারটের ভিতর। ক্রস একজামিনেশনে বাসু জানতে চাইলেন, ডক্টর ধর, মৃত্যুর সময়টা আপনি কীভাবে নির্ধারণ করলেন? রিগর মর্টিস দেখে?

—না। মৃতের পাকস্থলী ও অন্ত্রে প্রাপ্ত ভুক্তাবশেষের জীর্ণতার পরিমাণ থেকে। আহারের পর থেকেই খাদ্য জীর্ণ হতে থাকে। কোনও সময় আহারকারীর মৃত্যু হলে হজম হওয়াও বন্ধ হয়। পাকস্থলী ও অন্ত্রে যেসব অর্ধজীর্ণ ভুক্তাবশেষ পাওয়া যায় তার রাসায়নিক পরীক্ষা করে বলা যায়—আহার গ্রহণের কত পরে মৃত্যু হয়েছে।

—এক্ষেত্রে আহার গ্রহণের কত পরে মৃত্যু হয়েছে?

—প্রায় দুই ঘণ্টা।

—যেহেতু আপনি মৃত্যুর সময় তিনটে থেকে চারটে বলেছেন তাই আপনি ধরে নিয়েছেন যে, মৃতব্যক্তি একটা থেকে দুটোর মধ্যে আহার করেছিল। তাই নয়?

—হ্যাঁ তাই।

—আপনি কেমন করে জানলেন, মৃত ব্যক্তি কখন আহার করেছিল?

—হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। বেলা পৌনে দুটো নাগাদ রুম নম্বর 528-এ মধ্যাহ্ন আহার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্রেডরোল, চিকেন সুপ, মাখন, ফিশ্-ফিঙ্গার এবং চিকেন রোস্ট। যেহেতু এগুলি গরম গরম খেতে ভাল লাগে, তাই ধরে নিচ্ছি বেলা দুটো নাগাদ তিনি আহারে বসেন।

—আপনি যে খাদ্য-তালিকার কথা বললেন, সেটা নিশ্চয় লাঞ্চ মেমো অনুযায়ী। ঐ আইটেমগুলির প্রত্যেকটির অর্ধজীর্ণ ভুক্তাবশেষ কি আপনি শব ব্যবচ্ছেদে পেয়েছিলেন? মৃতের পাকস্থলী বা অন্ত্রে?

—হ্যাঁ, পেয়েছিলাম।

—ঐ তালিকাভুক্ত নয় এমন কোন খাদ্যের অবশেষ কি পেয়েছিলেন?

সাক্ষী একটু চিন্তা করে বলেন হ্যাঁ, তাও পেয়েছিলাম। 'গ্রীন পীজ', মানে মটরশুটি।

—সেটা কেমন করে হয়? উনি তো মটরশুটি খাননি, মানে লাঞ্চ মেমো অনুযায়ী! এতে আপনার মনে কোন সন্দেহ হয়নি?

—হয়েছিল। এজন্য আমি হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, গ্রীন পীজ এর একটি পদও লাঞ্চে সরবরাহের ব্যবস্থা ঐদিন ছিল। শেষদিকে ঐ আইটেমটা ফুরিয়ে যায়। হোটেলের হেডকুক বললেন যে হয়তো 528 নম্বর কামরায় ওটা পাঠানো হয়েছিল, ভুলে লাঞ্চ মেমোতে দাম ধরা হয়নি। যেহেতু মৃতের পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে অর্ধজীর্ণ মটরশুটি ছিল তাই আমি ধরে নিয়েছিলাম—এই ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত।

—তার মানে, ডক্টর ধর, আপনি মৃত্যুর যে সময়টা নির্ধারণ করছেন তা ঐ হেডকুক এবং রুম-সার্ভিস বেয়ারার কথার উপর নির্ভর করে। নিছক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই! তবে আহারের সময়টা ওদের কথা থেকে নিতে হয়েছে আমাকে।

—আমিও তাই বলছি—মৃত্যুর সময়টা আপনি নির্ধারণ করেছেন পরের কথায়—যাকে আইনের ভাষায় বলে হেয়ার-সে-রিপোর্ট ! দ্যাটস অল মি লর্ড।

দ্বিতীয় সাক্ষী সতীশ বর্মন। ইন্সপেক্টর। যিনি টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে প্রথম তদন্তে গিয়েছিলেন। মাইতির প্রশ্নে তিনি বিশদ বর্ণনা দিলেন। বিকাল পাঁচটা বাহান্ন মিনিটে তিনি প্রথম টেলিফোন পান। টেলিফোন করেন ব্যারিস্টার পি.কে.বাসু। তারপর হোটেলে এসে যা যা দেখেন তার দীর্ঘ বিবরণ দেন। তদন্তের অন্যান্য পর্যায়ের বর্ণনাও দিলেন।

জেরায় বাসু তাঁকে প্রশ্ন করলেন, মৃতের পকেট থেকে আপনি কী কী জিনিস উদ্ধার করেন?

—একটি ফাউন্টেন পেন, রুমাল, একটি মানিব্যাগ, যার গর্ভে ছিল বিভিন্ন নোটে মোট পাঁচশ বাহাত্তর টাকা আটত্রিশ নয়া পয়সা। একটি লটারির টিকিট, কলকাতা-বাগডোগরার দু-খানি প্লেনের টিকিট, দোশরা তারিখের।

—আপনি এই জিনিসগুলি মামলার এক্‌জিবিট হিসাবে জমা দেননি কেন?

—কেউ দিতে বলেননি তাই। এগুলি তদন্তকারী অফিসার হিসাবে আমার কাছেই আছে।

বাসু-সাহেব দাবী করেন এগুলিকে মামলার একজিবিট হিসাবে আদালতে নথীভুক্ত করা হক। মাইতি আপত্তি জানালেন, বললেন, এগুলিকে পিপলস্-এক্সিবিটি হিসাবে নথীভুক্ত করার কোন প্রয়োজন তিনি দেখছেন না।

বাসু বললেন, তাহলে ঐগুলি প্রতিবাদীর এক্সিবিট হিসাবে নথীভুক্ত করা হক।

অগত্যা তাই করা হল। বাসু ফাউন্টেন পেন-এর ক্যাপ খুলে দেখলেন, তাতে কালি আছে কি না। ছিল—সবুজ রঙের কালি। প্লেনের টিকিট দুটি এবং লটারির টিকিটের নম্বরটা টুকে নিলেন। মানিব্যাগ খুলে দেখে সাক্ষীকে বললেন, আপনি বলেছেন, ব্যাগে শুধু টাকা-পয়সা ছিল। আমি দেখছি টাকা-পয়সা ছাড়াও আছে কিছু ভিজিটিং কার্ড এবং একটি মহিলার ফটো। এগুলো কি মৃতব্যক্তির পকেট থেকে সংগ্রহ করার সময়েই মানিব্যাগে ছিল, না কি আপনি পরে ভরে দিয়েছেন?

—আমি কিছু ভরে দিইনি। ব্যাগে যা ছিল তাই আছে।

—তাহলে আপনার আগের স্টেটমেন্টটা 'হোল ট্রুথ' নয় কেমন? ঐ ফটোখানি কার?

—মিস্ মীনাক্ষী মজুমদারের।

—প্লেনের একখানি টিকিট তো শুনলাম কমলেশবাবুর। দ্বিতীয়টি কার নামে?

—টিকিটখানা তো পড়েই আছে, দেখলেই জানতে পারবেন।

—তা নয়। আমি জানতে চাইছি 'ইনভেস্টিগেটিং অফিসার' হিসাবে আপনি তা দেখেছেন কি না। নামটা বলতেই বা অত ইতস্তত করছেন কেন?

—মিস্ মীনাক্ষী মজুমদারের।

—আপনি ডাইরেক্ট এভিডেন্সে বলেছেন যে, দেশরা এপ্রিল রাত এগারোটা থেকে তেশরা এপ্রিল রাত একটার মধ্যে আসামী ডক্টর সেনগুপ্তের বাড়ি সার্চ করার সময় একটি রিভলভার খুঁজে পেয়েছেন। ঐ তল্লাসীর আগে প্রকাশবাবু বা তাঁর বাড়ির কোন লোক কি আপনাদের দেহ তল্লাস করে দেখেছিল?

—না।

—তাহলে আপনারা নিজেরাই ওটা ওখানে গুঁজে রেখে নিজেরাই সেটা আবিষ্কার করে থাকতে পারেন! ঠেকাচ্ছে কে? তা পারতেন না আপনারা?

—অবজেকশন য়োর অনার! উনি পুলিস বিভাগকে ডিফেম করছেন। —মাইতির আপত্তিতে জাস্টিস ভাদুড়ী চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন কপালি দিতে।

বাসু বলেন, য়োর অনার। আদালতের অনুমতি পেলে আমার প্রশ্নটির প্রয়োজনীয়তা ও যাথার্থ্য সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করতে চাই।

—বেশ বলুন—জাস্টিস ভাদুড়ী শুনতে চান।

—মাননীয় সহযোগীর ওপনিং স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আসামী মধ্যরাত্রে লীটন হোটেল থেকে নিজ বাড়িতে এসে আস্তাকুড়ে রিভলভারটা ফেলে দেয়। এক্ষেত্রে একটি অনিবার্য প্রশ্ন ওঠে—লীটন হোটেলে থেকে আসামীর বাড়ি যেতে কি অসংখ্য ম্যানহোল কভার ছিল না? বেছে বেছে নিজের বাড়ির আস্তাকুড়ে কেন সে মার্ডার-ওয়েপনটা রেখে এল? অপরপক্ষে অন্তটা পুলিসের রিভলভার। ঘটনার কিছু পূর্বে সেটা ছিল ইন্সপেক্টর রবি বসুর হেপাজতে। যাঁর স্টেটমেন্ট—সেটা ঘটনার আগেই খোয়া গেছে। এবং ইন্সপেক্টর রবি বসু হচ্ছেন বর্তমান সাক্ষীর অধীনস্থ কর্মচারী এবং তল্লাসীর পূর্বে তাঁদের সার্চ করা হয়নি। ফলে, এ সন্দেহ যদি প্রতিবাদীর মনে জাগে তাহলে সেটা কি অস্বাভাবিক, না পুলিস বিভাগকে ডিফেম করা?

জাস্টিস ভাদুড়ী বললেন, অবজেকশান ওভাররুলড। নাউ আনসার দ্যাট কোশ্চেন!

—না। আমরা নিজেরাই রিভালভারটা ওভাবে গুঁজে দিইনি।

—উঁহুহু ! ওতে হবে না মিস্টার বর্মন। ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—যেহেতু তল্লাসীর আগে আপনাদের সার্চ করা হয়নি, তাই ইচ্ছা করলে আপনারা নিজেরাই হাতসাফাই করে ওটা ওখানে রেখে নিজেরাই তা আবিষ্কার করতে পারতেন। তা পারতেন না আপনারা?

—অমন ইচ্ছে আমরা করিনি। হাতসাফাই করিনি!

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন বাসু, ন্যাকা সাজবেন না মিস্টার বর্মন। জবাব যতক্ষণ না দিচ্ছেন সারাদিন

আমি ঐ একই প্রশ্ন করে যাব। এবং এটা মনে রাখবেন, সহজ সরল জবাবটা যতবার এড়িয়ে যাবেন ততবারই আপনার 'গিল্টিকনশাস্' মনের প্রমাণ লেখা হয়ে থাকবে আদালতের নথীতে!

উঠে দাঁড়ান মাইতি, অবজেকশান! জেরার পদ্ধতিতে আমার আপত্তি। উনি সাক্ষীকে ধমক দিচ্ছেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী তৎক্ষণাৎ বলেন, ওভাররুলড! আমি ডিফেন্স কাউন্সেলের সঙ্গে একমত! সাক্ষী গ্রামের চাষী নন, থানার দারোগা। আদালত তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে প্রশ্নের জবাব দিতে, অথচ তিনি ক্রমাগত সেটা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

বর্মন বললে, হ্যাঁ, ইচ্ছা করলে তা আমরা পারতাম!

—থ্যাঙ্কু! এবার বলুন, তল্লাসীর সময় রবি বসু কি উপস্থিত ছিলেন?

—না ছিলেন না।

—কে ঐ রিভলভারটা খুঁজে পায়?

—আমি নিজেই।

—রবি বসু আপনার অধীনস্থ কর্মচারী?

—সে তো আপনি জানেনই।

—তা হলে সোজাসুজি স্বীকার করে 'হ্যাঁ' বলতে বাধছে কেন? মিস্টার বর্মন?

মাইতি গাত্রোত্থান করবার উপক্রম করতেই বাসু বলেন, এখানেই জেরা শেষ।

এর পর ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট জীতেন বসাকের সাক্ষী হল। তার সাক্ষ্যে প্রমাণ হল ঃ কমলেশ মিত্র রবি বসুর অপহৃত পয়েন্ট থ্রি-এইট বোরের রিভলভারের গুলিতেই মারা গেছেন। বাসু তাকে জেরাই করলেন না। এরপর সাক্ষী দিতে এলেন নবীন চট্টোপাধ্যায়। বাসু তাকে জেরায় প্রশ্ন করলেন, নবীনবাবু, এ কথা কি সত্য যে, কমলেশবাবুর অনুরোধে এবং তার অর্থে আপনি দেশরা এপ্রিল তারিখের দুখানি প্লেনের টিকিট কিনে দেন?

—হ্যাঁ, সত্য।

—একটি টিকিট ছিল কমলেশবাবুর, দ্বিতীয়টি মিস্ মীনাক্ষী মজুমদারের। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই।

আপনি কুণ্ডু-ট্র্যাভেলস অফিসে গিয়ে কমলেশবাবুর অনুরোধে এবং তাঁর অর্থে দার্জিলিঙে 'হোটেল কুণ্ডু'-এ ওদের জন্য সীট রিসার্ভ করেছিলেন, এ কথা সত্য?

—হ্যাঁ, সত্য।

—আপনি একটি ডবল্-বেডরুম বুক করেন। ঠিক?

সাক্ষী একটু চঞ্চল হয়ে পড়ে ঃ হ্যাঁ, ঠিক।

—কমলেশ মিত্রের স্ত্রী অনুপমা মিত্র আপনার আপন জাঠতুতো বোন—এ কথা সত্য?

—হ্যাঁ, সত্য।

—এবার নবীনবাবু, আদালতকে বলুন কোন স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে আপনি আপনার ভগ্নীর সর্বনাশ করছিলেন!

মাইতি আপত্তি তোলেন প্রশ্নের ধরনে। ভাদুড়ী সে আপত্তি মেনে নেন।

বাসু পুনরায় জেরা শুরু করেন, আপনি একত্রিশে রবিবার সন্ধ্যায় কমলেশবাবুর ফ্ল্যাটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যখন গল্প করছিলেন তখন আপনি জানতে পারেন যে, পূর্বদিন শনিবার কমলেশবাবু ব্যাঙ্ক থেকে নগদ দশ হাজার টাকা তুলেছেন এবং সে টাকা নিজের কাছে রেখেছেন—তাই নয়?

সাক্ষী ইতস্তত করছে দেখে বাসু বলে ওঠেন, এসব কথা তো কমলেশবাবুর চাকর শিবুর সাক্ষাতে হয়েছিল, মনে পড়ছে না আপনার?

—হ্যাঁ, পড়েছে। আমি জানতাম।

—আপনি এ-কথাও জানতেন যে, হোটেল থেকে কমলেশবাবু সোজা প্লেন ধরবে, ফলে হোটেলে তার কাছে তখন নগদে দশ হাজার টাকা ছিল? জানতেন তো?

—তাতে কী হল?

—হয়নি এখনও, হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি জানতেন, না—না?

—না, প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানতাম না।

—অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞানে জানতেন। এবার বলুন, তাহলে কেন পয়লা তারিখে দুপুরবেলা আপনি হোটেল হিন্দুস্থানে এসেছিলেন?

—লীডিং কোশ্চেন, য়োর অনার! —হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন মাইতি।

নবীনবাবু এই সুযোগে রুমাল বার করে কপালের ঘামটা মুছে ফেলে।

অপরাহ্নের সেশনে প্রথমেই সাক্ষী দিতে এলেন সুদীপ লাহিড়ী। মাইতির প্রশ্নে তিনি বললেন, পয়লা এপ্রিল বিকাল প্রায় পৌনে চারটেয় তিনি হোটেল হিন্দুস্থানে কমলেশের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি যখন লিফট্ দিয়ে উঠছিলেন তখন সিঁড়ি দিয়ে প্রকাশ সেনগুপ্তকে নেমে যেতে দেখেন। প্রকাশের পকেট উঁচু হয়ে ছিল এবং পিছনের পকেটে কালো রঙের কোন কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছিল। মাত্র দু-এক সেকেন্ড তিনি ওকে দেখতে পান, যখন লিফ্‌টটা উপরে উঠছে! তাই তিনি হলপ নিয়ে বলতে পারবেন না যে, হিপ-পকেট থেকে উঁচু হয়ে থাকা বস্তুটা রিভলবার কি না। তারপর তিনি কমলেশের 528 নম্বর ঘরে গিয়ে দেখতে পান একটি বোর্ড ঝুলছে। তাতে বিজ্ঞপ্তি লেখা আছে—'বিরক্ত করবেন না'। সুদীপ তখন আবার লিফট বেয়ে নিচে নেমে আসে। হোটেল ছেড়ে চলে যাবার সময় সে দেখতে পায় কাউন্টারের কাছে মিস্ মীনাক্ষী মজুমদার দাঁড়িয়ে আছে। না, মিস্ মজুমদারের সঙ্গে তার কোনও কথা হয়নি—মীনাক্ষী তাকে দেখতেও পায়নি। অতঃপর সে হোটেল ছেড়ে চলে যায়। ফিরে আসে সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ এবং তখনই সে জানতে পারে কমলেশ খুন হয়েছে।

বাসু-সাহেব জেরা করতে উঠে প্রথমেই প্রশ্ন করেন—আপনি এভিডেন্সে বলেছেন যে, কমলেশ আপনাকে সন্ধ্যাবেলায় আসতে বলেছিল! তাহলে পৌনে চারটের সময় আপনি কেন এসেছিলেন?

—আমার কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। সর্বসমক্ষে টাকাটা কমলেশের কাছ থেকে ধার চাইতে পারব না বলে জনান্তিকে দেখা করতে এসেছিলাম। সে ব্যস্ত আছে এবং 'ডোন্ট ডিস্টার্ব' বোর্ড টাঙিয়েছে দেখে ফিরে যাই।

—আপনি তো মীনাক্ষী দেবীকে ভাল করেই চেনেন। যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন তাকে কাউন্টারে দেখতে পেয়েও এগিয়ে এসে কথা বললেন না কেন?

সাক্ষী একটু ইতস্তত করে বলে, ওকে দেখেই আমি বুঝতে পারি কমলেশ ওর প্রতীক্ষাতেই প্রহর গুনছে। তাই অন্যান্য বন্ধুদের জন্য সে বোর্ড টাঙিয়েছে। এ কথা বুঝতে পেরে আমি মীনাক্ষী দেবীকে ডিসটার্ব করিনি।

—আপনি কি জানতেন পরদিন কমলেশ ও মীনাক্ষী দার্জিলিঙ যাচ্ছে?

—জানতাম।

—আপনি এ-কথাও জানতেন যে, প্রাইজ পাওয়া লটারীর টিকিটটা কমলেশের কাছে আছে?

—প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জানতাম না, আন্দাজ করেছিলাম।

—আপনি বলেছেন—লিফটে উঠতে উঠতে আপনি দেখতে পান যে, আসামী সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে এবং তার হিপ-পকেট থেকে কালো মতো কিছু বেরিয়ে আছে? তাই বলেছেন, নয়?

—হ্যাঁ, সেটা যে রিভলভার, তা আমি বলিনি।

—তা তো আমিও বলিনি। আপনার ভাষায় 'কালোমতন কিছু একটা জিনিস' তাই তো?

—হ্যাঁ, তাই।

—যদি ধরা যায় সেটা মার্ডার-ওয়েপন, তাহলে কোন আততায়ী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে যন্ত্রটা কি এমনভাবে নিয়ে যেতে পারে যাতে দূর থেকে কেউ সেটাকে 'কালোমতন একটা জিনিস' বলে সনাক্ত করবে?

মাইতি আপত্তি তোলেন।

—হিপ-পকেটে অনেকে পেপার-ব্যাক বইও রাখে, এমনভাবে রাখে যাতে দূর থেকে তার কালো রঙ বোঝা যায়, তাই নয়?

—এবারও মাইতি আপত্তি তোলেন, একই অজুহাতে।

বাসু-সাহেব বুঝতে পারেন, প্রশ্ন দুটি বাতিল হলেও তাঁর বক্তব্য আদালত বুঝতে পেরেছেন, আদালতের নথীতে তা লেখা হ'ক আর না হ'ক।

পরবর্তী সাক্ষী—মিস্ মীনাক্ষী মজুমদার।

মাইতি জানতে চাইলেন, আপনি ঠিক কখন কীভাবে জানতে পারলেন যে, কমলেশ ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে?

—আন্দাজ সকাল সাড়ে নয়টার সময়। কমলেশ নিজেই আমাকে টেলিফোন করে জানায়; হোটেল হিন্দুস্থান থেকে। সে আমাকে বেলা তিনটের সময় ঐ হোটেলে আসতে বলে। সে বলেছিল, সে রিসেপশন কাউন্টারে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

—আপনি কি সেইমত বেলা তিনটে নাগাদ হোটেল হিন্দুস্থানে এসেছিলেন? এসে থাকলে কি ঘটেছিল আনুপূর্বিক বলে যান।

জবাবে মীনাক্ষী জানায়, সে নির্ধারিত সময়েই হোটেলে উপস্থিত হয়। লাউঞ্জে কমলেশকে দেখতে পায় না। মিনিট দশেক অপেক্ষা করে সে রিসেপশনে কাউন্টার ক্লার্ককে প্রশ্ন করে কমলেশ মিত্রের রুম নম্বর কত। মেয়েটি বলে, 528। এরপর মীনাক্ষী লিফটে করে ওর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। দরজার সামনে বোর্ড ঝুলছে দেখে সে 'কলিং বেল' বাজায়। অনেকক্ষণ পরেও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সে নিচে নেমে আসে। কাউন্টার-ক্লার্ককে অনুরোধ করায় সে নিচে থেকে টেলিফোনও করে। তবু কমলেশ সাড়া দেয় না। তখন সে ফিরে যায়। হোটেলে আসে সন্ধ্যা প্রায় ছয়টায় এবং তখনই জানতে পারে কমলেশ খুন হয়েছে।

—কমলেশের প্রাইজ পাওয়ার কথা আপনি নিজে থেকে কাকে কাকে জানান?

—নবীনবাবুকে এবং সুদীপবাবুকে।

—প্রকাশবাবুকে?

—না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ই ছিল না।

—য়ূ মে ক্রস এগজামিন হার!—আসন গ্রহণ করেন মাইতি!

বাসু সাক্ষীকে বলেন, মিস্ মজুমদার, আপনি ডাইরেক্ট এভিডেন্সে বলেছেন, যে প্রকাশবাবুকে আপনি এই সুসংবাদটা দেননি। এখন বলুন, ঐ পয়লা এপ্রিল তারিখে আসামী প্রকাশ সেনগুপ্তের সঙ্গে টেলিফোনে আদৌ কোনও কথাবার্তা হয়েছিল কি?

—না, হয়নি।

—ঐদিন সকালে ইন্সপেক্টর রবিন বসুর সঙ্গে টেলিফোনে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?

—হয়েছিল।

—তাঁকে আপনি জানিয়েছিলেন, ঐ প্রাইজ পাওয়ার কথা—ইয়েস অর নো?

—ইয়েস্।

—তাহলে ডাইরেক্ট এভিডেন্সে যখন পি.পি. প্রশ্ন করলেন তখন কেন বললেন, শুধু নবীনবাবু আর সুদীপবাবুকেই জানিয়েছেন?

দেখা গেল, সাক্ষী জবাবের জন্য প্রস্তুত। সপ্রতিভভাবে কথার পিঠে কথার মত তৎক্ষণাৎ বললে, দুটি কারণে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'কমলেশের প্রাইজ পাওয়ার কথা আমি কাকে কাকে জানিয়েছি।' এক্ষেত্রে রবিবাবুকে আমি নিজে থেকে কিছুই জানাইনি, তিনিই প্রথমে ফোন করেন, তিনিই জানতে চান প্রাইজ পাওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত রবিবাবুকে আমি একথাও বলিনি যে, কমলেশ প্রাইজ পেয়েছেন। বরং বলেছিলাম, প্রাইজটা আমিই পেয়েছিলাম।

—বুঝলাম। ও-কথা কেন বলেছিলেন রবিবাবুকে?

—যেহেতু তারিখটা ছিল পয়লা এপ্রিল, তাই।

—বাসু বুঝলেন এদিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে লাভ নেই। তিনি এবার একেবারে অন্য দিক থেকে আক্রমণ শুরু করলেন ঃ মিস্ মজুমদার, আপনি কি জানেন কমলেশ মিত্র বিবাহিত?

—জানি।

—এবং এ-কথাও জানেন যে, তাদের সেপারেশন চলছিল, ডিভোর্সে মামলা কোর্টে চলছিল?

—হ্যাঁ, তাও জানি।

—তা-সত্ত্বেও আপনি কমলেশবাবুর সঙ্গে দার্জিলিঙে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলেন?

—'তা সত্ত্বেও' মানে কি? কমলেশবাবু এবং আমি, আমরা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। একসঙ্গে এক প্লেনে দার্জিলিঙ বেড়াতে যাওয়ায় দূষণীয় তো কিছু দেখছি না?

—কিন্তু আপনি কি এ-কথা জানতেন না যে, আপনাদের জন্য দার্জিলিঙ-এ হোটেল কুঞ্জ-এ একটি ডবল-বেড রুম বুক করা হয়েছে?

—সাক্ষী একটু ইতস্তত করে বললে, জানতাম।

—এতেও দূষণীয় কিছু নজরে পড়েনি নিশ্চয়? যেহেতু আপনারা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক?

সাক্ষী চকিতে একবার মাইতি-সাহেবের দিকে তাকায়। সেখান থেকে আপত্তি উঠবে এমন একটা আশা করেছিল হয়তো। মাইতি নির্বিকার থাকায় সে বললে, কমলেশ সেটা আমাকে না জানিয়েই করেছিল। দার্জিলিঙে পৌঁছে আমি ও ব্যবস্থায় রাজী হতাম না। পৃথক রুম নিতাম।

—আপনারা কি ইতিপূর্বে—আই মীন কমলেশবাবু বিবাহ করবার পরে কোনও হোটেলের ডবল-বেড রুমে রাত্রিবাস করেননি?

মীনাক্ষী পুনরায় তার উকিলের দিকে অসহায়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ে দেখে। মাইতি যথারীতি নির্বিকার। মীনাক্ষী অতঃপর স্বয়ং জজ সাহেবকে প্রশ্ন করে, য়োর অনার, আমি কি এ প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য?

—জজ-সাহেব এবার মাইতির দিকে একটি ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, যদিচ আপনার উকিল আপত্তি পেশ করেননি, তবু আদালত মনে করেন—এ প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক ও বৈধ নয়। আপনি এ-প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নন। মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল, আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

বাসু প্রশ্ন করেন, আপনি ডাইরেক্ট এভিডেন্সে বলেছেন যে, সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ কমলেশবাবু আপনাকে ফোন করে প্রাইজ পাওয়ার কথা বলেন এবং বেলা তিনটের সময় হোটেলে আপনাকে আসতে বলেছিলেন। এবার বলুন, ঐ সময় কি কমলেশবাবু আপনাকে একটি বিশেষ জিনিস সঙ্গে করে আনতে বলেছিলেন?

সাক্ষী বেশ একটু ভেবে নিয়ে বললে, হ্যাঁ বলেছিলেন।

—কী জিনিস সেটা?

সাক্ষী এবার মাইতি সাহেবের দিকে তাকাতেই মাইতি উঠে দাঁড়ান ঃ অবজেকশন য়োর অনার! সাক্ষী ইতিপূর্বেই তাঁর জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন যে, মৃত কমলেশ মিত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল! এক্ষেত্রে মৃত বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সে-কথা প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করা সাক্ষীর পক্ষে সঙ্কোচের। যে জিনিসটি কমলেশবাবু সাক্ষীকে আনতে বলেছিলেন তা যে বর্তমান মামলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ-কথা মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। ফলে প্রশ্ন ইরেলিভ্যান্ট অ্যান্ড অ্যাবসার্ড!

জজ-সাহেব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একটু ভেবে নিয়ে বলেন, মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল, আপনি কি আপনার উদ্দেশ্যটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন?

বাসু একটা 'বাও' করে বলেন, আমার উদ্দেশ্য একটাই—সত্য উদ্ঘাটন। মাননীয় সহযোগী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—সাক্ষীকে যে-বস্তুটি সঙ্গে করে আনতে বলা হয়েছিল তা বর্তমান মামলার সঙ্গে

সম্পর্কবিমুক্ত এবং এ প্রশ্নের জবাব দিতে সাক্ষী সঙ্কোচ বোধ করছেন। আপত্তির প্রথমাংশ বিষয়ে পূর্বেই কোন অভিমত দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ স্পষ্টই প্রতীয়মান—অর্থাৎ সাক্ষী এ প্রশ্নের জবাব দিতে সঙ্কোচ বোধ করছেন। মিস্ মজুমদারের সঙ্গে মৃত কমলেশ মিত্রের ঘনিষ্ঠতা কতদূর গভীর হয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। অপরপক্ষে আমি আশা করি, এই প্রশ্নের জবাব থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স পাওয়া যাবে। আমার প্রস্তাব, বর্তমান সাক্ষীর সাক্ষ্য আপাতত মুলতুবি রেখে অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হক। কারণ প্রতিবাদীপক্ষ আশা রাখেন, যে-কথা বলতে ওঁর সঙ্কোচ হচ্ছে সেই কথাটা অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দি থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তখন মিস্ মজুমদারের পক্ষে সে-কথা 'করোবরেট' করা ছাড়া উপায় থাকবে না। তখন সঙ্কোচের কোন প্রশ্ন থাকবে না। আদালত যদি অনুমতি করেন, তবে মিস্ মজুমদারের 'জেরা' অসমাপ্ত রেখে বাদীপক্ষ অন্যান্য সাক্ষীদের ডাকতে পারেন।

মাইতি আপত্তি জানালেন। কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টিকল না। আদালতের নির্দেশে মীনাক্ষী মজুমদার নেমে এল সাক্ষীর মঞ্চ থেকে। কোর্ট-পেয়াদা হাঁকল পরবর্তী প্রসিকিউশান উইটনেস্-এর নাম ঃ মনোরঞ্জন হাঁসদা, হা—জ্জি—র?

কৌশিক বাসু-সাহেবের কানে কানে প্রশ্ন করে, কমলেশ মিত্র যে মীনাক্ষীকে একটা জিনিস আনতে বলেছিল সে-কথা আপনি জানলেন কী করে?

—ইটস্ এ ওয়াইল্ড—ওয়াইল্ড গুজ্ চেজ! স্রেফ আন্দাজিক্যালি।

—কিন্তু জিনিসটা কী?

—এখনি শুনতে পাবে, যদি আমার ডিডাক্শন ঠিক হয়।

ততক্ষণে পরবর্তী সাক্ষী শ্রীমনোরঞ্জন হাঁসদা হলপ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে শুরু করেছেন। মাইতির প্রশ্নে জানা গেল—মনোরঞ্জন হাঁসদা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট লটারীর ডাইরেক্টরেটের অ্যাকাউন্টেন্ট। তিনি স্বীকার করলেন, পয়লা এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটা-এগারোটার সময় তিনি অফিসে একটি টেলিফোন পান। যিনি টেলিফোন করেছিলেন তিনি তাঁর নাম বলেননি; শুধু বলেছিলেন, তাঁর কাছে একটি লটারীর টিকিট আছে, যার নম্বর C/506909—যেটা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। ঐ অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোককে মিস্টার হাঁসদা প্রশ্ন করেছিলেন—ফার্স্ট প্রাইজ যিনি পেয়েছেন, অর্থাৎ ঐ টিকিটধারীর নাম কী? তাতে ভদ্রলোক অহেতুক চটে যান। বলেন, তা নিয়ে আপনার এত কৌতূহল কেন? আপনি শুধু বলুন, কোন সময়ে গেলে চেকটা পাওয়া যাবে? হাঁসদা জবাবে বলেন, ঐ টিকিটধারী যেন বিকাল তিনটা থেকে চারটের মধ্যে টিকিটটি সঙ্গে নিয়ে এসে ডিরেক্টার-সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। টিকিট পরীক্ষা করে তবে প্রাপকের নামে চেক্ কাটার ব্যবস্থা হবে।

মাইতি প্রশ্ন করেন, ঐ টেলিফোন কে করেছিলেন তা আপনি জানেন?

—না, জানি না। পুরুষমানুষের কণ্ঠস্বর। তিনি নাম, পরিচয় দেননি।

—কিন্তু তিনি কোথা থেকে টেলিফোন করেছিলেন তা জানেন?

—জানি।

—কেমন করে জানলেন?

—আমাদের অফিসে ডাইরেক্ট টেলিফোন নেই। পি.বি.এক্স বোর্ড আছে। যে অপারেটর আমার সঙ্গে বহিরাগত লাইনের যোগাযোগ করিয়ে দেয়, সেই বলেছিল—

—কী বলেছিল?

—'কল'টা অরিজিনেট করে হোটেলে হিন্দুস্থানের পি.বি.এক্স বোর্ড থেকে। হোটেল হিন্দুস্থানই প্রথমে আমাদের ডিরেক্টারকে চায়, না পেয়ে জানতে চায় নেক্সট-ইন-অফিস কে? তখনই আমার সঙ্গে আমাদের অপারেটর যোগাযোগ করিয়ে দেয়। এই সূত্রে আমি জানি, টেলিফোনটা হোটেল হিন্দুস্থান থেকে আসে।

—যু মে ক্রস একজামিন।

বাসু জানতে চান, ঐ ভদ্রলোক কি বলেছিলেন তিনিই ফার্স্ট-প্রাইজ পেয়েছেন?

—আজ্ঞে না। এ-কথার জবাব আমি আগেই দিয়েছি! তিনি বলেছিলেন, যে নম্বরে ফার্স্ট-প্রাইজ উঠেছে সেই নম্বরের টিকিটখানা তাঁর কাছে আছে।

—তিনি কি এ-কথা বলেননি যে, তাঁর এক বান্ধবী প্রাইজটা পেয়েছেন?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা মিস্টার হাঁসদা, প্রতি টিকিটে কি ক্রেতার নাম অথবা 'নম-ডি প্লুম' থাকে?

—আগে থাকত। আজকাল আর থাকেনা।

—অর্থাৎ বর্তমানে লটারীর টিকিট প্রায় বিয়ারার চেক-এর মত! মানে, যে ঐ প্রাইজ-পাওয়া টিকিটখানি উপস্থিত করবে সেই টাকাটা নগদে পাবে।

—নগদে পাবে নয়, 'অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক'-এ পাবে....যে ঐ টিকিটধারী।

—তার মানে, ধরা যাক যদি ঐ পয়লা এপ্রিল বিকাল চারটার সময় কমলেশবাবু কোন একজন মহিলাকে সঙ্গে করে আপনার ডাইরেক্টারের সঙ্গে দেখা করলেন, এবং প্রাইজ পাওয়া টিকিটখানি দাখিল করে বললেন যে, তাঁর বান্ধবীই ঐ টিকিটের অধিকারিণী তাহলে সেই বান্ধবীর নামেই অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক সওয়া লক্ষ টাকা দেওয়া হত?

—হ্যাঁ, যদি সেই মহিলা প্রাপ্তবয়স্কা হতেন, স্বীকার করতেন তিনিই ঐ টিকিট-এর মালিক।

—দ্যাটস অল মি লর্ড। আদালত অনুমতি করলে আমি এখনই মিস্ মজুমদারের অসমাপ্ত জেরা শেষ করতে প্রস্তুত। সহযোগী ঘটনাচক্রে প্রথমেই মিস্টার হাঁসদাকে আহ্বান করায় আমার আর কোনও অসুবিধা নেই।

অগত্যা মীনাক্ষী মজুমদারকে আবার উঠে দাঁড়াতে হল সাক্ষীর মঞ্চে। কোর্ট-পেস্কার স্মরণ করিয়ে দিল, হলপ পূর্বেই নেওয়া আছে, বর্তমানে সে যা বলবে তা 'হলফ্ নেওয়া' জবানবন্দিই।

বাসু আদালতকে বলেন, মি লর্ড! আমি প্রথমেই আমার পূর্বেকার প্রশ্নটি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি—অর্থাৎ কমলেশবাবু মিস্ মজুমদারকে কী জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছিলেন।

সাক্ষীর দিকে ফিরে বাসু বলেন, মিস্ মজুমদার, আপনিও এবার একটি লটারীর টিকিট কেটেছিলেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ।

—সেটা কি বর্তমানে আপনার কাছে আছে?

—এখন আমার কাছে নেই, বাড়িতে আছে।

—আমি যদি বলি—কমলেশ মিত্রের টিকিটখানি নয়, আপনার টিকিটখানিরই নম্বর ছিল C/506909—অর্থাৎ মৃত কমলেশ মিত্রের ওয়ারিশ নয়, আপনিই ঐ সওয়া-লক্ষ টাকার ন্যায্য অধিকারিণী তাহলে কি আপনি আপত্তি জানাবেন?

সাক্ষী বিহ্বল হয়ে পড়ে। ইতস্তত করে বলে, আমি জানি না।

—প্রাইজ ঘোষিত হবার পর আপনি নিজের টিকিটখানির নম্বর মিলিয়ে দেখেননি—ঠিক কি না!

মীনাক্ষীর বিহ্বলতা ঘোচেনি। যন্ত্রচালিতের মত বলে, ঠিক!

—অর্থাৎ আপনি জ্ঞানত জানেন না যে, মৃত কমলেশের পকেট থেকে যে লটারীর টিকিটখানা উদ্ধার করা হয়েছে ওটাই আপনার টিকিট কিনা—

—আমি....আমি জানি না।

—এবার স্বীকার করুন মীনাক্ষী দেবী। কমলেশ টেলিফোনে বলেছিল, আপনার টিকিটখানা নিয়ে যেতে, এবং সেখানা নিয়েই গিয়েছিলেন হোটেলে—তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই।

—অর্থাৎ, কমলেশ আপনাকে টেলিফোনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে আপনাকে নিয়ে লটারী অফিসে যাবে, আপনাকেই টিকিটধারী বলে স্বীকার করবে—অর্থাৎ প্রাইজ-মানি আপনিই পাবেন। তাই নয়?

সাক্ষী অধোবদনে স্বীকার করে, হ্যাঁ তাই।

—কিন্তু কেন এ ব্যবস্থা করা হল?

—আমি....আমি জানি না।

—জানেন! স্বীকার করছেন না! আপনি জানেন যে, কমলেশ ভয় পেয়েছিল সে যদি লটারীতে সওয়া লক্ষ টাকা পায় তাহলে ডিভোর্স মামলায় তাকে স্ত্রীর খোরপোস ও খেসারৎ বাবদ অনেক টাকা দিতে হবে! আপনি জানেন, ডিভোর্স-মামলার ফয়শালা হয়ে গেলে কমলেশ আপনাকে বিবাহ করত এবং ঐ টাকার সবটাই আপনাদের দুজনের হ'ত। স্বীকার করুন!

সাক্ষী দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে। মাইতি উঠে দাঁড়ান ঃ অবজেকশন য়োর অনার!

বাসু বিচারকের রুলিং-এর অপেক্ষায় থাকেন না। বলেন, দ্যাটস্ অল মি লর্ড!

দিনের শেষ সাক্ষী ইন্সপেক্টর রবি বোস। মাইতি-সাহেবের প্রশ্নে সে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আদ্যোপান্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গেল। সকাল পৌনে-সাতটায় সে বাড়ি ফিরে জানতে পারে যে, কমলেশ তার শয়নকক্ষে নির্জনে আধঘণ্টা কাটিয়ে গেছে। তখনই সে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। কমলেশের 'প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক' যে কী-জাতের তার প্রমাণ তো সদ্য-সদ্যই পেয়েছে। ওর মনে হল, ঐ আধঘণ্টা রুদ্ধদ্বার কক্ষে কৌতুকের একটি টাইম-বম্ব নিশ্চয়ই রেখে গেছে তার খেয়ালী বন্ধু। তাই সে আলমারি খুলে পরখ করে। যা ভেবেছে তাই—তার সার্ভিস রিভলভারটা আলমারিতে নেই। কমল যে এটা চুরি করেনি এটা নিশ্চিত—এ তার আর একটা উৎকৃষ্ট রসিকতা। তাই সে তৎক্ষণাৎ খবরটা থানায় রিপোর্ট করে না, বরং কমলেশ কোথায় গেল তাই জানতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। বাড়িতে ফোন করে তার চাকরের কাছ থেকে জানতে পারে যে, তার সাহেব সাতদিনের ছুটি নিয়ে দার্জিলিঙ গেছে। অতঃপর সে নবীনকে ফোন করে জানতে পারে যে, কমলেশের দার্জিলিঙ যাওয়ার কথা পরদিন এবং সঙ্গে মীনাক্ষী যাচ্ছে। ওরা 'হোটেল কুঞ্জ'-এ উঠবে। এর পর সে মীনাক্ষীকে ফোন করে শোনে দারুণ খবরটা। অর্থাৎ মীনাক্ষী লটারীতে সওয়া লক্ষ টাকা পেয়েছে! এ সঙ্গে আরও শোনে যে, কমলেশ হোটেল হিন্দুস্থানে আছে। রবি অতঃপর হোটেল হিন্দুস্থানে যায়, তার খোয়া যাওয়া রিভলভারটার খোঁজে। সেখানে পৌঁছায় দশটা নাগাদ। কমলেশ তখন হোটেলে ছিল না। আর দেরী করা অনুচিত বিবেচনা করে সে থানায় সংবাদ দেয় যে, তার সার্ভিস রিভলভারটি খোয়া গেছে। তবে বড় দারোগাকে সব কথা খুলে বলেছিল। এ কথাও বলেছিল যে, সন্ধ্যায় কমলেশ কয়েকটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছে। হয়তো তখনই সে ঐ হারানো অস্ত্রটা উদ্ধার করতে পারবে।

মাইতি প্রশ্ন করেন, সন্ধ্যায় যে কমলেশবাবু কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছে সে-কথা আপনি কেমন করে জানলেন?

—মীনাক্ষী দেবী টেলিফোনে বলেছিলেন।

অতঃপর প্রতিবাদী পক্ষের জেরা! বাসু-সাহেব রবিকে প্রথম যে প্রশ্নটি করলেন তাতেই আপত্তি জানালেন বাদীপক্ষ। প্রশ্নটি ছিল—আপনিও কি এই লটারীর একটি টিকিট কিনেছিলেন?

মাইতি-সাহেবের আপত্তির কারণ—এ প্রশ্ন বর্তমানে মামলার সঙ্গে সম্পর্কহীন।

জজ-সাহেব আপত্তি মেনে নিলেন না। ফলে রবিকে স্বীকার করতে হল।

—টিকিট কি আপনি নিজে কেটেছিলেন?

—না, আসামী প্রকাশ সেনগুপ্ত এক সঙ্গে পাঁচ-ছয়খানি টিকিট কাটে। বন্ধুরা এক-একখানি করে টিকিট তার কাছ থেকে সংগ্রহ করে।

—তাহলে আপনার টিকিট নম্বর ঐ প্রাইজ পাওয়া টিকিটের নম্বরের খুব কাছাকাছি হবে! যেহেতু

আপনারা কয়জন পরপর সিরিয়াল-নম্বরের টিকিট পেয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, তাই হবে।

—আপনার টিকিটের নম্বর কত ছিল?

—আমার মনে নেই!

—প্রাইজ ঘোষিত হবার পর কি আপনার নিজের টিকিটটা যাচাই করে দেখেছিলেন?

—না। প্রাইজ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার রিভলভারটা খোয়া যায়। তার পরেই মীনাক্ষী দেবীর কাছে শুনতে পাই যে, তিনি ফার্স্ট-প্রাইজ পেয়েছেন। 'C'-গ্রুপের অমন দুটি পর পর টিকিট প্রাইজ পেতেই পারে না। তাই মীনাক্ষী দেবী প্রাইজ পেয়েছেন জেনে নিজের টিকিটের নম্বর মিলিয়ে দেখার কথা আমার মনেও পড়েনি। তাছাড়া আমার বন্ধু কমলেশ খুন হয়ে যাওয়ায় ও-সব দিকে চিন্তাই ছিল না আমার।

—আপনার সেই টিকিটখানা কোথায়?

—ঠিক বলতে পারব না। বাড়িতে বাক্সে বা আলমারিতে থাকতে পারে। ইতিমধ্যে ফেলেও দিয়ে থাকতে পারি—

—দ্যাটস অল মি লর্ড!

সেদিনকার মত আদালতের অধিবেশন এখানেই শেষ হল।

আদালত থেকে ফিরে বাসু-সাহেব দেখলেন তাঁর বাড়ির সামনে একটি প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বৈঠকখানায় ঢুকে বুঝতে পারেন কারণটা। অনেকেই সেখানে উপস্থিত। মিসেস-বাসু, সুজাতা, কৌশিক, প্রকাশের দাদা বিকাশ, তার স্ত্রী এবং সতী। বিকাশবাবু নমস্কার করে বললেন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। কোর্টে হাজির ছিলাম। এখন বলুন—কী বুঝছেন?

বাসু বলেন, এক মিনিট। একটা কাজ আগে সেরে নিই।

ওঁর সহকারী ল-ক্লার্ককে ডেকে জেনে নিলেন—প্রতিবাদীর প্রত্যেকটি সাক্ষীকে আগামীকাল কোর্টে হাজির হবার সমন ধরানো হয়েছে কিনা।—ছেলেটি জানালো—প্রত্যেকেই সমন পেয়েছেন।

বাসু এবার আসন গ্রহণ করে বললেন, এবার বলুন?

—কী বুঝছেন? কিছু আশা আছে?

—আছে।

—বেকসুর খালাসের?

—বেকসুর খালাসের।

—কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকেই যে মার্ডার-ওয়েপনটা পাওয়া গেল?

—তা গেল। উপায় কী?

কৌশিক বলে, আপনাদের উচিত ছিল—পুলিস বাড়ি সার্চ করতে নামার আগে তাদের সার্চ করে দেখা। আইনত সে অধিকার আপনাদের ছিল।

বাসু বলেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত কৌশিক, কিন্তু তা হলেও কিছু লাভ হত না। পুলিস বাড়ি সার্চ করার সময় রিভলভারটা ওখানে নিজেরাই রাখেনি। অনেক আগে থেকেই ওটা ওখানে ছিল।

সতী অবাক হয়ে বলে, তাহলে মিস্টার বর্মনকে জেরা করার সময়—

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, ধরে নাও ওটা ওকালতি প্যাঁচ। বর্মন জানে, আমিও জানি, বিচারকও জানেন যে, রিভলভারটা আগে থেকেই ওখানে ছিল—

বিকাশ ইতস্তত করে বলেন, তার মানে বলতে চান, প্রকাশই ওটা—

—না। তার মানে তা নয়! প্রকাশ ওটা রাখেনি, রেখেছে সেই লোকটা যে ওর গাড়ির সীটের তলায় এক নম্বর রিভলভারটা রেখেছিল। যে ওকে ফাঁসাতে চায়। লোকটার বুদ্ধিকে আপনারা তারিফ করুন! সে এমন সুন্দরভাবে কেসটা সাজিয়েছে যে, স্বতই মনে হয় প্রকাশ নিজেই রাতারাতি রিভলভারটা

বদলিয়ে ভালোমানুষ সাজতে চেয়েছে!

—কিন্তু সে লোকটা তাহলে কে?

—যে লোকটা কমলেশকে খুন করেছে।

—তা তো বুঝলাম; কিন্তু সে যে কে হতে পারে তা কি আন্দাজ করা যায় না একেবারেই?

বাসু বিচিত্র হেসে বলেন, আন্দাজ? না, এখন আর ওটা আন্দাজের পর্যায়ে নেই। আমি নিশ্চিত জানি, লোকটা কে!

মিনিটখানেক কেউ কোন কথা বলতে পারে না!

নৈঃশব্দ ভেঙ্গে বিকাশবাবু প্রথম কথা বলেন! বলেন, বাসু-সাহেবের উচ্চারিত শেষ শব্দ দুটিই—লোকটা কে?

—তা নিয়ে আপনার কেন মাথা ব্যথা! আপনি কী চাইছেন? আপনার ভাই বেকসুর খালাস হক। এই তো?

মাথা নেড়ে সায় দেন বিকাশবাবু, নিশ্চয়ই! সেটুকুই আমার কাম্য। এখন বলুন আমাদের কতখানি আশা! আই মীন, প্রকাশের বেকসুর খালাস পাওয়ার চান্স কত পার্সেন্ট ?

—আই শুড সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট!

সতী উঠে দাঁড়ায়। বলে, ব্যস! আর কিছু শুনতে চাই না আমি। এস বড়দা।

বড়দার কৌতূহল কিন্তু তখনও মেটেনি। বলেন, কিন্তু আসল ব্যাপারটা—

বাসু হেসে বলেন, মাপ করবেন, এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।

ওরা চলে গেলে কৌশিক বলে, ও-ভাবে বলাটা কি ঠিক হল?

—কী ভাবে? কোন কথাটা?

—ঐ যে মক্কেলকে আশ্বাস দেওয়া—হান্ড্রেড পার্সেন্ট চান্স!

বাসু শ্রাগ করে বলেন, কী করব বল কৌশিক? হলপ যদিচ নেওয়া নেই, তবু খামকা মিথ্যা কথাই বা বলি কেন? আমার যা ধারণা তাই বলেছি।

এর পর আর কী কথা?

তবু কথা বলল কৌশিক। বললে, কিন্তু আমরা যে এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।

—পারছ না, তার কারণ তোমরা আসল 'ক্লু'টা নজর করছ না।

—কী সেই আসল ক্লু?

—মহাকাল!

—মহাকাল?

—ঘড়ির কাঁটা।

আদালত বসার পর বাসু-সাহেব প্রতিবাদী তরফের প্রথম সাক্ষীকে ডাকলেন। পূর্বদিন প্রসিকিউশনের সব সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জেরাও শেষ হয়েছিল।

প্রতিবাদীর প্রথম সাক্ষী ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিস্টার পি.শেষাদ্রি!

—মিস্টার শেষাদ্রি, আপনার ব্রাঞ্চে কি মৃত কমলেশ মিত্রের একটি অ্যাকাউন্ট ছিল?

—ছিল।

—বর্তমানে কত টাকা ব্যালেন্স পড়ে আছে?

—সাত হাজার পাঁচশ বত্রিশ টাকা তের নয়া পয়সা!

—ঐ অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ কত টাকা ছিল এবং কবে ছিল?

—সর্বোচ্চ ব্যালেন্স ছিল প্রায় সাতাশি হাজার টাকা, বছর তিনেক আগে। একজ্যাক্ট অ্যামাউন্ট এবং ডেট লেজার দেখে বলতে পারি।

—তার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আপনার অ্যাকাউন্ট-হোল্ডার প্রায় আশি হাজার

টাকা খরচ করেছেন কিনা গত তিন বছরে?

—তা জানি না। তবে আমার ব্যাঙ্কে তাঁর জমা টাকা ঐ পরিমাণ কমেছে।

—তাকেই তো আমরা খরচ করা বলি, না কী?

—না, আমরা, মানে ব্যাঙ্কের লোকেরা,তা বলি না। কারণ আমার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তিনি অন্য ব্যাঙ্কে রেখে আসতে পারেন, শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারেন, ফিক্স ডিপোজিট কিনতে পারেন—তাকে খরচ করা বলে না।

—অন্তত আপনার ব্যাঙ্কে তিনি ফিক্সড-ডিপোজিট করেননি?

—না।

—একথা কি সত্য যে, কমলেশবাবু গত ত্রিশে মার্চ, শনিবার, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার টাকা নগদে তোলেন?

—হ্যাঁ, সত্য।

—এ-কথা কি সত্য যে, উনি ঐ শনিবার আপনাকে প্রথমে বলেন—নগদে টাকা তিনি নিতে চান না। তার বদলে দশখানি হাজার টাকার ট্র্যাভলার্স চেক নিতে চান?

—হ্যাঁ বলেছিলেন, কিন্তু তখন ব্যাঙ্কিং আওয়ার্স প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই আমি বলেছিলাম, সোমবারের আগে ওটা করানো যাবে না। তখন তিনি ঐ দশ হাজার টাকা নগদে নিয়ে যান। কারণ তিনি বলেছিলেন যে, সোমবার সকালের প্লেনে তিনি দার্জিলিঙ চলে যাচ্ছেন।

—এ-কথা কি সত্য যে, সোমবার বেলা ঠিক দশটার সময়, ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গে কমলেশবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন যে, তিনি সোমবারের বদলে মঙ্গলবারে দার্জিলিঙ যাচ্ছেন; আর তাই আপনাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে বলেন দশখানি ট্র্যাভলার্স চেক করিয়ে দিতে?

—হ্যাঁ, এ কথা সত্য।

—সেই অনুসারে আপনি তার কাছ থেকে নগদে দশহাজার টাকা নিয়ে দশখানি ট্রাভলার্স চেক করিয়ে আনেন স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে—রাইট?

—রাইট।

—আপনি কমলেশবাবুকে বিকাল চারটে নাগাদ ঐ দশখানি ট্র্যাভলার্স-চেক ডেলিভারি নিয়ে যেতে বলেন? ইয়েস?

—ইয়েস।

—তার মানে শনিবার যে-টাকা কমলেশবাবু ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলেন সে-টাকা সোমবার বেলা দশটার পর আর তাঁর কাছে ছিল না?

—সেটাই সম্ভব; কারণ কমলেশবাবু বলেছিলেন, ঐ টাকাই তিনি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি যদি সত্য কথা বলে থাকেন, তাহলে শনিবার যে টাকা তিনি ব্যাঙ্ক থেকে তোলেন সেই দশ হাজার টাকা সোমবার বেলা দশটার পর আর তাঁর কাছে ছিল না।

—ওঁর স্পেসিমেন-সিগ্‌নেচার কি আপনি সঙ্গে করে এনেছেন?

—হ্যাঁ, এ বিষয়ে আপনার নির্দেশ ছিল। এনেছি।

—আপনি ওটা দেখে আদালতকে কি জানাবেন, 'মিত্র' বানান তিনি কী ভাবে লিখতেন?

—MITTER.

—আপনাকে আমি পরশুদিন একটি সইয়ের 'ফটোস্ট্যাট-কপি' দিয়ে এসেছিলাম, যেটি হোটেল হিন্দুস্থানের চেক-আউট রেজিস্টার থেকে ফটো নেওয়া। সেখানে 'মিত্র' বানান কী ভাবে আছে পড়ে শোনাবেন কি?

—MITRA.

—আপনি একটি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এখনই বলেছেন যে, বাইশ বছর চাকরি করছেন আপনি,

সুতরাং সই-মেলানোর অভিজ্ঞতা আপনার যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি জানাবেন কি যে, ঐ দুটি সই এক ব্যক্তির কি না।

—না। সই দুটি এক ব্যক্তির নয়!

বাসু বললেন, মি-লর্ড, ঐ স্পেসিমেন সিগনেচার-ইন-অরিজিনাল এবং হোটেল রেজিস্টারের সইয়ের ফটোস্ট্যাট কপিখানি প্রতিবাদীর এক্‌জিবিট হিসাবে আদালতের নথীভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

মাইতি আপত্তি জানিয়ে বলেন, ঐ ফটোস্ট্যাট কপিখানি যে হোটেল রেজিস্টার থেকে ফটো নেওয়া এ-কথা আমরা মেনে নিচ্ছি না।

জজ-সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, কে বলেছে মেনে নিতে? সেজন্যই তো দুটি নথীভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যাতে আপনি মূল রেজিস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন।

—দ্যাটস্ অল মি-লর্ড—বাসু তাঁর ছেদ টানেন।

মাইতি জেরা করতে উঠে প্রশ্ন করেন, হোটেল রেজিস্টারে সই করবার সময় কেউ যে ব্যাঙ্কের সই করবে তার নিশ্চয়তা কী? তাহলে আপনি কেন বললেন, দুটি লেখা একজনের নয়?

শেষাদ্রি সপ্রতিভভাবে বললেন, আমি এ-কথা বলিনি যে, দুটি 'লেখা' একজনের নয়, আমি বলেছি দুটি 'সই' একজনের নয়। দুটো জিনিস এক নয়। নাউ, লেট মি এক্সপ্লেন—

মাইতি ধমক দিয়ে ওঠেন, আপনাকে পাণ্ডিত্য-জাহির করবার জন্য এখানে ডাকা হয়নি! আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। যা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দিন—

শেষাদ্রি পাকা লোক। উকিলের ধমকে ঘাবড়াবার পাত্র সে নয়। বিচারকের দিকে ফিরে সে সবিনয়ে বললে, আমি মাননীয় বিচারকের কাছে প্রার্থনা করছি—আমাকে জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হক। এ আদালতে হয়তো এমন দর্শক উপস্থিত আছেন যাঁর অ্যাকাউন্ট আমাদের ব্যাঙ্কে আছে। এ-ক্ষেত্রে তাঁদের স্বার্থ ব্যাঙ্ক কী ভাবে দেখে থাকেন, তাঁদের 'সই'য়ের মূল্য কত তা বুঝিয়ে বলার অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি। সরকার ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজ করেছেন, আমি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং-এর একজন অফিসার। মাননীয় পি.পি. বাধা দেওয়ায় আমানতকারীদের ক্ষতিকর কোন 'ইন্টারপ্রিটেশন' আমার সাক্ষ্য থেকে উদ্ভূত হয় এটা আমি চাই না। আমি মহামান্য আদালতের রুলিং প্রার্থনা করছি।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, ইয়েস। য়ু মে এক্সপ্লেন য়োরসেলফ্।

শেষাদ্রি যে কায়দায় 'বাও' করল তাতে মনে হয় ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢোকার আগে সে বোধকরি ওকালতি করত। বললে, MITTER বানানে যিনি নিজের নাম লেখেন, তিনি 'সই' করুন বা না করুন, নিজের নামের বানান কখনও MITRA লিখবেন না। তা ছাড়া এই প্রশ্ন করা হতে পারে আশঙ্কা করে আমি লেট কমলেশ মিত্রের গোটা ফাইলটা নিয়ে এসেছি। তাতে তাঁর লেটার-হেডের মাথায় ছাপা অক্ষরে MITTER বানান আছে। সর্বত্র তিনি নিজের নাম MITTER বানানে লিখেছেন—সই করুন, আর না করুন। এমনকি তাঁর স্ত্রীর উল্লেখ করতেও 'Mrs. Mitter' লিখেছেন।

জাস্টিস্ ভাদুড়ী বলেন, থ্যাঙ্কু। নাউ ইউ মে প্রসিড উইথ য়োর ক্রস একজামিনেশন।

মাইতি কিন্তু আর ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না। শেষাদ্রির সাক্ষ্যে ইতিমধ্যেই দু-দুটো বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রথম কথা, সোমবার দ্বিপ্রহরে হোটেলের ঐ ঘরে যে নগদ দশ হাজার টাকা ছিল না, এটা প্রমাণ হয়েছে—অর্থাৎ আসামীর অপরাধের যেটা ছিল মূল 'মোটিভ' সেটাই ধ্বসে গেছে। দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে—হোটেল রেজিস্টারে কমলেশ সই করেনি। কেন?

মাইতি শুধু বললেন, থ্যাঙ্কু মি লর্ড!

প্রতিবাদীর পরবর্তী সাক্ষী রতন বেয়ারা। হোটেল হিন্দুস্থানের রুম-সার্ভিস বেয়ারা। বাসু তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি ঐ হোটেলে কতদিন চাকরি করছ?

—হোটেল খোলা ইস্তক হুজুর। তারিখ আমার মনে নেই!

—গত দোসরা এপ্রিল অটোপ্সি-সার্জেন, মানে ঐ ডাক্তারবাবু কি হোটেলে এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রুম 528-এ কখন তুমি লাঞ্চ সার্ভ করেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কবে শুধিয়েছিলেন তার তারিখটা আমার মনে নেই, তবে মনে আছে খুনের পরদিন।

—তুমি তাঁকে কী বলেছিলে?

—সত্যি কথাই বলেছিলাম হুজুর—বেলা দুটোর সময় আমি 528 নম্বর ঘরে লাঞ্চ দিয়ে আসি।

—কী কী ছিল লাঞ্চ প্লেটে?

—আজ্ঞে মনে নেই। মেমোতে যা লেখা আছে তাই-তাই, তবে—

—'তবে' বলে থামলে কেন? বল?

—আজ্ঞে লাঞ্চ-মেমোতে 'গ্রীন পীজ' লেখা হয়নি, কিন্তু প্লেটে বোধ হয় ছিল—

—প্লেটে 'বোধ হয়' ছিল? কী করে জানলে?

—আজ্ঞে জানি এইজন্য যে, পরে ঐ নিয়ে খুব ধ্যাতানি খেয়েছিলাম। শুনেছি, ওনার পেটের ভিতর থেকে মটরশুটি বেরিয়েছে, যার দাম নেওয়া হয়নি।

—তার মানে, তুমি নিজের জ্ঞানমত জান না, লাঞ্চ প্লেটে মটরশুটি ছিল, কি ছিল না?

—আজ্ঞে না, তা আমার মনেই নেই। থাকে কখনও? রোজ এত-এত লোক গোগ্রাসে গিলছে, মানে গিলছেন, এ কি কারও মনে থাকে কে মটরশুটি খেল, কে খেল না?

—সে তো বটেই! আচ্ছা এবার তুমি বল তো রতন, বেলা দুটোর সময় যখন তুমি খাবার পৌঁছে দিলে তখন তিনি কী করছিলেন?

—আমার বাগে পিছন ফিরে টেবিলে বসে চিঠি লিখছিলেন। আমি খাবারটা নামিয়ে রেখে চলে আসি।

—অর্থাৎ তাঁর মুখ তুমি দেখনি, তাই নয়?

—আজ্ঞে না, দেখিনি।

—তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে?

—আজ্ঞে না! তবে তিনি তো 'গঙ্গা পেয়েছেন হুজুর, চেনাচিনির তো বালাই ঘুচে গেছে।

—মারা যাবার পর মৃতদেহ তুমি দেখেছিলে?

—তাও দেখিনি। আমাদের কাউকে ও-বাগে যেতেই দেওয়া হয়নি!

—তাই নাকি! কোনও বেয়ারাই মৃতদেহ দেখেনি?

—দেখবে কেমন করে হুজুর? পুলিস এসেই ঘর তালাবন্ধ করল। পরে যখন নামিয়ে নিয়ে গেল তখন তো তিনি পর্দানসীন—আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা।

—আচ্ছা বলতো রতন, 524 নম্বর ঘরে তুমি কখন লাঞ্চ সার্ভ করেছিলে?

—আজ্ঞে, বেলা ঠিক সাড়ে দশটায়।

—ঐ ঘরে যিনি ছিলেন, তাঁর নামটা কি?

—আজ্ঞে পি.কে.মৈত্র। মানে মিস্টার পি.কে.মৈত্র।

—তাঁকে কি 'গ্রীন-পীজ' সার্ভ করা হয়েছিল?

মাইতি আপত্তি জানান। 'অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন'—এই অজুহাতে। বাসু তাঁর সওয়ালে এর প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় জজ-সাহেব রতনকে প্রশ্নটির জবাব দিতে বললেন।

রতন বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সকাল সাড়ে দশটায় 'গ্রীন পীজ' সার্ভ করা হয়েছিল 524 নম্বরে।

—দ্যাটস্ অল মি লর্ড!

মাইতি জেরা করতে উঠে প্রথমেই প্রশ্ন করেন, বাবা রতন, বল তো 523 নম্বরে ঐ দিন লাঞ্চে কী কী দেওয়া হয়েছিল?

—523 হুজুর? তা তো জানি না। অত কি মুখস্ত থাকে?

—থাকে না বুঝি? তাহলে 524 নম্বরের খবর অমন চট করে বললে কেমন করে?

—বা-রে! কেন বলব না? ঐ হুজুর পরশু দিন গিয়ে যে আমাকে শুধিয়েছিলেন। একটি বেলা ধরে আমরা পুরোনো সব মেমো ঘেঁটে দেখেছিলাম। উনি আমাকে তা দেখিয়েও দিয়েছিলেন। কোন সওয়ালের কী জবাব হবে তাও বলে দিয়েছিলেন।

—তাই বল, তার মানে তুমি ওঁর শেখানো মত বলছ?

—আজ্ঞে না হুজুর, তা কেন? কোন প্রশ্নের কী ন্যায্য উত্তর হবে রেকর্ড ঘেঁটে উনি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। উনি এ-কথাও বলেছিলেন যে, জেরায় আপনি আমাকে কাৎ করতে চাইবেন। তখন যেন 524 নম্বর ঘরের লাঞ্চ মেমোটার কাউন্টার ফয়েল আপনাকে দেখাই। আমি সাথে করেই এনেছি হুজুর। দেখছেন?

সাক্ষী তার পকেট থেকে একটি লাঞ্চ-মেমোর কাউন্টার-ফয়েল সবিনয়ে বাড়িয়ে ধরে—ডানহাতের কনুইয়ে বাঁ-হাতের আঙুল স্পর্শ করে।

কোর্টে হাস্যরোল ওঠে।

মাইতি জেরা শেষ করে বসে পড়েন।

বাসু উঠে বলেন, আমাদের আর কোন সাক্ষী নাই। আদালত যদি অনুমতি করেন তবে বাদী এবার তাঁর কেস 'আরগু' করতে পারেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী মাইতিকে প্রশ্ন করেন, আপনি প্রস্তুত?

মাইতির ভঙ্গিমায় মনে হল, তিনি চূড়ান্ত অপ্রস্তুত, কিন্তু মুখে তিনি তা স্বীকার করলেন না। বললেন,—

মহামান্য আদালত যখন অনুমতি করছেন তখন আমি যুক্তিনির্ভর সমাপ্তি ভাষণ দিচ্ছি। আমি প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে, আমি একটু অসুবিধাজনক অবস্থায় আছি। মাননীয় সহযোগী মামলার একেবারে শেষ পর্যায়ে কিছু ভেলকি দেখিয়েছেন। তা থেকে তিনি কী সিদ্ধান্তে আসতে চাইছেন তা আমি এখনও জানি না; ফলে সেইসব যুক্তির বিরুদ্ধ-যুক্তি আমি এখন দেখাতে পারছি না। মামলার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাদীপক্ষ প্রথমে 'আরগু' করেন, এবং বিবাদীপক্ষ তার পরে করেন। সে যাই হোক, মিস্টার শেষাদ্রির সাক্ষ্যে প্রতিবাদী প্রমাণ করেছেন যে, পয়লা এপ্রিল বেলা দশটার পর মৃত কমলেশ মিত্রের কাছে নগদ দশ হাজার টাকা ছিল না। তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, হত্যার উদ্দেশ্য ঐ টাকা অপহরণ নয়। কিন্তু এ-কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী ঐ দিন বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ ঐ 528 নম্বর ঘরে ঢুকেছিলেন। ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্টের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে, যে বাথরুমে কমলেশ মিত্রের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই বাথরুমের 'ডোর-নবে' আসামীর সন্দেহাতীত আঙুলের ছাপ রয়েছে। ঐ ঘরের অ্যাশট্রে থেকে উদ্ধার পাওয়া সিগারেট-স্টাম্পও যে ব্রান্ডের সিগারেট আসামী সেই সিগারেটেই অভ্যস্ত। আশট্রেতেও ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাওয়া গেছে। আমরা মামলা চলাকালে দেখেছি যে, আসামী ভিন্ন কমলেশ মিত্রের আরও দু'তিনটি বন্ধু ঐদিন হোটেলে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ যে ঐ ঘরে প্রবেশ করেছিলেন এমন প্রমাণ প্রতিবাদীপক্ষ উপস্থিত করতে পারেননি। অপরপক্ষে আসামী যে ঐ ঘরে প্রবেশ করেছিলেন তা আমরা প্রমাণ করেছি—সেটা প্রকারান্তরে প্রতিবাদীপক্ষ স্বীকারও করে নিয়েছেন। আমরা দেখেছি, কমলেশ মিত্রের হেপাজতে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দু-দুটি রিভলভার ছিল, এবং মৃত্যুর পর সে-দুটোই খোয়া যায়। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা—ঐ দুটি রিভলভারই আসামীর হেপাজতে পাওয়া গেল! একটি তার গাড়ির ভিতর, একটি তার বাড়ির চৌহদ্দিতে! এর পরে হত্যা কে করেছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে কি? দুটি রিভলভারের মিলিত মূল্য ছয়-সাত হাজার টাকা। হত্যার আরও কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যে কথা এ মামলায় উদ্‌ঘাটিত হয়নি। উদ্দেশ্য যাই হোক—এ-কথা স্পষ্ট যে,

হত্যা আসামী ছাড়া আর কেউ করেনি, করতে পারে না। এর জ্বলন্ত প্রমাণ আসামীর বাড়ি থেকে উদ্ধার পাওয়া দ্বিতীয় রিভলভারটি, যেটি মামলা চলাকালে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি 'মার্ডার-ওয়েপন' রূপে।

সহযোগী ডিফেন্স কাউন্সেল ইন্সপেক্টর বর্মনকে জেরা করার সময় এমন একটি তির্যক ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন যে, পুলিস-খানা তল্লাসীর সময় নিজেরাই রিভলভারটি ওখানে রেখেছে। সহযোগী একটা কথা খেয়াল করে দেখেননি যে, এটা কোন পুলিস অফিসারের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নয়। পুলিস অপরাধীকে চিহ্নিত করতে উৎসাহী—নিরপরাধকে অহেতুক জড়িয়ে তার কোনও লাভ নেই। তাতে তার প্রমোশন হয় না। চাকরিতে কোন ভাবেই কোন লাভ হয় না। উপরন্তু এ অপকীর্তি করতে গিয়ে যদি সে ধরা পড়ে তবে তার চাকরি তো যাবেই,এমনকি জেল পর্যন্ত হতে পারে। দ্বিতীয় কথা, আসামীর স্বীকারোক্তি মতে সে তার মোটরে কমলেশের রিভলবার 'কুড়িয়ে পায়'। আশা করি, ডিফেন্স কাউন্সেল এ-কথা বলবেন না যে, কোনও অসৎ পুলিস অফিসার সেটা গুঁর গাড়িতে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল! তৃতীয়ত, আসামী তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন, মীনাক্ষী দেবী তাকে টেলিফোন করে বিকাল সাড়ে তিনটায় হোটেল হিন্দুস্থানে যেতে বলেন। অথচ মীনাক্ষী দেবী তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন যে, তিনি অমন কোন টেলিফোন করেননি। তিনি আদৌ আসামীকে চেনেন না। এ-ক্ষেত্রে অপরিচিত একজন ভদ্রলোককে তিনি অহেতুক টেলিফোন করে কেন হোটেলে যেতে বলবেন, এবং কেনই বা সেটা হলপ নিয়ে অস্বীকার করবেন? তাহলে আসামী কেন বললেন যে, তিনি মীনাক্ষী দেবীর আমন্ত্রণে হোটেলে গিয়েছিলেন? বললেন এ জন্য যে, তাঁকে একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করতে হয়েছিল—কেন তিনি বিনা আমন্ত্রণে ঐ হোটেলে গেলেন, কেমন করে তিনি জানলেন যে, কমলেশ ঐ হোটেলে আছে!

—উদ্দেশ্য যাই হোক, এ-কথা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী স্বহস্তে ঐ রিভলভার দিয়ে তাঁর বন্ধু কমলেশ মিত্রকে খুন করেন। মৃতদেহটি বাথরুমে রেখে স্বহস্তে দরজা বন্ধ করেন—যখন 'ডোর-নবে' তাঁর আঙুলের ছাপ পড়ে। ঘর ছাড়ার আগে তিনি দরজায় 'DO NOT DISTURB' বোর্ড ঝুলিয়ে যান, যাতে মৃতদেহ আবিষ্কারে বিলম্ব হয়। ঐ জন্যই তিনি লিফ্‌ট দিয়ে নিচে নামেন না—যাতে লিফ্‌টম্যান তাঁকে সনাক্ত না করতে পারে। মার্ডার-ওয়েপনটি তিনি কায়দা করে সরিয়ে ফেলে দ্বিতীয় রিভলভারটি নিয়ে হাজির হন তাঁর কাউন্সেলের কাছে। সেটি তিনি নির্ভয়ে থানায় জমা দেন—একথা জেনে যে, সেটি মার্ডার ওয়েপন নয়।

—সহযোগী মৃতদেহের পাকস্থলীতে কিছু মটরশুটির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে হয়তো তাঁর আসামীকে নিরপরাধ বলতে চাইবেন। এমন অদ্ভুত যুক্তির কোন অর্থ হয় না। কমলেশ মিত্র ঐ লাঞ্চ ছাড়া সারা দিনে আর কোথাও কিছু খাননি এমন সিদ্ধান্ত অথহীন। ফলে মটরশুটি প্রসঙ্গে তিনি অহেতুক কালক্ষেপ করছেন।

—সহযোগী হয়তো প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন যে, হোটেল রেজিস্টারে যে 'সই' আছে সেটা কমলেশের নয়। তা থেকে কী প্রমাণ হয়? কমলেশ মিত্র ঐ 528 নম্বর ঘর বুক করেননি? অর্থাৎ 528 নম্বরে আবিষ্কৃত মৃতদেহটা কমলেশ মিত্রের নয়? আমরা আগেই দেখেছি, কমলেশ ছিলেন খেয়ালী কৌতুকপ্রিয় মানুষ—হয়তো তিনি ইচ্ছে করেই রেজিস্টারে ভিন্ন বানানে নিজের নাম লিখেছিলেন। কিন্তু যে ঘর তিনি বুক করেছেন, যে ঘরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল, সে ঘরের তিনিই তো বাসিন্দা! কমলেশ বোধহয় 'মরিয়াই প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।'

—সই যারই হোক, মটরশুটি সার্ভ করা হোক বা না হোক, কমলেশের হেপাজতে দশ হাজার টাকা থাক বা না থাক, এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীই হত্যাকারী। আমরা এ ক্ষেত্রে আসামীর চরমতম দণ্ডের দাবী জানাই।

মাইতি ভাষণ শেষ করেন।

—এবার আপনি বলুন—জজ-সাহেব প্রতিবাদীর দিকে ফিরে বললেন।

বাসু তাঁর সওয়াল শুরু করেন—

—মহামান্য আদালতের কাছে আমার সর্বপ্রথম প্রতিবেদন ঃ মামলার প্রারম্ভিক ভাষণে আসামীর অপরাধের যেটাকে 'মোটিভ' বা উদ্দেশ্য রূপে বলা হয়েছিল সেটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। মৃত কমলেশের হেপাজতে মৃত্যু-সময়ে দশ হাজার টাকা ছিল না। ছিল মাত্র পাঁচ-শ' বাহাত্তর টাকা, যে টাকা অপহৃত হয়নি, তার মানিব্যাগেই ছিল। ফলে অর্থলোভে আসামী হত্যা করেছে এ অভিযোগ ধোপে টেকে না! প্রারম্ভিক-ভাষণের মোটিভ ধ্বসে যাবার পর সহযোগী বললেন, হত্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক জোড়া রিভলভার চুরি করা—অথচ দেখা যাচ্ছে আসামী তার একটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে থানায় জমা দিয়েছেন, এবং সহযোগীর মতে দ্বিতীয়টি নিজ বাড়ির আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছেন। ডক্টর সেনগুপ্তের মত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট নাগরিক এক জোড়া রিভলভার চুরির জন্য হত্যা করেছেন, যে রিভলভার দুটি তিনি নিজের কাছে রাখলেন না—এ যুক্তি যে হাস্যকর তা সহযোগী নিজেই বুঝতে পেরেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন—'হয়তো হত্যার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, যা এ মামলায় উদ্‌ঘাটিত হয়নি।' মামলায় যে প্রসঙ্গ আদৌ ওঠেনি তার জবাবদিহি কেমন করে করি? তাই অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম ঃ আমার দায় হচ্ছে প্রমাণ করা—বিনা উদ্দেশ্যে শুধু হত্যার আনন্দে ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্ত এম.বি.বি.এস. যে হত্যা করেননি এটুকুই প্রমাণ করা। অতঃপর তাই আমি করব ঃ

—মাননীয় আদালতকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, লটারি-ডাইরেক্টরের অ্যাকাউন্টেন্টের জবানবন্দি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী প্রথম প্রাইজ পাওয়া টিকিটের নম্বর হচ্ছে C/506909; এবার আমি প্রতিবাদীর এক্সিবিট নং 7 বিচারককে পরীক্ষা করে দেখতে বলব। যেটি মৃত কমলেশ মিত্রের পকেট থেকে উদ্ধার করা গেছে। আদালতে নথীভুক্ত হওয়ার সময় আমি তার নম্বর টুকে রেখেছি। নম্বরটি হচ্ছে C/506906। এটি আদৌ প্রাইজ পাওয়া টিকিটখানি নয়।

বাসু একটু থামলেন। বিচারক এক্সিবিটখানি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখলেন। মাইতিও উঠে গিয়ে দেখে এলেন। বাসু সওয়াল শুরু করেন ঃ

—এ থেকে প্রমাণ হয়, মৃত কমলেশ মিত্র আদৌ পুরস্কার পাননি। তাহলে এত হৈ-চৈ কিসের জন্য? তার একমাত্র হেতু কমলেশ মিত্রের কৌতুকপ্রিয়তা। যে জন্য সে সকাল পাঁচটায় আসামীকে ফোন করেছিল, যে জন্য সে রবির আলমারি থেকে তার সার্ভিস-রিভলভারটি অপহরণ করেছিল। ঠিক সেই জন্যই সে এই মিথ্যা প্রচার করে। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে ছিল ঃ 'এপ্রিল ফুল!'

—এবার আমি মাননীয় বিচারককে প্রতিবাদীর এক্সিবিট নং ইলেভেন পরীক্ষা করে দেখতে বলি। সেটা হচ্ছে হোটেল হিন্দুস্থানের রেজিস্টারের একটি পৃষ্ঠার ফটোস্ট্যাট কপি। ওতে লক্ষণীয় যে, কমলেশ মিত্র 528 নম্বর ঘরে সই করেনি। শুধু সইয়ের মিল হচ্ছে না এটাই একমাত্র কারণ নয়। আরও একটি মারাত্মক কারণ আছে। 528 নম্বর ঘরে যেই সই করে থাক তার 'চেক-ইন' টাইম হচ্ছে সকাল দশটা পাঁচ। ইউ.বি.আইয়ের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিস্টার শেষাদ্রির সাক্ষ্য অনুযায়ী আমরা জানি—সোমবার পয়লা এপ্রিল বেলা দশটা-পাঁচ মিনিটে কমলেশ মিত্র ছিলেন ব্যাঙ্কে। হোটেলে নয়। মোক্ষম অ্যালিবাই!

—সহযোগী বলেছেন, মৃতদেহই প্রমাণ করে যে, কমলেশ মিত্র 528 নং ঘরের বাসিন্দা। আমি আপত্তি জানাব। আমি বলব, না—528 নম্বর ঘরে আবিষ্কৃত মৃতদেহ একথা প্রমাণ করে না যে, সে ঐ ঘরই 'বুক' করেছিল। সহযোগী কাব্য করে বলেছেন, 'কমলেশ মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' তা থেকে কমলেশের মৃত্যুই প্রমাণিত হয়, আসামীর হত্যাপরাধ নয়। কমলেশের মৃত্যু সম্বন্ধে কেউ কোন সন্দেহ প্রকাশ করেনি, ফলে সেটা প্রমাণের জন্য রবীন্দ্র সাহিত্যের উদ্ধৃতিটা বাহুল্য! আমার মতে—কমলেশ সকাল নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ঐ হোটেলে 'চেক-ইন' করে। 'বুক' করে 524 নম্বর ঘর। আই রিপীট—528 নয়, 524 নম্বর ঘর। 'পি.কে.মৈত্র' এই ছদ্মনামে। ফটোস্ট্যাট কপি করা পৃষ্ঠাটিতে দেখা যাচ্ছে 524 নম্বর ঘরের বাসিন্দা মিস্টার 'পি.কে.মৈত্র' সোমবার সকাল নয়টা পঁয়ত্রিশে চেক-ইন

করেন এবং বেলা তিনটেয় চেক-আউট করে যান। আমি মাননীয় বিচারককে পুনরায় কমলেশ মিত্রের সই এবং 'পি.কে.মৈত্রের' সইটি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ জানাব। ঘটনাচক্রে কমলেশ যে ছদ্মনাম নিয়েছিল তাতে দুটি 'ক্যাপিটাল-লেটার' আছে, যার সঙ্গে তার সইয়ের দুটি ক্যাপিটার অক্ষর মিলে যায়। 'কে' এবং 'এম'। ঐ পি. কে.মৈত্রের স্বাক্ষরে 'কে' এবং 'এম' কমলেশ মিত্রের সইয়ের হুবহু নকল। আমি হস্তরেখাবিদ পণ্ডিতের মত জেনে নিয়েই এ-কথা বলছি। মাননীয় আদালত প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে এ সত্য যাচাই করে নিতে পারেন। আরও একটা কথা। 'পি.কে.মৈত্র' নামটা সই হয়েছে সবুজ কালিতে। ঐ পাতায় ঐ একটাই মাত্র সবুজ কালির এনট্রি! আশ্চর্যের কথা—কমলেশের পকেট থেকে উদ্ধার করা কলমের কালি ছিল সবুজ।

—মোটকথা, 524 নম্বর ঘরের বোর্ডার 'পি.কে.মৈত্র' নামধারী কমলেশ মিত্রকে আর একজন অনুসরণ করছিল। কমলেশের চরিত্রটা কেমন তা আমরা জেনেছি। এমনকি সহযোগী পি.পি.-র মতে 'কমলেশ কিছু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিল না'। ফলে ঐ পশ্চাদ্ধাবনকারী ব্যক্তিটি কে, সে কথা না জানলেও এমন লোকের অস্তিত্ব আমরা যুক্তির খাতিরে মেনে নিতে পারি। আমার দায় প্রমাণ করা—সেই পশ্চাদ্ধাবনকারী আততায়ী আর যেই হোক, আসামী নয়। কমলেশ মিত্র যখন 524 নম্বর ঘরটি ছদ্মনামে বুক করে তখন ঘটনাচক্রে সে নিকটেই ছিল। ঐ সকাল নয়টা পঁয়ত্রিশে। সে এই সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ করে। কমলেশ চেক-ইন করার পরেই যখন ট্যাক্সি নিয়ে ব্যাঙ্কে চলে গেল তখন সে ঐ 528 নম্বর ঘরটি 'বুক' করল। স্বনামে নয়, ছদ্মনামে। সে ছদ্মনাম নিয়ে 'কমলেশ মিত্র'। চলে যায় 528 নম্বর ঘরে।

—কমলেশ ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে আসে সাড়ে দশটা নাগাদ। এসেই লাঞ্চের অর্ডার দেয়। রতন বেয়ারার সাক্ষ্য থেকে আমরা জানি 524 নম্বর ঘরের বোর্ডার, অর্থাৎ কমলেশ মিত্র স্বয়ং সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ লাঞ্চ খেয়ে নেয়! উল্লেখ্য—লাঞ্চ মেমো অনুযায়ী সে মটরশুটিও খায়!

—কমলেশের আহার শেষ হবার মুখে—ধরা যাক বেলা এগারোটা নাগাদ, ঐ আততায়ী 524 নম্বর ঘরে ঢুকে পড়ে। যেমন করেই হ'ক, সে কমলেশের অপহরণ করা রিভলভারটা হস্তগত করে এবং তৎক্ষণাৎ কমলেশকে হত্যা করে।

—হোটেলের ম্যাপ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে 524 নম্বর ঘরের দু-পাশেই দুটি ঘর ফাঁকা ছিল। এয়ার-কন্ডিশন করা ঘরে পিস্তলের শব্দও কম হয়। তাই এ ঘটনাটা জানাজানি হয় না। আততায়ী তারপর করিডরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুযোগ বুঝে মৃতদেহটি 524 নম্বর ঘর থেকে তার নিজের ঘর 528 নম্বর ঘরে নিয়ে আসে। বাথরুমে রেখে দেয়। এখন তার কাছে দুটি ঘরেরই চাবি আছে। দুটিরই ডুপ্লিকেট চাবি। শুধু তাই নয়, তার কাছে দুটি রিভলভারও আছে।

—আসামীর জবানবন্দি অনুযায়ী মীনাক্ষী দেবী আসামীকে বেলা সাড়ে তিনটেয় আসতে বলেছিলেন। মীনাক্ষী দেবী অবশ্য সে-কথা অস্বীকার করেছেন। অথচ আমরা নিঃসন্দেহে জানি—আসামী একটি মহিলা কণ্ঠে বেলা সাড়ে তিনটেয় হোটেল হিন্দুস্থানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আসামীর ভগ্নী সতী দেবী এবং বৌদির জবানবন্দি থেকে আমরা জানি আসামীর এই উক্তি মিথ্যা নয়। মীনাক্ষী দেবীর পরিচয়ে কোনও মহিলা যে তাঁকে ফোন করেছিল এ-কথা অবিসংবাদিত সত্য। সে নারীকণ্ঠ যারই হক, আততায়ী এ সংবাদ জানত। তাই সে একটি খামের ভিতর 528 নম্বর ঘরের চাবিটি ভরে ফেলে। সে বেলা পৌনে দুটায় লাঞ্চের অর্ডার দেয় এবং দুটো নাগাদ লাঞ্চ সেরে নেয় ঐ 528 নম্বর ঘরে বসে। বেলা দুটোর সময় 'গ্রীন পীজ' শেষ হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ যে লোকটি 528 নম্বর ঘরের লাঞ্চ মেমো তৈরী করেছিল সে কিছুই ভুল করেনি। রতন বেয়ারা বৃথাই বকুনি খেয়েছিল। 528 নম্বর ঘরে বসে আততায়ী বেলা দুটোর সময় আদৌ মটরশুটি খায়নি। রতন আততায়ীকে দেখেনি, মৃতদেহও দেখেনি। তার কাছে বোর্ডাররা শুধু নাম্বার মাত্র।

—বেলা আড়াইটে নাগাদ আততায়ী ঘরে তালা লাগিয়ে চাবিটি খামে ভরে রিসেপশান-কাউন্টারে

528 নম্বর খোপে রেখে যায় ডক্টর পি.সেনগুপ্তের উদ্দেশ্যে। একটু পরে সে আবার কাউন্টারে গিয়ে 524 নম্বর ঘরের চাবিটি জমা দেয় এবং 'পি.কে.মৈত্রের' পরিচয়ে চেক-আউট করে চলে যায়।

—আমার অনুমান, যে কোন কারণেই হোক, আততায়ী শুধু কমলেশকেই শত্রু বলে মনে করে না, আসামী সেনগুপ্তকে সে ফাঁসাতে চায়। তাই আসামী যখন খাম নিয়ে উপরে উঠে যায় তখন সে তার গাড়িতে রিভলবারটি রেখে সরে পড়ে।

—এখানেই আততায়ী একটা 'মাস্টার-টাচ' দেয়। সে ঐ গাড়িতে মার্ডার-ওয়েপনটা রাখে না। রাখে কমলেশের রিভলভারটা, কারণ সে ভেবেছিল যে, প্রকাশ সেটি আবিষ্কার করা মাত্র কোন ম্যানহোলে ফেলে দেবে। তাই সে মার্ডার-ওয়েপনটা লুকিয়ে রেখে আসে প্রকাশবাবুর বাড়ির চৌহদ্দিতে। আমার প্রশ্ন করার অধিকার নেই, কিন্তু মাননীয় বিচারক রায়দানের পূর্বে যদি পুলিস বিভাগকে প্রশ্ন করেন, তবে হয়তো জানতে পারবেন যে, কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি পুলিসকে টেলিফোন করে জানায়—সে দেখেছে আসামী রাত্রের অন্ধকারে কালোমতন কিছু একটা জিনিস ঐ ইটের স্তূপে লুকিয়ে রাখছে এবং সেজন্যই সেরাত্রে আসামীর বাড়ি সার্চ হয়।

—আমি জানি, আমার এ ব্যাখ্যায় একটি জিনিস অনুক্ত থেকে গেল। কে সেই আততায়ী? কী কারণে সে কমলেশ ও প্রকাশবাবুকে শত্রু হিসাবে গণ্য করে? সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় আমার নয়। আমার দায় প্রমাণ করা যে, সেই আততায়ী কোনক্রমে ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্ত হতে পারে না। সে-কথা প্রমাণের জন্য অসংখ্য যুক্তির ভিতর আমি একটিমাত্র যুক্তি পেশ করছি—আততায়ী 528 নম্বর ঘরটি 'বুক' করে সকাল দশটায় 'কমলেশ মিত্রের' পরিচয়ে এবং বেলা দুটোর সময় লাঞ্চ খায়। ঐ দুটি সময়েই আসামী ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁর নিজের বাড়িতে। তার একাধিক অকাট্য অ্যালিবাই আছে।

—আমার এই ব্যাখ্যায় আটটি মূল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। **এক**, কেন মৃতের পাকস্থলীতে অর্ধজীর্ণ মটরশুটি পাওয়া গেল। **দুই**, কেন হোটেল রেজিস্টারে কমলেশের সই মিলল না। **তিন**, কেন 524 নম্বর ঘরের বোর্ডার পি.কে.মৈত্রের হস্তাক্ষরের সঙ্গে কমলেশের হস্তাক্ষর আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়। **চার**, কেন পি.কে.মৈত্রের নামটি সবুজ কালিতে লেখা। **পাঁচ**, কেন মীনাক্ষী দেবীর পরিচয়ে কোন একজন অজ্ঞাতনামা মহিলা প্রকাশবাবুকে হোটেল হিন্দুস্থানে টেনে নিয়ে যায়। **ছয়**, কেন কমলেশের ঘরের চাবি খামের মধ্যে ঐভাবে পাওয়া গেল। **সাত**, কেন আসামীর গাড়িতে কমলেশের রিভলভার আবিষ্কৃত হল। এবং **আট নম্বর**—কেন ঐ আসামী প্রকাশবাবুর বাড়ির চৌহদ্দিতে আবর্জনা-স্তূপের ভিতর মার্ডার-ওয়েপনটা পাওয়া গেল।

—মাননীয় পি.পি. বলেছেন, তিনি নাকি অসুবিধাজনক অবস্থায় আছেন। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আমিই শেষ আরগুমেন্ট করব। তাই তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, আমার যুক্তির বিরুদ্ধ-যুক্তি দেখাবার সুযোগ তিনি পাবেন না। মাননীয় বিচারককে আমার সবিনয় নিবেদন ঃ আমরা এখানে কবির লড়াই করতে আসিনি। আমরা এসেছি একটি সত্য-উদ্‌ঘাটন করতে। তাই মাননীয় আদালতকে আমার অনুরোধ—সহযোগী পি.পি.-কে আর একবার আরগুমেন্ট করবার সুযোগ দেওয়া হক। তিনি হয়তো বলবেন, আমার এই 'হাইপথেসিস্' একটি 'আষাঢ়ে গল্প'! সেক্ষেত্রে আমরা তাঁর কাছে একটি 'শ্রাবণী গল্প' শুনতে চাই! অর্থাৎ 'আসামী অপরাধী'—এই হাইপথেসিসে তিনি সে কাহিনীতে ঐ আটটি মূল সমস্যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা সমাধান দাখিল করুন। তা যদি তিনি পারেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা বিষয়টি পুনরায় পর্যালোচনা করব। আর তা যদি না পারেন, তাহলে আমরা আশা করব—তিনি স্বয়ং আসামীর বেকসুর খালাসের আবেদন পেশ করবেন।

বিচারক বললেন, বাদী ও প্রতিবাদী মামলায় একবার করে 'সাম-আপ' করেন—এটাই প্রথা। তবু মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল যে অনুরোধ করেছেন তা আমি মেনে নিচ্ছি। তাই আমি পি.পি.-কে অনুরোধ করছি, তিনি কি আর কিছু বলবেন?

মাইতি উঠে দাঁড়ালেন। বিহ্বলভাবে শুধু বললেন, থ্যাঙ্ক, মি. লর্ড। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।

মামলায় রায় কী বের হল তা বোধ করি এখন লেখা বাহুল্য!

কিন্তু আসামীর বেকসুর মুক্তিলাভে মামলা শেষ হয়; গল্প শেষ হয় না।

রাত্রে নৈশাহারে বসেছিলেন ওঁরা—বাসু-সাহেব, মিসেস বাসু, কৌশিক আর সুজাতা।

সুজাতা বললে, আমি কিন্তু একটা জিনিস এখনও বুঝতে পারছি না—প্রাইজ পাওয়া টিকিটটা তাহলে কার কাছে?

কৌশিক বলে, সম্ভবত এঁদের কারও কাছেই নয়।

—কিন্তু মৃত কমলেশের বুক-পকেট থেকে উদ্ধার করা টিকিটখানা সত্যই প্রাইজ পাওয়া টিকিট কি না, তা পুলিস মিলিয়ে দেখেনি?

বাসু-সাহেব ফর্ক দিয়ে মাংসের টুকরোটা চেপে ধরে ছুরি দিয়ে কাটতে ব্যস্ত ছিলেন। বলে ওঠেন, হয় তাই সুজাতা—গোয়েবলস্-এর থিয়োরি। কমলেশ প্রাইজ পেয়েছে—এই মিথ্যেটার প্রচার এমন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ব্যাপকভাবে করা হল যে, 'নয়' আর 'ছয়ে' গোলমাল করে ওরা কেসটাকে নয়-ছয় করে দিল।

কৌশিক বলে, আমার বক্তব্য কিন্তু অন্য ধরনের। আপনার ব্যাখ্যার একটা বিরাট ফাঁক ছিল। সেটা আপনিও কৌশলে এড়িয়ে গেলেন, মিস্টার মাইতিও খেয়াল করেননি।

—কী ফাঁক?

—কমলেশ মিত্র একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি; পকেটে রিভলবারটি নিয়ে ঘোরাফেরা করে। সে নিজেই নবীন বাবুকে বড়াই করে বলেছিল—সিংহের বিবরে ঢুকে কেউ সিংহের-শাবককে অপহরণ করতে পারে না! অথচ আপনি আপনার ব্যাখ্যায় সেই রকম কথাই বলেছেন। আপনার 'আষাঢ়ে গল্প' অনুযায়ী আততায়ী সিংহের বিবরে ঢুকে সিংহ শিকার করে, এবং ছিনিয়ে নিয়ে যায় এক জোড়া সিংহশাবক! আততায়ী যেমন কমলেশকে চেনে, কমলেশও নিশ্চয় তেমনি হাড়ে হাড়ে চিনত ঐ লোকটাকে। কমলেশের এক্তিয়ারে তখন দু-দুটো রিভলভার! একটা নিজের, একটা রবিবাবুর। এ-ক্ষেত্রে কেমন করে সে নিজের এক্তিয়ার-ভুক্ত রিভলভারে নিজেই হত হল?

বাসু-সাহেব এতক্ষণে মাংসের টুকরোটাকে কায়দা করেছেন। মুখবিবরে ফেলে দিয়ে বললেন, পার্টিনেন্ট কোশ্চেন! কেউ কোন ব্যাখ্যা দিতে পার?

মিসেস বাসু বলেন, ওসব ছেঁদো কথা থাক—তুমি বারে বারে বলেছ, কে কমলেশকে খুন করেছে তা তুমি জান। এবার আসল কথাটা বল দিকি?

বাসু বলেন, আগে তোমরা বল?

সুজাতা বলেন, আমার মনে হয় সুদীপ অথবা নবীনবাবু—

কৌশিক বললে, আমার কিন্তু ধারণা মীনাক্ষী অথবা রবি—

বাসু সাহেব স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, আর রানু? তোমার কি মনে হচ্ছে, মনোরঞ্জন হাঁসদা অথবা ঐ শেষাদ্রি! আচ্ছা জাস্টিস্ সদানন্দ ভাদুড়ী নন্ তো?

মিসেস বাসু ধমক দিয়ে ওঠেন, ইয়ার্কি থাক! বল, সত্যি করে।

আর একটি মাংসের টুকরো মুখবিবরে নিক্ষেপ করে বাসু বলেন, আসল হত্যাকারীকে তোমরা ধরতেই পারনি। হত্যাকারীর নাম সমরেশ!

—সমরেশ! সমরেশ মানে? কোন সমরেশ?—সমবেত প্রশ্নের টাইফুন।

—সমরেশ মিত্র। কমলেশ মিত্রের যমজ ভাই!

সবাই স্তম্ভিত। সুজাতা বলে, যমজ ভাই! তার প্রসঙ্গই তো ওঠেনি।

—সো হোয়াট? তোমরা কেউ জান না, কমলেশের এক যমজ ভাই ছিল ঃ সমরেশ! বাপ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। সেই রাগে....

কৌশিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, স্যার, এতক্ষণে আপনি একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা-গল্প লেখক হয়ে উঠেছেন।

—কেন?

—ঐ জাতীয় গোয়েন্দা গল্পের লেখক যখন শেষমেশ হালে পানি পান না, তখন শেষ পৃষ্ঠায় একটি নতুন চরিত্র আমদানি করেন, যাকে কেউ চেনেই না।

বাসু বলেন, উপায় কী বল? তোমরা তিনজনে যে ডিটেকটিভ গল্পের একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক হয়ে উঠেছ। শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের মতামত, আর তোমরা এক নিশ্বাসে পাইকারী হারে সবকটা পরিচিত নাম বলে চলেছ। একটা না একটা তো মিলবেই!

মিসেস বাসু বলেন, তবে কি আমাদের একটিমাত্র নাম বলতে হবে?

—না। নাম আদৌ বলতে হবে না। শুধু প্রত্যেকটি অসঙ্গতি মিটিয়ে দিতে হবে। মাইতিকে আমি যে 'শ্রাবণী গল্পটা' বলার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলাম শুধু সেটাই রচনা করতে হবে। নাম আপনিই এসে যাবে। প্রথমেই দিতে হবে ব্যাখ্যা— যে প্রশ্নটা কৌশিক এইমাত্র তুলেছে ঃ আততায়ী কেমন করে সিংহের বিবরে ঢুকে সিংহ শিকার করল। বুঝিয়ে বলতে হবে, নিজে এক্তিয়ারে দু-দুটো রিভলভার থাকা সত্ত্বেও কমলেশের মত মানুষ কী করে খুন হতে পারে। তারপর দিতে হবে ব্যাখ্যা— যে প্রশ্ন সুজাতা তুলেছে ঃ কমলেশের টিকিট যে প্রাইজ পাওয়া টিকিট নয় তা এতগুলো ধুরন্ধর পুলিস অফিসার কেন খেয়াল করেনি? সব শেষে মিটিয়ে দিতে হবে মামলায় যে আটটি অসঙ্গতির কথা বলেছি। আমার 'আষাঢ়ে গল্প' ঐ আটটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছু ফাঁক বা ফাঁকি আছে। তাই এখন চাই একটা 'শ্রাবণী গল্প'।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। মিসেস বাসুই নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন, তুমি অমন একটা 'শ্রাবণী গল্প' শোনাতে পার?

—পারি।

—তাতে সব কটা অসঙ্গতির সমাধান পাওয়া যাবে?

—তাই তো আশা করি।

—এবং তুমি জান, হত্যা কে করেছে?

—জানি!

—তবু তুমি চুপচাপ বসে আছ? হত্যাকারীর ফাঁসি হ'ক এটা তুমি চাও না?

বাসু বলেন, আমি পুলিস কমিশনার নই রানু। তবে একটা কথা মানছি, সামাজিক মানুষ হিসাবেও আমার একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু সে তো তোমাদেরও আছে। বেশ তো, এবার আমি আমার সেই 'আষাঢ়ে গল্পটা' প্রত্যাহার করে নতুন করে একটা গল্প শোনাই, যাকে বলেছি ঃ 'শ্রাবণী গল্প'। গল্প গল্পই, এটা যে সত্য ঘটনা এমন দাবী আমি করছি না, কিন্তু তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, এই কাহিনী অনুযায়ী কোথাও কোন অসঙ্গতি থাকবে না। সব কয়টি সমস্যার বেমালুম সমাধান হয়ে যাবে। 'জিগ-স্'-ধাঁধায় যেমন খাঁজে খাঁজে মিলে যায়। গল্পটা শেষ হবার পর তোমরা সবাই যদি পরামর্শ দাও তাহলে আমি পুলিস কমিশনারকে না হয় গল্পটা শুনিয়ে আসব।

—তুমি শুরু কর দিকিন—তাগাদা দেন মিসেস বাসু।

—মনে কর, ডাক্তার সেনগুপ্ত বন্ধুদের টাকায় ছয়খানা টিকিট কাটে। নিজে একখানা রাখে, বাদবাকি একখানা করে দিয়ে দেয় রবি, সুদীপ, নবীনকে। কমলেশ দুখানি টিকিট নেয়, একটা নিজে রাখে, একটি দেয় মীনাক্ষীকে। হল?

—এখানে মনে করা যাক, কমলেশ তার ডায়েরিতে ছয়খানা টিকিটের নম্বর টুকে রেখেছিল—কে কোনখানা রেখেছে তার উল্লেখ সমেত। লটারির 'ড্র' কবে হবে তা কেউ খেয়াল করেনি; শতকরা 99.99 ভাগ লোকই তা করে না। পয়লা এপ্রিল খবরের কাগজে ফলাফলটা ছাপা হল। সেটা সর্বপ্রথম

www.boiRboi.blogspot.com

ঐ ছয় জনের মধ্যে কার নজরে পড়বে? নিঃসন্দেহে নিউজ এডিটর কমলেশ মিত্রের। ঐ দিন ভোর পাঁচটার সময় সে জানতে পারে যে, রবি বসুর C/506909 টিকিটখানি প্রথম প্রাইজ পেয়েছে। খবরটা তখনও আর কেউ জানে না; কাগজ তখনও সংবাদপত্রের অফিসের বাইরে যায়নি। কমলেশ লোভ সামলাতে পারেনি। এক লপ্তে সওয়া লক্ষ টাকা! সে রবির টিকিটখানা হাতিয়ে নিজেরখানা সেখানে রেখে আসার পরিকল্পনা করে। তা করতে হলে প্রথমেই রবিকে বাড়ির বাইরে আনতে হয়—অন্তত দৈনিক পত্রিকা রবির হস্তগত হবার আগেই। চমৎকার পরিকল্পনা তার—তাই সে প্রকাশের সাহায্যে রবিকে বিছানা থেকে তুলে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে। রবি এবং প্রকাশ দুজনেই তখন ভেবেছিল, এটা এপ্রিল ফুলের ছেলেমানুষী।

কমলেশ ছুটল রবির বাড়ি—হাসপাতালে নয়। হয়তো ভেবেছিল, রবির স্ত্রীকে বলবে—লটারির টিকিটটা দেখি, নম্বরটা টুকে রাখব। আজকালের মধ্যে 'ড্র' হবে।

রবির বউ টিকিটটা বার করে দেখালে, কমলেশ হাত-সাফাই করে ফিরে আসত; অর্থাৎ নিজের টিকিটখানা ওখানে রেখে রবিরটা হাতিয়ে। কিন্তু পরে ওর মনে হল, এতে রবির সন্দেহ হতে পারে। তাই প্রথমে সে রবির ড্রয়ার আলমারি হাতিয়ে দেখতে চাইল। যদি ঘটনাচক্রে সেটা পেয়ে যায়, তাহলে রবির কোন সন্দেহ হবে না। এই সুযোগটা করে নিতেই সে অঞ্জলির সঙ্গে এমন ব্যবহার করল যাতে রবির স্ত্রী সাহস করে ঐ শয়নকক্ষে ঢুকতেই পারেনি।

সৌভাগ্য কমলেশের—আলমারির পাল্লাটা খোলা ছিল। কমলেশ টিকিটখানা খুঁজে পায়। সেটি আত্মসাৎ করে, নিজের টিকিটখানা সেখানে রেখে একটু পরে সে চলে যায়। রবির রিভলভার সে আদৌ নেয়নি। আই রিপিট—রবির রিভলভার কমলেশ আদৌ নিয়ে যায়নি।

আধঘণ্টা পরে রবি ফিরে আসে। স্ত্রীর কাছে যখন শুনল যে, কমলেশ তার শয়নকক্ষে রুদ্ধদ্বার জনান্তিকে বেশ কিছুক্ষণ ছিল তখনই সে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। সে আলমারি হাতড়ে দেখে। তার ভয় হয়, কমলেশ হয়তো তার সার্ভিস রিভলভারটা সরিয়েছে একটা 'প্র্যাকটিক্যাল জোক' করতে। কিন্তু না, রিভলভার যথাস্থানেই আছে। টাকা পয়সা কমলেশ নেবে না। তাহলে কেন সে হঠাৎ শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল?

রবির স্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার চা বানাতে ব্যস্ত তখন রবি খবরের কাগজ পড়ছে। হঠাৎ নজরে পড়ল—কাগজে লটারির ফলাফল বার হয়েছে। তখন সে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে নিজের টিকিটখানা বের করে মিলিয়ে দেখে। দেখে, খুব কান ঘেঁষে মিস্ করেছে। এই সময়েই বিদ্যুৎচমকের মত একটা সম্ভাবনার কথা মনে হয়। তাই কি কমলেশ রুদ্ধদ্বার কক্ষে কয়েক মিনিট কাটিয়ে গেল, রবির অনুপস্থিতিতে?

কমলেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য ঃ সে যেমন ছয়খানি টিকিটের নম্বর নাম অনুসারে ডায়রিতে লিখে রেখেছিল, ঠিক সে ভাবেই রবিও লিখে রাখে। ডায়েরি খুলে বুঝতে পারে তার টিকিটখানিই ছিল C/506909 যা এখন হয়ে গেছে C/506906! মুহূর্তমধ্যে রবি বুঝে ফেলে, কমলেশ তার সঙ্গে কতবড় তঞ্চকতা করেছে। অসাধারণ মনোবল এই পুলিস অফিসারটির! এতবড় বজ্রাঘাতটা বুক পেতে সহ্য করল। স্ত্রীকে পর্যন্ত কিছু বলল না। মন্ত্রগুপ্তি ওর মজ্জায় মজ্জায়—ও হচ্ছে পুলিস ইন্সপেক্টর। প্রথমেই কমলেশের বাড়িতে ফোন করে; তার গৃহভৃত্য জানায় যে, কমলেশ সাতদিনের ছুটিতে বাইরে গেছে। তারপর সে মীনাক্ষীকে ফোন করে এবং শোনে যে, মীনাক্ষীই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। রবি বুদ্ধিমান। তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়, কমলেশ কেন নিজে প্রথম পুরস্কার না নিয়ে মীনাক্ষীকে সেটা নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে ঃ কেন?

—দুটি প্রয়োজনে। প্রথম কথা, মীনাক্ষী প্রাইজ পেলে রবির সন্দেহটা হবে না। দ্বিতীয় কথা, তার ডিভোর্সের মামলা আদালতে ঝুলছে। মানি-সেটেলমেন্ট কেস-এ ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কম রাখাই বুদ্ধিমানের

কাজ। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়, শেষাদ্রি বলেছিল, কমলেশ আশি হাজার টাকা উড়িয়েছে কি না তা সে জানে না, যদিও তার ব্যালেন্স ঐ পরিমাণ কমেছে। বস্তুত শেষাদ্রি ঠিকই ধরেছিল—কমলেশ ঐ টাকা ধীরে ধীরে বেনামি করছিল, যাতে মানি-সেটেলমেন্টের সময় তার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স খুব কম থাকে। সে যাই হোক, মীনাক্ষীর কাছ থেকে হোটেল হিন্দুস্থানের খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে যায়। যাবার সময় তার লোডেড সার্ভিস রিভলভারটা নিতে ভোলে না।

—বেলা সাড়ে নয়টা নাগাদ কমলেশ যখন নিজের খোপে চাবি রেখে ব্যাঙ্কে বেরিয়ে গেল, তখনই রবি জানতে পারল যে, 524 নম্বর ঘরের বোর্ডার মিস্টার পি.কে.মৈত্র হচ্ছে কমলেশ মিত্র। কমলেশ কোনও রকম রিস্ক নিতে চায়নি, কী জানি যদি রবি সন্দেহ করে তাকে খুঁজতে বের হয়, তাই সে ছদ্মনামে ঘরটা বুক করে। এমনকি ঘরের নম্বর মীনাক্ষীকেও জানায় না। তাকে বলেছিল, লাউঞ্জে সে ওর জন্য অপেক্ষা করবে। রবি তৎক্ষণাৎ 528 নম্বর ঘরটা বুক করে। কমলেশ যদি ডালে-ডালে ঘোরে তো রবি ঘোরে পাতায়-পাতায়! সে চেক-ইন রেজিস্টারে সই করল 'কমলেশ মিত্র' নামে। খাতা কলমে কমলেশ মিত্র হল 528 নম্বর ঘরের বোর্ডার।

আধ ঘন্টার মধ্যেই ব্যাঙ্ক থেকে কমলেশ ফিরে এল। সারা দিনে সে অনেকগুলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। মীনাক্ষী, নবীন, সুদীপকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসতে বলেছে, নিজে বেলা চারটেয় ব্যাঙ্কে যাবে বলে এসেছে; তাই সে ঘরে ফিরেই আরলি-লাঞ্চের অর্ডার দেয়। ডাইনিং-রুমে গিয়ে খাবার সাহস পায় না, কারণ তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছিল; রবি তাকে সন্দেহ করতে পারে এবং এ সংবাদ পেতে পারে যে, সে হোটেল হিন্দুস্থানে আছে।

আহার সার্ভ করতে যেটুকু সময় লাগল তার মধ্যে কমলেশ লটারি অফিসে হাঁসদার সঙ্গে কথা বলে।

কমলেশের আহার পর্ব যখন শেষ হচ্ছে তখন রবি ওর ঘরে নক করে। কমলেশ দরজা খুলেই যেন ভূত দেখল! এর পর রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঠিক কী কী ঘটেছিল তা অনুমান-নির্ভর। সম্ভবত রবি বলে, আমার টিকিটটা দিয়ে দাও, আই শ্যাল ফরগিভ য়ু! এটা অবশ্য আমার আন্দাজ! মোটকথা খুব সম্ভবত দুজনের বচসা হয়। আমার ধারণা, কমলেশ ঠিক তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়—অর্থাৎ রবিকে খুন করার পরিকল্পনা। সে বাজী হয় টিকিটটা ফেরত দিতে। পকেটে হাত ঢোকায়, এবং হাত যখন বার করে আনে তখন তার হাতে রিভলভার। রবি অত্যন্ত দুঃসাহসী। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার সে জানে। সে 'ডাক' করে এবং নিজের রিভলভারটা বার করে। কমলেশ ফায়ার করে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, এটা আপনি কেমন করে আন্দাজ করছেন?

বাসু বললেন, আমি আগেই বলেছি—এটা নিছক গল্প। সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করার মত এভিডেন্স আমার হাতে নেই। তবু আমার যুক্তির স্বপক্ষে বলব ঃ প্রকাশ যখন তার গাড়ির ভিতর কমলেশের রিভলভারটি পায় তখন তাতে একটা ডিসচার্জড বুলেট ছিল, এবং ব্যারেলে বারুদের গন্ধ ছিল। ঐ দুটি সূত্র থেকেই আমার গল্পের এই অংশটার উপাদান সংগৃহীত। আমার ধারণা ঐ 524 নম্বর ঘরটা তল্লাসী করলে ডিসচার্জড বুলেটটা এখনও আবিষ্কার করা যায়!

—সে যাই হোক, পরমুহূর্তেই রবি ফায়ার করে এবং কমলেশের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ে।

—ঘটনা যদি এই খাতে বয়ে থাকে তাহলে রবি তখন কী করতে পারে?

—আত্মরক্ষার্থে সে গুলি ছুঁড়েছে এ গল্প পুলিসকে বিশ্বাস করানো শক্ত। প্রথমত, লটারির টিকিট চুরি যাওয়ার কথা কেউ জানে না। দ্বিতীয়ত, হোটেল-রেজিস্টারে জাল পরিচয় দিয়ে ঘর নিয়েছে, যেটা আইনত অপরাধ। ফলে, সে আত্মগোপন করতে চাইল—ভেবে দেখল, সে যে হোটেল হিন্দুস্থানে এসেছিল তার কোনও প্রমাণ নেই, তাকে কেউ সন্দেহ করবে না। কমলেশ আত্মহত্যা করেছে এ-কথা প্রমাণ করা যাবে না, কারণ সে মরেছে .38 বোরের সার্ভিস রিভলভারের গুলিতে। রবি তখন কমলেশের পকেট থেকে লটারির টিকিটখানি উদ্ধার করে নিজের টিকিটটা সেখানে রেখে দিল। ঘরটা

তালাবন্ধ করে ফিরে এল নিজের বাড়িতে। রবি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না, কারণ মার্ডার-ওয়েপনটা তখনও তার পকেটে! বাড়ি ফেরার পথেই ওর হঠাৎ সন্দেহ হয়—হয়তো ডক্টর প্রকাশ সেনগুপ্তও ছিল কমলেশের ষড়যন্ত্রের ভিতর! তাই সে সাত-সকালে রবিকে ভুল খবর দিয়ে হাসপাতালে ডেকে পাঠায়। অদ্ভুত তার মনের জোর। একটা মানুষকে খুন করে এসে, মার্ডার-ওয়েপনটা পকেটে নিয়েও সে ঘাবড়ায় না। বাড়ি ফিরে সে তার স্ত্রীকে বলে, সকালবেলা প্রকাশ যেমন তাকে নাকাল করেছিল, এ-বেলা সে তার শোধ নেবে। তার পরামর্শমত রবির স্ত্রী অঞ্জলি, মীনাক্ষীর পরিচয়ে প্রকাশকে ফোন করে। বলে, সে মীনাক্ষী মজুমদার, কমলেশের নির্দেশমত সে প্রকাশকে হোটেল হিন্দুস্থানে যেতে বলে। ঠিক সাড়ে তিনটেয়। এ সময় প্রকাশ একটা মারাত্মক ভুল করে। মীনাক্ষীরূপী অঞ্জলিকে সে কৌতুক করে বলে যে, কমলেশ যে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে সে-কথা সে সকাল পাঁচটা থেকে জানে।

—আমার এই 'শ্রাবণী গল্পের' ম্যাল কিন্তু এখানেই : 'কৌতুকের হলেও কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না'! প্রকাশ এটুকু মিথ্যার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলতে বসেছিল! কারণ এ কথা শুনে রবি নিঃসন্দেহ হল যে, প্রকাশ ও কমলেশ দুজনে মিলে তার লটারির টিকিটটা চুরি করেছিল। কারণ প্রকাশ যদি ভোর পাঁচটায় এতবড় খবরটা পেয়ে থাকে তাহলে সে হাসপাতালে সে কথা বলেনি কেন? দ্বিতীয়ত টেলিফোনে মিথ্যা খবর দিয়ে সে রবিকে বাড়ি থেকে সরিয়েই বা দিল কেন? অমল আহত হয়ে হাসপাতালে আসাটা নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা! অন্তত তার পনের-বিশ মিনিট আগে প্রকাশ টেলিফোন করেছিল রবিকে! সুতরাং রবি চরম প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হল। টেলিফোনের কথা-মুখে চাপা দিয়ে অঞ্জলি যখন তাকে জানালো যে, প্রকাশ সকাল পাঁচটা থেকেই জানে কমলেশ প্রাইজ পেয়েছে তখনই মুহূর্তমধ্যে সে মনস্থির করে। কমলেশকে সে শেষ করেছে, এরপর হত্যাপরাধটা প্রকাশের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে হবে। তৎক্ষণাৎ সে অঞ্জলির মাধ্যমে প্রকাশকে হোটেলে আসতে বলে, ঠিক সাড়ে তিনটেয়—পাঙ্কচুয়ালিটির বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত করে।

—ভেবে দেখ, কী দ্রুত সিদ্ধান্তে এসেছে সে। বোধহয় সে পরিকল্পনাটা মোটামুটি মনে মনে ছকেই রেখেছিল—প্রকাশ যে মুহূর্তে স্বীকার করল যে, সে সকাল পাঁচটা থেকে এ খবরটা জানে তৎক্ষণাৎ সে পরবর্তী পরিকল্পনা কার্যকরী করল। মোটর বাইক নিয়ে ফিরে গেল হোটেলে। বেলা তখন দুটো। খুব তাড়াতাড়ি সে 528 নম্বর ঘরে বসে লাঞ্চ সেরে নেয়। তারপর সুযোগমত মৃতদেহটা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে নিয়ে আসে। বাথরুমে মৃতদেহটা রেখে বেরিয়ে আসে। Do not disturb বোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। তারপর ঘরের চাবিটি খামবন্ধ অবস্থায় কাউন্টারে জমা দিয়ে অদূরে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। প্রকাশ যখন এসে খামটা নিয়ে উপরে উঠে গেল তখন সে কমলেশের রিভলভারটা তার গাড়ির ভিতর রেখে চলে যায়। বলাবাহুল্য সে রাত্রে সে মার্ডার-ওয়েপনটাও রেখে আসে প্রকাশের বাড়িতে। আশা করি আমার গল্পের নটে গাছটি এতক্ষণে নিঃশেষে মুড়িয়ে গেছে। কারও কোন অসঙ্গতি নজরে পড়ছে?

সবাই একমনে ভাবছে।

রানী বলেন, তোমার এই আষাঢ়ে গল্পটা, না, না, 'শ্রাবণী' গল্পটা সত্যি কি না, তা কোনদিনই জানা যাবে না—না গো?

—কে বললে জানা যাবে না? তিনমাসের মধ্যেই তা জানতে পারবে!

—তিন মাসের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে রবি বোস?

—যাবে! পুলিসের কাছে নয়, আমাদের তিনজনের কাছে।

—কেমন করে?

—ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট লটারির প্রাইজ ফলাফল ঘোষিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে দাবী পেশ করতে হয়। ইতিমধ্যে পুলিস যেই ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করে বলবে—কমলেশ মিত্রের হত্যাকারীকে আর সন্ধান করা হচ্ছে না, অমনি দেখবে রবি বোস তার ড্রয়ার থেকে একখানি লটারির টিকিট খুঁজে পাবে! কী আশ্চর্য! তার নম্বর C/50 6909! তাই আমার প্রশ্নের জবাবে সে বলেছিল, তার নিজের

টিকিটের নম্বর সে আদৌ যাচাই করে দেখেনি; বলেছিল সেই টিকিটখানা বর্তমানে কোথায় আছে তা সে জানে না, ফেলে দিয়েও থাকতে পারে।

—তখন হয়তো রবিই একটা ডিনার থ্রো করবে। তাই নয়?

—বড় স্কেলে পার্টি দিক আর না দিক সে আমাকে নিমন্ত্রণ করবেই।

সুজাতা বলে, কেন? এত লোক থাকতে আপনাকেই বা বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করতে যাবে কেন?

—চক্ষুলজ্জায়! অত্যন্ত ধূর্ত সে! অত্যন্ত বুদ্ধিমান! তাই রবি জানে যে, আমি জানি যে, রবি জানে যে, আমি জানি!!

—সে আবার কী! তার মানে?

—সেটা বোঝা ভারি শক্ত। □

www.boiRboi.blogspot.com

কুলের কাঁটা

রচনাকাল: 1977

প্রথম প্রকাশ: মে 1978

প্রচ্ছদশিল্পী: প্রকাশক উল্লেখ করেননি

উৎসর্গ: কামাল হোসেন

মোকাম আপনাদের পসন্দ্ হইয়েসে?—জানতে চায় রামপ্রসাদ। প্রশ্নটা সে করে অবিনাশচন্দ্রকে, যদিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অবিনাশের স্ত্রী আরাধনার দিকে। জবাবও দিলেন আরাধনা। বললেন, পাণ্ডাজী, এখান থেকে কুণ্ড যে অনেক দূরে পড়বে। ঐ কুণ্ডের কাছাকাছি কোন ঘর পাওয়া যায় না?

পাণ্ডা রামপ্রসাদ বলে, এক বাত বলুঁ বাবুজী? হমার মোকাম একদম ঐ কুণ্ডের বাগে আছে। অগর আপনারা বুরা না মানেন তো একঠো কামরা হামিলোগ ছাড়িয়ে দেব—

রামপ্রসাদ শর্মা রাজগীরের পাণ্ডা। কুণ্ডের কাছেই তার নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। রামপ্রসাদ রেলে কাজ করত; রিটায়ার করার পরে গ্র্যাচুইটির টাকায় এক যজমানের কাছ থেকে সস্তায় এই বাড়িটা কিনেছে। রেলে কাজ করলেও সে ব্রাহ্মণ সন্তান, পূজারীর বংশ। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে কৌলিক বৃত্তিতেই ফিরে এসেছে।

আরাধনা জানতে চাইলেন, ওর বাড়িতে কে কে আছে। পাণ্ডাজী তার ভাঙা-ভাঙা বাংলায় নামের একটা ফিরিস্তি শোনালো ঃ বুধন, শনিচরী, মুংলি আর লছমী। আরাধনা আন্দাজে বুঝলেন প্রথম তিনজন ওর সন্তান-সন্ততি—নামকরণের সময় পাণ্ডাজী শুধু সপ্তাহের কী বার সেটা খোঁজ নিয়েছিল। তাহলে দলছুট শেষ নামটা ওর ব্রাহ্মণীর।

বাড়িটি দেখে ওঁদের পছন্দ হল। একতলার দক্ষিণপুব খোলা ভাল ঘরটা সে ছেড়ে দিল যাত্রীদের। দোতলার ঘরটা নিলেই ভাল হত; কিন্তু আরাধনা বাতে পঙ্গু—সিঁড়ি ভাঙার হাঙ্গামাটা এড়াতে চাইলেন।

একটা জিনিসে প্রথমেই খটকা লাগল অবিনাশের—ঐ লছমী। ঘোমটায় মুখটা অবশ্য আড়ালে আছে, তবু মনে হয় ওর বয়স বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। পাণ্ডাজী ষাটের কোঠায়। তার মানে দুজনের বয়সের ফারাক প্রায় চল্লিশ বছর। এমনও হয় না কি?

রামপ্রসাদ হাত দুটি জোড় করে বললে, বাবুজী, আপনারা রেলগাড়ির ধকল সয়ে এসেছেন।

ই-বেলায় রসুইয়ের ইন্তাজাম করবেন না। লছমী আপনাদের খাবার বানিয়ে দেবে। লেকিন এক বাত আছে বাবুজী, হামিলোক মছলি খায় না—

অবিনাশ বাধা দিয়ে বলেন ঃ বিলক্ষণ! সে জন্য কিছু নয়, তবে আপনার স্ত্রীকে আবার কেন মিছিমিছি—

এক হাত জিব্ বার করে পাণ্ডাজী বলে, জী নেহি! লছমী হমার বেটি আছে। হমার ঘরওয়ালী ইখানে না আছে। তার বহিনের সাদী আছে, তাই—

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল অবিনাশের। অবগুণ্ঠনবতী লছমীর দিকে আবার নজর পড়ল। দরজার চৌকাঠ ধরে সে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আরাধনা তাঁর স্বামীকে বললেন, আচ্ছা তুমি ঐ লছমীকে লক্ষ্য করে দেখেছ?

অবিনাশ ধুতির প্রান্ত থেকে চোর-কাঁটা তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, মানুষটাকে দেখেছি, মুখখানা নয়। কেন?

—ওর মুখের সঙ্গে আমাদের মিন্টির মুখের অদ্ভুত মিল।

চম্‌কে স্ত্রীর দিকে তাকালেন অবিনাশ ঃ মিন্টি! মানে মিনতি! কী বকছ পাগলের মত।

আরাধনা হেসে বলেন, না গো, সে-কথা বলছি না। কিন্তু দুজনের মুখের আদল...

অবিনাশ স্ত্রীকে ধমক দেন, কী পাগলের কথা! মিন্টি হারিয়ে গেছে চৌদ্দ বছর আগে। তখন তার বয়স ছিল বারো-তের—কচি মুখ ছিল তার...

আরাধনা বলেন, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার ঘটেও আছে। ও যে মিন্টি নয় তা আমিও জানি। তবু ওকে দেখেই আমার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠেছিল।

অবিনাশ জবাব দিলেন না। কী যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন তিনি।

এক বাড়িতে থাকতে হলে ঘোমটা বেশি দিন চলে না। তাছাড়া অবিনাশ ওর বাপের বয়সী। অচিরে ঘোমটা খুলতে হল। এবার নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অবিনাশ।

পাণ্ডাজীর স্ত্রী বাপের বাড়ি গেছে। ফলে লছমীই এখন গৃহিণী। সে কিছুতেই ওঁদের দুজনকে পৃথক রান্নার আয়োজন করতে দিল না। বললে, দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন, কেন খামকা কষ্ট করবেন। আমাকে তো রান্না করতেই হবে—দুটি চাল হাঁড়িতে বেশি নেওয়া বই তো নয়? খরচপত্রের হিসাব পিতাজির সঙ্গে করবেন। রান্না আমিই করব।

অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন আরাধনা। এমনিতেই তিনি বাতে পঙ্গু। এ তো অযাচিত স্বর্গ। দিবারাত্র তিনি ডুবে রইলেন কুণ্ডতে।

অবিনাশও ডুবে ছিলেন। দিন দুই পরে চিন্তার গলাজল থেকে মুখ তুলে পাণ্ডাজীকে বললেন, কিছু মনে করবেন না পাণ্ডাজী, আপনি যে এতদিনেও লছমীর বিবাহ দেননি, এতে সমাজ থেকে আপত্তি ওঠেনি?

পাণ্ডাজী চকিতে অন্দরমহলের দিকে দৃক্‌পাত করে নিচু গলায় তার বিচিত্র ভাষায় বললে, সে এক ভারী দুঃখের কথা বাবুজী। লছমী বিবাহিত; কিন্তু ওর মরদ ওকে নেয়নি। সে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারি।

—কেলেঙ্কারি! কীসের কেলেঙ্কারি পাণ্ডাজী?

—সে আপনার শুনে কাজ নেই, বাবুজী।

—তাহলে দ্বিতীয়বার মেয়ের বিবাহ দেননি কেন? বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে?

—কেমন করে দেব? একবার বিয়ে দিতেই আমি ফতুর হয়েছি। তাছাড়া শনিচরী—

—শনিচরী! আপনার স্ত্রী? তিনি চান না তাঁর কন্যার বিবাহ হয়?

পাণ্ডাজী তার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, শনিচরী লছমীর বিমাতা। লছমীর মা ফুলেশ্বরী স্বর্গে যাবার পর বুধনের মাকে আমি বিবাহ করেছিলাম। শনিচরী এখন এখানে নেই, তাই বাড়িতে শান্তি

আছে। না হলে দেখতেন দুজনের ধুন্ধুমার লেগেই থাকত।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করে বসেন অবিনাশ ঃ দেখুন পাণ্ডাজী, আমাদের সংসারে আমরা মাত্র দুজন—এই বুড়োবুড়ি! ছেলে-মেয়ে আমাদের নেই। অথচ ভগবানের দয়ায় অর্থের অভাব নেই আমাদের। দেখতেই পাচ্ছেন, আমার স্ত্রী বাতে পঙ্গু। এখন আমি যদি ফেরার সময় আপনার কন্যাটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই, আপনি রাজী হবেন?

পাণ্ডাজী অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারে না। শেষে দম নিয়ে বলেন, মাপ করবেন বাবুজী, আমি আপনার প্রস্তাবটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—দেখুন, আমি লছমীকে কন্যাত্বে বরণ করতে চাই। সে আমার মেয়ের মর্যাদা নিয়ে আমার সংসারে থাকবে। আমার স্ত্রী পঙ্গু, বুঝতেই পারছেন, আপনার মেয়ের খাওয়া-পরা সখ-আহ্লাদের যাবতীয় দায় আমার, এ-কথা বলাই বাহুল্য। যে-হেতু তাকে আমি আমার পরিবারভুক্ত বলে মনে করতে চাই তাই তাকে মাহিনা আমি কিছু দেব না, কিন্তু আমার নিজের বিধবা কন্যা বা পুত্রবধূ থাকলে আমি যা করতাম, এ-ক্ষেত্রেও আমি তাই করব, ওর নামে পোস্ট অফিসে একটি খাতা খুলে তাতে প্রতি মাসে আমি একশ' টাকা করে জমা দিয়ে যাব। লছমী যে-কোন কারণে যদি কোনদিন আমার সংসার ছেড়ে চলে আসতে চায়, তাহলে ঐ টাকাটাই হবে তার নতুন জীবনের মূলধন।

বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল রামপ্রসাদ। অবিনাশের হাত দুটি ধরে বললে, রামজীর অশেষ কৃপা যে, আপনার মত মানুষ আজও পৃথিবীতে জন্মায়! তবে, বাবুজী, লছমী প্রাপ্তবয়স্কা, তার সঙ্গে কথা না বলে আমি আপনার এ প্রস্তাবের জবাব দিতে পারছি না।

সে-রাত্রেই আরাধনা স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, তোমার মতলবটা কী বলত?

—মতলব! মতলব আবার কিসের?

—একশ' টাকায় এর চেয়ে ভাল রাঁধুনি ক'লকাতায় পাওয়া যেত না?

—আহা-হা, রাঁধুনি কেন? ওকে তো আমি পুত্রবধূর মর্যাদায়—

—তুমি কি ওর সঙ্গে সুরজিতের বিয়ে দিতে চাও?

সুরজিৎ অবিনাশের শ্যালক। অবিনাশ গম্ভীর হয়ে বলেন, ও যদি লছমী না হয়ে মিনতি হত, তাহলে নিশ্চয় তোমার আপত্তি হত না। তোমার ভাই তাহলে রাজ-জামাই হয়ে যেত।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আরাধনা বলেন, তাই তো জানতে চাইছি, তোমার মতলবখানা কী?

পরদিন পাণ্ডাজী জানালো সে অবিনাশচন্দ্রের প্রস্তাবে রাজী। তবে শনিচরী ফিরে আসার আগেই ওঁদের যাত্রা করতে হবে। কারণ শনিচরী জানতে পারলে বাধা দেবে।

অবিনাশ কারণটা জানতে চাওয়ায় পাণ্ডাজী সব কথা অকপটে স্বীকার করল। অর্থাৎ যদিচ শনিচরী খুশি হবে লছমী বিদায় হলে, কিন্তু সে কলকাতাবাসী এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে কন্যার মর্যাদা নিয়ে একশ টাকা রোজগার সম্বল করে যাচ্ছে এ কথা শুনলে সে ধুন্ধুমার বাধিয়ে দেবে। সব শুনে অবিনাশ বললেন, বুঝলাম, সে-ক্ষেত্রে লছমীর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আমাকে জানাতে হবে। কোথায় কবে তার জন্ম হয়েছে, কোথায় বিবাহ হয়েছিল...

বাধা দিয়ে পাণ্ডাজী বলে, কেন বাবুজী? এতসব খবরে কী প্রয়োজন?

—প্রয়োজন আছে। সম্ভব হলে এবং লছমী রাজী হলে তাকে হয়তো পাত্রস্থ করব।

অতঃপর পাণ্ডাজী বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। লছমীর জন্ম তারিখ তাঁর মনে নেই, তবে এটা মনে আছে—দিল্লীতে মহাত্মাজী যেদিন নিহত হলেন তার দুদিন পরে। তখন উনি পাটনা জংশনে পোস্টেড। লছমীর জন্ম রেলওয়ে হাসপাতালে। ওর বাল্যকাল কেটেছে পাটনাতেই। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে! তারপর এগারো-বারো বছর বয়সে তার বিবাহ হয়। ছাপড়া জেলার বিশৌলী গ্রামের সম্পন্ন চাষী মহাবীর প্রসাদ দেওয়ের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে। বছর পাঁচেক পরে 'গওনা' করে ওরা লছমীকে নিয়ে

যেতে আসে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য লছমীর—সেই রাত্রেই তার পেটে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়। রেলের ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং অপারেশন করেন। বরযাত্রীরা এটাকে বিশ্রীভাবে নিল। তারা বললে... সঙ্কোচে থেমে গেলেন পাণ্ডাজী।

অবিনাশ বলেন, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই তো তাঁরা জানতে পারতেন অসুখটা কী জাতের ছিল।

বিচিত্র হাসলেন পাণ্ডাজী। বললেন, তা পারতেন, কিন্তু তার পূর্বেই তাঁরা লছমীর গহনা পুঁটলীতে বেঁধেছিলেন। আমার মেয়ের নামে কলঙ্ক রটিয়ে সদর্পে গ্রামে ফিরে যাওয়াটাই পছন্দ হল তাঁদের। সে-ক্ষেত্রে পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিয়ে আর একটি কন্যাদায়গ্রস্তের রক্ত শুষবার সুযোগ পাবেন তাঁরা।

অবিনাশ বলেন, কত তারিখে লছমীর অপারেশন হয়েছিল মনে আছে আপনার?

পাণ্ডাজী ঝুঁকে পড়েন ঃ বাবুজি আপনি যাচাই করতে চাইছেন! আপনিও বিশ্বাস করেছেন যে, লছমী 'মা' হতে বসেছিল!

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে অবিনাশ বললেন, না। বিশ্বাস আমি করিনি। তবে হ্যাঁ, যাচাই আমি করতে চাই। আমার জেনে নেওয়া দরকার অসুখটা কী?

—কেন বাবুজী?

—সে আমার কন্যা হতে চলেছে। ভবিষ্যতে কোন সুপাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজনে আমাকে সব কথা একদিন বলতে হতে পারে। আমি চাই না ঐ অজুহাতে লছমীর ভাগ্যে দ্বিতীয়বার কোন বিড়ম্বনা আসুক।

পাণ্ডাজী মাথা নেড়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন বাবুজী। এ দুনিয়া ভারি পাজি জায়গা। অসুখটা কী তা ডাক্তার-সাহেব আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু সে অংরেজী নাম আমার স্মরণে নেই। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। সময়টা মোটামুটি বলতে পারব। তার পরের মাসেই আমি রিটায়ার করি। তার মানে 1963 সালের ফাগুন-চৈত।

অবিনাশ বলেন, ওতেই হবে। আমি কালই পাটনা যাচ্ছি। ফিরে এলে কথা হবে।

দিন দুই পরে আরাধনা স্বামীকে বললেন, একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছ? বুধন, মুংলি এমনকি পাণ্ডাজী পর্যন্ত ভাঙা ভাঙা বাঙলা বলে, অথচ লছমীর বাঙলা উচ্চারণ পরিষ্কার! বোঝাই যায় না যে, ও বিহারী!

অবিনাশ বললেন, তা হোক, তুমি যা ভাবছ তা নয়। লছমী তোমাদের সেই হারানো মিন্টি নয়।

—অমন অদ্ভুত কথা আমি কেন ভাবতে যাব?

—সচেতনভাবে না ভাবলেও কথাটা তোমার অবচেতন মনে আছে। তাই ওর বাঙলা উচ্চারণে এতটা আশ্চর্য হয়েছ তুমি। কিন্তু আসলে এটা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। আমি নিশ্চিতভাবে জেনে এসেছি। শোন ঃ

সারাটা দিন ছোটাছুটি করেছেন উনি। পাটনা রেলওয়ে হাসপাতালে অবশেষে সব সন্দেহের নিরসন হল। ঘটনাচক্রে ওঁর পরিচিত একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হাসপাতালে। ডক্টর সতীশ ধর। তাঁর কাকা ছিলেন অবিনাশের সহপাঠী। ডক্টর ধর অবিনাশের অনুরোধে পুরাতন রেজিস্টার ঘেঁটে বার করে দিলেন অকাট্য তথ্য ঃ 2.2.48 তারিখে সকাল সাতটা বারো মিনিটে পাটনা আউটার সিগনালের কেবিনম্যান শ্রীরামপ্রসাদ শর্মার স্ত্রী ফুলেশ্বরী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন—জাতকের ওজন সাত পাউন্ড—প্রসূতির প্রথম কন্যাসন্তান।

শুধু ঐটুকুই নয়। পরবর্তী সংবাদটাও বিশদ। প্রথম তথ্যে জাতকের নাম ছিল না; জন্মমুহূর্তে কারও নাম থাকে না, তাই শুধু লেখা ছিল 'ফিমেল চাইল্ড'। এবার নামও পাওয়া গেল।

25.3.63 তারিখে রাত বারোটার সময় এমার্জেন্সি বিভাগে একটি রোগিণী আসে। নাম লছমী দেবী।

বয়স ষোলো। পিতার নাম রামপ্রসাদ শর্মা। পেটে নিদারুণ যন্ত্রণা। রাত তিনটার সময় ডাঃ শঙ্করীপ্রসাদ ত্রিবেদী, সার্জেন, রোগিণীর এ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দেন। 30শে মার্চ এ্যাপেন্ডিসাইটিস-এর রোগিণীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সমস্ত বিবরণ শুনে আরাধনা বললেন, এত খবর তুমি কেন নিচ্ছ বল তো? তোমার অবচেতন মনে কী আছে?

অবিনাশ বলেন, সেটা এবার তোমাকে জানাবার সময় হয়েছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

অবিনাশের অবচেতনে প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে তাঁর ভগ্নিপতি অধ্যাপক গোকুলচন্দ্রের কথা। শুধু তাঁর নয়, তাঁর পিতৃপুরুষদের কথাও কিছুটা।

গোকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী মৈমনসিং-এর এক বিখ্যাত জমিদার-বাড়ির সন্তান। বর্তমানে তাঁর বয়স ছিয়াত্তর। বেশ বড় জমিদারী ছিল, লাখ-দশেক টাকার আদায়। বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন ওঁর পূর্বপুরুষরা। তবু গোকুলচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন তখনও বাড়িতে তিন-তিনটে হাতি ছিল। বংশের আদিপুরুষ দুর্লভচন্দ্র রায়—তিনিই প্রথম রায়-চৌধুরী খেতাব পান—ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। চার পাঁচটি ভাষা জানতেন তিনি। কিন্তু তারপর আর কেউ ও বংশে সরস্বতীর বন্দনা করেনি। চতুর্থ পুরুষ গোকুলচন্দ্র হলেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কৃতিত্বের সঙ্গে পরপর দু-বার এম.এ. পাশ করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দর্শনে ও ইতিহাসে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য হয়ে তরুণ গোকুলচন্দ্র এলেন কলকাতায়। পিতা নিবারণচন্দ্রের আপত্তি ছিল—ওঁদের জমিদার বংশে চারপুরুষে কেউ চাকরি করেনি, শুধু খরচ করেছে। গোকুল গ্রাহ্য করেননি। এ নিয়েই পিতাপুত্রে হল মতান্তর। মতান্তর থেকে মনান্তর। শেষে গোকুলচন্দ্র এমন একটি কাজ করে বসলেন যে, পিতৃদেব তাঁর মুখদর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। ব্যাপারটা গুরুতর। পিতার অজ্ঞাতে গোকুলচন্দ্র একটি শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এ থেকেই পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি। গোকুলের একটিমাত্র পুত্রসন্তান হয়েছিল। সেই পুত্রের বিবাহেও নিবারণচন্দ্র উপস্থিত হননি। তারপর বাঙলা বিভাগ হয়েছে। উদ্বাস্তু হিসাবে নিবারণ চলে এলেন কলকাতায়। গোকুল তখন শাঁখারীপাড়ায় বাসা ভাড়া করে আছেন। ছুটে গেলেন। নিবারণ তবু দেখা করেননি।

কেটে গেল আরও দশ-বারো বছর। তারপর একদিন অশীতিপর নিবারণচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন পুত্রের বাড়িতে। নতমস্তকে। গোকুলচন্দ্রের চরমতম দুর্দিনে! ইতিমধ্যে গোকুলের স্ত্রী গত হয়েছেন। সাবালক পুত্র স্ত্রী-কন্যা সহ কাশীতে চলে গেছে চাকরি নিয়ে। গোকুল তখন একাই থাকতেন তাঁর দীর্ঘদিনের পুরাতন ভৃত্য শিবনাথের তত্ত্বাবধানে। হঠাৎ এল মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। কাশীতে ওঁর পুত্রের গৃহে ডাকাতি হয়েছে। ওঁর পুত্রকে ডাকাতেরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, সর্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে—এমনকি তাঁর তের বছরের নাতনী মিনতিকেও তারা অপহরণ করে নিয়ে গেছে! সংবাদ শুনে পাড়ার একটি ছেলেকে নিয়ে তখনই ছুটে গিয়েছিলেন কাশীতে—কিন্তু পুত্রবধূর সাক্ষাৎ পাননি। তিনি উপস্থিত হবার পূর্বেই সে হতভাগিনী আত্মহত্যা করেছিল!

গোকুলচন্দ্র ফিরে এলেন কলকাতায়—একেবারে পাষাণ হয়ে।

সেই দুর্দিনেই তাঁর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন চুরাশী বছরের বৃদ্ধ নিবারণচন্দ্র। তাঁর মৃত্যুর পূর্ববৎসর। পাঁজর-সর্বস্ব বুকে বৃদ্ধ গোকুলকে জড়িয়ে ধরে শুধু বলেছিলেন, বিশ্বাস কর বড়খোকা!

এতবড় অভিসম্পাত কিন্তু আমি তোকে কোনদিন দিইনি!

দিন কারও জন্য বসে থাকে না। পাষাণ হয়ে যাওয়া গোকুল আবার একদিন উঠে বসলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির অধিকারীও হলেন। সেটা 1961 সাল। গোকুলের বয়সও তখন একষট্টি। অবসর নিয়েছেন কর্মজীবন থেকে। অধ্যাপনা ত্যাগ করলেও ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যেই তিনি ডুবে থাকতেন। পিতা দেশ-বিভাগের পূর্বেই কিছু সম্পত্তি এদেশে এনেছিলেন। আর এনেছিলেন এক তোরঙ্গ বোঝাই কাগজপত্র। ওঁদের মহাফেজখানায় সযত্নে রাখা ছিল সেইসব প্রাচীন দলিল। নিবারণচন্দ্র তাঁর পণ্ডিত পুত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেইসব কীটদষ্ট পুরাতন নথিপত্র। গোকুল নাকি তার ভিতরে আবিষ্কার করেছেন কিছু অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য। কেউ বলে—তিনি ওদের পারিবারিক ইতিহাস লিখছেন, কেউ বলে—না, উনি লিখছেন ওঁর প্রপিতামহের জীবনী, আবার কেউ বলে উনি নাকি সিপাহী-বিদ্রোহের উপর একটি প্রামাণিক গবেষণা করছেন। এমন অনুমান করার কারণ হচ্ছে এই যে, বংশের আদিপুরুষ, নিবারণচন্দ্রের পিতামহ দুর্লভচন্দ্র রায়—হ্যাঁ, তখনও ওঁরা রায়চৌধুরী খেতাব পাননি—সিপাহী বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন। মঙ্গল পাণ্ডের যখন ব্যারাকপুরে ফাঁসি হয়, তখন দুর্লভচন্দ্রও ছিলেন ঐ ব্যারাকপুর ছাউনিতে। সেই দুর্লভচন্দ্রের একটি দুর্লভ দিনপঞ্জী নাকি পাওয়া গেছে জমিদারীর মহাফেজখানা থেকে। গোকুলচন্দ্রের মতে প্রপিতামহের ঐ দিনপঞ্জিকাটির দাম লাখ টাকা!

সরশুনা ছাড়িয়ে ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে বড় রাস্তার উপর একটি প্রকাণ্ড বাগানওয়ালা বাড়ি বানিয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র। সেখানেই এসে উঠলেন গোকুল। একেবারে একা। না, একা নন—তাঁর পুরাতন ভৃত্য শিবনাথ এবং তার স্ত্রী দুর্গামণিও এল সঙ্গে। আর এল তাঁর ডগ-শো জেতা কুকুর 'ডেভিল'। গোকুলচন্দ্রের যদি বংশগৌরব থাকে তবে ডেভিলেরও তা আছে। ডেভিলের বাবা ছিল হ্যারিস-কোম্পানির বড়-সাহেবের একটি খানদানি 'গ্রেট ডেন' এবং গর্ভধারিণী লাহাদের বাড়ির প্রাইজ পাওয়া জার্মান 'ম্যাস্টিফ্'। তখন তার বয়স মাত্র তিন বছর, তবু প্রায় একটা প্রকাণ্ড বাছুরের মত হয়ে উঠেছে ডেভিল!

অতবড় হাতাওয়ালা বাড়িতে তিনটি মানুষ ও একটি কুকুর নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গতা অনুভব করতো—করল না, কারণ আত্মীয়-স্বজনেরা গুটিগুটি এসে জুটলেন। প্রথমেই এলেন গোকুলের শ্যালক অবিনাশচন্দ্র সস্ত্রীক এবং স্ত্রীর ভাইকে নিয়ে। এলেন গিরিনবাবু—তিনি নাকি সম্পর্কে গোকুলের বোন-পো। আরও দু-চারজন এলেন—রক্তের সম্পর্কের টানে; যদিচ 'রায়চৌধুরী' পরিবারের পারিবারিক ইতিহাস যিনি রচনা করেছেন তিনি বুঝে উঠতে পারেননি সম্পর্কটা ঠিক কী জাতের। পুরাতন ভৃত্য শিবনাথ বলত, বুড়োকর্তা আপনি এ্যাত বড় পণ্ডিত হয়েও এমন সোজা কথাটা বুঝলেন না আজ্ঞে? সম্পর্কটা ট্যাকার! অনেক ট্যাকা যে আপনে-হুস্ করি পায়ে গেলেন। ওয়ারিশ নাই। তাই ওঁয়ারা একে একে এসে জুটছেন।

সংসার-অনভিজ্ঞ পণ্ডিত মানুষটি কথাটা প্রথমে মেনে নেননি। ক্রমে বুঝলেন। তাঁর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। একদিন সবাইকে ডেকে বললেন, শোন বাপু। তোমরা এখানে থাকতে চাও তো থাক। আমি যা খাই, তোমরাও তা খাবে। তবে আমার মৃত্যুর পর তোমরা কেউ কিছু পাবে না। আমার হারানো নাতনী যদি কোনদিন ফিরে আসে তবে সেই আমার যাবতীয় সম্পত্তি পাবে! বুঝলে?

সাফ কথা। ভীড় ক্রমে পাতলা হয়ে গেল। 'দুর্লভ-নিকেতনে' তাই বৃদ্ধ এখন ঐ ভৃত্যসম্বল হয়ে প্রায় একাই থাকেন। আত্মীয়-স্বজনেরা বললে, ছেলে যে-ভাবে মরেছে, বাপও একদিন ঐ-ভাবে খতম হবে। ডাকাতের হাতে!

তা কিন্তু হয়নি। দুটি কারণে। এক নম্বর, সবাই জানত মিতব্যয়ী গোকুলের না আছে সোনাদানা, না নগদ টাকা। দ্বিতীয়ত, সন্ধ্যার পর থেকে চেন-ছাড়া ডেভিল বাড়ির দায়িত্ব নিত। লোহার গেটে ঝোলানো আছে প্রকাণ্ড সাবধানবাণী। প্রয়োজন ছিল না। দুর্লভ-নিকেতনকে কেন্দ্রবিন্দু করে

আধ-মাইলের ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি ভৌগোলিক বৃত্ত যদি টানা যায়, তাহলে সেই বৃত্তবাসীরা নিঃসন্দেহে শুনেছে ডেভিলের নৈশ গর্জন। ও-পাড়ায় ডেভিলের নাম 'হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিল!'

তারপর আরও এক যুগ কেটে গেছে। মাত্র গত বৎসর গোকুল তাঁর শ্যালক অবিনাশকে জরুরী পত্র লিখে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আজ বড় বিপদে পড়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি অবিনাশ। কিছু দিন চোখে ব্যথা হচ্ছিল। ডাক্তার দেখিয়েছি। ওঁরা বলছেন, আমার চোখের শিরা-উপশিরা না কি সব শুকিয়ে যাচ্ছে। মাস তিনেকের ভিতরেই আমি নাকি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাব।

অবিনাশ বলেছিলেন, সে কী! তা হতেই পারে না। আপনার তো পয়সার অভাব নেই চৌধুরী মশাই। আপনি বিলেত চলে যান—রাশিয়ায়, আমেরিকায় কিম্বা ভিয়েনায়—

গোকুল তাতে রাজী হননি, বলেছিলেন—কদিনই বা বাঁচব? দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেও লাভ নেই। আমার শরীর ভেঙে পড়েছে বুঝতে পারছি। আর বড়জোর এক বছর। তোমাকে যেজন্য ডেকেছি তাই বরং বলি। আমার মন বলছে—একদিন না একদিন মিনতি ফিরে আসবে। এখন বল, অন্ধ হয়ে যাবার আগে আমার সম্পত্তি আমি কীভাবে তার জন্য রেখে যাবার ব্যবস্থা করব? কাকে আমার অছি করে যাব?

অবিনাশ বহু ইতস্তত করেও বুকের কথাটা মুখে আনতে পারলেন না। বললেন, আপনি কি চান, এ অবস্থায় আমরা দুজন আপনার এখানে এসে থাকি?

—নিশ্চয়ই চাই। বরাবরই তাই চেয়েছি।

এরপর ভাঁটার পর জোয়ারের মত আবার গুটিগুটি এসে জুটলেন সবাই! অবিনাশ, আরাধনা, গিরিনবাবু এবং আরো সব আত্মীয়-স্বজন। আহা! উনি অন্ধ হয়ে যেতে বসেছেন।

মাস তিনেকের ভিতরে গোকুল সত্যই অন্ধ হয়ে গেলেন। আরও মাসতিনেক পরে অবিনাশ 'দুর্লভ-নিকেতন' ছেড়ে নিজের শালার কাছে ফিরে এলেন। দুর্জনে বলে, তিনি.নাকি বৃদ্ধের অন্ধত্বের সুযোগে তাঁর সব খাতাপত্র তন্ন তন্ন করে হাতড়ে দেখেছেন। গুপ্তধনের কোনও সন্ধান তো দূরের কথা ইঙ্গিতও পাননি। ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে তার হদিশ নেই, বাক্সে-ড্রয়ারে কোনও শেয়ার, ক্যাশ-সার্টিফিকেট, বা সম্পত্তির দলিল খুঁজে পাননি। রাতারাতি এত টাকা তাহলে কোথায় সরিয়ে ফেললেন বৃদ্ধ? এর কিছুদিন পরেই অবিনাশ সস্ত্রীক রাজগীরে চলে যান, বাতগ্রস্ত সহধর্মিণীর চিকিৎসা করাতে।

শনিচরী ফিরে আসার আগেই রওনা হলেন ওঁরা। আরাধনা বেশ উপকার পাচ্ছিলেন, তবু কী-জানি কেন তিনিও বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব। লছমী তো উঁচিয়ে আছে কলকাতা শহর দেখার লোভে। হিসাবপত্র মিটিয়ে অবিনাশ পাণ্ডাজীকে বললেন, আর একটা কথা। বলি বলি করেও কথাটা আপনাকে এতদিন বলিনি। আমার স্বর্গগতা ভগ্নীর একটি কন্যাকে চৌদ্দ বছর আগে ডাকাতে ধরে নিয়ে যায়। আমাদের সেই হারানো নাতনীর সঙ্গে লছমীর চেহারার বেশ মিল আছে। আমার বৃদ্ধ ভগ্নীপতি জীবিত। কিন্তু তিনি অন্ধ। আমি স্থির করেছি, লছমীকে নিয়ে গিয়ে বলব, তাঁর হারানো নাতনীকেই আমি নিয়ে এসেছি। অন্তত শেষ জীবনের বাকি কটা দিন অন্ধ বৃদ্ধ কিছু শান্তি পাবেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেল পাণ্ডাজী? আমতা আমতা করে বলল, তাঁকে কী বলবেন? কোথায়, কেমন করে মেয়েটিকে পেলেন?

—বলব যে, আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে আপনি—রাজগীরের পাণ্ডা শ্রীরামপ্রসাদ শর্মা—কাশীর

দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি দশ বছরের মেয়েকে কাঁদতে দেখে তাকে কুড়িয়ে এনে কন্যার মত মানুষ করেছেন। বাদ-বাকি সত্য কথাই বলব—অর্থাৎ লছমীর এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়, তারপর দ্বিরাগমনের সময় তার নামে মিথ্যা বদনাম দিয়ে—

বাধা দিয়ে পাণ্ডাজী বলে, এতে পাপ হবে না বাবুজী?

—না, হবে না! আপনি তো গীতা পড়েছেন। ফলের আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে পাপ। আমার উদ্দেশ্য কী? একটা মরণোন্মুখ অন্ধ বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া।

—কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে আমি তো কাশী যাইনি?

—সেটা কী-ভাবে প্রমাণ হবে বলুন? ঐ চৌদ্দ বছরের কথাই বলতে হবে। না হলে চার পাঁচ বছরের ফাঁক থাকলে অনেক বাধা আপত্তি দেখা দেবে। আত্মীয়-স্বজনেরা কেমন মানুষ তা তো জানেনই। হয়তো তারা বলে বসবে, ঐ কয় বছর মেয়েটি ঘৃণিত জীবন-যাপন করেছে। তাহলে আমাদের নিষ্ঠাবান গোঁড়া পরিবারে—বুঝতেই তো পারছেন।

পাণ্ডাজী বলেন, মেয়েকে যখন আপনার হাতে তুলে দিলাম তখন তার ভালমন্দের ভারও আপনার। আমার তো হাত-পা ধোওয়া।

—না পাণ্ডাজী। প্রথমত, লছমীকে আপনি এখনই কিছু বলবেন না। সে হয়তো ঘাবড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এর পর কেউ কখনও যদি আপনার কাছে খোঁজ নিতে আসে তবে আপনি বলবেন, সে আপনার পালিতা কন্যা। কাশীতে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছেন! রাজি?

পাণ্ডাজী তার টাকে হাত বুলোতে থাকে নীরবে।

অবিনাশ একশ টাকার পাঁচটা নোট ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন, মিথ্যা-ভাষণের জন্য যদি কোন পাপ হচ্ছে মনে হয়, তবে একটা পূজা-টুজা চড়িয়ে দেবেন।

পাণ্ডাজী বজ্রাহত হয়ে গেল।

ট্রেন ছাড়তে লছমী বললে, একী? এ গাড়ি তো পশ্চিমমুখো যাচ্ছে।

আরাধনা বলেন, হ্যাঁ রে, আমরা আগে কাশী যাচ্ছি। কাশী ঘুরে ক'লকাতা ফিরব।

লছমী বলে, কেন মাইজী?

—মাইজী নয়, তুই আমাকে রাঙাদিদা বলে ডাকবি। মিন্টু আমাকে ঐ নামেই ডাকত।

লছমী অবাক হয়ে বলে, মিন্টু! মিন্টু কে?

রেলগাড়িতে বসেই আরাধনা লছমীকে তাঁদের পরিকল্পনার কথাটা শোনালেন। আসল কথাটা অবশ্য ভাঙলেন না। গোকুলচন্দ্র যে লক্ষপতি এবং তাঁর সঞ্চিত অর্থের সন্ধানই যে মূল লক্ষ্য এ তথ্যটা গোপন থাকল। সে শুনল—একজন মরণোন্মুখ অন্ধ বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে তাকে কিছু অভিনয় করতে হবে। আদ্যন্ত শুনে লছমী শিউরে উঠেছিল ঃ মাপ করবেন মাইজী। ও আমি পারব না, পারব না, কিছুতেই পারব না।

আরাধনা চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন, মর ছুঁড়ি! মাইজী কিরে? রাঙাদিদা নয়?

অবিনাশ পাকা লোক। একবারে গোড়া বেঁধে কাজে নামতে চান। কাশীতে একটি ধর্মশালায় উঠলেন। প্রথমেই বাজার থেকে কিনে আনলেন—শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া থেকে রোল-গোল্ডের চুরি-দুল-মালা। লছমীর এত সাধের এক-হাত কাঁচের চুরি ভেঙে ফেলতে হল। দু-পায়ে যে রূপার চুটকি ছিল তা গেল। মায় আরাধনা ওর তেল মাখা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন—এক বেলা ধরে শ্যাম্পু ঘষলেন মাথায়। মোট কথা লছমীর অপমৃত্যু ঘটল, নবজন্ম পেল মিনতি রায়চৌধুরী।

দুর্গাবাড়ি ছাড়িয়ে চৌদ্দ-পনের বছর আগে যে নির্জন বাড়িতে মিনতির বাবা থাকতেন সেই ঘনবসতি অঞ্চলে হাজির হলেন। সে বাড়ির নতুন বাসিন্দা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার অশোক মেহ্তা অবাক হলেন! এ বাড়িতে যে গত দশকে একটি ডাকাতি হয়েছিল তা তিনি জানতেনই না। তিনি অবাক হচ্ছিলেন এ-কথা ভেবে—ডাকাতি যদি হয়েই থাকে, সেটা এমন কিছু সুখস্মৃতি নয় যে,

সেই নৃশংস ঘটনা কোথায় ঘটেছিল তা দেখতে এঁরা আসবেন। যা হোক, তবু অবিনাশের অনুরোধে তিনি সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন।

লছমীকে যতটা বোকা ভাবা গিয়েছিল আসলে সে কিন্তু অতটা বোকা নয়। রাত্রে সে আরাধনাকে ধরে বসল, রাঙাদিদা, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো! আপনি বলছেন, একজন অন্ধ বুড়োকে ধোঁকা দেবার জন্য আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে আমাকে এ-ভাবে সবকিছু চিনিয়ে দিচ্ছেন কেন? সেই অন্ধ বুড়ো তো আমাকে জেরা করবে না?

—বুড়ো না করুক, আর পাঁচজন করতে পারে। বুড়োর আত্মীয়স্বজন—

—তাদের খোলাখুলি সত্যি কথা বলে দিলেই হয়? তাঁরা যদি বুড়োর কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখেন তাহলেই তো আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হবে? সকলের কাছে এ মিথ্যা কথা বলার কী দরকার?

আরাধনা জবাব দিতে পারেন না। স্বামীর দিকে বিহ্বলভাবে তাকান। জবাব দিলেন অবিনাশ ঃ একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। বুড়োর অনেক টাকা। তার কোনও ওয়ারিশ নেই। ওঁর আত্মীয়-স্বজনেরা ওৎ পেতে বসে আছে—কবে বুড়ো মরে। গোকুলবাবু যদি তোমাকে নাতনী বলে মেনে নেন, তাহলে হয়তো তাঁর সব সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে যাবেন।

লছমী উঠে দাঁড়ায়। বলে, বাবুজী, এতদিনে আপনাদের অভিসন্ধি আমি ঠিকমত বুঝে উঠতে পেরেছি। আমি এ তঞ্চকতার মধ্যে নেই। আপনারা দয়া করে আমাকে রাজগীরে নামিয়ে দেবেন, কোলকাতা ফেরার সময়ে।

অবিনাশ বিচিত্র হাসলেন শুধু।

দিন সাতেক কাশীবাস করে অবিনাশ ফিরে এলেন কলকাতায়। বলা বাহুল্য ফেরার পথে লছমীকে রাজগীরে নামিয়ে দেননি। মেয়েমানুষের ভাগ্যটাই যে ঐ রকম। ঘরের বাইরে আসা সহজ, ঘরে ফিরে যাওয়া কঠিন। অবিনাশ ধীরে ধীরে ওকে তালিম দিচ্ছিলেন—কখনও মিষ্টি কথায়, কখনও ধমক দিয়ে।

কলকাতায় ফিরে সরাসরি 'দুর্লভ নিকেতনে' গেলেন না কিন্তু। এসে উপস্থিত হলেন নিজের বাসায়। আরাধনার ভাই সুরজিৎ অবাক হল লছমীকে দেখে। বললে, এ মেয়েটি কে দিদি?

আরাধনা বলেন, ভাল করে দেখতো তাকিয়ে, চিনতে পারিস?

সুরজিৎ পূর্ণ যৌবনা মেয়েটিকে ভাল করে দেখল। দেখল, মেয়েটিও অসঙ্কোচ তাকে দেখছে। সুরজিৎ অবাক হয়ে বললে, মিন্টু! কিন্তু তা কেমন করে হবে?

আরাধনা সে কথার জবাব না দিয়ে লছমীকে বলেন, কী রে চিনতে পারছিস না? তোর সুরজিৎদা।

লছমী এতক্ষণে নতনেত্র হল। রাম-গঙ্গা কিছুই বলল না। সুরজিৎ রীতিমত অবাক হয়েছে। মিনতিকে তার স্পষ্ট মনে আছে। থাকারই কথা; মিনতিকে সে শেষ যখন দেখে তখন মিনতির বয়স দশ-বারো, ওর নিজের আঠারো-উনিশ। কিন্তু মেয়েটির দৃষ্টিতে পূর্ব পরিচয়ের আভাসমাত্র ছিল না। কাজল কালো দুই চোখে ছিল শুধু বিস্ময়। এবার সে নিজেই প্রশ্ন করে, আমাকে চিনতে পারছ না মিন্টু?

নতনেত্রেই মাথা নাড়ে লছমী—না, সে চিনতে পারছে না।

অবিনাশ এ সম্ভাবনার কথাও ভেবে রেখেছেন। বললেন, তোমাকে সব কথা পরে বলব সুরজিৎ। সে অনেক কথা।

সময় ও সুযোগ মত যে আষাঢ়ে গল্পটা সুরজিৎকে শোনালেন অবিনাশ, সেই গল্পটাই আবার আরাধনা শোনালেন লছমীকে। এ-ছাড়া উপায় ছিল না। এ না হলে যে-কোন মুহূর্তেই সমস্ত পরিকল্পনাটার বনিয়াদ ধ্বসে যেতে পারে।

আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে সেই ভয়াবহ রাত্রের ঘটনাই। মিনতির মাথায় নাকি একজন ডাকাত লাঠির আঘাত হেনেছিল। সে সংজ্ঞা হারায়। কতদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল সে জানে না। জ্ঞান হলে দেখে, একজন পাণ্ডার বাড়িতে সে শুয়ে আছে। সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞান নাকি সে হারিয়ে ফেলে, মায় নিজের

নাম এবং পরিচয়। চিকিৎসা-শাস্ত্রে একে বলে 'প্যারামনেসিয়া' বা স্মৃতিভ্রংশ। পাণ্ডাজী সে জন্যই পুলিসে খবর দেননি। মেয়েটি যখন তার পূর্বজীবনের কথা কিছুই স্মরণ করতে পারছে না তখন পুলিস তাকে অনাথ আশ্রমে পাঠাতো। পাণ্ডাজী ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি তাই তাকে কন্যার স্নেহে মানুষ করেছেন। এতদিনে মেয়েটির কিছু কিছু পূর্বস্মৃতি ফিরে আসছে বটে, তবু অনেক কিছুই সে মনে করতে পারে না।

সুরজিৎ এ গল্প শুনে বলেছিল, অদ্ভুত ঘটনাচক্র! রীতিমত নাটকীয়! ভালো সিনেমার প্লট!

লছমী সে কথা বলেনি। আরাধনার কাছে গল্পটা শুনে সে লুটিয়ে পড়েছিল তাঁর পায়ে। বলেছিল, এ আমি পারব না, কিছুতেই পারব না, আপনারা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন মাইজী!

—আবার বলে 'মাইজী'!

চোখের জল মুখে লছমী বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাঙাদিদা। কিন্তু এবারে আপনারা আমাকে রেহাই দিন। আমি ঠিক ধরা পড়ে যাব।

—যাবি না। যাতে না যাস্ তাই তো তোর রাঙাদাদু এ গল্প ফেঁদেছে। শোন, এই দ্যাখ আমাদের ফটো অ্যালবাম। আয়, তোকে সব চিনিয়ে দিই। এই তোর আসল, মানে নকল দাদু—গোকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী, এ হল তার বাড়ির চাকর শিবনাথ, আর শিবনাথের পাশে তার বউ দুর্গামণি। বুঝলি? এই বাঘের মত কুকুরটার নাম ডেভিল। এবার তো সব চিনে গেলি; ভয় কী?

অবিনাশের গোড়া বেঁধে কাজ। স্মৃতিভ্রংশতার অজুহাত সর্বক্ষেত্রে চালালে সন্দেহ হবে। সুরজিতের বিস্ময়টা তিনি ভুলতে পারেননি। তাই প্রথমেই তিনি লছমীকে নিয়ে গেলেন ভবানীপুরের শাঁখারীপাড়া লেনে।

কৈশোরে মিনতি এখানকার একটা ভাড়া বাসায় থাকত, গোকুলের সংসারে। বাড়িটা, পাড়াটা লছমীর চিনে রাখা ভাল।

লছমীকে নিয়ে সে পাড়ায় একটা বাড়িতে উপস্থিত হলেন অবিনাশ। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল একজন যুবক। বছর চৌত্রিশ বয়স। বললে, কাকে খুঁজছেন?

—হরিবিলাস সরকার মশাই আছেন?

যুবকটি ওঁদের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, তিনি তো বছর আট-দশ আগে স্বর্গলাভ করেছেন। আপনার কোথা থেকে আসছেন?

অবিনাশ বলেন, সরকার মশাই গত হয়েছেন! দশ বছর! কী আশ্চর্য! আমরা কোন খবরই রাখি না।

ছেলেটি বললে, আসুন ভিতরে এসে বসুন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন?

বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে বসলেন অবিনাশ। বললেন, আমাকে আপনি চিনবেন না, আচ্ছা আপনি কি অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম শুনেছেন?

ছেলেটি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠে। অবিনাশের কথার জবাব না দিয়ে সরাসরি নতমুখী মেয়েটিকে বলে ওঠে, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি মিনতি?

অবিনাশ আটখানা! কিন্তু সে আহ্লাদ ক্ষণস্থায়ী। লছমী কিছুতেই স্বীকার করতে পারল না। মাথা নিচু করে বসেই রইল। অবিনাশ বলেন, তবে তো চিনতেই পেরেছেন।

ছেলেটি এবারও সে-কথা কানে নিল না। পুনরায় লছমীকে বললে, কী আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পারছ না মিন্টু? আমি রঞ্জন, তোমার রঞ্জুদা!

নতমুখী লছমী এবারও জবাব দিল না। মাথা নেড়ে জানালো—না!

কোন মানে হয়? শুনছিস্ তোরা যে বাড়িতে ভাড়া ছিলি তারই দোতলার বাড়িওয়ালার ছেলে! নামও তো শুনলি? এখন ঘড়ির পেন্ডুলামের মত ঘটঘট করে মাথা নাড়ার কোনও মানে হয়? ভগবান এমন সুযোগ পাইয়ে দিলেন অথচ মেয়েটার ঐ নিরেট মাথায় একটু ঘিলু দিতে পারলেন না?

রঞ্জন অনেক কথা বক্‌বক্ করে বকে গেল। মিনতিকে উদ্দেশ্য করে। অবিনাশকে সে গ্রাহ্যের

মধ্যেই আনছে না। তাতে তাঁর দুঃখ নেই। তিনি মনে মনে অঙ্কের হিসাব করছেন। রঞ্জনের বর্তমান বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তার মানে চৌদ্দ বছর আগে তার বয়স ছিল কুড়ি-একুশ। মিনতির তের-চোদ্দ। বাড়িওয়ালার ছেলে আর ভাড়াটের মেয়ে! একতলা আর দোতলা। অতনু কি অহৈতুকী কৌতুকে দু-একটি বাণ ছুঁড়েছিলেন? কাফ্ ল্যভ! না হলে মিনতির রঞ্জুদা এমন চুলবুল করছে কেন? কিন্তু মেয়েটা হাবার বেহদ্দ। ক্রমাগত তাঁতের মাকুর মত মাথাটা দুদিকে দোলাচ্ছে—না, পূজা-প্যান্ডেলে জলসার কথা, মায়া, শেফালী, বাবলু, সুখেন—কারও কথা তার মনে নেই।

অবিনাশ শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমার মা? তিনি—

—হ্যাঁ, মা এখানেই আছেন। এস মিন্টি, মায়ের সঙ্গে দেখা করবে এস—

লছমী দশ-মিনিটের ভিতরেই মিন্টি হয়ে গেল। অথচ রঞ্জন 'রঞ্জুদা' হবার কোনও লক্ষণ নেই। গোঁয়াড় আর কাকে বলে!

মেয়েটি সব কিছু অস্বীকার করা সত্ত্বেও রঞ্জন এবং তার মা অসঙ্কোচে মেনে নিলেন মিনতিকে। অবিনাশ জনান্তিকে রঞ্জনকে শুনিয়ে দিলেন মিনতির স্মৃতিভ্রংশতার আষাঢ়ে গল্পটা। রঞ্জন বললে, মিনতির হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা সে ভালভাবেই জানে। গোকুলচন্দ্রকে সে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে—না, চিনত নয়, চেনে। এখনও মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসে। কারণও আছে। রঞ্জন ইতিহাসের এম.এ.। সে যখন য়ুনিভার্সিটিতে পড়ত তার আগেই অবশ্য গোকুল অবসর নিয়েছেন, তবু ইতিহাসের প্রগাঢ় প্রাক্তন অধ্যাপকটির স্নেহধন্য ছিল সে। মাস কয়েক আগেও সে গিয়েছিল দুর্লভ নিকেতনে। তবে ইতিমধ্যে তিনি যে অন্ধ হয়ে গেছেন এ খবর রঞ্জন জানত না।

রঞ্জন ওদের বড় রাস্তার বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। বললে, মিন্টি, কাল পর্শুর মধ্যে একদিন যাব তোমাদের বাড়ি। মানে দুর্লভ-নিকেতনে!

লছমী এতক্ষণে অনেকটা সহজ হয়েছে। বললে, আমি আপনাকে আদৌ চিনতে পারলাম না, তবু আপনি যাবেন? .

—সেটা তোমার দোষ নয় মিন্টি। ও একটা অসুখ। ক্রমে ক্রমে সবই তোমার মনে পড়বে। আমি মনে পড়িয়ে দেব।

বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত আগিয়ে দিয়ে ওদের গাড়িতে তুলে দেবার পর রঞ্জন বাড়ি ফিরল না। চুপটি করে গিয়ে বসল সামনের পার্কে। সে জানে মা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। আর যার চোখকেই ফাঁকি দেওয়া যাক, মায়ের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ও জানে, যে মা জানে। মা জানতো। মায়ের কাছ থেকে লুকানো যায়নি, লুকানো যায়না।

রঞ্জন কিছু শিশু নয়—চৌদ্দ বছর কদিন হয় তার হিসাব ভালো মতই জানা। যে নিদারুণ আঘাতে চৌদ্দ বছর আগে পাঁজরাটা গুঁড়িয়ে গিয়েছিল এতদিনে তার ধার খয়ে যাওয়ার কথা—গিয়েছিলও তাই। রঞ্জন হাসতো, খেলতো, সিনেমা দেখতো, বন্ধুদের নিয়ে হৈ-চৈ করত। কে বলবে তার বুকের পাঁজরায় একটা প্রকাণ্ড ক্ষতচিহ্ন! এম.এ. পাশ করা পর্যন্ত মা কোন তাগাদা দেয়নি—তারপর চাকরি পাওয়ার পর থেকে নানা ভাবে প্রসঙ্গটা পেড়েছে। মায়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে, একা হাতে আর পেরে ওঠে না—রঞ্জন বুঝত সবই কিন্তু রাজী হয়নি। একটা অতীত-স্মৃতিকে মূর্খের মত আঁকড়ে থাকার যে কোনও অর্থ হয় না, এটা ভালোমতোই জানে; কিন্তু কী করতে পারে সে? ও বিষয়ে আর কোনদিনই

উৎসাহ বোধ করেনি। এত এত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু ওর ছত্রিশ বছরের জীবনে দ্বিতীয়বার আর বসন্ত আসেনি। কারও পথ চেয়ে সে প্রতীক্ষা করছিল কি না?—নিশ্চয় নয়! সে তো পাগল নয়। তবে ঐ! ও বিষয়ে সে নির্লিপ্ত। মা যে জানত তার প্রমাণ—আজ চৌদ্দ বছরের মধ্যে একবারও ছলের কাছে ঐ নামটা উচ্চারণ করেনি; একবারও সরাসরি জানতে চায়নি; হ্যাঁরে খোকা! সেই আবাগীটাকে ভুলতে পারিসনি, নারে?

সচেতনভাবে নিজের কাছেও সে-কথা ও স্বীকার করত না। তার কথা মাঝে মাঝে ঘুম-না-আসা রাতে মনে পড়ত—ভাবত, সে তো মারা যায়নি; এই দুনিয়ারই কোন এক অচেনা গৃহের অজানা কক্ষে হয়তো সে হতভাগীও বিনিদ্র বালিশ আঁকড়ে পুরোনো দিনের রোমন্থন করছে—সেই প্রথম-সাক্ষাতের উষ্ণ বাক্য বিনিময় থেকে শেষ সাক্ষাতের উষ্ণ স্পর্শ পর্যন্ত। চৌদ্দ বৎসরেও সে উত্তাপ শীতল হয়ে যায়নি। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে—হঠাৎ একদিন রঞ্জন ঘটনাচক্রে তার মুখোমুখি হয়ে পড়ল। দুজনে দুজনকে চিনতে পারবে তো? কী পরিবেশে? একদিন প্রথম সম্বোধনের অনড় পাঁচিলটা ভেঙে ফেলতে দুজনেই যেমন উদগ্রীব ছিল, অথচ ভাষা খুঁজে পেত না,—আবার কি তাই হবে? রঞ্জন কি পেশ করবে সেই চিরাচরিত প্রশ্নটি ঃ 'আমাদের গেছে যা দিন, তা একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি।

আর মিনতি জবাবে জানাবে ও প্রশ্নের একমাত্র জবাব ঃ 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে!'

কিন্তু পটভূমিটা যদি রেলগাড়ির কামরায় না হয়? যদি হয় অন্য কোন অবাঞ্ছনীয় পরিবেশে! অকৃতদার রঞ্জন যদি কামনার তাড়নায় বন্ধুদের সঙ্গে উপস্থিত হয় কোন বারবিলাসিনীর ডেরায়—আর সেখানে সাক্ষাৎ পায় তার? মনে মনে শিউরে উঠত রঞ্জন! না! তা কখনই হবে না! নিজের অজ্ঞাতেই মিন্টি ওকে রক্ষা করবে—কোনও দিন ও-সব পাড়ায় পা বাড়াতে দেবে না! যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়—এই ভয়ে!

কী সব আবোল-তাবোল ভাবছে!

পার্কে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এখানে ওখানে জোড়ায়-জোড়ায় বসে আছে কয়েকজন। যাদের নীড় ডাকাতে তছনছ করে দিয়ে যায়নি। রঞ্জন ওদের দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনল। না, এখন বাড়ি ফিরবে না সে। মায়ের মুখোমুখি হবার আগে একবার নিজের মুখোমুখি হওয়া দরকার।

গোকুলচন্দ্র মাত্র বছরতিনেক ছিলেন ওদের একতলার ভাড়াটে হিসাবে। রঞ্জন যখন ফার্স্ট ইয়ারে ঢোকে তখন ওঁরা আসেন, যে-বছর সে বি.এ. দেয় সে বছর চলে যান। রঞ্জনের বাবা হরিবিলাসবাবু তখনও জীবিত। তখনও কোর্টে বের হতেন। দ্বিতলে বাপ-মা-ছেলের ছোট্ট সংসার। একতলায় ভাড়া ছিলেন অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র, তাঁর পুত্র-পুত্রবধূ আর একমাত্র নাতনীকে নিয়ে। আর ছিল প্রকাণ্ড একটা কুকুর। ওঁরা যেদিন প্রথম এলেন সেদিনটার কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে। সেদিনই লক্ষ্য করেছিল মিনতিকে—এগারো বছরের নেহাৎ বাচ্চা মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন কিন্তু। রঞ্জন সাহস করে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেনি। মিনতি ভর্তি হয়েছিল মেয়েদের স্কুলে। বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত আসত। দ্বিতলের বারান্দা থেকে একজন যে তাকে লক্ষ্য করে এটা সে নিশ্চয় জানত, কারণ ভুলেও উপর দিকে তাকিয়ে দেখত না। দুটি পরিবারে ঘনিষ্ঠতাও ছিল যথেষ্ট। গোকুলের পুত্রবধূ দ্বিতলে ওর মায়ের কাছে আসতেন, মিনতিও আসত মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গে। অথচ কী আশ্চর্য, দু-জনকেই দুজনে এড়িয়ে চলত। রঞ্জন লক্ষ্য করত, পাড়ার আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে প্রয়োজনে মিনতি কথা বলে; পূজা প্যান্ডেলে ওকে বাবলু-সুখেনের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছে। কী জানি কেন, এক ছাদের নিচে বাস করেও মেয়েটা কোনদিন ওর সঙ্গে কথা বলেনি। আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলের এ-জন্য আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে দোষ দেওয়া যায় না। সে কোনদিন ভেবে দেখেনি, ব্যাপারটা উল্টো দিক থেকেও সত্য। এক ছাদের নিচে বাস-করা একটা বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে সে-ও তো এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতে

পারতো! আত্মসম্মানে আঘাত তো ও-পক্ষেরও লাগতে পারে? এ-কথাটা সে-বয়সে তার খেয়াল হয়নি—সে এমন ভাব দেখাতো যেন খেয়ালই নেই, একতলার ভাড়াটে বাড়িতে বেণী-দোলানো একফোঁটা একটা মেয়ে ক্লাস সেভেন না এইটে পড়ে।

বাবলু হয়তো কৌতূহলী হয়ে মাঝে মাঝে ওকে প্রশ্ন করত, এই রঞ্জু, তুই সিংহবাহিনীর সঙ্গে কথা বলিস্‌না কেন রে? ভাব নেই?

গোকুলচন্দ্রের পোষা কুকুরটা ছিল সিংহের মত। মিনতির ন্যাওটা। তাই বন্ধুমহলে মিন্টিকে সবাই ঠাট্টা করে বলত ঃ সিংহবাহিনী!

রঞ্জন বলতো, 'ভাব' আবার কী? এক বাড়িতে থাকি, ও আমাকে চেনে, আমিও ওকে চিনি। ব্যাস্! অত আদিখ্যেতা আমার নেই!

সুখেন ফোড়ন কাটত, তাতেই তো ভয় হয় কেলেঙ্কারিয়াস্ কিছু করছিস্ নাতো! অত লোক-দেখানো নির্লিপ্ততা কেন বাওয়া? সিক্কিং সিক্কিং...

রঞ্জন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিত ওদের। এ সব রসিকতা বরদাস্ত হত না।

এক-একবার ভাবতো, কথা বলে দেখলেই হয়—দেখাই যাক না, ও আলাপ করতে আগ্রহী কিনা। সিঁড়ির মুখে, সদর দরজায় আচমকা দেখা হত। দু-জনেই পাশ দিত! চমকে উঠত—অথচ সম্বোধনের বাধাটা কেউই অতিক্রম করতে পারত না। আচ্ছা, ও তো ঠিক চারটে দশে স্কুল থেকে ফেরে; ঠিক তখনই যদি রঞ্জন হঠাৎ ঘটনাচক্রে সদর দরজায় দাঁড়ায়? ওকে দেখে বলে, স্কুল থেকে ফিরছ বুঝি?

যা মুখফোঁড় মেয়ে! হয়তো জবাবে বলবে, না গঙ্গাস্নান করে!

হ্যাঁ, মুখফোঁড়া বাবলু-সুখেন দুজনেই বলে, সিংহবাহিনী কথার পিঠে কথা বলায় ওস্তাদ!

তারপর একদিন আলাপ হল। নিতান্ত অ-রোমান্টিক পরিবেশে!

কলিং বেল বাজতে রঞ্জন উঠে গিয়েছিল সদর দরজা খুলে দিতে। মনে আছে, ছুটির দিন, হয়তো রবিবার। বাপি বাড়িতে। সকালবেলা। বাপি দক্ষিণের বারান্দার ইজিচেয়ারে খবরের কাগজ পড়ছেন; মা রান্নাঘরে। দরজাটা খুলে দেখে একতলার সেই সিংহবাহিনী! আজও স্পষ্ট মনে আছে দৃশ্যটা। ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে। মাথার চুল খোলা। রঞ্জনকে দেখে একটু হকচকিয়ে যায়। তারপর সামলে নিয়ে বলে, দাদু পাঠিয়ে দিলেন।

ওর হাতে একটা খাম। বুঝতে অসুবিধা হল না, মাসের এটা প্রথম সপ্তাহ। অর্থাৎ বাড়ি ভাড়ার টাকা। সেই আলাপই হল, অথচ একটা বিশ্রী অ-রোমান্টিক পরিবেশে! হাত বাড়িয়ে খামটা নিল। বললে, ও!

পুরো দশ-সেকেন্ড দুজনেই চুপচাপ। চৌকাঠের দু-প্রান্তে দুজন। শেষ পর্যন্ত রঞ্জনই মরিয়া হয়ে বলে বসল, ভিতরে আসবে?

বলেই খেয়াল হল—ওর বাক্যটা প্রশ্নবোধক চিহ্নে শেষ হওয়াটা ঠিক হয়নি। ওর বরং বলা উচিত ছিল ঃ ভিতরে এস না।

মেয়েটি জবাবে বললে, না! আপনি টাকাটা বরং গুণে দেখুন।

রঞ্জন হেসেই বলেছিল, গুণে দেখার কী আছে? তোমার দাদুই তো গুণে দিয়েছেন।

—তা হোক।

মেজাজের ব্যারোমিটারে পারদ উর্ধ্বগামী। মেয়েটা কী বলতে চায়? রঞ্জন ঐ খাম থেকে দু-খানা নোট হাতাবে? পরে বলা হবে ঃ গুনতিতে কম ছিল! কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বলে, কেন বলতো?

—সেটাই নিয়ম। টাকা গুণে নিতে হয়।

ব্যাস্! মেজাজ সপ্তমে। রঞ্জন শ্লেষ মিশিয়ে বললে, তাই বুঝি? দুদিন পরে যখন বিয়ে হবে তখন বরের কাছ থেকে মাসকাবারি টাকা গুণে নেবে?

উড়ন-চুবড়িতে যেন আগুনের স্পর্শ। মেয়েটা ছিটকে সরে গেল এক পা। এতক্ষণে সিংহবাহিনী হয়ে বললে, আপনি ইতর!

চেঁচামেচিতে মা বের হয়ে এসেছে রান্নাঘর থেকে ঃ কী রে? ও মা, মিন্টি কখন এলি?

রঞ্জন খামটা মায়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, ভাড়ার টাকাটা ঐ সিংহবাহিনীর সামনে গুণে নিও—হাত-সাফাই কর না!

মা তো তাজ্জব! কিছু বলার আগেই রঞ্জন হাওয়া।

সেই ওদের প্রথম সাক্ষাৎ। পরে রঞ্জন বুঝেছিল, দোষটা তারই। মেয়েটা এমন কিছু অপমানকর কথা বলেনি। অহেতুক কড়া কথা না বললেই হত। আসলে ওর রাগ হয়েছিল মেয়েটার উপর নয়, ভাগ্য-দেবতার উপর। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটাতে অমন টাকা-পয়সার ভেজাল ঢুকে যাওয়ায়! ভুলটা শুধরে নেবার সুযোগ হয়ে গেল অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে। মা পৌষপার্বণের পিঠে ভাজছিল; হঠাৎ বললে—এই পাত্রটা একতলার মাসিমাকে দিয়ে আসবি খোকা?

রঞ্জন জানত, এ-জাতীয় আদান-প্রদান প্রায়ই হয়ে থাকে। একতলার পায়েস দোতলায় আসে, দোতলার মালপোয়া একতলায় যায়। গোকুল-পিঠের বাটিটা নিয়ে রঞ্জন নেমে গিয়েছিল নিচে। ঘটনাচক্রই বলতে হবে—কলিং বেল বাজাতে ডেভিলের ঘেউ ঘেউ অগ্রাহ্য করে দরজা খুলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মিনতি। কনভার্স থিয়োরেম। এবার ও সিঁড়ির চাতালে, চৌকাঠের এ-পারে, মেয়েটি ওপারে। একই ভঙ্গিতে রঞ্জন পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে বলেছিল, মা পাঠিয়ে দিলেন।

মেয়েটি সপ্রতিভের মত বললে, ও! পৌষপার্বণের পিঠে বুঝি?

—হ্যাঁ! কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ!

—সর্বনাশ! কার আবার সর্বনাশ!

—আমার! সামনে পরীক্ষা!

মিনতি কিন্তু সে-ভুল করেনি। প্রশ্নবোধক চিহ্নে শেষ করেনি পরবর্তী বাক্যটা। বলেছিল, সিঁড়ির মধ্যে কেন? ভিতরে আসুন না?

গেলেই হত; কিন্তু মুখ-ফসকে বেরিয়ে গেল, না থাক।

—কেন? ডেভিলের ভয়ে? ও কিছু বলবে না। আমি যে সিংহবাহিনী।

—জানি! সেজন্য নয়। সামনে পরীক্ষা।

—ও! তবে থাক!

আবার পুরো দশ-সেকেন্ড দুজনেই চুপচাপ। শেষে রঞ্জন মরিয়া হয়ে বললে, গুণে নাও!

—গুণে নেব? কী গুণে নেব?

—বারোটা পিঠে আছে! গুণে নেওয়াই নিয়ম।

খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। কী মিষ্টি হাসি ওর। বলে ঃ তাই বুঝি? দুদিন পরে যখন বিয়ে হবে তখন বউকে নিশ্চয় মাসকাবারি টাকা গুণে নিতে বলবেন!

রঞ্জনও হেসে ফেলে। বলে, এ-কথার জবাবে আমার যা বলার কথা, তা আমি বললাম না কিন্তু!

—কী আপনার বলার কথা?

—আমি বলতে পারতুম—'তুমি ইতর!'

আবার খিলখিলিয়ে হাসি! বললে, তাহলে কী বলবেন?

ইচ্ছে করে বলেনি। নেহাৎ মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা। বস্তুত ও স্বেচ্ছায় বলেনি—ভিতর থেকে কে যেন ওর কানে-কানে 'প্রম্পট্' করল! রঞ্জন 'রিপীট্' করল শুধু ঃ তুমি সুন্দর!

মনে হল কথা নয়, এক মুঠো আবীর বুঝি ছুঁড়ে মেরেছে!

—সেই শুরু। তারপর অতিক্রান্ত-কৈশোর ওরা দুজনে সকলের অগোচরে কেমন করে তিল তিল

করে গড়ে তুলেছিল একটা গোপন দুনিয়া তা শুধু ওরা দুজনেই জানে। বাইরের পৃথিবী সে-কথা জানতে পারেনি। সুখেন তখনও বলত, আয় না একদিন, সিংহবাহিনীকে ডেকে তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। রঞ্জন একই ভঙ্গিতে নির্লিপ্ততার ভান করে বলত ঃ দায় পড়েছে আমার।

এমনকি ডেভিল ছাড়া বাড়ির লোকেরাও জানত না। জানত না যে, ওদের দুজনের ভাব হয়েছে, আড়ালে আবডালে দুজনে বকম-বকম করে—সিঁড়ির কোনায়, চিলে কোঠায়; এমনকি কচিৎ কখনও ক্লাস পালিয়ে ম্যাটিনির সিনেমাতেও। ঠিক চারটের সময় রঞ্জন গিয়ে হাজির হত ওদের স্কুল গেটের অদূরে। তারপরে ঘুর পথে দুজনে বাড়ি ফিরত, অনেকটা আগুপিছু করে।

মনে পড়ছে সেই দুর্ঘটনার কথাও। সিঁড়ির মধ্যে ওদের দুজনকে আবিষ্কার করে অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সুইচ জ্বেলে তিনি যেন ভূত দেখলেন ঃ এ কি! কী করছিস তোরা ওখানে? অন্ধকারের মধ্যে?

মিনতি ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। রঞ্জন পালাতে পারেনি। আত্মসম্মানে বেধেছিল তার।

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরেই মিনতির বাবা কাশীতে চলে যান।

মা তখনই আন্দাজ করে। হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।

সবটা বুঝতে পেরেছিল যেদিন কাশীর বাড়িতে ডাকাতি হবার খবরটা এল। গোকুলচন্দ্র বজ্রাহত হয়ে গেলেন। রঞ্জনই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল কাশীতে। ফিরে এল তিন দিন পরে। মিনতির মায়ের দেহ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করে। বৃদ্ধ যেন পাষাণ হয়ে গেলেন। তাঁর আঘাতটার তবু অর্থ হয়—একমাত্র পুত্রবধূ। আর একমাত্র নাতনী। কিন্তু রঞ্জন? প্রতিবেশী পরিবারের মর্মান্তিক আঘাতে কে না আহত হয়—কিন্তু এ কী! রঞ্জন যেন পাষাণ হয়ে গেল। তখন তার মনের অবস্থা এমন যে, কে-কী ভাবছে তা বুঝতে পারত না। তখনই বুঝতে পেরেছিল মা।

কিন্তু সে তো বার-চৌদ্দ বছর আগেকার কথা। সব শোকই সময়ে মানুষে সহ্য করে। রঞ্জনও করেছে। সে হাসে, খেলে, গান গায়, সিনেমা দেখে—কিন্তু তার যৌবনে দ্বিতীয়বার আর বসন্ত আসেনি। ও কিছুতেই ভুলতে পারেনি তার সিংহবাহিনীর সেই বিদায় বেলার প্রতিশ্রুতি ঃ কথা দাও। যত যাই হোক তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে?

বাহুবন্ধন দৃঢ়তর করে রঞ্জন বলেছিল, ভয় তো সেদিকে নয় মিন্টি, ভয় তোমার তরফে। মাসিমা আর মেসোমশাই যদি তোমার অন্য কোথাও বিয়ের ঠিক করেন?

—আমি কিছুতেই রাজী হব না। দরকার হলে সব কথা মাকে খুলে বলব।

—তাই বল। আমিও বলব। মাকে। তোমার দাদু তো কিছুটা জানেন—

—হ্যাঁ। স্বচক্ষেই তো দেখেছেন সেদিন!

—তোমাকে বকাবকি করেননি?

—না। তোমাকে?

—বিশেষ কিছু নয়। উনি ভেবেছেন, এ আমাদের ছেলেমানুষী।

সেই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। তারপর আর দুজনের দেখা হয়নি। পত্র-বিনিময়ও নয়। দু-পক্ষের কেউই সাহস পায়নি চিঠি-পত্র লিখতে।

আশ্চর্য! সেই মিনতি আজ এতদিন পরে, চৌদ্দ বছর পরে, এসে দাঁড়ালো শাঁখারিপাড়া লেনের বাসায় অথচ তার রঞ্জনদাকে চিনতে পারল না! কিছুই তার মনে নেই! মায়া, শেফালী, বাবলু, সুখেন—কারও কথা তার মনে পড়ে না।

তাই রঞ্জন আজ বাড়ি ফিরতে ইতস্তত করছিল। সে জানত, নিশ্চিত জানত—যে কথাটা আজ চৌদ্দ বছর ধরে সঙ্গোপনে রেখেছে, ওর মা আজ তাই জানতে চাইবে। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। খোকার ধনুর্ভঙ্গপণ ভাঙা যায় কিনা পরখ করতে চাইবে।

কী বলবে রঞ্জন?

টুকটুক করে হার্ডল-রেসের সব কয়টা বেড়াই নির্বিঘ্নে ডিঙিয়ে আসছিলেন, হোঁচট খেলেন একেবারে শেষ লেংথে! সবাই মেনে নিল লছমীকে—মিনতি হিসাবে, কেউ কেউ দর্শনমাত্রেই। নিল না মাত্র দু-জন। এবং মোক্ষম দু-জন। স্বয়ং গোকুলচন্দ্র এবং তাঁর পেডিগ্রিড কুকুর ঃ ডেভিল।

ডেভিল নিশাচর। দিনের বেলা মোটা চেন দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়। বাগানে তার নির্দিষ্ট ঘরে। 'দুর্লভ-স্মৃতিমন্দিরের' মুখোমুখি। ঐ স্মৃতিমন্দিরটার কথা বলা হয়নি। বাগানের একান্তে গোকুল একটি ঘর তুলেছিলেন। সেটাই ওঁর গবেষণাগার। সেখানে বই, বই আর বই। কাঠের আলমারির মাঝখানে একটা মজবুত গডরেজের আলমারি। তাতে রাখা ছিল ওঁর গবেষণার মূল দলিলপত্র। 'পেস্ট-কনট্রোল সার্ভিস' থেকে প্রতি মাসে তাতে কীটনাশক 'স্প্রে' করে যায়। ঐ ঘরের পাশেই ছাতিমতলায় সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো চত্বর। সেখানে বংশের আদিপুরুষ গোকুলের প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্রের নামে একটি শ্বেতপাথরের স্মৃতি-ফলক। সেটি পাঠ করলে জানা যায়—দুর্লভচন্দ্রের জন্ম 1825 সালে এবং তিরোধান 1869 সালে। ঐ স্মৃতিমন্দিরের পাশেই ডেভিল-এর কেনেল।

অবিনাশ ও আরাধনাকে ডেভিল ভালমতই চেনে, কিন্তু ওদের সঙ্গে লছমীকে ঢুকতে দেখে সে যে তাণ্ডবের গর্জন শুরু করল তা আর থামতেই চায় না। অবিনাশের মনে হল, মানুষের চোখে ধুলো দিলেও ঐ জানোয়ারটার চোখে তিনি ধুলো ছড়াতে পারবেন না কোনদিনই। শিবনাথ-দুর্গামণি ওকে কিন্তু মেনে নিল। দুর্গামণি তো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল লছমীকে ঃ এতদিনে আমাদের কথা মনে পড়ল হতভাগী।

গোকুল কিন্তু সংবাদটা শুনে গুম মেরে গেলেন। না হাসি, না কান্না। না আবাহন, না বিসর্জন। ঘরের প্রবেশপথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা—শিবনাথ, দুর্গামণি, অবিনাশ, আরাধনা, গিরিনবাবু। লছমী যা অভিনয় করল তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন অবিনাশ। সে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল বৃদ্ধের পাঁজর-সর্বস্ব বুকে। তারপর তার সে কী ফুলে ফুলে কান্না। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অবিনাশ! এমন বুকফাটা কান্না কেমন করে কাঁদছে মেয়েটা? হয়তো অন্ধ বৃদ্ধের কাছে ঐ কান্নার নৈবেদ্যে সে বলতে চাইছে—তুমি আমাকে ক্ষমা কর। বিশ্বাস কর, তোমার সম্পত্তির লোভে আমি আসিনি। তোমার ঐ পাঁজর-সর্বস্ব বুকে আশ্রয় নিতেই এসেছি শুধু। আমি প্রবঞ্চক নই—আমি এক হতভাগিনী।

বৃদ্ধ যেন পাষাণ হয়ে গেছেন। হাতখানাও রাখলেন না ওর মাথায়।

অবিনাশ কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, মিন্টু ফিরে এসেছে চৌধুরী মশাই। আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন।

বৃদ্ধ না রাম, না গঙ্গা!

আরাধনা ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে ধরে তুললেন লছমীকে। বললেন, উনি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। ওঁকে একটু সামলাতে দে মিন্টু। আয় উঠে আয়।

লছমী কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাতও করল না। নাট্যসম্রাজ্ঞীর মত আর্তনাদ করে ওঠে—দাদু, তুমি বিশ্বাস করছ না! আমি মিন্টু, তোমার সোনামণি।

ওরা ধরাধরি করে ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল। একতলার বাগানে তখনও ডেভিল তীব্র প্রতিবাদ করে চলেছে ঃ তোমরা বিশ্বাস কর না। ও প্রবঞ্চক। ও ঠগ্।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। এ ঘরে তখন জমাটি আড্ডা। অবিনাশ সবাইকে সবিস্তারে শোনাচ্ছেন—কেমন করে তিনি হারানো মেয়ে খুঁজে পেলেন। হঠাৎ শিবু এসে বলল, আপনাদের দুজনকে বুড়োকর্তা ডাকতিছেন!

গল্পে ছেদ পড়ল। বুড়ো কর্তার তাহলে এতক্ষণে 'শান' হয়েছে। দুজনে উঠে এলেন এ ঘরে। গোকুল বললেন, বস তোমরা দুজন। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোকুল বললেন, এবার বল, কোথায় জোগাড় করলে ওকে?

—আপনি বিশ্বাস করছেন না,—ঐ আমাদের মিন্টি?

—বিশ্বাস যাতে করতে পারি তাই তো তোমাদের গল্পটা শুনতে চাইছি। এমন একটা গল্প শোনাও যা অতি-নাটকীয় না মনে হয়, আবার আষাঢ়ে বলেও না মনে হয়। নাও শুরু কর।

অবিনাশ পনের দিন ধরে মনে মনে যা মহড়া দিয়ে রেখেছেন তাই গড় গড় করে বলে গেলেন। দীর্ঘ কাহিনী শেষ হলে গোকুল শুধু বললেন, সুন্দর গল্পটা। তবে যাবার সময় মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, না হলে ডেভিল আমাকে ঘুমোতে দেবে না।

অবিনাশের হাতে বন্দুক থাকলে হয়তো ডেভিলকে গুলি করে মারতেন। ঢোক গিলে বলেন, চৌধুরী মশাই, বলা সহজ, কিন্তু কোথায় ওকে নিয়ে যাব বলুন? আমার বাড়িতে? নাকি রাজগীরে তার পালক-পিতার আশ্রয়ে?

—সে তোমার মাথাব্যথা।

হঠাৎ দ্বারের কাছ থেকে শিবনাথ বলে ওঠে, তাহ'লে ঐ সঙ্গে আমাদের দু-জনকেও বিদায় দ্যান কর্তা। আপনে অন্য লোক দেখুন।

বৃদ্ধ ধমকে ওঠেন, তোকে কে কথা বলতে ডেকেছে?

—কেউ ডাকে নাই, কর্তা! আমি চাকর, আপনে মনিব! তবু আমি মনিষ্যি তো বটে! আপনে চোখে দেখেন না, আমরা যে জলজ্যান্ত দেখছি মিন্টি-মাকে।

বৃদ্ধ এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলেন, ঠিক আছে। কী নাম মেয়েটার?

—মিনতি, মিন্টি!

—আহ! সে-কথা বলছি না। ওর বাপ, সেই পাণ্ডা ওকে কী নামে ডাকে?

—আজ্ঞে লছমী।

—ঠিক আছে! লছমী এ বাড়িতেই থাকবে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল অবিনাশের।

সন্ধ্যার পর শিবনাথ আর দুর্গামণি আবার এল দরবার করতে। শিবু বলে, আপনি তো চোখে দেখেন না, গায়েও হাত বুলালেন না। তাহলে কেমন করে জানলেন...

গোকুল বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আমি চোখে দেখি না ঠিকই—সে জন্যে তিন তিনটে কেষ্টর জীব পুষেছি। একটা ষাঁড়, একটা গরু আর একটা কুকুর। তিনটের মধ্যে ঘ্রাণশক্তি আর বুদ্ধি আছে ঐ কুকুরটারই। সে আমাকে বলে দিয়েছে।

দুর্গামণি বলে, কিন্তু ওর মুখখানা দেখলে...

—জানি। মুখখানা একরকম না হলে অবিনাশ এতবড় দুঃসাহস দেখাতো না!

বস্তুত ওরা দুজন জানে না গোকুল এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। পূর্বদিন সন্ধ্যায় রঞ্জন এসেছিল 'দুর্লভ নিকেতনে'। গোকুল সব কথা তার কাছে শুনেছেন। আজ সকালে লছমীকে নিয়ে যে অনিশ আসছে তাও জানতেন। গোকুল বলেছিলেন, আশ্চর্য! সে তোমাকে চিনতেই পারল না?

—না, স্যার। ওর সব পূর্বস্মৃতি নাকি হারিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, কিন্তু তোমার নিশ্চয় মনে আছে রঞ্জন—আজ থেকে চৌদ্দ-পনের বছর আগে আমি একদিন তোমাকে ডেকে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছিলাম?

রঞ্জন চুপ করে বসে থাকে। জবাব দেয় না।

একটা হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা টেনে নিয়ে অন্ধ বলেন, ভুল বুঝো না আমাকে। একটা বিশেষ কারণে ও-কথা বললাম। মেয়েরা জীবনে সব কিছু ভোলে, ভুলতে পারে না একটি জিনিস—তার জীবনের প্রথম প্রেমকে। তোমাদের দুজনকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলাম আমি সিঁড়ির মধ্যে। সে ঘটনার কথা এ দুনিয়ায় জানে শুধু তিনজন—তুমি, আমি আর সেই হতভাগী! অথচ দেখে নিও, কাল সকালে এসে সে এ বাড়ির সবাইকে চিনতে পারবে। তার কারণটা কী জান? এদের সকলের ফটো আছে অবিনাশের অ্যালবামে। তোমার ফটো নেই। তোমার সঙ্গে সোনামণির যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার কথা অবিনাশ জানে না!

বৃদ্ধ জানতে পারেননি—তাঁর শ্রোতা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল শুনে। তাহলে কি ঐ মেয়েটা সেই সিংহবাহিনী নয়! প্রবঞ্চক! কাল কি সেইজন্যই মেয়েটা তার রঞ্জনদাকে চিনতে পারেনি! কিন্তু ওর মুখটা, ওর চাহনিটা, সেই নিচেকার ঠোঁট কামড়ানোর ভঙ্গিটা—আশ্চর্য!

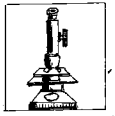

রঞ্জন স্থির থাকতে পারেনি। পরদিনই আবার এসে উপস্থিত হল দুর্লভ-নিকেতনে। শিবনাথ ওকে বৈঠকখানায় বসিয়ে বললে, বুড়োকর্তাকে—

—না। মিনতিকে বরং বল, তার রঞ্জুদা এসেছে।

মিনিটপাঁচেক পরে লছমী এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

—এস মিনতি। বস! তোমার সঙ্গে কথা আছে। 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে কর না। তোমাকে আমি 'তুমিই' বলতাম।

মেয়েটি চোখ তুলে একবার তাকায়। বলে, না, মনে কিছু করিনি। বলুন—

—কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন করে গল্প করব? বস?

লছমী মেঝের উপরেই বসে পড়ে। রঞ্জন বলে, ও কী! মাটিতে কেন? সোফায় বস।

লছমী নতনেত্রে বলে, সে অধিকার আমি পাইনি। আমি আশ্রিত মাত্র। দ্বিতীয় কথা, এ-বাড়িতে আমার পরিচয়—আমি 'লছমী'। আমাকে সেই নামেই ডাকবেন।

রঞ্জনের বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। ঐ মেয়েটিকে—না, ঐ রকম দেখতে একটি মেয়েকে সে জীবনে প্রথম ভালবেসেছিল। গোকুলচন্দ্রের ভাষায় 'কাফ্-ল্যভ'! তা হোক, কিন্তু আজও তো সে ঐ মুখখানা ভুলতে পারেনি। রঞ্জন বলে, আর সকলে তোমাকে 'লছমী' বলে ডাকলেও তুমি অন্তত আমার কাছে—মিনতি। মিন্টি। সিংহবাহিনী!

মেয়েটি আবার চোখ তুলে তাকায়। বলে, সিংহবাহিনী! তার মানে? আপনার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

—তুমি ভুলে গেছ, তাই তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। তের বছরের সেই মিনতির সঙ্গে এককালে আমার গভীর ও নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

—কিন্তু আমার তো সে কথা মনে পড়ে না?

—কিন্তু আমিও যে সে কথা ভুলতে পারছি না?

লছমী হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, একটা কথা বলব বাবুজী?

—বাবুজী! ...আচ্ছা, বেশ বল?

—অবিনাশবাবু যে প্রয়োজনে আমাকে এখানে এনে ফেলেছেন, আপনিও কি সেই প্রয়োজনে আপনার সিংহবাহিনীর সঙ্গে পাতানো সম্পর্কটা লছমীর সঙ্গে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন?

রঞ্জন গম্ভীর হয়ে বললে, বুঝলাম না!

—না বোঝার কী আছে? বুড়োর অনেক টাকা! কিন্তু আপনি ভুল করছেন, বাবুজী! বুড়োবাবু লছমীকে তাঁর যক্ষের ধন দিয়ে যাবেন না। তিনি তাঁর সোনামণির পথ চেয়ে বসে আছেন!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ায় রঞ্জন। বলে, একটা কথা তাহলে তোমাকে বলে যাই, লছমী। তুমি যেই হও, আমার গোপন কথাটা যখন শুনে ফেলেছ তখন সবটাই শুনে যাও। মিনতিকে যখন আমি ভালবেসেছিলাম সে তখন বড়লোকের নাতনী ছিল না। আর তুমি যদি সেই মিনতি না হও তাহলে আর কোনদিন আমার সামনে এসে দাঁড়িওনা! বুঝলে?

—আর আমি যদি সেই মিনতি হই?

রঞ্জন জবাব দিতে পারে না। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। কে ও? লছমী, না মিনতি? লছমী বলে, বলুন বাবুজী! আমি যদি সেই মিনতিই হই, অথচ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হই, তখন কি আপনার সামনে এসে দাঁড়াব?

রঞ্জন ওর হাতখানা তুলে নেয়। বলে, সত্য করে বল—তুমি কে?

লছমী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, এটা তো আমার প্রশ্নের জবাব নয়, বাবুজী!

শিবনাথ এসে বলে, বুড়ো-কর্তা আপনারে ডাকতিছেন।

বৃদ্ধের ঘরে ঢুকতেই গোকুল বলেন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এসে বস।

রঞ্জন আদেশ পালন করলে বৃদ্ধ বললেন, তুমি ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে পারবে রঞ্জন? মেয়েটাকে আমি ঘরে ঢুকতে দিই না, কিন্তু সে আর সকলেরই হৃদয় জয় করে নিয়েছে। তুমি রাজগীরে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসতে পার?

রঞ্জন বললে, সেই কথা বলতেই এসেছিলাম আজ। আমি তদন্ত করে দেখতে চাই।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বলেন, আর একটি কথা। মেয়েটি যদি মিনতি হয়, তাহলে ...মানে পূর্বকথা স্মরণ করে প্রশ্ন করছি, তুমি কি আমার কাছে কোন বিবাহ-প্রস্তাব পেশ করবে?

অন্ধের কাছে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। রঞ্জন বললে, স্যার, ঠিক জানি না—ও যদি মিনতি নাও হয়, তবু হয়তো আমি ওকে বিবাহ করতে চাইব।

গোকুল স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটু ভেবে নিয়ে বলেন, এতবড় কথাটা যখন তুমি বলতে পারলে রঞ্জন, তখন রাহা-খরচের কথা তুলব না। তুমি রাজগীরে গিয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে খোঁজ নিয়ে এস। তুমি বুদ্ধিমান—এ কথা বলা বাহুল্য যে, রামপ্রসাদ শর্মা অবিনাশের স্টেটমেন্ট 'করোবরেট' করবে। সেটুকু ব্যবস্থা অবিনাশ নিশ্চয় করেছে।

রঞ্জন মাথা নেড়ে সায় দেয়। খেয়াল করে না, বৃদ্ধ ওর মাথা নাড়া দেখতে পাচ্ছেন না। গোকুল আবার বলেন, আরও একটা কথা। তোমাকে এর আগে একদিন বলেছিলাম, আমি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—ঐ যাকে ভুল করে বলা হয়, 'সিপাহী-বিদ্রোহ'—তার উপর গবেষণা করছিলাম। কাজটা শেষ হয়নি। মূল দলিলপত্র সব রাখা আছে দুর্লভ-নিকেতনের লোহার আলমারিতে। তুমি ইতিহাসের ছাত্র, আমাকে কথা দাও—আমার মৃত্যুর পর ঐ কাজটা তুমি শেষ করবে?

রঞ্জন শুধু বললে, এ তো অনুরোধ নয় স্যার, আশীর্বাদ। এ আমার সৌভাগ্য।

বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বলেন, সব কথা তোমাকে এখনই বলতে পারছি না; কিন্তু আমার এ-কথাটা কখনও ভুলো না ঃ ঐ কীটদষ্ট নথিপত্রের মধ্যেই আছে আমার গুপ্তধনের চাবিকাঠি! তুমি খুঁজে নিও। বুঝলে?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রঞ্জন দেখে লছমী দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে।

আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিয়ে রঞ্জন বললে, কলকাতায় কী কী দেখলে?

—কিছুই দেখিনি বাবুজী! কে আমাকে কী দেখাচ্ছে বলুন?

তা বটে। যতদিন না ওর পরিচয়টা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন কে-ই বা ওকে নিয়ে ঘুরবে? প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললে, কলকাতায় পৌঁছে রাজগীরে চিঠি দিয়েছ?

—না।

—কেন? তোমার সেই বাবা ব্যস্ত হয়ে আছেন নিশ্চয়! একটা পৌঁছানো সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

—উচিত তো অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু খাম-পোস্টকার্ড না থাকলে কী করে চিঠি লেখা যায় সে-কথা তো আমাকে কেউ বলে দেয়নি।

—তোমার ...তোমার হাত-খরচা পয়সা কিছু নেই?

—কে দেবে? বুড়োবাবু তো আমাকে মানতেই চান না। কার কাছে চাইব?

রঞ্জন বিনা বাক্যব্যয়ে পাঞ্জাবির পাশ পকেটে হাত চালিয়ে দিল। একটাকার খান কয়েক নোট আর এক মুঠো খুচরো ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, নাও ধর।

—আপনি কেন দেবেন?

—সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে! ধর।

—কত আছে ওতে?

—দেখলেই তো, আমি গুণে দেখিনি।

লছমী একদৃষ্টে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। তারপর হেসে বললে, না গুণে কাউকে টাকা পয়সা দিতে নেই, আপনি জানেন না!

রঞ্জন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, না, জানি না। কেন বল তো?

—সেইটেই নিয়ম!

কথার পিঠে কথা। অবাক হবার কী আছে? রঞ্জন কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে যায়।

লছমী একটু হেসে বললে, কী হল? আপনি তো কিছু বললেন না, বাবুজী!

রঞ্জন সম্বিত ফিরে পায়। বলে, কী বলব?

—অন্তত একটা ধমকও তো দিতে পারতেন আমাকে। বলতে পারতেন—'তুমি ইতর!'

রঞ্জন বজ্রাহত!

লছমী কিন্তু আর দাঁড়ালো না। ওর অবশ হাত থেকে এক-মুঠো খুচরো অসংকোচে গ্রহণ করে চলে গেল অন্দরমহলে।

সাতদিনের মাথায় রাজগীর থেকে ফিরে এসে রঞ্জন উপস্থিত হল দুর্লভ-নিকেতনে। এবার দরজা খুলে দিল লছমী। রঞ্জনকে দেখে বিচিত্র হাসল। বললে, আসুন! আপনাকে রোজই আশা করছি।

রঞ্জন ভিতরে এসে বললে, তাই নাকি? কেউ আমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে জানা থাকলে, আগে আসতাম। সে কথা নয়, কিন্তু তুমি এখানে কেন এসেছিলে 'লছমী'?

—লছমী! সিংহবাহিনী নয় তাহলে?

—না, মিস্টি নয়।

মেয়েটি চমকে ওঠে। রঞ্জন এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, ভুল ভুলই, —তোমাকে মিনতি মনে করে

অনেক প্রগলভতা আমি করেছি। সে জন্য আজ লজ্জা হচ্ছে। তোমার হচ্ছে কি না জানি না। সে যাক—তুমি এখন কী করবে?

লছমী নয়ন নত করল। অনেকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর যখন মুখ তুলল, তখন দেখা গেল ওর চোখের কোণায় জল টলটল করছে। বললে, আমি এখন কী করব তা বলছি; কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? সত্যি করে জবাব দেবেন?

—বল, কী জানতে চাও?

—ধরুন, আমি যদি সেই মিনতিই হতাম, এবং দাদুর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতাম, তাহলে আপনি কী করতেন?

রঞ্জন বলে, ও অবান্তর প্রশ্নের কী জবাব দেব? তুমি তো সেই মিনতি নও?

—নাই হই! তবু ...তবু আমার প্রশ্নের জবাবটা দেবেন?

—তোমার এ-প্রশ্নের জবাব তো আমি সেদিনই দিয়েছি, লছমী। মিনতিকে যেদিন আমি ভালবেসেছিলাম, সেদিন আমরা কিশোর-কিশোরী—সব কথা বুঝতাম না। কিন্তু সেদিন মিনতি বড়লোকের নাতনী ছিল না। তারপরের ঘটনা তো দেখতেই পাচ্ছ। তাকে ভুলতে পারলে এতদিনে আমি নিশ্চয় সংসার শুরু করতাম।

লছমীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। ঝুঁকে পড়ে বলে, তাহলে আর একটা কথাও বলে যান, বাবুজী! ধরুন আমি লছমীই, প্রবঞ্চক, ঠগ—এসেছি সম্পত্তির লোভে। আমার কথা থাক। কিন্তু আপনি হঠাৎ আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া সিংহবাহিনীর প্রতিমাটিকে আবিষ্কার করলেন একটা পচা নর্দমায়! একটা ঘৃণিত পরিবেশে! তার জরির সাজ খুলে গেছে! সে শুধু উলঙ্গই নয়, তার দেহ গলে গেছে, খড়-মাটি বেরিয়ে পড়েছে! তখন আপনি কী করতেন?

রঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। বলে, তোমার সঙ্গে প্রলাপ বকতে আমি আসিনি লছমী! আমি এসেছি অধ্যাপক গোকুলচন্দ্রকে তোমার সত্য পরিচয়টা জানিয়ে যেতে। ইতিমধ্যে আমি রাজগীর ঘুরে এসেছি। তোমার সব ছলনার অবসান ঘটেছে। সর, পথ ছাড়!

হঠাৎ শিউরে ওঠে লছমী। বলে, কী! কী জেনে এসেছেন আপনি?

—তোমার সব কথা! হাসপাতাল রেজিস্টারে তোমার জন্ম-ইতিহাস! তোমার মায়ের নাম...

থর থর করে কেঁপে ওঠে লছমী। একেবারে ভেঙে পড়ে। বসে পড়ে রঞ্জনের পায়ের উপর। অশ্রুআর্দ্র কণ্ঠে বলে, সব মিছে কথা রঞ্জুদা! সব মিথ্যা! আমি, আমি সেই মিন্টিই!

রঞ্জন ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে চলে যায়।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র বললেন, আমি এমনটিই আন্দাজ করেছিলাম। আমি যে জানি, অবিনাশ একটা প্রবঞ্চক। ঠগ! তোমরা সবাই ভুল করলেও ডেভিল ভুল করেনি। লছমীকে দেখলেই সে তাড়স্বরে ডাকতে থাকে। চেন ছিঁড়ে ফেলতে চায়!

রঞ্জন বলে, এখন কী করবেন স্যার? মানে ঐ মেয়েটাকে...

—তুমি কী পরামর্শ দাও?

—ওকে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দিন। মেয়েটাও ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিল!

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কী যেন ভাবেন। তারপর বলেন, একটা কথা তোমাকে বলি—তোমার বয়স কম, রক্ত গরম। কিন্তু আমি তো দুনিয়াদারী শেষ করে এসেছি। তুমি ঐ মেয়েটার উপর যতটা রাগ করছ, আমি ততটা করতে পারছি না। ভেবে দেখ—এ দুনিয়ায় মানুষের কাছে, সংসারের কাছে, সমাজের কাছে ও কী পেয়েছে? মানুষ হয়েছে ঐ শনিচরীর শনিদৃষ্টিতে—দু-বেলা দুমুঠো খেতেও হয়তো পায়নি। বিয়ে হল, অথচ স্বামী নিল না। বাপ তার রক্ত জল করা টাকায় গহনা বানিয়ে দিল—সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওর শ্বশুর। বিনিময়ে ওর মাথায় চাপিয়ে গেল মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা! এভাবেই পূর্ণ যুবতী হল সে—তারপর ওদের সংসারে এল অবিনাশ। লোভ দেখালো মেয়েটাকে। জীবনের পঁচিশটা

বছর যে মেয়েটা স্নেহ পায়নি, ভালবাসা পায়নি, সখ-আহ্লাদের জিনিস তো দূরের কথা, ভরপেট খেতেই পায়নি—তার সামনে অবিনাশ মেলে ধরল বিরাট প্রলোভন। কলকাতা শহর একটি বিহারী যুবতীর কাছে স্বর্গরাজ্য। সেই স্বর্গরাজ্যের এক ধনীর নাতনী হবার লোভ দেখালো অবিনাশ। নিত্য নতুন শাড়ি-গহনা, মোটর গাড়ি! সিনেমা-থিয়েটার-নাচ-গান! মাথা ঘুরে গেল মেয়েটার! কিন্তু রঞ্জন, সে জন্য সবটুকু শাস্তি কি ঐ হতভাগীরই পাওনা?

রঞ্জন স্থির হয়ে বসে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর নিচু হয়ে প্রণাম করল বৃদ্ধকে। বললে, এজন্যেই শাস্ত্রে গুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। আমি এভাবে ভেবে দেখিনি।

—না, মেয়েটাকে আমি খালি হাতে বিদায় দেব না। আফটার অল, হতভাগীকে দেখতে সোনামণির মত! —গলাটা ধরে এল বৃদ্ধের।

—বেশ তো। দেবেন তাকে কিছু টাকা।

—না! কিছু টাকা নয়, বেশ কিছু টাকা! সোনামণি আর ফিরে আসবে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি। তাহলে কার জন্যে এ কুবেরের ধন রেখে যাব আমি? তুমি এক কাজ কর। টেবিলের ড্রয়ারে আমার অ্যাড্রেস বইটা আছে। নিয়ে এস, দেখ ওতে 'বাসু প্রসন্নকুমার, বার অ্যাট-ল'-র ঠিকানা আছে। তাঁকে খবর দাও। আমাকে তিনি চেনেন। বল, কাল সকালে নয়টার সময় তিনি যেন অবশ্য-অবশ্য আসেন। আমি একটি উইল করব। আমি অন্ধ, সই যাতে 'ভ্যালিড' হয়, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। হয়তো টিপছাপ দিতে হবে। তুমিও এস। অবিনাশকেও কাল বেলা দশটার সময় আসতে বল। সর্বসমক্ষেই আমি উইলটা করতে চাই।

রঞ্জন ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বিদায় হল।

সেদিনই সন্ধ্যা নাগাদ অবিনাশ এসে উপস্থিত। ঘটনাচক্রে লছমী তখন বাড়িতে একা। অন্ধ বৃদ্ধ অবশ্য আছেন দ্বিতলের ঘরে। ও ঘরে লছমীর প্রবেশ নিষেধ। লছমীকে দুটি আদেশ জারি করে রেখেছিল শিবনাথ—সে যেন বুড়োর ঘরে না ঢোকে; আর রাত দশটার পরে সে যেন বাগানে না নামে। ডেভিল আজ পনের দিনেও তাকে সহ্য করতে পারছে না। দূর থেকে ওকে দেখলেই গর্জন করতে থাকে। চেন ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

অবিনাশ যখন এলেন তখন অবশ্য ডেভিল চেন দিয়ে বাঁধা। লছমী দরজা খুলে দিয়ে বললে, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল—

অবিনাশ ওকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কথার জবাব দিলেন না। গটগট করে উঠে গেলেন দ্বিতলে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বলেন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—কে অবিনাশ? কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তো নয়। কাল সকালে আসতে বলেছিলাম।

—না হয় ক-ঘণ্টা আগেই এসেছি। এখন বলুন, কেন ডেকেছেন?

বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বলেন, দেখ অবিনাশ, তুমি বয়সে ছোট, সম্পর্কেও। তাই ক্ষমা আমি চাইব না, তুমি লজ্জা পাবে। আমি তোমাকে মিথ্যা সন্দেহ করেছিলাম বলে অনুতপ্ত, এই কথাটাই জানাতে ডেকে পাঠিয়েছি।

অবিনাশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বলেন, যাক! একটা পাষাণভার নামল আমার বুক থেকে। তাহলে লছমী যে মিনতি এটা মেনে নিচ্ছেন আপনি? কিন্তু কেমন করে বুঝলেন সে কথা?

—তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলাম। রঞ্জন আর মিনতির মধ্যে অনেক দিন আগেই একটা অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল। আমরা তখন শাঁখারীপাড়ার বাসায় থাকতাম। রঞ্জনই আমার সন্দেহ দূর করেছে। বুঝতেই পারছ তুমি—কিশোর-কিশোরী কী ছেলেমানুষী করে থাকে। লছমী সে সব কথা রঞ্জনের কাছে বলতে পেরেছে। রঞ্জন নিঃসন্দেহ—লছমী আর কেউ নয়, মিনতিই!

অবিনাশ আকাশ থেকে পড়লেন। তবে তিনি অভিজ্ঞ মানুষ; তৎক্ষণাৎ বুঝলেন রঞ্জনের পরিকল্পনা! ছেলেটি দুর্লভ সুযোগ পেয়ে 'নেপো'র ভূমিকায় দধিভক্ষণ-মানসে অবিনাশের আষাঢ়ে গল্পে রঙ চড়াচ্ছে! একটা ঢোক গিলে বললেন, রঞ্জন কি মিনতিকে বিয়ে করতে চায়?

—সে কথা বলাই বাহুল্য। ওদের বিবাহটা চুকে গেলে আমিও নিশ্চিন্ত! তখন আর এ যক্ষের ধন আমাকে পাহারা দিতে হবে না।

বৃদ্ধ অন্ধ,—না হলে দেখতে পেতেন অবিনাশের চোখ দুটো জ্বলছে। ডেভিলের চোখের মত। তবু কণ্ঠে মোলায়েম স্বর এনে অবিনাশ বলেন, যক্ষের ধন মানে? এ বসতবাড়ি ছাড়া আপনার তো আর বিশেষ কিছুই নেই?

—তুমি তা কেমন করে জানলে অবিনাশ? তুমি তো আর আমার কাগজপত্র হাৎড়ে দেখনি?

অবিনাশ দাঁতে দাঁতে চেপে বলেন, সোনা কিনে পুঁতে রেখেছেন?

হো-হো করে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ। বলেন, না অত বোকা আমি নই। যাক ও-কথা। কাল সকালে এস। আমি সর্বসমক্ষে উইল করব। তোমাকে সাক্ষী রাখতে চাই।

অবিনাশ নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বললেন, উইল করে কাকে কী দিচ্ছেন জানবার কৌতূহল আমার নেই। তবে উইল করার আগে আপনাকে একটা সংবাদ জানাতে চাই। কথাটা জরুরী। বস্তুত সেজন্যই আমি ছুটে এসেছি। শুনুন—আমি নিঃসংশয়ে জানতে পেরেছি, লছমী আপনার অপহৃতা নাতনী মিনতি নয়!

—তাই নাকি! তাহলে তো উইলের বয়ানটা বদলাতে হয়। সে-ক্ষেত্রে উইলে আমার ওয়ারিশকে নাতনী বলে উল্লেখ করাটা তো আইনত ঠিক হবে না।

অবিনাশ স্তম্ভিত হয়ে যান। বলেন, মানে? তা সত্ত্বেও আপনি ঐ প্রবঞ্চক মেয়েটিকে—

—হ্যাঁ, অবিনাশ। প্রবঞ্চনা তো সে করেনি। বেচারি ছিল অপরের হাতের পুতুল! আর তাছাড়া তুমি যে-কথাটা আমাকে বলতে এসেছ সেটাও আমার জানা আছে।

—কী কথা জানাতে এসেছি আমি? কী জানেন আপনি?

—জানি যে, লছমীর মায়ের নাম ফুলেশ্বরী। তার জন্ম পাটনার রেল হাসপাতালে। দোশরা ফেব্রুয়ারী 1948। আর ও হ্যাঁ, জন্ম সময়ে তার ওজন ছিল সাত পাউন্ড!

অবিনাশ ইতিপূর্বেই স্তম্ভিত হয়েছেন। এবার বজ্রাহত হয়ে গেলেন।

—কী হল? কথা বলছ না কেন অবিনাশ? ঐ কথাই তো জানাতে এসেছ?

আমতা-আমতা করে অবিনাশ বলেন, আপনি কেমন করে জানলেন?

—ভগবান যাকে অন্ধ করেন, তাকে একটা 'সিক্সথ্-সেন্স' দিয়ে থাকেন। শোননি?

বৃদ্ধ উৎসাহে উঠে বসেছেন। অবিনাশ মরিয়া হয়ে ওর বালিশের তলায় হাতটা চালিয়ে দেন। যা আশা করেছিলেন! চাবির থোকা! এর মধ্যেই আছে দুর্লভ-নিকেতনের সেই লোহার আলমারির চাবি! হঠাৎ খেয়াল হয়েছে ওঁর—কী মূর্খ উনি! সব হাৎড়ে দেখেছেন—দেখেননি ঐ আলমারিটা, যাতে মাসে মাসে কীট-নাশক স্প্রে করা হয়!

—কী হল? চুপ করে গেলে যে?

অবিনাশ উঠে দাঁড়িয়েছেন। বলেন, তার মানে সব জেনে-বুঝেও—শুধুমাত্র আমাকে বঞ্চিত করার জন্যই আপনি ঐ লছমীটাকে আপনার সব কিছু দিয়ে যাবেন?

—আবার 'লছমী' কেন অবিনাশ? মিনতিকে! অন্ধ বুড়ো মানুষ শেষ জীবনে একটা ভুলকে আঁকড়ে ধরে সান্ত্বনা খুঁজছে, কেন তাতে বাধা দিচ্ছ তুমি?

অবিনাশ ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তা হোক, অবিনাশের হাতে টর্চ ছিল। দ্রুতপায়ে উনি বাগানটা পার হয়ে চাবি হাতে এগিয়ে গেলেন ঐ দুর্লভ নিকেতনের দিকে। ডেভিল চেন-বাঁধা পড়ে আছে তার কেনেলে। একবার মুখ তুলে দেখল। অবিনাশকে দেখে ল্যাজটা নাড়ল। সিংহ শাবকের মত প্রকাণ্ড জন্তুটা তারপর নিশ্চিন্তে দুটি থাবায় মাথা রেখে চোখ বুজল।

লছমী ছিল তার একতলার ঘরে। অবিনাশকে বাগান পার হয়ে দুর্লভ নিকেতনের দিকে যেতে দেখল। পরমুহূর্তেই তার কানে গেল বৃদ্ধের চীৎকার ঃ শিবু! শিবনাথ! গিরিন! দুর্গা!

ওঁর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল লছমী। এমন পাগলের মত ডাকছেন কেন উনি? দ্রুতপদে সে উঠে এল দ্বিতলে। দ্বারের বাইরে থেকে বলল, কী হয়েছে? শিবুদা নেই। বাড়িতে কেউ নেই!

—লছমী! তুমি ...তুমি খুঁজে দেখ তো। বালিশের নিচে আমার চাবির থোকাটা ছিল।

লছমী বিছানা হাৎড়ে বললে, নেই তো! এখানেই ছিল?

—অবিনাশ কোথায়? চলে গেছে?

—না উনি বাগানে নেমে গেলেন। ঐ স্মৃতি-মন্দিরের দিকে!

দাঁতে দাঁত চেপে বৃদ্ধ গর্জন করে ওঠেন ঃ শয়তান! ...এত বড় শয়তান!

—কেন? কী হয়েছে দাদু?

—ঐখানেই যে লুকানো আছে আমার বুকের পাঁজর ক'খানা—

বৃদ্ধ ঘর ছেড়ে হাৎড়াতে হাৎড়াতে বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। বলেন, নেই? কেউ নেই? গিরিন, দুর্গা, শিবু?

লছমী এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। বৃদ্ধ বারান্দার রেলিং ধরে ধরে এগিয়ে আসেন। চিৎকার করে ডাকলেন ঃ ডেভিল! লিস্ লিস্!

বাঘের মত লাফিয়ে উঠল ডেভিল। এ ডাক বহুদিন শোনেনি সে! গর্জন করে উঠল প্রভুভক্ত গ্রেট-ডেন। অবিনাশ একবার চোখ তুলে দেখল। না! ডেভিলের গলায় শক্ত করে চেন বাঁধা। দ্রুতহাতে সে আলমারি খুলে ফেলে। তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে কাগজপত্রের ভিতর।

বৃদ্ধ বলেন, লছমী, তুই আমাকে হাত ধরে ঐ কেনেলটা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিস না?

লছমী জবাব দিল না। মাথার মধ্যে ঘুরে উঠল তার। অবিনাশের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণায় সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারালো। কোন জবাব না দিয়ে সে এক ছুটে নেমে গেল বাগানে। রান্নাঘরের পাশে পড়ে ছিল একটা কয়লাভাঙার হাতুড়ি। বজ্রমুষ্টিতে বাগিয়ে ধরল সেটা। তারপর উন্মাদিনীর মতো সে ছুটে চলল দুর্লভ-নিকেতনের দিকে!

দেখতে পেল অবিনাশ। তৎক্ষণাৎ বার হয়ে এল সে ঘর থেকে। পৈশাচিক হাসল। বললে, আয়! এইটাই চাইছিলাম! আগে তোকে শেষ না করলে আমার তৃপ্তি হবে না!

লছমী বাগানের আধা-আধি পাড়ি দেবার আগেই অবিনাশ ঢুকে গেল কেনেলে। ডেভিল তখন উন্মাদ হয়ে গেছে। প্রভুর ডাক সে শুনেছে! চেন ছিঁড়বার জন্য সে প্রচণ্ড দাপাদাপি জুড়ে দিয়েছে। অবিনাশ এ সুযোগ ছাড়ল না। ছুটে এসে খুলে দিল চেনটা। লছমীর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে আদেশ দিল, ডেভিল! লিস্! লিস্!

বাঘের মত গর্জন করে নক্ষত্রবেগে ছুটে আসেছে দানবটা!

লছমী ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল! ছুটে পালানো অসম্ভব। দু-হাতে মুখ ঢেকে সে বসে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণেই একটা প্রচণ্ড আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ডেভিল ওকে পেড়ে ফেলেছে! পৈশাচিক উল্লাসে অবিনাশ দৃশ্যটা উপভোগ করছে।

দ্বিতলের বারান্দা থেকে ভেসে আসছে একটা অন্ধ আর্তনাদ ঃ কী হল? লছমী! ডেভিল! অন্ধ দৃষ্টিমান হলে দেখতে পেতেন একটা অদ্ভুত দৃশ্য। ধুলোয় কাদায় লছমী আর ডেভিল লুটোপুটি খাচ্ছে। দুজনে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে মাটিতে। ডেভিল তার বাঘের মত মাথাটা ওর বুকে,

তলপেটে, পায়ের উপর রগড়াচ্ছে। আজ পনের দিনের নিরুদ্ধ বাসনাটা সে চরিতার্থ করছে। ওরা এতদিন চেন বেঁধে তাকে সরিয়ে রেখেছিল। তার তীব্র প্রতিবাদে কেউ কান দেয়নি। না, এমনকি মিস্টিও নয়! আজ তাই সে চুটিয়ে শোধ নিচ্ছে!

মানুষ ভুলতে পারে—গ্রেট-ডেন আর ম্যাস্টিফের রক্ত বইছে যার ধমনীতে সে যে কিছুতেই ভুলতে পারে না! আজ থেকে এক দশক কাল যে এ গন্ধ লেগে আছে ওর নাকে। ও কি ভুলতে পারে ফ্রক-পরা সেই ছোট্ট মিস্টিকে?

পাঁচ মিনিট পরে লছমী উঠে দাঁড়াল। ধুলো কাদা গা থেকে ঝাড়বার চেষ্টা করল না। ডেভিলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, নো, ডেভিল, নো! স্টে! লক্ষ্মী! আর নয়! হল তো আদর! আর কত?

শান্ত হল সিংহশাবক। সিংহবাহিনীর মতই এবার মিনতি ফিরে দাঁড়ালো মহিষাসুরের মুখোমুখি। গেটের দিকে তর্জনীটা নির্দেশ করে বললে ঃ বেরিয়ে যান! না হলে ডেভিলকে লেলিয়ে দেব কিন্তু! দাঁড়ান! ঐ চাবির থোকাটা রেখে যান। হ্যাঁ! এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝেছেন এ বাড়ি থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার আমার আছে!

বিখ্যাত ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু দুর্লভ নিকেতনের গেটের গাছে গাড়িটা পার্ক করেই লক্ষ্য করেন অদূরে একটা পুলিসের গাড়ি। কী ব্যাপার? ব্যাপারটা বোঝা গেল বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র। পুলিস ইন্সপেক্টর সতীশ বর্মনের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বলেন, সরি ব্যারিস্টার-সাহেব! আপনার কিছুটা দেরী হয়ে গেছে। আপনার ক্লায়েন্ট মারা গেছেন।

—মারা গেছেন? কে? প্রফেসর রায়চৌধুরী! কেমন করে?

—এ কেস অব পয়েজনিং! বিষ প্রয়োগে হত্যা!

বাসু-সাহেব বারান্দায় উঠে আসেন। সেখানে অনেকেই উপস্থিত। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নয়। এঁদের সকলকেই গোকুলচন্দ্র আজ সকালে আসতে বলেছিলেন। অবিনাশ, আরাধনা, রঞ্জন, গিরিনবাবু—ওপাশে ম্লানমুখী লছমী। শিবনাথ উপস্থিত নেই—সে দুর্গামণিকে সামলাচ্ছে। মৃতদেহ এখনও অপসারিত হয়নি। বর্মন বললেন, এবার আমি একে একে সকলের প্রাথমিক জবানবন্দি নেব। আপনারা সকলে এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি ঐ বৈঠকখানায় গিয়ে বসছি। একজন-একজন করে ডেকে পাঠাবো।

একজন পুলিস ব্যবস্থা করে দিল। বৈঠকখানায় কাগজপত্র সাজিয়ে বর্মন বলেন, আপনি এখন কী করবেন ব্যারিস্টার সাহেব? আপনার ক্লায়েন্ট তো মৃত। ফিরে যাবেন নিশ্চয়? আপনার সময়ের দাম আছে।

বাসু বলেন, তা আছে! তবে নাকি, মক্কেল মারা গেলেই আমার দায়িত্ব শেষ হয় না। তাঁর শেষ ইচ্ছা ঠিকমত পূর্ণ হচ্ছে কি না সেটা দেখতে হবে আমাকে।

—শেষ ইচ্ছা! সেটা আবার কী?

—তাঁর সম্পত্তি যাতে তাঁর ন্যায্য ওয়ারিশই পায়, এটুকুই।

—বটে! তা কে তার ন্যায্য ওয়ারিশ?

—সেটাই তো খুঁজে দেখার জন্য থেকে যাচ্ছি।

—ও! তা বেশ। খুঁজুন। তা আপনি কোথায় থাকবেন? আমি যেখানে এজাহার নেব সেখানে, না বাইরের এই বারান্দায়?

বাসু বলেন, না, এজাহারের ওখানে আমার থাকাটা ঠিক নয়। আমি বাইরেই থাকি।

বর্মন একটু ভেবে নিয়ে বলেন, না মশাই। আপনি নিতান্তই যখন চলে যেতে রাজী নন, তখন আমার চোখের সামনেই থাকুন। এখানে বসে বসে সাক্ষীদের তালিম দিয়ে ভিতরে পাঠাবেন, সে ব্যবস্থায় আমি নেই। আসুন, আপনি ভিতরেই আসুন।

বর্মনের সঙ্গে আদালতে বহুবার বাসু-সাহেবকে লড়তে হয়েছে। হেসে বলেন, বেশ তাই চলুন।

সর্বপ্রথম এজাহার দিতে এল শিবনাথ। মৃতদেহ সেই প্রথম আবিষ্কার করেছে। সে নাকি সকালবেলা বৃদ্ধকে ডাকতে এসে দেখে তিনি শক্ত হয়ে আছেন। ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর আসে পুলিস। উনি কখন কী ভাবে মারা গেছেন তা সে জানে না। রাত্রে তিনি দুধ-রুটি খেয়েছিলেন। রোজকার মতো দুর্গামণিই তা তৈরী করেছিল। শিবনাথই এনে দিয়েছিল। আর কিছু সে জানে না।

এরপর এজাহার দিতে এলেন অবিনাশ। প্রথম থেকে তিনি লছমীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে গেলেন। রাজগীরে মেয়েটিকে দেখে তাঁর নাকি ভুল হয়েছিল। ভুল ভুলই। পরে অনুসন্ধান করে অবিনাশ নাকি জানতে পারেন, লছমী রামপ্রসাদেরই কন্যা। তার মৃতা স্ত্রী ফুলেশ্বরীর গর্ভজাতা। খবর পেয়েই তিনি গোকুলকে মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় সব কথা খুলে বলেন। বৃদ্ধের ঠিকমত বিশ্বাস হয় না। তখন অবিনাশ নাকি বলেছিল, 'আমি কাল সকালে অকাট্য প্রমাণ এনে দাখিল করব।' লছমী নিশ্চয় আড়ি পেতে সব কথা শুনেছিল। অবিনাশের ধারণা—আজ সকালে সর্বসমক্ষে অপমানিত হবার আশঙ্কায় লছমী গোকুলের খাদ্যে অথবা পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

বর্মন প্রশ্ন করেন, আপনি কি সেই অকাট্য প্রমাণটি সঙ্গে করে এনেছেন?

—এনেছি স্যার, কিন্তু সেটা আপনাকে জনান্তিকে দেখাতে চাই। ঐ ওঁর সামনে নয়।

বর্মন বলেন, ঠিক আছে। আপনার বাকি এজাহার আমি পরে নেব।

অবিনাশের পর এজাহার দিতে এল লছমী।

—আপনার নাম?

—মিনতি রায়চৌধুরী।

—'লছমী শর্মা' কার নাম?

—আমারই নাম। আমার পালক-পিতা আমাকে ঐ নামে ডাকতেন।

—আপনি কি বিবাহিত?

—না।

—কাল সন্ধ্যাবেলা যখন অবিনাশবাবু আর গোকুলচন্দ্র গোপনে আলাপ করছিলেন, তখন কি আপনি তা আড়ি পেতে শুনছিলেন?

লছমী জবাব দেবার আগেই বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, লছমী, তুমি ইচ্ছে করলে এ-প্রশ্নের উত্তর না-ও দিতে পার। বলতে পার 'আমার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে—'

বাধা দিয়ে ওঠেন বর্মন, জাস্ট এ মিনিট। আপনি মোড়লি করছেন কেন? লছমী কি আপনার মক্কেল?

—এখনও নয়। পরে হতে পারে!

—তাহলে আপনি ফোড়ন কাটছেন কোন অধিকারে?

—'ভারতীয় নাগরিক', এই অধিকারে। সংবিধান লছমীকে যে অধিকার দিয়েছে সেটাই তাকে জানিয়ে দিচ্ছি শুধু। আমি লছমীকে জানিয়ে রাখতে চাই—আপনি তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছেন।

—আমি! হোয়াট ডু য়ু মীন?

—নয়? আপনি কি লছমীকে জানিয়েছেন, সে যা এজাহার দিচ্ছে তা প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ হতে পারে? একথা তাকে জানিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে তার একজন সলিসিটার দরকার? এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করো কোনও এজাহার না দেবার সংবিধানগত অধিকার তার আছে?

বর্মন বলেন, আপনি মশাই এবার বরং বাইরে গিয়েই বসুন!

—ধন্যবাদ! বাসু স্থানত্যাগ করেন। বাইরের ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন কি বসেননি লছমীও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাসু বলেন, কী হল আবার?

লছমী বললে, এককথায় শেষ হয়ে গেল। আমি ওঁকে বলেছি, উকিলের সঙ্গে কথা না বলে আমি কোন জবাব দেব না।

রঞ্জন এগিয়ে এসে বলে, কী হল?

বাসু লছমীকে বলেন, তোমার কাছে একটা টাকা আছে লছমী?

—একটা টাকা? না তো। কেন?

রঞ্জন এক টাকার একখানা নোট বাড়িয়ে ধরে বলে, আমার কাছে আছে স্যার।

বাসু বলেন, আমাকে নয়, লছমীকে দাও—তাকে এক টাকা ধার দিচ্ছ তুমি। দ্যাটস্ ইট। লছমী এবার আমাকে ঐ টাকাটা দাও।

লছমীর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে বাসু পকেটজাত করলেন। বলেন, এস লছমী, এখন তুমি আমার মক্কেল। বর্মনের কাছে গিয়ে বাকি জবানবন্দিটা দেবে চল। যে প্রশ্নের জবাব দিতে বারণ করব, তার জবাব দেবে না।

লছমীকে নিয়ে বাসু-সাহেব আবার বৈঠকখানায় ঢুকলেন, বললেন, আমার মক্কেল তার বাকি জবানবন্দি দিতে এসেছে।

বর্মন খাতাপত্র গুছিয়ে উঠছিল। বললে, বুঝেছি। ধন্যবাদ! এজাহার সে থানায় গিয়ে দেবে। বডি-ওয়ারেন্ট আগে করিয়ে আনি।

মৃতদেহ অপসারিত করে বর্মন বৃদ্ধের শয়নকক্ষ এবং দুর্লভ স্মৃতিমন্দিরে তালা লাগালো। লছমীকে বলল, আপাতত আপনাকে গ্রেপ্তার করছি না। কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যেতে হলে আপনাকে থানা থেকে অনুমতি নিতে হবে।

অবিনাশ বলেন, কিন্তু এ-বাড়িতে তাকে থাকতে দিচ্ছে কে? গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুতে আমি—ওঁর নিকটতম আত্মীয়, তাকে এ বাড়িতে থাকতে দেব কেন?

বর্মন বললে, দেবেন, যেহেতু খাল কেটে এ কুমিরটিকে আপনিই এখানে এনেছিলেন। শুনুন মশাই, বাড়ির মালিক কে তার ফয়সালা হবে দেওয়ানী মামলায়। ফৌজদারী কেস-এ গৃহকর্তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে ব্যবস্থা ছিল তাই বহাল থাকবে। শুধু ঐ ঘর দুটি আমি আপাতত তালাবন্ধ করে গেলাম। আদালতের ডিক্রি নিয়ে যখন বাড়ির দখল নিতে আসবেন তখনই কুমিরটিকে উচ্ছেদ করতে পারবেন। তার আগে নয়। আপাতত আপনার স্বথাত সলিলে উনি বর্তমান থাকবেন। বুঝেছেন?

বর্মন জীপ নিয়ে চলে গেল। অবিনাশও লছমীকে শাসিয়ে বিদায় হলেন। বাসু বললেন, এবার চল, নির্জনে কোথাও গিয়ে বসি। ব্যাপারটা শুনি—

লছমী বললে, আমি একটু একা থাকতে চাই। ব্যাপারটা পরে আলোচনা করা যায় না?

—যায়। ঠিক আছে। আমি পরেই আসব।

দিনদুয়েক পরে বাসু-সাহেব আবার এসে হাজিরা দিলেন দুর্লভ-নিকেতনে। কেউ তাঁকে উকিল হিসাবে নিয়োজিত করেনি—যদিও তিনি ছিলেন স্বর্গত গোকুলচন্দ্রের আইন পরামর্শদাতা। বয়সে

গোকুল ছিলেন অনেক বড়—বস্তুত বাসু-সাহেবের সিনিয়ার এ-কে. রে ছিলেন গোকুলের বন্ধু। সেই সূত্রেই গোকুলের সঙ্গে তাঁর আলাপ—তাঁর নামটাও লেখা ছিল গোকুলচন্দ্রের অ্যাড্রেস-বুক-এ। কিন্তু না, ঠিক বন্ধুকৃত্য করতে তিনি আসেননি, এসেছিলেন ঐ মৃত্যু-রহস্যের অমোঘ আকর্ষণে! ঘটনাটা অদ্ভুত রহস্যময়! কে-কেন কী-করে রাতারাতি গোকুলকে হত্যা করল?

বাসু গাড়ি থেকে নেমে বৈঠকখানাতে এসে দেখেন সেখানে আরও দুজন বসে আছেন, মিনতি ছাড়াও ঃ রঞ্জন আর তার মা। গোকুলের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রঞ্জনের মা এসেছেন ছেলেকে নিয়ে দেখা করতে। রঞ্জনই অভ্যর্থনা করে বাসু-সাহেবকে নিয়ে গিয়ে বসালো ঃ আসুন স্যার! আপনার কথা মা এখনই বলছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার মা। মা, ইনি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। যাঁর কথা তোমাকে বলছিলাম।

রঞ্জনের মা যুক্তকরে নমস্কার করে বললেন, ভাববেন না, রঞ্জুর কাছ থেকেই আপনার কথা প্রথম শুনলাম। আপনার অনেক কীর্তি-কাহিনীর কথা আমি পড়েছি। এখনই রঞ্জুকে বলেছিলাম, আপনাকে খবর দেওয়ার কথা—

—আমাকে? কেন? কী ব্যাপারে?

—এই কেসটা আপনাকে নিতে হবে। প্রফেসর রায়চৌধুরীর কেসটা—

বাসু-সাহেব পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বার করে বললেন, হুঁ! কিন্তু কার তরফে? কে আমার মক্কেল?

—আমার পুত্রবধূ!

শুধু বাসু নন, রঞ্জনও চমকে তাকায় বক্তার দিকে। শান্তভাবে রঞ্জনের মা, মিসেস্ মমতা সরকার বললেন, মিনতি রায়চৌধুরী আমার ভাবী পুত্রবধূ। এ হাঙ্গামা মিটে গেলেই—

রঞ্জন আর মিনতি বিহ্বল হয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়।

বাসু বলেন, কিন্তু এই মেয়েটি মিনতি রায়চৌধুরী, না লছমী শর্মা তা তো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি।

—সে জন্যই তো আপনাকে প্রয়োজন। সেটা আপনার কাজ! আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, ঐ মেয়েটিকেই আমার ঘরে পুত্রবধূ করে নিয়ে যাব। এ কথাটাই আজ ওকে জানাতে এসেছিলাম।

মিনতি দুই হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ফুলে-ফুলে কাঁদতে থাকে।

মমতা উঠে এলেন তাঁর সোফা থেকে। মিনতির পিঠে একটি হাত রেখে বললেন, পাশের ঘরে উঠে যা মিন্টি। প্রাণ-ভরে কেঁদে মুখে চোখে জল দিয়ে ফিরে আয়। তোকে সব কথা খুলে বলতে হবে ওঁকে।

মিনতি কী-যেন বলতে গেল, পারল না। উদ্গত অশ্রুর ধমক কোনক্রমে চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

বাসু তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন রঞ্জন আর তার মায়ের দিকে। বললেন, মিসেস সরকার, কেসটা হাতে নেবার আমারও প্রবল বাসনা। তার কারণ এর চেয়ে জটিলতর কোন কেস আমি আমার লীগ্যাল-কেরিয়ারে কখনও পাইনি। ইন ফ্যাক্ট সে জন্যই অনাহূত আমি ছুটে এসেছি! কে-কেন-কীভাবে রাতারাতি প্রফেসর রায়চৌধুরীকে হত্যা করল সেটা আমাকে বুঝে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে এই অবকাশে আপনাকে দু-একটা কথা বলে নিতে চাই। ঐ মেয়েটি যদি মিনতি রায় চৌধুরী না হয়, প্রবঞ্চক লছমী শর্মাই হয়, তাহলেও কি আপনি ওকে পুত্রবধূ করতে চান?

মমতা দেবী সপ্রতিভভাবে জবাবে বললেন, সে প্রশ্নের জবাব আমি দেব না, দেবে রঞ্জন। আমি শুধু চাই আমার ছেলে সংসারী হক।

বাসু-সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ধরেন রঞ্জনের দিকে!

রঞ্জনও সপ্রতিভভাবে বললে ঃ প্রশ্নটা অবৈধ, কারণ ও নিঃসন্দেহে মিন্টি! আমি জানি!

বাসু শ্রাগ করলেন। মমতার দিকে ফিরে বললেন, আরও একটা কথা। যদি ও মিনতিই হয়, তাহলে

এ-কথা আশঙ্কা করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, প্রথম যৌবনে—অর্থাৎ ডাকাতের হাতে ও নিগৃহীতা হয়েছিল—ওর জীবনের কয়েকটা বছর...

—আমি জানি! অর্থাৎ আন্দাজ করতে পারি। সে জন্য আমার তরফে কোনও বাধা নেই—মমতা দেবী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। বোধ করি বাসু-সাহেবকে শিখণ্ডী করে মাতা-পুত্র নিজেদের মনের কথা জানিয়ে দেবার একটা সুযোগই খুঁজছিলেন।

রঞ্জন বললে, আপনি কেন বললেন, এর চেয়ে জটিলতর কোন কেস আপনি পাননি কখনও?

—বিবেচনা করে দেখ। মোটিভ-এর দিক থেকে দুজন মাত্র সন্দেহজনক ব্যক্তি। শিবনাথ, দুর্গামণি বা গিরিনবাবু সন্দেহের বাইরে। তাঁদের কোনও মোটিভ নেই। সকলেই আজ দশ-বারো বছর আছেন এ পরিবারে। গোকুলের খাদ্যে বিষ মেশানোর প্রচুর সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। কখনও তার প্রয়োজন হয়নি—আজও এমন কিছু ঘটেনি যাতে ওরা অমন একটা কাণ্ড করতে পারে। সন্দেহ ঘনীভূত হয় মাত্র দুটি ব্যক্তির উপর। এক অবিনাশ। তার মোটিভ আছে; কিন্তু স্কোপ নেই। কিছুমাত্র সুযোগ সে পায়নি। সন্ধ্যা নাগাদ সে 'দুর্লভ-নিকেতন' ত্যাগ করে যায়। তার তিন-চার ঘণ্টা পরে গোকুল নৈশাহার সারেন। ফলে তাঁর খাদ্যে বা পানীয়ে অবিনাশ বা আরাধনা বিষ মেশাতে পারেন না। শিবনাথ বা দুর্গামণি এতই বিশ্বস্ত যে, তাদের দ্বারা ও-কাজ করানো অবিনাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই নয়?

কেউ জবাব দেয় না। বাসু-সাহেবকেই তাই বাধ্য হয়ে পুনরায় শুরু করতে হল। দ্বিতীয় সমাধান—যে-কথা অবিনাশবাবু বলেছেন, তাই মেনে নেওয়া। অর্থাৎ ঐ মেয়েটিই...

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে ওঠে ঃ অসম্ভব!

বাসু প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে ওঠেন ঃ ডোন্ট বি ইমোশনাল! আমরা অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান করছি। যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অবিনাশ যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয় অর্থাৎ ঐ মেয়েটি যদি সত্যই মিনতি রায়চৌধুরী না হয়, সে যদি বাস্তবে প্রবঞ্চক লছমী শর্মা হয়, তাহলে সেটাই হচ্ছে এ সমস্যার সমাধান। একমাত্র সমাধান! তাই—মাফ করবেন মিসেস সরকার—কেস হিস্ট্রিটা আদ্যন্ত না শুনে আমি কথা দিতে পারছি না।

রঞ্জন কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই তার মা বলে ওঠেন, তার মানে মিস্টির কাছে সব কিছু শুনে যদি আপনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, সে এই জঘন্য অপরাধ করেনি তাহলেই আপনি কেসটা নেবেন?

—একজ্যাক্টলি!

—আর যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয়, সেই অপরাধী?

—তাহলে আমার পরামর্শ—সে 'গিলটি প্লীড' করুক। অপরাধ স্বীকার করে আইনত সাজা নিক। অবশ্য ইচ্ছা করলে সে অন্য কোনও আইনজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থও হতে পারে।

রঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। বলে, ওকে ডাকব?

—ডাক।

একটু পরেই মেয়েটি ফিরে এল। এতক্ষণে সে নিজেকে সামলেছে। কিন্তু এবার সে একা প্রবেশ করল না ঘরে। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল সিংহশাবকের মত প্রকাণ্ড একটা গ্রেট-ডেন। মেয়েটি বসল একটা সোফায়। ডেভিল এগিয়ে এসে রঞ্জন, তার মা এবং বাসু-সাহেবের কাছে গিয়ে ঘ্রাণ নিল। মেয়েটি বললে, স্টে! ডেভিল! চুপ করে বস এখানে।

সিংহবাহিনীর পদপ্রান্তে বসল ডেভিল। ওর পায়ের উপর মাথাটা রেখে গা এলিয়ে দিল। তার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর মমতার দিকে ফিরে বাসু বললেন, আই উইথড্র মিসেস্ সরকার! আমি স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁচেছি! কেসটা আমি নিলাম!

রঞ্জন আর তার মা পরস্পরের দিকে তাকায়।

মিনতি বলে, কিসের কেস?

বাসু বলেন, কিছু নয়। এবার তুমি সব কথা খুলে বল দিকি? সেদিন যেটুকু শুনেছি ঠিক তার পর থেকে। ডেভিলের ভয়ে অবিনাশ বিদায় হলেন। এটুকুই সেদিন বলেছিলে। তারপর? তারপর যা-যা ঘটল আনুপূর্বিক বলে যাও!

মেয়েটি পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা দেয় ঃ

বৃদ্ধ অন্ধ অসহায় দৃষ্টি মেলে বারান্দা থেকে শুধু বললেন, 'কী হল? ডেভিল! লছমী! অবিনাশ!'—কেউ সাড়া দিল না। বৃদ্ধ অনুমানে বুঝলেন পরবর্তী ঘটনার অনুক্রম। লছমী ছুটে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। তার মানে মেয়েটি বাগানে নেমে গেল। তারপরেই ভেসে এল ডেভিলের গর্জন। অবিনাশের 'লিস্! লিস্' আর লছমীর আর্ত চীৎকার। বুঝতে অসুবিধা হয়নি গোকুলের। অবিনাশ এ সুযোগ ছাড়েনি। বাড়িতে আর কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই! লছমীর মৃত্যু কেমন করে হল তার কোন প্রমাণ থাকবে না। বৃদ্ধ মেঝের উপর বসে পড়েছিলেন—ঐ বারান্দাতেই। চমক ভাঙল একটি লোমশ স্পর্শে। ডেভিল ওঁর পায়ের উপর মুখ ঘষছে। প্রথমে দুরন্ত ক্রোধে ওকে মারতে উঠেছিলেন—তারপর হাতটা নামিয়ে ওকে ঠেলে দেন। আপন মনেই বলে ওঠেন ...তোর কী দোষ? তোকে আমরা যা শিখিয়েছি, তাই তো শিখবি তুই! তারপর ডেভিলের গলা জড়িয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন অন্ধ বৃদ্ধ ঃ এ তুই কী করলি ডেভিল!

হঠাৎ আবার বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসেন। একটি নারী কণ্ঠের রুদ্ধ ক্রন্দনের ক্ষীণ রেশ কানে গেছে তাঁর। অন্ধ দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ বলেন, কে? কে ওখানে কাঁদছে?

আবার পায়ের উপর একটা লোমশ স্পর্শ। হাত বুলিয়ে বোঝেন, মাথার চুল! লছমী!

—তুই! ...তুই বেঁচে আছিস্! ডেভিল তোকে...

বৃদ্ধের পায়ের উপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে হতভাগিনী। বলে, না, দাদু, না! ডেভিল তো মানুষ নয়! ও যে কুকুর!

এরপর লছমী আর শোনাতে পারেনি বাসু-সাহেবকে। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে।

মোট কথা সেই নিভৃত সন্ধ্যায় লছমী নাকি তার সব দুঃখের কথা তার দাদুকে শোনায়। বাবার মৃত্যু থেকে শুরু করে অবিনাশচন্দ্রের বিতাড়ন-পর্ব পর্যন্ত। কেন সে এতদিন সব কথা স্বীকার করতে পারেনি সেই গ্লানিকর অধ্যায়টাও অকপটে নিবেদন করে।

বাসু বলেন, উপায় নেই মিনতি। সেই গ্লানিকর ইতিহাসটা আর একবার আমাকে বলতে হবে। তুমি ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার-চার্জের আসামী। উকিল হিসাবে সব কথা আমার জানা থাকা দরকার।

মমতা দেবী উঠে দাঁড়ান। বাধা দিল মিনতি। বললে, যাবেন না, মাসিমা! কথাগুলো আপনাদেরও শোনা দরকার। দাদুকে আমি খুন করিনি—কিন্তু আমি ...নিষ্পাপ নই!

মমতা জড়িয়ে ধরেন ভাবী পুত্রবধূকে! বলেন, না রে পাগলি! পাপ তুই করিসনি, করতে পারিস না! তবে তুই কী বলতে চাস তা আমি বুঝেছি! আমার সিদ্ধান্ত তাতে এক চুল বদলাবে না। তবে আমি তো মা! বসে বসে ও-কথা আমি শুনতে পারব না। রঞ্জু থাক! তার সব কথা জানা দরকার। সে পুরুষমানুষ! তাকে সহ্য করতে হবে।

ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মমতা দেবী। রঞ্জনও উঠে দাঁড়িয়েছিল। মিনতি যেন ধমক দিল তাকে ঃ তুমি বস, রঞ্জুদা! শুনলে না মা কী বলে গেছেন?

রঞ্জন আবার বসে পড়ে তার আসনে।

লছমীকে গ্রেপ্তার করা হল না আদৌ। বস্তুত পুলিস মামলা সাজালোই না। কারণ অটোপ্সি-সার্জেন স্থির-সিদ্ধান্তে এসেছেন—গোকুলচন্দ্রের মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনায় মধ্যরাত্রে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বার্ধক্যজনিত কারণে বন্ধ হয়েছিল তাঁর। বিষ-প্রয়োগে হত্যার কেস এটা আদৌ নয়।

ফৌজদারী মামলার পালা চুকল, সম্পত্তি নিয়ে দেওয়ানী মামলাও হল না! ওখানকার স্থানীয় এম.এল.এ. সন্তোষবাবু গোকুলচন্দ্রের ছাত্র। তিনি মধ্যস্থ হয়ে একদিন সকলকে ডেকে পাঠালেন। এলেন সবাই—আরাধনা, গিরিনবাবু, রঞ্জন, দুর্গামণি। সলিসিটর বিজন দত্তকে নিয়ে অবিনাশ এবং লছমীর তরফে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং পি.কে.বাসু।

সন্তোষবাবু বললেন, মাস্টার-মশায়ের সম্পত্তি নিয়ে একটা বিশ্রী মামলা হয় এটা আমরা কেউই চাই না। মাস্টারমশাই কোনও উইল করে যাননি। ফলে 'ইনহেরিটেন্স অ্যাক্ট' অনুযায়ী সে সম্পত্তি কে পাবে তা নির্ধারণ করতে মামলা মোকদ্দমা নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্ন তো একটাই ঃ লছমী দেবী প্রক্তপক্ষে মিনতি রায়চৌধুরী কি না! সেটা কোনও আর্বিট্রেটারের মাধ্যমে আপনারা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করুন। লছমী দেবী যদি মিনতি হয়, তাহলে অবিনাশবাবুর দাবী টেঁকে না। না হলে অবিনাশবাবুই নিকটতম আত্মীয়।

অবিনাশ বললেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। আর্বিট্রেটারের রায় যদি আমাদের পছন্দ না হয়, তা হলে আমরা আপীল করতে পারব?

—না, পারবেন না। 'ইন্ডিয়ান আর্বিট্রেশান অ্যাক্ট' অনুযায়ী ঐ মধ্যস্থের রায়ের উপর কোন আপীল করা চলে না—যদি না প্রমাণ করা যায় তিনি পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছেন, বা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন।

অবিনাশ ইতস্তত করতে থাকেন। সন্তোষবাবু বলেন, কিন্তু আর্বিট্রেটর তো আপনার সম্মতিসাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। তিনি তো আপনার বিশ্বাসভাজন লোক—

অবিনাশ বলেন, আপনি নিজে সালিশী করলে আমার আপত্তি নেই।

বাসু বলেন, আমার মক্কেল এ প্রস্তাবে স্বীকৃত।

সন্তোষবাবু বলে, আজ্ঞে না। আমার নিজেরই আপত্তি আছে। প্রথম কথা, আমি বর্তমানে অত্যন্ত ব্যস্ত। অ্যামেমরি খোলা। দ্বিতীয়ত, আমি আইনজ্ঞ নই—উভরাধিকার আইন সম্বন্ধে ভাল জানি না। আমি বরং একজন দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করছি। দেখুন আপনারা রাজী কি না। আমি কলকাতা বারের প্রবীণতম ব্যারিস্টার এ. কে রে'-র কথা বলছি। তিনি রিটায়ার্ড, আইনজ্ঞ, বিচক্ষণ, আইনের বিষয়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং তাঁর সততার বিষয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

অবিনাশ নিম্নস্বরে তার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে বললে, আমরা রাজী।

বাসু বলেন, আমার মক্কেলও রাজী। তবে একটা কথা বলে রাখি—আমি এককালে এ. কে. রে সাহেবের জুনিয়র হিসাবে বারে প্রবেশ করেছিলাম।

বিজন দত্ত বাধা দিয়ে বলেন, মিস্টার বাসু। রে-সাহেবকে চেনে না এমন আইনজীবী কলকাতায় নেই ঃ জুনিয়র কেন, আপনি তাঁর একমাত্র পুত্র হলেও আমরা রাজী হতাম। তিনি পক্ষপাতদোষের ঊর্ধ্বে থাকতেন তা সত্ত্বেও! তবে তিনি কি রাজী হবেন?

সন্তোষবাবু বলেন, হবেন। গোকুলবাবুর সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্ক ছিল তাঁর।

বাসু বলেন, তাই নাকি? নিকট সম্পর্ক! তা তো জানতাম না।

—হ্যাঁ। রক্তের সম্পর্ক নয়। পাণ্ডিত্যের সম্পর্ক।

মাসখানেক পরের কথা।

প্রবীণ এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার এ. কে. রে-র বৈঠকখানায় বসেছে মামলার প্রথম অধিবেশন। সালিশী-মামলার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, মধ্যস্থকে তিন মাসের মধ্যে রায় দিতে হয়। ফলে দেওয়ানী মামলার মত বছরের পর বছর আদালতে মামলা ঝুলে থাকার আশঙ্কা নেই। বাদী তাঁর অভিযোগ বিস্তারিতভাবে লিখে পেশ করেন। প্রতিবাদী তাঁর প্রত্যুত্তরও পেশ করেন। অতঃপর শুনানী হয়। দু'পক্ষ ইচ্ছে করলে নিজ নিজ আইনজ্ঞ পেশ করতে পারেন। আর্বিট্রেটর ইচ্ছা করলে সাক্ষীর শপথ গ্রহণ করতে পারেন, আদালতের বিচারকের মত। যদিও সচরাচর তা করা হয় না। সাক্ষী, প্রমাণ, সওয়াল-জবাব আদালতের মত হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। শুধু বিবদমান উভয়পক্ষ সমান সুযোগ পাচ্ছেন কিনা এটা আর্বিট্রেটরকে দেখে নিতে হয়। রায়ে তাঁকে যুক্তি দেখাতে হয় না। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মাত্র এক লাইনের রায় দেওয়া হয়েছে, এমন নজীরও আছে।

বাদীর প্রতিবেদন এবং প্রতিবাদীর প্রত্যুত্তর পেশ করা হয়েছে। এবার রে-সাহেব বসেছেন বিচার করতে। ওঁর টেবিলের একদিকে বাতগ্রস্তা আরাধনা, অবিনাশ এবং তাঁর অ্যাডভোকেট বিজন দত্ত। অপরদিকে লছমী, রঞ্জন, মমতা এবং বাসু-সাহেব। একজন শ্রুতি-লিখনকারী নোটবই-পেন্সিল বাগিয়ে বসে আছে এক পাশে। সাক্ষীরা পাশের ঘরে। ডাক পড়লেই আসবেন।

রে-সাহেবের নির্দেশে বিজন দত্ত তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বললেন, মি লর্ড! আমার মক্কেল তাঁর বক্তব্য লিখিতভাবেই বলেছেন। আমরা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করব, প্রতিবাদিনী শ্রীমতী লছমী শর্মা একজন প্রবঞ্চক। শ্রীরামপ্রসাদ শর্মা তাঁর পালক-পিতা নন, জনক-পিতা। লছমী দেবীর জন্ম পাটনা রেলওয়ে হাসপাতালে। জন্মতারিখ দোশরা ফেব্রুয়ারী 1948। তাঁর গর্ভধারিণীর নাম ফুলেশ্বরী। অপরপক্ষে গোকুলচন্দ্রের নাতনীর জন্ম 7 সেপ্টেম্বর 1949। প্রমাণস্বরূপ আমরা পাটনা হাসপাতালের রেজিস্টারের একটি ফটোস্টাট কপি দাখিল করছি। এটি আমাদের এক নম্বর এক্সিবিট্।

বাসু বললেন, ওটি নথিভুক্ত করায় আমাদের কোন আপত্তি নেই, মি লর্ড। বরং আদালতের সময় সংক্ষেপ করার জন্য আমরা আরও স্বীকার করছি যে, ঐ ফটোস্ট্যাট্ কপিখানা মূল হাসপাতাল রেজিস্টার থেকেই গ্রহণ করা। যাচাই করার দরকার নেই।

রে-সাহেব বলেন থ্যাঙ্ক কাউন্সেল!...ইয়েস য়ু মে প্রসীড প্লীজ!

বিজনবাবু বলেন, রামপ্রসাদ শর্মার সাক্ষ্যে আমরা প্রমাণ করব যে, তিনি 1963 সালের মে মাস পর্যন্ত পূর্ব-রেলওয়েতে চাকরি করেন, এবং পাটনার রেল-কোয়ার্টার্সে বাস করতেন। লছমীও তাঁর সঙ্গে সেখানে থাকত এবং স্কুলে পড়ত। তার এগারো বছর বয়সের সময় ছাপড়া জেলার বিশৌলী গ্রামের জোতদার-চাষী মহাদেব প্রসাদ দেওয়রের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিবাহের দু-বছর পর 24.3.63 তারিখে পুত্রবধূকে স্বগৃহে নিয়ে যাবার জন্য মহাবীর রামপ্রসাদের গৃহে আসে। সেই রাত্রেই অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা ওঠে। তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সার্জেন ডক্টর শঙ্করীপ্রসাদ তার পেটে অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করেন। সেই অপারেশন সম্বন্ধে হাসপাতাল রেজিস্টারে যে তথ্য লেখা আছে এটিই তার ফটোস্ট্যাট্ কপি। আমাদের দু-নম্বর এক্সিবিট্। সুতরাং প্রতিবাদী পক্ষের মন-গড়া কাহিনী কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আদালত অনুমতি করলে এবার আমরা একে একে আমাদের সাক্ষীদের ডাকতে পারি।

রে-সাহেব বললেন, না। তার পূর্বে আমি প্রতিবাদীর প্রারম্ভিক ভাষণটা শুনতে চাই।

বাসু বললেন, মি লর্ড! প্রতিবাদীর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ঃ যাঁকে এই মামলায় প্রতিবাদী করা হয়েছে, অর্থাৎ রামপ্রসাদের পালিতা কন্যা লছমী দেবী, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে গোকুলচন্দ্রের পৌত্রী মিনতি রায়চৌধুরী। কেন আমার মক্কেল এই সত্যটা এতদিন গোপন করে রেখেছিলেন সে-কথা তিনি আমাকে জানিয়েছেন; কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে সেটি তিনি জানাতে অনিচ্ছুক। এটুকুই এ মামলার জটিলতা, সে-কথা যদি প্রকাশ করে বলবার অধিকার আমার থাকত তাহলে এ মামলার মীমাংসা পাঁচ-মিনিটের মধ্যে হয়ে যেত—

বিজন হঠাৎ বলে বসেন, অর্থাৎ সহযোগী প্রকৃত সত্য গোপন করে মামলা জিততে চাইছেন?

বাসু বলেন, না। ডাকাতে ধরে নিয়ে যাওয়া একটি অসহায়া নারী যদি তার সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশ্য আদালতে পেশ করতে না চায় তবে তাকে সত্য-গোপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। এ মামলায় আমাদের দায় প্রমাণ করা—রামপ্রসাদের স্ত্রী ফুলেশ্বরীর গর্ভজাতা কন্যা এবং এই প্রতিবাদিনী এক ব্যক্তি নয়; আমাদের দায় প্রমাণ করা—প্রতিবাদিনী গোকুলচন্দ্রের পৌত্রী মিনতি দেবী—তার বেশী নয়। তাই করব আমরা। এর বেশি আর আমার কিছু বলার নেই আপাতত।

বিজনবাবুর তরফে প্রথম সাক্ষী রামপ্রসাদ শর্মা তার নাম, ধাম, পরিচয় দিয়ে অবিনাশের সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছিল তা জানালো। একশ টাকা মাস-মাহিনায় সে লছমীকে অবিনাশের সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়েছিল—অবিনাশের কথা অনুযায়ী সে বিশ্বাস করেছিল অবিনাশের উদ্দেশ্য একটি মরণোন্মুখ অন্ধ বৃদ্ধের শেষের দিনগুলিকে একটা মিথ্যার কুহেলিকার ভরিয়ে দেওয়া। বিজনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, শনিচরীকে বিবাহ করার পূর্বে তিনি ফুলেশ্বরীকে বিবাহ করেন। ফুলেশ্বরীর একটি মাত্র কন্যা সন্তান হয়—লছমী, হ্যাঁ, সে পাটনা স্কুলে পড়ত। এগারো বছর বয়সে বিবাহ হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। দীর্ঘ সওয়াল অন্তে বিজনবাবু বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, য়ু মে ক্রস হিম নাউ!

বাসু বলেন, পাণ্ডাজী, আপনি আধঘণ্টা ধরে অনেক অবান্তর কথা বলেছেন। অবশ্য দোষ আপনার নয়, যেভাবে প্রশ্ন হয়েছে সে-ভাবেই জবাব দিয়েছেন আপনি। এবার আমার একটি সোজা কথার সরল উত্তর দিন—ঐ মেয়েটি, অর্থাৎ এ মামলার প্রতিবাদিনী কি আপনার স্বর্গগতা স্ত্রী ফুলেশ্বরীর গর্ভজাত কন্যা?

—না!

—ঐ মেয়েটির সঙ্গে ছাপড়া-জেলার মহাদেব প্রসাদ দেও-য়ের পুত্রের বিবাহ হয়েছিল?

—না!

—অবিনাশচন্দ্র যখন ঐ মেয়েটিকে গোকুলচন্দ্রের নাতনী হিসাবে ক'লকাতায় নিয়ে আসতে চাইলেন, তখন কি আপনি অনুমান করেছিলেন যে, হয়তো আপনার পালিতা কন্যা তার পিতামহের কাছেই যাচ্ছে?

বিজনবাবু আপত্তি করেন ঃ মি লর্ড! সাক্ষীর অনুমান কোনও এভিডেন্স নয়।

এ. কে. রে বলেন, অবজেকসন ওভারুলড্! এটা আদালত নয়। সাক্ষী কেন তাঁর কন্যাকে অবিনাশবাবুর সঙ্গে পাঠান তা আমি জানতে চাই। বলুন?

—না। সেটা আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম না। বেটি কোনদিনই তার প্রকৃত পিতৃ-পরিচয় আমাকে জানায়নি। আমি জানতাম সেটা ওর দুঃখের ইতিহাস। তাই জানতে চাইনি। তবে আমি অনুমান করেছিলাম, হয়তো আমার পালিতা কন্যা তার পিতৃগৃহেই যাচ্ছে।

—বিদায় দেওয়ার সময় সে-কথা কি আপনার পালিতা কন্যাকে বলেছিলেন?

—বলেছিলাম। আমি বেটিকে বলেছিলাম—দ্যাখ, তোর ভাগ্য তোকে কোথায় নিয়ে যায়। যদি দেখিস্ ঠিক বন্দরে পৌঁছাতে পারিসনি, তাহলে ফিরে আসিস। আমার বাড়ির দরজা চিরকাল তোর জন্য খোলা থাকবে।

—আর একটা কথা পাণ্ডাজী! এই মেয়েটি—মানে কবে আপনার পালিতাকন্যা আপনার সংসারে আসে? কী-ভাবে আসে, তা আপনি জজ-সাহেবকে জানাবেন কি?

—জানাব, হুজুর। আমার কন্যা লছমী আত্মহত্যা করেছিল। ঐ পাটনা শহরেই। ওর নামে যে মিথ্যা কলঙ্ক রটেছিল তা ও সহ্য করতে পারেনি। ফুলেশ্বরী একেবারে পাগলের মত হয়ে যায়। ঐ সময়ে ঘটনাচক্রে আমি এই মেয়েটিকে উদ্ধার করি, পাটনায়—গঙ্গার ঘাটে। এও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। আমি তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসি। কেন ও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল তা ও আমাকে জানায়। আমি তাকে আমার কন্যা লছমীর কথা বলি। তাকে বোঝাই—এটাই মেয়েদের নিয়তি। লাঞ্ছনা সইতেই মেয়েরা দুনিয়ায় পয়দা হয়। তবু আত্মহত্যা মহাপাপ! ওকে আমার সংসারে আশ্রয় দিই। ঐ সময়েই রিটায়ার করে আমি রাজগীরে চলে আসি। মেয়েটিকে আমি আমার মৃতকন্যার স্থলভুক্তা করে নিই। নিজের সংসারে ও হতভাগী কেন ফিরে যেতে পারেনি, সে-কথা আমি বলব না, বাবুজী। বেটি যদি নিজে সে কথা বলে সে তো স্বতন্ত্র কথা। আমি তাকে জবান দিয়েছিলাম—তার দুঃখের কথা দুনিয়াকে জানাব না। আমি আমার সত্য রক্ষা করেছি। ফুলেশ্বরীও করেছিল। আমার বর্তমান স্ত্রী শনিচরী পর্যন্ত জানে না ও তার সতীনের গর্ভজাত নয়। এর বেশী আমি কিছু বলব না, বাবুজী!

—দ্যাটস্ অল মি লর্ড!

পাণ্ডাজী তাঁর পালিতা কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখেন, তার দুই চোখে জল।

বিজন বিচারকের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডাজীকে পুনরায় জেরা শুরু করেন, তাহলে আপনি অবিনাশবাবুকে কেন জানালেন না—এ মেয়েটি আপনার কন্যা নয়?

—এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না, বাবুজী!

বিজন উত্তেজিত হয়ে বলেন, মি লর্ড! সাক্ষী হোস্টাইল্। আপনি তাকে বাধ্য করুন।

এ. কে. রে. বলেন, সাক্ষী প্রতিবাদী পক্ষের নয়! আপনার। উনি যদি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা না করেন আমি নাচার।

—কিন্তু উনি যে ইতিমধ্যে ও-পক্ষের কাছে ঘুষ খেয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে না, তার প্রমাণ কী?

—দিচ্ছেন, সেটা আপনি প্রমাণ করুন। আপনার প্রশ্নের জবাবে ওঁকে এমন কোন কথা বলতে হবে, যা গোপন রাখার জন্য তাঁর এভিডেন্স-মোতাবেক তিনি তাঁর অ্যালেজড্ পালিতা-কন্যার কাছে প্রতিশ্রুত! আমি তাঁকে বাধ্য করতে পারি না। আই রিপিট—সাক্ষী বাদীপক্ষের।

বিজন হতাশ হয়ে বলেন, দ্যাটস্ অল, মি লর্ড!

দ্বিতীয় সাক্ষী অবিনাশচন্দ্র। বিজনবাবুর প্রশ্নে তিনি তাঁর উকিলের প্রারম্ভিক ভাষণের সব কথাই স্বীকার করে নিলেন। বাসু জেরায় তাঁকে প্রশ্ন করেন, রাজগীর থেকে সোজা কলকাতায় না এসে আপনি হঠাৎ কাশী গিয়েছিলেন কেন?

—তীর্থদর্শনে। বেড়াতে।

—কিন্তু কাশীতে পৌঁছে ধুলো-পায়ে আপনি দুর্গাবাড়ী অঞ্চলের সেই বাড়িটিতে প্রথম গিয়েছিলেন—যেখানে গোকুলচন্দ্রের পুত্র খুন হন; তাই নয়?

অবিনাশ চুপ করে থাকেন। কী যেন ভাবছেন তিনি।

বাসু বলেন, যদি স্মরণ না হয় তবে তাই বলুন। আমি বরং পরবর্তী সিটিং-এ কাশীর লেকচারার অশোক মেহতাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকি!

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল অবিনাশের। স্বীকার করলেন তিনি।

—এবার হুজুরকে বুঝিয়ে বলুন, আপনি যখন নিজে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, লছমী আসলে মিনতি নয়, তখন সর্বপ্রথমে বিশ্বনাথের মন্দিরে বা গঙ্গাস্নানে না গিয়ে তাকে ঐ বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন কেন?

আবার চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন অবিনাশ। ভেবে নিয়ে বলেন, আমি জানি না।

—জানেন! স্বীকার করছেন না! আপনি ভগ্নিপতিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মেয়েটিকে সংগ্রহ করেননি। আপনি চেয়েছিলেন, ঐ জাল-মিনতির সাহায্যে জেনে নিতে গোকুলচন্দ্র কোথায় তাঁর গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছেন! স্বীকার করুন।

—না! না! এ কথা সত্য নয়!

—নয়? তাহলে কলকাতায় এসে প্রথমেই কেন 'দুর্লভ-নিকেতনে' যাননি? কেন তাকে শাঁখারীপাড়ার বাড়িটা চিনিয়ে দিতে গিয়েছিলেন? সে যে জাল, এ-কথা কেন সকলের কাছে গোপন রেখেছিলেন?

অবিনাশ রুখে ওঠে, আপনি কী বলতে চাইছেন? জাল মিনতি সম্পত্তি পেলে আমার কী ?

—আপনার সব! কারণ আপনি একা জানতেন—সে জাল। তার মৃত্যুবাণ পকেটে নিয়ে আপনি তাকে খেলাচ্ছিলেন। জাল-মিনতি যদি গুপ্তধনের সন্ধান পায়, সম্পত্তি পায়—তখনই আপনি দুনিয়াকে জানাতেন যে, সে জাল। সব কিছু আপনাতে বর্তাতো!

—আপনার এ অভিযোগ মিথ্যা!

—এবার বলুন, গোকুলবাবুর মৃত্যুর পূর্বদিন সন্ধ্যায় কি আপন তাঁর পোষা কুকুর ডেভিলকে ঐ মেয়েটির দিকে লেলিয়ে দেননি?

—না। এ-অভিযোগও সর্বৈব মিথ্যা।

এ. কে. রে বলেন, কুকুরটার ব্যাপার আমরা এখনও জানি না। কাউন্সেল যদি তার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা একটু বুঝিয়ে বলেন সুবিধা হয়।

বাসু বলেন, মি লর্ড! গোকুলচন্দ্রের একটি কুকুর আছে, নাম ডেভিল। গ্রেট-ডেন আর জার্মান ম্যাস্টিফ-এর ক্রসব্রীড। প্রকাণ্ড বাঘের মত, খানদানী কুকুর। লছমী এ বাড়িতে আসার পর থেকে সে প্রচণ্ডভাবে ডাকতে থাকে। লছমীকে বলা হয়, সে যেন ঐ কুকুরটার ধারে-কাছে না যায়। তাহলে ডেভিল তাকে ছিঁড়ে ফেলবে।

বাসু অতঃপর বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন—কীভাবে অবিনাশ ঐ কুকুরটাকে লছমীর দিকে লেলিয়ে দেন এবং কীভাবে বোকা হন।

এ. কে. রে বলেন, স্ট্রেঞ্জ স্টোরি!

বিজন দত্ত ফোড়ন কাটেন, স্টোরিজ আর যুজুয়ালি স্ট্রেঞ্জ মি লর্ড! আষাঢ়ে গল্পটা শুনতে আমাদেরও বেশ ভাল লাগছিল। তবে গল্প গল্পই। তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।

বাসু অবিনাশের দিকে ফিরে বলেন, আপনি এ ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন?

—আদ্যন্ত।

বাসু বলেন, দ্যাটস্ অল, মি লর্ড।

বাদীপক্ষের আর কোন সাক্ষী না থাকায় এবার প্রতিবাদী তরফের প্রথম সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্য দিতে এলেন। ডক্টর পি. উপাধ্যায়, এম. ডি, এফ. আর. সি. এস.।

বাসু-সাহেব তাঁকে প্রশ্ন করেন, গত পর্শুদিন, প্রতিবাদিনী ঐ মেয়েটিকে আমি আপনার চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আপনি তাকে পরীক্ষা করেছিলেন, একথা সত্য?

—আপনার উভয় প্রশ্নের উত্তরই—হ্যাঁ, সত্য।

—ডাক্তারী পরীক্ষায় আপনি কী দেখেছেন?

—আপনার অনুরোধমত আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম—ঐ মেয়েটির অ্যাপেনডিক্স যথাস্থানে আছে। অর্থাৎ অ্যাপেন্ডিসাইটিস্ রোগে ওঁর কোনদিন অপারেশন হয়নি।

—ডক্টর উপাধ্যায়, এবার আপনি বলুন-অ্যাপেনডিক্স কি মানবদেহের এমন একটি প্রত্যঙ্গ যা কেটে বাদ দিলে আবার গজাতে পারে? দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল, হাত পায়ের নখ যেভাবে গজায়?

—না। অ্যাপেনডিক্স কেটে বাদ দিলে তা পুনরায় গজাতে পারে না।

—এবার আপনি এ মামলার এক্সিবিট নম্বর 2 পরীক্ষা করে দেখুন। ও থেকে জানা যাচ্ছে পাটনা হাসপাতালের ডাক্তার শঙ্করীপ্রসাদজী রামপ্রসাদ পাণ্ডার কন্যা লছমীর অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করেছিলেন। এখন আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নির্ভর সিদ্ধান্ত কি সন্দেহাতীতরূপে বলতে পারে যে, গত পর্শু যে পেশেন্টটিকে আপনি পরীক্ষা করেছিলেন, অর্থাৎ প্রতিবাদিনী ঐ মেয়েটি এক্সিবিট 2 বর্ণিত পেশেন্ট নয়?

—হ্যাঁ পারি। এই ভদ্রমহিলাকে ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ অপারেশন করেননি।

—যার অর্থ—রামপ্রসাদ শর্মার কন্যা লছমী, যাকে অপারেশন করা হয়েছিল সেই মেয়েটি এবং প্রতিবাদিনী পৃথক ব্যক্তি?

—নিঃসন্দেহে।

—দ্যাটস্ অল মি লর্ড!

বাসু বলেন, মি লর্ড! আমার আর কোন সাক্ষী নেই। রঞ্জন সরকারকে আমি সাক্ষী হিসাবে ডাকতে পারতাম, যে-হেতু সে কিশোর বয়সে মিনতি রায়চৌধুরীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত। তাদের সেই কিশোর বয়সের রোমান্স এ মামলায় নথিভুক্ত হ'ক এটা আমি চাই না। তিনটি কারণে। প্রথমত, সে গোপন-জীবনের কোন তৃতীয় সাক্ষী নেই। দ্বিতীয়ত, রঞ্জনবাবু মিনতিকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, ফলে তাঁর সাক্ষ্যের ততটা মূল্য হবে না। তৃতীয়ত, ইতিপূর্বেই সহযোগী এমন ইঙ্গিত করেছেন যে, রামপ্রসাদ শর্মা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাই আমি এমন একটি সাক্ষীকে অতঃপর হাজির করতে চাই, যার বিরুদ্ধে আমার সহযোগী অন্তত উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ আনতে পারবেন না।

এ. কে. রে বলেন, আপনি এই যে বললেন আপনার আর কোন সাক্ষী নেই?

—আজ এখানে নেই মি লর্ড! আগামী অধিবেশনে তাকে পাবেন। আমার প্রস্তাব, আপনি এ মামলার পরবর্তী অধিবেশন অকুস্থলে করুন—অর্থাৎ ঐ 'দুর্লভ নিকেতনের' দ্বিতলের বারান্দায়। ডেভিল অবিনাশবাবুকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে, তাঁর এভিডেন্স-মোতাবেক সে লছমীকে চেনে না—আমরা ওঁদের দুজনকে বাগানে পাঠিয়ে দেখতে পারি ডেভিল কী সাক্ষ্য দেয়!

এ. কে. রে. বলেন, পরিকল্পনাটা অদ্ভুত! কিন্তু আপনি কী প্রমাণ করতে চাইছেন বলুন তো?

—আমি আশা রাখি—ঐ তথাকথিত প্রবঞ্চক মেয়েটির অঙ্গুলি নির্দেশ ডেভিল তার অতি-পরিচিত অবিনাশচন্দ্রকে ছিঁড়ে ফেলবে! অ্যান্ড আই থ্রো দিস্ প্রোপোজাল অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ!

অবিনাশ মুখ কালো করে বসে থাকেন।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ান বিজন দত্ত ঃ মি লর্ড! কী বলব? ...সহযোগীর প্রস্তাব ...সিমপ্লি হরিবল্! আমার মক্কেল একজন গ্ল্যাডিয়েটর নন! আর ...মানে ...উনি কী করে আশা করেছেন, মাননীয় বিচারক একটা কুকুরের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন?

এ. কে. রে. হেসে বলেন, আই বেগ টু ডিফার উইথ্ দ্য কাউন্সেল। আমার নিজের একটি অ্যালসেশিয়ান আছে। কুকুরচরিত্র আমার ভালমতো জানা। আমি ঐ ডেভিলের সাক্ষ্যকে রীতিমত গুরুত্ব দিতে চাই। যদি অবশ্য মিস্টার বাসু আমাকে নিশ্চিন্ত করেন যে, ডেভিল ওঁদের কাউকে কামড়ে দেবে না।

বাসু চট করে উঠে দাঁড়ান। বলেন, মি লর্ড! আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি—রামপ্রসাদের পালিতা কন্যাকে সে কিছু বলবে না। কিন্তু ডেভিল যাঁকে আজীবন ও-বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখেছে তাঁর সম্বন্ধে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি না! বরং আমার আশঙ্কা ...ওয়েল, আশঙ্কার কথা থাক...

এ. কে. রে. অবিনাশের দিকে ফিরে বলেন, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

অবিনাশ জবাব দিলেন না! তাঁর হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন বিজন দত্ত ঃ মি লর্ড! ইন্ডিয়ান আর্বিট্রেশন অ্যাক্টে কুকুরের সাক্ষ্য নেওয়ার কোন নজীর নেই।

এ. কে. রে. হেসে ফেলেন ঃ থ্যাঙ্কু অল! লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন!

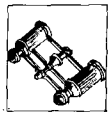

আরও মাসখানেক পরের কথা।

রঞ্জন আর মিনতি এসেছে বাসু-সাহেবকে নিমন্ত্রণ করতে। সাতদিন পরে রেজিস্ট্রি মতে ওদের বিবাহ। বাসু বলেন, মামলা তো জিতলে, সম্পত্তির দখলও পেলে, কিন্তু ভাঁড়ে ভবানী কতটা ছিল?

রঞ্জন বলে, সে আর এক রহস্য। সমস্ত বাড়িটা আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারিনি। এই সঙ্গে একটা কথা বলি—মাস্টারমশাই আমাকে বারে বারে বলেছিলেন, তাঁর গুপ্তধনের চাবিকাঠি লুকানো আছে ঐ দুর্লভ স্মৃতিমন্দিরে। তার চারপাশে আমরা খুঁড়ে দেখেছি। কিছু পাইনি। ঐ আলমারিতে আছে কিছু প্রাচীন দলিলপত্র...

বাসু পাইপটা ধরিয়ে বলেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। সংক্ষেপে বলত, কী কী প্রাচীন দলিলপত্র আছে?

রঞ্জন নিজেও ইতিহাসের ছাত্র। আজ একমাস ধরে সে ডুবে আছে ঐ নিয়ে। একটা বিস্তারিত বর্ণনা দিল সে। প্রাচীন দলিলের মূলস্তম্ভ একটি দিনপঞ্জিকা। 1842 থেকে 1868 পর্যন্ত। লেখক—বংশের আদি পুরুষ, দুর্লভচন্দ্র রায়। হাতে-তৈরী তুলট কাগজে খাগের কলমে লেখা। হস্তাক্ষর স্পষ্ট। প্রতিদিন পাশে তারিখ দিয়ে লেখা। দুর্লভচন্দ্র ছিলেন ব্রিটিশ পল্টনে। তাঁর রচনায় তদানীন্তন ভারতবর্ষের একটি ছবি পাওয়া যায়; বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের। দিনপঞ্জিকায় পৃষ্ঠা-সংখ্যা না থাকলেও প্রতি পৃষ্ঠার মাথায় তারিখ দেওয়া আছে। তাই কাগজগুলি বাঁধানো না হলেও ঠিকমত সাজানো যায়। এছাড়া আছে দুর্লভচন্দ্রের পৌত্র, অর্থাৎ গোকুলের পিতার খানআষ্টেক ডায়েরি। কিছু বিক্রি কোবালার দলিল। খান দশেক পোস্টকার্ড ও খাম। খামের ভিতর চিঠি। সেগুলিতে পোস্টাপিসের ছাপ 1868 থেকে 1894 পর্যন্ত। অধিকাংশের প্রাপক দুর্লভচন্দ্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র রায়চৌধুরী। খানপাঁচেক খামের উপর আছে অদ্ভুত কিছু সাঙ্কেতিক চিহ্ন, যার অর্থ গ্রহণ হয় না।

বাসু-সাহেব নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসেন। বলেন, ও তোমার ঐতিহাসিকের কম্মো নয়। আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে দাও তো। সাঙ্কেতিক চিহ্ন মানে কী রকম চিহ্ন?

—এক সার পুতুল। সংখ্যায় তারা পাঁচজন। অঙ্গ-ভঙ্গী করে নাচছে। আর আছে একটা জন্তু—কুকুর, বেড়াল অথবা খরগোশ!

—স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! সার আর্থারের একটা ডিটেকটিভ গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। 'ডান্সিং ডল' বা ঐ জাতীয় কী নাম। চল তো দেখি।

বাসু-সাহেবকে ঠেকানো গেল না। তখনই তিনি হাজির হলেন দুর্লভ নিকেতনে। তারপর তিনদিন তিনরাত্রি তিনি ডুবে রইলেন ঐ নথিপত্রে। যে পাঁচখানি খামের উপর ঐ পুতুলের ছবি পেলেন, প্রথমেই তার ফটো তুলে নিলেন। সবগুলি খামই 1868 থেকে 1869-এর ভিতর ব্যবহৃত। যে কয়টির পোস্টাল ছাপ পড়া যায় তার তারিখ এবং চিঠির ভিতরের তারিখ মিলিয়ে বোঝা যায়—খামের চিঠির কোন অদল-বদল হয়নি। পাঁচখানি পত্রের প্রাপকই হচ্ছেন—দুর্লভচন্দ্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র। সবগুলি খামের ছবি তো ছাপানো যায় না। খান-দুয়েকের ছবি এখানে দেওয়া গেল, যাতে পুতুল নাচের গোপন রহস্য বোঝা যায় কিনা তা আপনারাও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পাঁচটি খামেই আছে পাঁচটি করে পুতুল। আর সব শেষে একটি কুকুর। যেন মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীর পতনের পর হাত ধরাধরি করে এগিয়ে

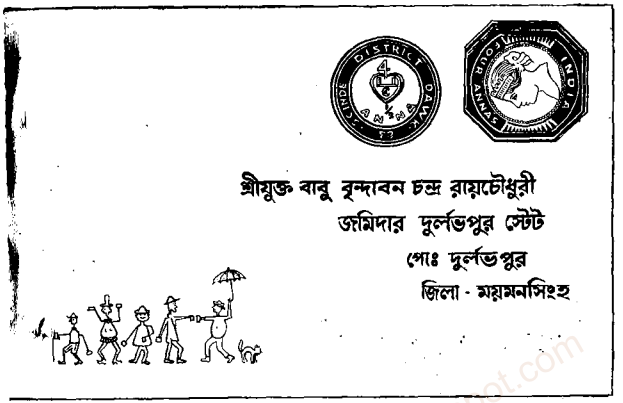

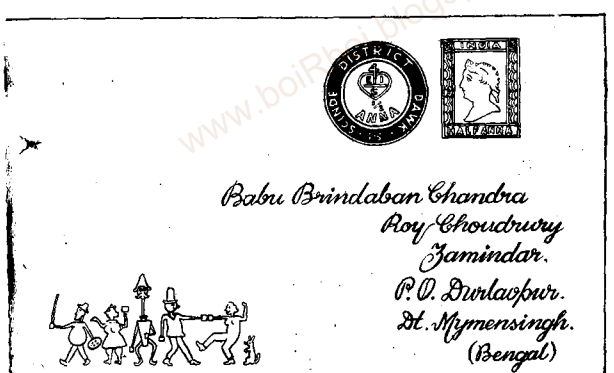

www.boiRboi.blogspot.com

চলেছেন পঞ্চপাণ্ডব। না, তাও নয়, ওরা সকলেই যে পুরুষ, তা নয়! কখনও তিনটি পুরুষ দুটি মহিলা, কখনও দুটি পুরুষ তিনটি মহিলা। একটি আবার স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নাটক।

পাঁচখানি পত্রের প্রেরক বিভিন্ন ব্যক্তি—তাহলে ঐ পুতুলের ছবি কে এঁকেছিলেন? বৃন্দাবনচন্দ্র? কেন? ওরা কী কথা বলতে চায়? তৃতীয় দিনে রঞ্জন এসে প্রশ্ন করে, কিছু পেলেন স্যার?

বাসু বলেন, একটা বিরাট অসঙ্গতি আমার নজরে পড়েছে।

—কী বলুন তো? কোথায়?

—শেষ তিনটি পৃষ্ঠায়। পয়লা জুন থেকে তেশরা জুন পড়ে যাও—

রঞ্জন দিনপঞ্জিকাটির শেষ তিনটি পৃষ্ঠা পড়তে থাকে ঃ

বুধবার, ১লা জুন, ১৮৬৮ ঃ অতঃপর একদা দুর্গের পতন হইল। পরিখা অতিক্রম করতঃ ফেরঙ্গ সৈন্য পিপীলিকা শ্রেণীবৎ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। নবাব সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইলেন। নবাবজাদাকে আমরা বন্দী করিলাম। মন্দভাগিনী নবাবজাদী এবং হারেমের অভ্যন্তরস্থ মুশলমান মহিলাদিগের ভাগ্যে কী ঘটিল তদ্বিত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা বাহুল্যমাত্র। মেজর ম্যাকফার্লন অতঃপর দুর্গাধীপের পদ অধিকার করতঃ আদেশ করিলেন, সিপাহীগণ দুর্গের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ও প্রত্যন্তভাগ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউক। তাহাই হইল। পরন্তু নবাব-ছাহেবের অতুল হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের সন্ধান কেহই পাইল না। অবশেষে দুর্গাধীপ বৃথা অন্বেষণে ক্ষান্ত হইলেন, পরন্তু আমার হৃদয় ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অর্ণবের ন্যায় অশান্তই রহিয়া গেল। আমি নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলাম—ইহা কিপ্রকারে সম্ভব? নবাবকে দুর্গ মধ্যে আমরা তিনদিক হইতে বেষ্টন করিয়াছিলাম। চতুর্থ দিকে খরস্রোতা যমুনা নদী। ফলে নবাব ঐ রত্নরাজি কোথায় লুক্কায়িত করিতে পারেন? ঐ সময়ে আমার লক্ষ্য হইল, নবাব-ছাহেবের দিনপঞ্জিকাটি সর্ব্বসাধারণের চক্ষুর সম্মুখে অনাদৃত অবস্থায় নিরন্তর বিরাজমান। আমার সন্দেহ জন্মিল—হয়তো নবাব-ছাহেব তাঁহার দিনলিপিতে কোন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থটি আদ্যন্ত বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে লিখিত। সে দিনলিপি পাঠে অনুধাবন করা যায়—নবাব-ছাহেব সাতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ফার্সি, আরবি ও সংস্কৃতের ভূরিভূরি উদ্ধৃতিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বিরাজমান। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, দিনপঞ্জিকার আদ্যন্ত সহজ, সরল ও অর্থবহ। শুধুমাত্র শেষ পৃষ্ঠাটি যেন বাতুলের রচনা!

উক্ত শেষ পৃষ্ঠার প্রথমেই নবাব-ছাহেব একটি ফার্সি উদ্ধৃতি দিয়াছেন—দীবান হাফিজের একটি বয়েৎ। তৎপরে একটি সংস্কৃত শ্লোক। পরন্তু তাহার পরের অংশ সম্পূর্ণ কৃত্মটিকাবৃত। আমি অতঃপর নবাব-ছাহেবের দিনপঞ্জিকার শেষ পৃষ্ঠাটি হুবুহু নকল করিয়া দিতেছি ঃ

'রহজনে দহ্‌র্ ন খুফতস্ত, ম-শও অয়্‌মন্ অজ-ও
অগর্ ইম্‌রোজ্ ন র্বদস্ত, কে ফর্দা বে-বরদ ॥

—দীবান্ হাফিজ, ২৫৬/৮

'অর্থাৎ সংসারে তস্কর নিদ্রাগত হয় নাই, তাহা হইতে নির্ভয় থাকিও না। আজ যদি সে তোমাকে অপহরণ না করে, কল্য তা সে করিবেই ॥

'দীবান্ হাফিজ-এর এ সাবধানবাণী বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তস্কর এতদিন আসে নাই, তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম। অদ্য সে আমাকে অপহরণ করিতে আসিয়াছে। অদ্য প্রাতে পণ্ডিতজী কুমারসম্ভব পাঠ আরম্ভ করিলেন। প্রথম শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছেন মাত্র, অর্থাৎ 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ঃ নাম নগাধিরাজঃ', তখনই খড়্গদূত আসিয়া সংবাদ দিল সফদরজং বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন—ফেরঙ্গ সৈন্য ইসলামপুরের দুর্গ দখল করিয়া এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ হইল। আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলাম। আমি মুশলমান। ইসলামের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিব ইহাতে ভীত নহি। কিন্তু বেগমদিগের কী ব্যবস্থা করিব? একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে

আদেশ করিলাম বেগমদিগকে সন্নিকটস্থ 'রদনখুম' গ্রামে পঁহুছাইয়া দিতে। খোদা সহায় হইলে তাহারা ঐ পথে অযোধ্যায় চলিয়া যাইবে। অযোধ্যার নবাব তাহাদিগকে আশ্রয় দিবেন। পরন্তু আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যরাশির কী ব্যবস্থা করিব? তৎক্ষণাৎ তাহাও লুক্কাইত করিলাম। একমাত্র নবাবজাদা শাহ্ মেহ্‌বুব তাহার সন্ধান জানিল। পরন্তু দুর্গরক্ষার সময় প্রাণাধিক পুত্র মেহ্‌বুবও নিহত হইতে পারে। সেজন্য আমার ভবিষ্যদ্-বংশীয়দিগের উদ্দেশ্যে এই বজ্রকূট সাবধানবাণী লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। অবধান কর ঃ

'শত্রুদলে যদি ফ্লেচ্ছ সিপাহী দেখিতে পাও তখন শুধু প্রথম পাঁচটি সৈন্যকে আক্রমণ করিবে। তাহাদের শিরশ্ছেদ করতঃ ছিন্নমুণ্ড সংগ্রহ করিবে। অপরপক্ষে যদি শুধুমাত্র কাফের সৈন্য আক্রমণ করে তখন শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদলের প্রথম চারিজন সৈন্যকে অতিক্রম করতঃ পঞ্চম সৈন্যকে আক্রমণ করিবে। পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় কাফের সৈনিকদিগকেও সম্পূর্ণ অবহেলা করিবেক না।'

এই আমার নির্দ্দেশ।

খোদা হাফেজ।'

নবাব-ছাহেবের ঐ শেষ পৃষ্ঠাটি আমাকে উন্মাদ করিয়া দিল। আদ্যন্ত সহজ সরল উর্দ্দুতে নিজ জীবন কাহিনী বিবৃত করিয়া একেবারে শেষ পৃষ্ঠায়

বৃহস্পতিবার, ২রা জুন ১৮৬৮। তিনি এরূপ প্রলাপোক্তি করিলেন কেন? নিশ্চয় উহার অভ্যন্তরে কোনও গুপ্ত সঙ্কেত আছে। তাহা কী?

চিন্তা করিতে করিতে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় আমার নিকট ঐ গূঢ় সংকেতের অর্থ নিশাবসানে সূর্য্যোদয়ের মত প্রতীয়মান হইল। কী মূর্খ আমি! নবাব-ছাহেব আদৌ প্রলাপোক্তি করেন নাই। অতি সুকৌশলে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের হিত্যর্থে গুপ্তধনের নির্দ্দেশ ঐ উপদেশে গোপনে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফ্লেচ্ছ-সিপাহী ও কাফের-সিপাহী শব্দদ্বয় তির্য্যকঅর্থে গ্রহণযোগ্য। ফ্লেচ্ছ-সিপাহী অর্থে দীবান হাফিজের ঐ বয়েৎ, যাহার প্রথম পাঁচটি শব্দ হইতেছে—'রহজনে দহর ন খুফতস্ত ম-শও'। তাহাদের শিরচ্ছেদ করতঃ— অর্থাৎ প্রথম অক্ষরগুলি গ্রহণ-করতঃ যে শব্দ পাই তাহা 'র-দ-ন-খু-ম'। কিমাশ্চর্য্যম্! সেটি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম—যে-গ্রামে বেগম-ছাহেবাগণ পলায়ন করিয়াছেন! অতঃপর কাফের সৈন্যদলের, অর্থাৎ সংস্কৃত শ্লোকটির প্রথম চারিটি শব্দ অতিক্রম করতঃ পঞ্চম শব্দটি হইতেছে ঃ 'নগাধিরাজঃ'। অহো ভাগ্য! ঐ রদনখুম গ্রামে একটি শৈবমন্দির বিরাজমান; বিগ্রহের নাম 'নগাধিরাজ'। কূটচক্র ভেদ করিয়া আমার সর্ব্বাবয়বে রোমাঞ্চ হইল। অতঃপর মেজর ম্যাকফার্লন ছাহেবের নিকট দিবসত্রয়ের নিমিত্ত অনুপস্থিতির আর্জ্জি পেশ করিলাম—বলিলাম, নিকটেই আমার একজন আত্মীয় আছেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি। ছুটি মঞ্জুর হইল। আমি একাকী ঐ রদনখুম গ্রামে উপনীত হইলাম। নগাধিরাজ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দুই দিবস বৃথা অন্বেষণ করিলাম। কোনও সঙ্কেত দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় নিরন্তন চিন্তা করিতে করিতে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় স্মরণ হইল—নবাব-ছাহেবের আরও একটি নির্দ্দেশ ছিল, যাহা এযাবৎকাল আমি গ্রাহ্য করি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—'প্রথম ও দ্বিতীয় কাফের সৈন্যদ্বয়কেও সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না।' সেই দুইটি শব্দ হইতেছে 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি' অর্থাৎ 'উত্তর দিকে আছে'! আমি নগাধিরাজ মন্দির হইতে উত্তরাভিমুখে চলিতে শুরু করিলাম। লক্ষ্য হইল, সে দিকে গ্রাম্য পথ নাই—বিজন অরণ্য! তাহা হউক। আমি সেই অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এক্ষণে দেখিলাম—ঘন পত্রগুল্মকণ্টকাকীর্ণ সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে সম্প্রতি মনুষ্য গমনের চিহ্ন রহিয়াছে। দুই একটি বৃক্ষশাখা কিছু দিন পূর্বেই কেহ ছেদন করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সঙ্কেত চিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অতিক্রম করতঃ একটি উন্মুক্ত স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। এই স্থান

বাহির হইতে কিছুতেই লক্ষ্য হইবে না। দেখিলাম, প্রায় চারিহস্ত পরিমিত বর্গক্ষেত্রে লতাগুল্মাদি পরিষ্কৃত। সে স্থলে সম্প্রতি কে বা কাহারা একটি গর্ত্ত মৃত্তিকাদ্বারা বন্ধ করিয়াছে। আমার রোমাঞ্চ হইল। বুঝিলাম, গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছি। দিবাভাগে খনন করিতে সাহসী হইলাম না। স্থানটি অন্তরে চিহ্নিত করিয়া অরণ্য হইতে নির্গত হইলাম। গ্রামে গিয়া একটি খনিত্র সংগ্রহ করিয়া নগাধিরাজ মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। প্রথম প্রহরে শিবাকুলের সঙ্কেত পাইয়া নগাধিরাজ মন্দিরে আগমনপূর্ব্বক আমি খনিত্রসহ অকুস্থলে পুনরাভির্ভূত হইলাম। তিন দণ্ডকাল নিরন্তর কায়িক পরিশ্রমে মনুষ্যদেহ পরিমাণ গর্ত্ত খনন করিতে অস্মদেহে শ্রমজল নির্গত হইল। তদনন্তর কোনও কঠিন ধাতব পদার্থে আমার খনিত্র প্রতিহত হইল। একটি মঞ্জুষা পাইলাম। তাহা উন্মোচন করিতেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে নবাব-ছাহেবের অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি ঝলমল করিয়া উঠিল। আমি বজ্রাহত হইয়া গেলাম।

আমি অতুলবৈভবের অধিকারী হইয়াছি। এক্ষণে আমার সমস্যা এই অতুল ঐশ্বর্য্য

শুক্রবার, ৩রা জুন, ১৯৬৮ ঃ সমভিব্যাহারে কী প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব? কী প্রকারে ঐ হীরামুক্তামাণিক্য মোহর ও তঙ্কায় রূপান্তরিত করিব? যদ্যপি তাহা সঙ্গোপনে করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে শুধু আমি নহি, অস্মদ্‌বংশীয় অধঃস্তন সপ্তপুরুষ শতাধিক বৎসরকাল বিনা আয়াসে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে। নবাব-সাহেব আমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। আমিও চৌর-তস্কর হস্তলাঘবাদিগের এবং স্বার্থলোলুপ আত্মীয় পরিজনের লোলুপ দৃষ্টি হইতে আমার এ গুপ্তধন একই প্রকারে কৌশলে লুক্কাইত রাখিব। আমি উর্দু-ফার্সি-সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই ঐ বজ্রকূট সমস্যা ভেদ করিতে সফলকাম হইয়াছি। ইহা জননী সরস্বতী দেবীর আশীর্বাদ। এ সম্পত্তি আমিও অস্মদবংশীয় পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাইব। এই দিনপঞ্জিকাতেই রাখিব আমার নির্দেশ। বজ্রকূট সমস্যা সমাকীর্ণ। আমার মৃত্যুর পরে এই দিনপঞ্জিকাও সর্বসমক্ষে বিরাজমান থাকিবে, যেমন ছিল নবাব-ছায়েবের দিনলিপি। কেহ দৃক্‌পাত করিবে না ঃ পরন্তু যদি কেহ যত্নবান হইয়া যথোচিত অনুসন্ধান করে, যদি তাহার পাণ্ডিত্যে যথেষ্ট অধিকার থাকে, তবে সেও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে, নচেৎ নহে। এক্ষণে আমি অস্মদবংশীয়দিগের উদ্দেশ্যে এই অন্তিম নির্দেশ রাখিয়া যাইতেছি। অবধান কর ঃ

RUBAIAT E OMAR KHAYYAM

'Ghiyashuddin Abulfath Omar Bin Ibrahim Al-Khayyamic, KUZA NAMA'.

"Shapes of all sorts and sizes, great and small,
That stood along the floor and by the wall;
And some loquacious Vessels were; and some
Listen'd perhaps, but never talk'd at all.
Said one among them—Surely not in vain
My substance of the common Earth was ta'en—
অলমিতি। শিবশম্ভু!'

রঞ্জন থামতেই বাসু-সাহেব বলেন, এবার বল ঐতিহাসিক, অসঙ্গতিটা কী?

রঞ্জন মাথা নেড়ে বললে না! অসঙ্গতি কিছু নেই; একটিমাত্র বর্ণাশুদ্ধি আমার নজরে পড়েছে। দুর্লভচন্দ্র 'ৎ' লিখতে এক জায়গায় 'ঃ' লিখেছেন। উনি ১৮৬৮ লিখতে ভুলে ১৯৬৮ লিখেছেন—

—দেয়ার লাইস্ দ্য ক্লু। লেখক ভুল লেখেননি। সালটা ঠিকই আছে। নির্ভুল!

—কী বলছেন স্যার! ঠিক আছে মানে? দুর্লভচন্দ্র তো একশ বছর আগেকার যুগের মানুষ। ১৯৬৮ সালটা ভুল নয়?

—না, নয়। কারণ শেষ পৃষ্ঠার লেখক দুর্লভচন্দ্র নন—তোমার হবু-দাদাশ্বশুর গোকুলচন্দ্র—ওটা মাত্র আট বছর আগেকার লেখা! বুঝলে?

রঞ্জন হেসে ওঠে। বলে, এটা কী বললেন বাসু-সাহেব? দেখছেন না—কাগজ এক, হাতের লেখা এক, কালি এক, ভাষা এক, এমনকি পূর্বপৃষ্ঠা থেকে পারম্পর্যটুকু পর্যন্ত বজায় আছে? 'ৎ' লিখতে ভুলে 'ঃ' লেখা হয়েছে বলে—

বাসু ঘন ঘন মাথা নাড়েন; ভুল নয়, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড—এটা ইচ্ছা করে করা কারচুপি। সবটাই গোকুলচন্দ্রের কীর্তি! তিনি একই রকম কাগজ জোগাড় করেছেন, একই কালিতে, একই ভাষায় একই হাতের লেখায় ঐ শেষ পৃষ্ঠাটি লিখেছেন! এমনভাবে মূল পাণ্ডুলিপিতে সাজিয়ে রেখেছেন যে, বোঝাই যায় না—ওটা প্রক্ষিপ্ত।

—এমন মনে করার হেতু?

—গোকুলচন্দ্র বলতে চেয়েছেন—খামের উপর আঁকা ঐ নৃত্যরত পুতুলের সারি loquacious—অর্থাৎ বাক্সয়। সোজা কথায়—ওরাই নির্দেশ দেবে, কোথায় তিনি তাঁর সম্পত্তি লুকিয়ে রেখে গেলেন! গোকুল বলছেন, সৃষ্টিকর্তা কুম্ভকার ঐ পুতুলগুলি নিরর্থক সৃষ্টি করেননি—Surely not in vain!

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে, আমি সে-কথা বলছি না। আমি জানতে চাইছি, আপনি কী কারণে অনুমান করছেন—

—অনুমান নয় রঞ্জন—এ আমার স্থির সিদ্ধান্ত। একাধিক কারণে ধরা পড়ে গেছেন গোকুলচন্দ্র। না, ভুল বললাম। তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন, কারণ তাঁর সেটাই ছিল উদ্দেশ্য—তাঁর ভাষায় 'যাহার পাণ্ডিত্যে প্রকৃত গভীরতা আছে, সে যেন বুঝিতে পারে'। নাউ লুক হিয়ার—প্রথম দুটি পৃষ্ঠার সঙ্গে শেষ পৃষ্ঠার একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আছে—বানানে। প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় বানান আছে 'সর্বসাধারণ, কর্ম্মচারী, নির্দ্দেশ, তির্য্যক, ঐশ্বর্য্য, প্রত্যাবর্ত্তন' ইত্যাদি। অথচ শেষ পৃষ্ঠায় বানান আছে—'আশীর্বাদ, নির্দেশ, ঐশ্বর্য, সর্বসমক্ষে'! অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠার লেখক 'রেফ'-এর পর দ্বিত্ব বর্জন করেছেন। এটা বর্তমান শতাব্দীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত আইন অনুসারে। এখন আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি—১৮৬৮ সালের লেখক ঐ বানানে শেষ পৃষ্ঠাটা কেমন করে লিখেছেন? তিনি কেমন করে জানলেন পরের শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয় 'রেফ'-এর পর দ্বিত্ব বর্জন করবেন? এতবার বানান ভুল করার মানুষ তো তিনি নন?

রঞ্জন বলে, আশ্চর্য। এটা তো খেয়াল হয়নি। এ থেকে প্রমাণ হয়, আপনিই যথার্থ পণ্ডিত। আমি পণ্ডিতম্মন্য!

—না রঞ্জন। আমি অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আছি, তাই ওসব বিষয়ে আমার নজরটা তীক্ষ্ণ। দ্বিতীয়ত দেখ, যে উদ্ধৃতিটা দেওয়া হয়েছে সেটা ওমর-খৈয়ামের ফিটজেরাল্ড কৃত অনুবাদ। ওটা ১৮৬৮ সালে লেখা অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব? এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের কবিতাগুচ্ছ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে।

—ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম কয়েক বছর দুনিয়া তার খবর জানত না। পর বৎসর কবি রসেটি এবং কবি সুইনবার্ন ঐ কবিতাগুচ্ছ পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তবু তার যথেষ্ট প্রচার হয়নি। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিল আট বছর পরে। তখন দুনিয়া সে খবর পায়—

—মানলাম। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, প্রথম সংস্করণের একটি কপি কোনও ইংরাজের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এসেছিল ১৮৬৮ সালের আগেই। হয়তো দুর্লভচন্দ্র তখনই সে কাব্যগ্রন্থ পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত—আরবি, ফার্সী, উর্দু, সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙলা—ছয়-ছয়টি ভাষায় অধিকার ছিল তাঁর।

বাসু-সাহেব বলেন, মাই ডিয়ার ঐতিহাসিক, ও রাজ্যটা আমার এক্তিয়ারে। আমি ইংরাজি-সাহিত্যের

ছাত্র। এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের যে উদ্ধৃতি ওখানে দেওয়া হয়েছে সেটা তাঁর কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ও শেষ সংস্করণ থেকে হুবহু নকল করা এবং তার প্রকাশকাল ১৮৬৮ সালের পরে।

রঞ্জন বলে, তার মানে ঐ পুতুলগুলো সবাক? ওরা কিছু বলতে চায়?

—ঠিক তাই রঞ্জন। ঐ পুতুলগুলি বলতে চায় এ যুগের 'রদনখুম' গ্রাম আছে কোন পথের বাঁকে, সেখানকার 'নগাধিরাজ' মন্দিরের আধুনিক নামটা কী? খোঁজ, খোঁজ রঞ্জন, খোঁজ। হীরা-মুক্তা-পান্না-জহরতের পশরা সাজিয়ে ঐ পুতুলগুলো আনন্দে নাচছে। কান পেতে শোন—ওরা কী বলতে চায়! কুম্ভকার বৃথাই ওদের ওভাবে সাজায়নি—'Surely not in vain'!

রঞ্জন বললে, ঠিক পারব! নিশ্চিত শুনতে পাব, ওরা কী বলতে চায়।

এরপর কদিন ধরে রঞ্জনের চোখে ঘুম নেই। সব সময়েই তার চোখের সামনে একসার বিলাতী পুতুল নাচছে। তারা মোটা-সরু, বেঁটে-ঢ্যাঙা; কেউ ছড়ি হাতে বেড়াতে যাচ্ছে, কেউ বা তরোয়াল হাতে লড়াই করতে চলেছে। সংখ্যায় ওরা পাঁচজন—কখনও চারটি ছেলে, একটি মেয়ে; কখনও তিনটি ছেলে দুটি মেয়ে। ওরা পাঁচজনে কী এমন কথা বলতে পারে? ধরা যাক, ওরা পাঁচটি সংখ্যা বলছে—'১.. ৭.. ৩.. ৫.. ৮..'; কিম্বা পাঁচটা অক্ষর—'প.. ক.. শ.. ন.. ধ'। তা থেকে কেমন করে বোঝা যাবে গোকুলচন্দ্র কোথায় তাঁর গুপ্তধন রেখে গেছেন? কী ভাবে রেখেছেন? মোহরের থলি? এক কৌটা হীরা-মুক্তা? এক তাড়া কোম্পানির কাগজ? কোথায় সেটা পুঁতে রেখেছেন? স্মৃতিমন্দিরের উত্তরে, না দক্ষিণে, দশ হাত দূরে, না পঞ্চাশ হাত দূরে? কত গভীরে? অসম্ভব!

কিন্তু না! নবাবসাহেব তো মাত্র তিনটি শব্দে বাক্যস্থ হতে পেরেছিলেন। দিয়েছিলেন পূর্ণ নির্দেশ; তিনটি মাত্র শব্দে —'রদনখুম', 'নগাধিরাজ', আর 'উত্তরস্যাং দিশি'। গোকুল তিনের পরিবর্তে পাঁচটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাহলে কেন পারবেন না? শব্দ? ওরা পাঁচজন পাঁচটি শব্দই তো? নাকি অক্ষর? অথবা সংখ্যা? সব গুলিয়ে যায় আবার।

পুতুলগুলোর একটা সাদৃশ্য ওর নজরে পড়েছে অবশ্য। শেষ দু'জন, অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম পুতুল দুটি পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে যেন করমর্দন করতে চাইছে। কিন্তু ওদের হাতে হাতে ঠেকেনি। তার মানে কী? আরও সাদৃশ্য আছে—দ্বিতীয় পুতুলটি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলা এবং প্রথমটি পুরুষ; আর মনে হচ্ছে দ্বিতীয় পুতুল প্রথমটির কাঁধে খোঁচা মেরে কিছু একটা কথা বলতে চায়। কী বলতে চায় সে?

রঞ্জন প্রায় পাগল হতে বসেছে।

আরও তিনদিন পরের কথা।

বাসু-সাহেবের গাড়িটা এসে দাঁড়ালো দুর্লভ নিকেতনের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে বাসু-সাহেব হাঁক পাড়লেন, ওহে বাবা শিবনাথ, গাড়িতে একটা ফুরির কেক আর ফুলের তোড়া আছে, নামিয়ে নিয়ে এস তো হে—

মিনতি ছুটতে ছুটতে নেমে আসে দ্বিতল থেকে। পিছন পিছন নেমে আসে ডেভিল। মিনতি বলে, হায় ভগবান! আপনি এখানে? আর আপনার সাকরেদ গেছে আপনার বাড়িতে।

—কে? রঞ্জন? কেন? আমি তো রোজই সকালে এখানে আসি।

—ইতিমধ্যে যে একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে। ও সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছে। ও নাকি বুঝতে পেরেছে পুতুলনাচের ভাষা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন বাসু। বলেন, সে কী! কখন?

—এই তো আধঘণ্টা আগে। স্মৃতি-মন্দির থেকে ছুটতে ছুটতে এল 'ইউরেকা-ইউরেকা' বলে চিল্লাতে চিল্লাতে। তারপরেই পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল আপনাদের বাড়ির দিকে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে—

—সে কী বুঝতে পেরেছে, তা বলেনি?

—আমাকে পাত্তাই দিল না। শুধু বললে 'ইউরেকা-ইউরেকা!'

—ছেলেটা ভোগাবে দেখছি! তাকে যে এখনি দরকার!

—ভয় নেই। এখনই আসবে সে। ও ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর দেখি সে মনিব্যাগ নিয়ে যায়নি। অগত্যা ঐ ট্যাক্সিতেই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে—ভাড়া মেটাতে। অহেতুক অনেকগুলো টাকা অর্থদণ্ড হবে তার।

বাসু বিচিত্র হেসে বলেন, অনেকগুলো টাকা! তুমি জান, তোমরা আজ কত টাকার মালিক?

—না, কেন? আপনিও কি 'ইউরেকা' শোনাবেন নাকি?

—তাই শোনাব মিনতি! তোমাদের হীরা-মুক্তার কিছু সন্ধান পেয়েছি। ইতিমধ্যে বাজারে তা যাচাইও করেছি। যে কয়টির সন্ধান পেয়েছি, তার বর্তমান বাজার দর এক লক্ষ সতের হাজার টাকা!

মিনতি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ঃ কী বলছেন? কিসের দাম? কী পেয়েছেন?

বাসু সাহেব জবাবে কিছু বলার আগেই গেটে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। রঞ্জন ছুটতে ছুটতে এসে বলে, এই যে আপনি! পেয়েছি স্যার! পুতুলগুলো কী বলতে চায় তা বুঝতে পেরেছি।

বাসু বলেন, আশ্চর্য! তুমি তো তাহলে আমাকে হারিয়ে দিলে রঞ্জন! আমি যে সে রহস্য এখনও ভেদ করতে পারিনি! কী বলছে পুতুলগুলো?

মিনতি বলে, সে কি? তাহলে কেমন করে বুঝলেন ওর দাম ১,১৭,০০০ টাকা?

রঞ্জন জানতে চায়, কিসের দাম?

—কিসের তা বলছি। আগে তুমি বল দেখি—পুতুলগুলো কী বলছে?

পুতুলগুলো বারে বারে একই কথা বলছে। তার কী অর্থ তা আমি জানি না। ওরা বলছে 'সীল মোহর'!

—সীলমোহর? হতেই পারে না! সীলমোহর?

—হ্যাঁ, সীলমোহর—STAMP!

লাফিয়ে ওঠেন বাসু ঃ কারেক্ট! Stamp! সীলমোহর নয় রঞ্জন! তার বঙ্গানুবাদ—'ডাকটিকিট'!

—ডাকটিকিট! তার অর্থ?

—বলছি। কিন্তু তুমি কেমন করে বুঝলে ওরা সবাই বলছে ঃ STAMP?

রঞ্জন বুঝিয়ে বলে, লক্ষ্য করে দেখুন—ওদের টুপিগুলো বিভিন্ন ধরনের, কারও হাতে ছাতা, কারও তলোয়ার, কারও বা লাঠি। ওরা মোটা-সরু, ছেলে-মেয়ে, কখনও ডাইনে-ফেরা, কখনও বাঁয়ে! ওদের আকার, আকৃতি, লিঙ্গ, পায়ের মুদ্রা, পোষাক কোথাও কোনও সাদৃশ্য নেই, সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখুন—প্রতিটি পুতুলের স্থান-মাহাত্ম্যে হাতের মুদ্রা অভিন্ন। অর্থাৎ প্রথম খামের ১, ২, ৩, ৪, এবং ৫ নম্বর পুতুলে মুদ্রা দ্বিতীয় খামের ঐ-ঐ পুতুলের হাতের মুদ্রার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তাই নয়?

—কিন্তু তাতে কী হল?

হল এই যে, ওরা 'সিমাফোর সিগন্যালিং কোডে' পাঁচটি অক্ষর জানাচ্ছে। আমি ছেলেবেলায় স্কাউট ছিলাম, তাই সিগন্যালিং শিখেছিলাম—সব স্কাউটকেই শিখতে হয়। সিমাফোর আইন অনুসারে ওদের অবশ্য সামনে ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কথা; কিন্তু তাহলে ওরা সহজে ধরা পড়ে যায়। তাই গোকুলচন্দ্র ওদের ঐভাবে নাচিয়েছেন—

বাসু বলেন, শুধু পুতুলদের নয়, আমাদেরও; কিন্তু ওরা পাঁচজনে কী বলছে?

—বলছে পাঁচটি অক্ষর S...T...A...M...P; আমি ভেবেছিলাম তার অর্থ সীলমোহর। আপনি বলছেন না, ডাকটিকিট। কিন্তু কেন? ডাকটিকিট কেন?

বাসু বলেন, ইয়ংম্যান, এতদিনে তুমি প্রফেসর গোকুলচন্দ্রের নাতজামাই হবার যোগ্যতা অর্জন

করেছ। আর ঘণ্টাকতক চেষ্টা করলেই তুমি চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছাতে। আমি পুতুলের ভাষাটা ধরতে পারিনি। আমি সমাধানে পৌঁচেছি অন্যভাবে। আমার প্রথম সন্দেহ জাগে গোকুলচন্দ্রের নোটবইতে একটি ঠিকানা দেখে ঃ Stanley Gibbons Ltd. Romans House, 399 Strand, London W.C.2; খোঁজ নিয়ে জানলাম ঐ প্রতিষ্ঠান সুদুর্লভ ডাকটিকিট কেনা-বেচা করে। তখনই দুটি জিনিস খেয়াল হল—একনম্বর, ডাক টিকিটের উপর ডাকঘরের ছাপ পড়েনি। এটা কেমন করে সম্ভব? বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র ডাকে চিঠি পেলেন, অথচ খামের উপর ডাকঘরের ছাপ নেই কেন? তোমরা জান, অব্যবহৃত ডাকটিকিটের মূল্য বেশি। তারপরেই খেয়াল হল—ডাকটিকিটে রাণী ভিক্টোরিয়ার মাথাটা উল্টো করে ছাপা। তারপর দেখি ডাকটিকিটে তিনটি অক্ষর E.I.C.—অর্থাৎ East India Company—তাজ্জব! চিঠির তারিখ ১৮৬৮ সালের। অর্থাৎ কোম্পানির আমল শেষ হবার দশ বছর পর। সে সময় নিশ্চয় ডাকঘরে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাকটিকিট বিক্রি হত না। তখনই খোঁজ নিয়ে দেখলাম, ঐ গোলাকৃতি টিকিট দুটি সর্বপ্রথম ভারতীয় ডাকটিকিট—ওর বর্তমান বাজার দর ষোলো হাজার টাকা। ইংরাজী খামে চৌকো আধ-আনার টিকিটখানির দাম আট হাজার টাকা আর সব চেয়ে দামী হচ্ছে ঐ রাণী ভিক্টোরিয়ার উল্টো করে ছাপা চার আনার টিকিটখানি। ঐ একখানা টিকিটের দাম—আশি হাজার টাকা!

—আশি হাজার টাকা! কেমন করে জানলেন?

—ন্যাশনাল নাইব্রেরীর 383.22085/G352/ নম্বর গ্রন্থের ১৯৩ নং পৃষ্ঠায়! ভুলে উল্টোভাবে ছাপা এমন টিকিট মাত্র খানকতক আছে পৃথিবীতে! দৃষ্টিশক্তি চিরতরে খোয়াবার নোটিস পেয়ে গোকুলচন্দ্র বিলাত থেকে ঐ দুর্লভ ডাক-টিকিটগুলি সংগ্রহ করেন। সর্বসমক্ষে তা ফেলে রাখেন—কূট কৌশলে দিনলিপিতে ঐ নির্দেশ দিয়ে। অবিনাশ হাতে পেলেও তার অর্থ বুঝত না। অদ্ভুত কৌশল করেছিলেন তোমার দাদাশ্বশুর!

ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে দাঁড়ায়। জানায় তার ভাড়া উঠেছে—একুশ টাকা।

মিনতি তাকে তিনখানা দশটাকার নোট দিয়ে বলে, তোড়ানি আপ রাখ দিজিয়ে!

সর্দারজীর 'হাঁ'টা এতবড় যে দাড়ি-গোফের জঙ্গলের ভিতর দিয়েও তা দেখা গেল স্পষ্ট। মস্ত সেলাম করে সে বিদায় হল।

বাসু বলেন, এটা 'কিপ্রকার' ব্যবস্থা মিস্টিদিদি? অবধান কর ঃ ট্যাক্সি চালকের ক্ষেত্রে নয় তঙ্কা বকশিস্ এবং অম্মদীয়-ক্ষেত্রে একতঙ্কা ফি?

মিনতি হাসতে হাসতে বলে, আপনাকে আমার সর্বস্ব দিলেও যে ঋণ শোধ হবে না। বলুন—কী প্রণামী দেব?

—আপাতত তোমাদের ঐ ওয়েডিং কেক থেকে একটা ম্যাগনাম-সাইজ কর্তৃতাংশ/

রঞ্জন লাফিয়ে ওঠে ঃ ওয়েডিং কেক! বাই জোভ! কাল না আমাদের বিয়ে! মিস্টি। তোমার মনে ছিল?

মিনতি বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে মুচকি হেসে বললে, এ জন্যও আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এতদিনে ঐতিহাসিক-মশায়ের মনে পড়েছে—আগামীকাল আমাদের জীবনে একটি চিহ্নিত খণ্ডকাল!

শিবনাথ ততক্ষণে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া আর কেক-এর প্লেটটা নামিয়ে রাখছে সেন্টার-টেবিল। □

www.boiRboi.blogspot.com

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900